
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১৪৩
৮২

REGISTERED No. [redacted]

কৃষক

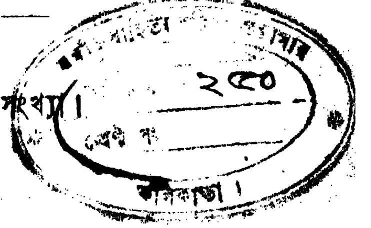
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

বৈশাখ, ১৩১৮।

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

দ্বাদশ খণ্ড,—১ম সংখ্যা।





সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

বৈশাখ, ১৩১৮।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



INDIAN ART SCHOOL.

সুরমা মর্ত্তের পারিজাত।

পুরাণের আখ্যানেই সাধারণে শুনিয়াছেন, যে স্বর্গে—ইন্দ্রের নন্দনে, দেবভোগ্য পারিজাত আছে। সেই পারিজাত দেবরাজ ইন্দ্রের শচীরাণীর সোহাগের বিলাসভোগ। পারিজাতের রং কেমন, গন্ধ কেমন, আকার কেমন, তাহা কেহ জানেন না। তবে, পারিজাতের গন্ধটা যে খুব মনমাতান তার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদি এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব পারিজাতের স্বর্গীয় সৌরভ কতকটা ধারণায় আনিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় সুরমা ব্যবহার করুন। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের সুরমা মর্ত্তের পারিজাত। শুধু গন্ধে নহে, সুরমা—সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ অথচ সুলভ সুগন্ধি কেশতৈল।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির ৸৹ আনা। ডাক-মাশুলাদি ।৵৹ আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। মাশুলাদি ৸৵৹ তের আনা।

শুক্রবল্লভ-রসায়ন।

শুক্রই শরীরের সার জিনিষ। কাজেই শুক্র-ক্ষয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না। শুক্রক্ষয়ে দেহ অবসন্ন, মন বিষণ্ণ, বর্ণের মলিনতা, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্কের বলহানি, শরীরে দারুণ গ্লানি প্রভৃতি উৎকট উপদ্রব উপস্থিত হইয়া, মানুষকে জীবন্মৃত করিয়া ফেলে। এই রসায়ন ঔষধ শীঘ্র শীঘ্র শুক্রবৃদ্ধি করিয়া, সেই সমস্ত দোষ দূর করিয়া দেয়। এই জন্যই ইহার নাম শুক্রবল্লভ। এই শুক্রবল্লভ সেবনে শুক্রধাতু গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা দূর হইয়া যায়, মনের স্ফূর্ত্তি ও দেহের কান্তি বৃদ্ধি পায়, উত্তেজনা ও ধারণাশক্তি আশানুরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক মাত্রাতেই ইহার উপকার অনুভব করা যায়। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৵৹ আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর

পুষ্পসার।

বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্‌কা বকুলফুলের মতই অটুট সুন্দর।



পারিজাত।—এ যেন সত্য সত্যই স্বর্গীয় সৌরভ!

বঙ্গমাতা।—বাঙ্গালীর "বঙ্গমাতা" সমস্ত বাঙ্গালার গৌরবস্বরূপ।

মিলন।—"মিলনের" সুবাস মিলনের মতই মনোরম!

রেণুকা।—আমাদের "রেণুকা" বিলাতী কাশ্মীরী-বোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে।

কামিনী—যামিনীর জ্যোৎস্না কামিনীর সৌরভে মধুরতর হইয়া উঠে।

চম্পক।—চাঁপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ!

বেলা।—অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় "বেলার" গন্ধ যেন স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়।

হোয়াইট রোজ।—নামের অনুবাদ করিলেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই আমাদের "শেউতি গোলাপ"।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸৹ বার আনা। ছোট ॥৹ আট আনা। প্রিয়জনের প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২॥৹ টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ টাকা। ছোট তিন শিশি ১।৹ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸৹ আনা, ডাক-মাশুল ।৵৹ আনা। অডিকলোন এক শিশি ॥৹ আনা, মাশুলাদি ।৵৹ আনা। আমাদের অটো-ডি-রোজ, অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া, অটো অব্ খস্‌খস্, অতি উপাদেয় পদার্থ। এক শিশি ১৲ এক টাকা, ডজন ১০৲ দশ টাকা।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্।

১৯৷২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কৃষক।

সূচী পত্র।

বৈশাখ, ১৩১৮ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

কৃষক

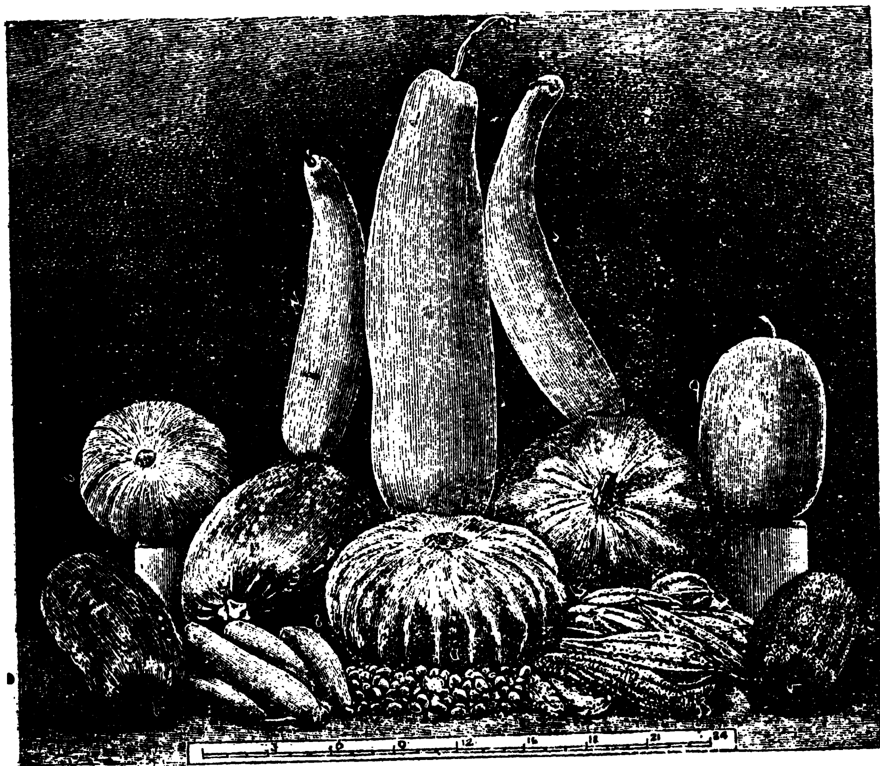


কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ খণ্ড। } বৈশাখ, ১৩১৮ সাল। { ১ম সংখ্যা।

সব্জী চাষ।

লাউ, কুমড়া, প্রভৃতির চাষ।



(১) লাউ (পাকা)। (২) লাউ (খাইবার উপযুক্ত)। (৩) খরমুজ, তরমুজাদি। (৪), (৫), (৬) বিলাতি কুমড়া। (৭) ছাঁচি কুমড়া। (৮) শসা। (৯) ধুঁধুল। (১০) গোমুখ ফুটি। (১১) করলা। (১২) ঝিঙ্গা।

লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি উদ্ভিদসমূহ উদ্ভিদজগতে শসাকী (Cucurbitaceæ) জাতির অন্তর্ভূক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। শসা এই জাতির আদর্শ বলিয়া উক্ত জাতির "শসাকী" নামকরণ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় এই জাতির অন্তর্ভূক্ত প্রায় ছয় শত প্রকার (species) জগতের বিভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ অপেক্ষকৃত কম। ডাক্তার প্রেণের বেঙ্গল প্ল্যাণ্টস্ (Dr. Prain's Bengal Plants) নামক পুস্তকে কেবল আঠারটী বর্গ (genus) এবং চৌত্রিশটী 'প্রকারে'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 'প্রকারে'র সংখ্যা সামান্য হইলেও শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের শঙ্কর উৎপাদনপ্রবণতা এত প্রবল যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় উক্ত উদ্ভিদসমূহের এক একটী প্রকার 'ভেদ' (variety) উৎপাদিত এবং সংরক্ষিত হইয়া থাক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদিত হয় এবং বৎসরের সকল সময়েই উক্ত জাতির কোন না কোন প্রকারের উদ্ভিদ আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই এই সমস্ত উদ্ভিদের এত অধিক বিস্তৃতির কারণ অনুমান করিতে পারা যায়। ইহাদের চাষ, অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসসাধ্য; কতিপয় প্রকারের (species) ফল সুবৃহৎ এবং অন্যান্য প্রকারের ফল ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষ গুণসম্পন্ন।

ঔষধার্থে কতিপয় শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়। ইহাদের অনেকেরই বিরেচক গুণ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি যেমন মাকাল, ব্রায়োনিয়া প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত মৃদু বিরেচক বলিয়া ব্যবহৃত হয়, আর অপর কয়েকটি, দৃষ্টান্ত স্বরূপ পটলের মূল বিষম বিরেচক বলিয়া ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃত চিকিৎসা শাস্ত্রে কুমড়া, পটল, কাঁকড়ি, তেলাকুচা ও মাকালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও এতদ্দেশে শোভার জন্য শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদিত হয় না, তথাপি এই জাতীয় কয়েকটী উদ্ভিদ দেখিতে যে অত্যন্ত মনোহর তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। ইউরোপের নানাস্থানে লতাকুঞ্জ প্রস্তুতের জন্য কুমড়া, করলা প্রভৃতির গাছ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহাদের পাতা, ফুল ও ফলের বৈচিত্রে কুঞ্জের শোভা যে অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এতদ্ভিন্ন লাউ খোলাও নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের এবং আফ্রিকার লাউর খোল হইতে বিভিন্ন প্রকার ভোজন পাত্র ও বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হয়। শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের বীজে যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসারময় পদার্থ এবং তৈল পাওয়া যায়। মান্দ্রাজ প্রদেশের কোন কোন স্থানে এই সমস্ত বীজ হইতে (প্রধানতঃ কাঁকড়ি) এক প্রকার আটা প্রস্তুত হয়। উহাদের তৈলও জ্বালানি এবং আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার জি, রক্সবর্গের মতে উক্ত আটা সুস্বাদু এবং বিশেষ পুষ্টিকর।

শসাকী জাতির পুরাতন ইতিহাস অত্যন্ত কৌতুহলপ্রদ। ইহাদের বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি ও পরিব্যাপ্তি অনেক উদ্ভিদ শাস্ত্রবিদ্ দ্বারা সমালোচিত হইয়াছে। তাহার ফলে বুঝিতে পারা যায় যে, লাউর উৎপত্তি আমাদের দেশেই। প্রমাণ স্বরূপ দেরাহুন প্রদেশের জঙ্গলী লাউর উল্লেখ করিতে পারা যায়। এই লাউর ফল ক্ষুদ্র ও তিক্তাস্বাদ বিশিষ্ট। সংস্কৃতে ইহাকে কটু তুম্বী বলে। এতদ্ভিন্ন মালাবার উপকুলে ও অ্যাবিসিনিয়া দেশে বন্য অলাবু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, উক্ত দুই স্থান হইতে লাউর বংশ পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতী কুমড়ার নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা আমাদের দেশের আদিম অধিবাসী নহে। কোন পুরাতন চীন অথবা সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আমেরিকায় ইহার বহু পুরাকাল হইতে অবস্থিতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন উদ্ভিদ্‌বিদের মত এই যে, বিলাতী কুমড়ার উৎপত্তি স্থান গিনিদেশে। ফলতঃ ইহা যে ভারতীয় নয় সে সম্বন্ধে সকলেই এক মত। ছাঁচি কুমড়ার উৎপত্তি স্থান মেক্সিকো কিম্বা টেক্সাস্ দেশ বলিয়াই বোধ হয়। লাউর ন্যায় খরমুজাই দুইটী বিভিন্ন স্থানে, অর্থাৎ আফ্রিকা ও ভারতে বন্যভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহা উক্ত উভয় কেন্দ্র হইতেই নানাস্থানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তরমুজার আদিম বাসস্থান উত্তর আফ্রিকা। শসার চাষ ভারতে অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। নিম্নবঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয়ের অনেক উচ্চ প্রদেশেও শসা দেখিতে পাওয়া যায়। কুমাউন হইতে আরম্ভ করিয়া সিকিম পর্য্যন্ত এক প্রকার বন্য শসা দৃষ্ট হয়। ইহা ক্ষেত্রজাত শসা হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। অপরাপর শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে চালকুমড়া জাপানে ও চীনে ঝিঙ্গা ও চিচিঙ্গা ভারতে প্রথম উৎপাদিত হয়।

শসাকী জাতীয় যে সমস্ত উদ্ভিদ এতদ্দেশে উৎপাদিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান।—পটল, চিচিঙ্গা, লাউ, কুমড়া, শসা, উচ্ছে, করলা, ধুন্দুল, ঝিঙ্গে, চালকুমড়া।

চাষ প্রণালীর সাদৃশ্যের হিসাবে শসাকী জাতীয় উদ্ভিদগণকে নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে প্রত্যেক জাতির নামের পার্শ্বে বৈজ্ঞানিক নাম প্রদত্ত হইল।

১ম শ্রেণী—পটল (১) Trichosanthes dioica Roxb.

২য় শ্রেণী—চিচিঙ্গা (২) Trichosanthes anguina Linn.

কুন্দরকী (৩) Trichosanthes disecа.

ধুঁধুল (৪) Luffa ægyptiaca Mill.

ঝিঙ্গা (৫) Luffa acutangula Roxb.

করলা (৬) Momordica Charantia Linn.

উচ্ছে (৭) Momordica Muricata Wild.

কাঁকরোল (৮) Momordica Cochinchinensis Spring.

৩য় শ্রেণী – লাউ (৯) Lagenaria Vulgaris Ser.

ছাঁচি কুমড়া (১০) Benicasia Cerifera Savi.

সফরী কুমড়া (১১) Cucurbita Pepo De.

বিলাতি কুমড়া (১২) Cucurbita Maxima Duch.

৪র্থ শ্রেণী—খরবুজা (১৩) Cucumis Melo Linn.

ফুটি (১৪) Cucumis Momordica R.

গোমুখ ফুটি (১৫) Cucumis Madraspatensis Wild.

শসা (১৬) Cucumis Sativus Linn.

খেঁড়ো (১৭) Cucumis (round variety).

কাঁকড়ি (১৮) Cucumis Melo Linn.

তরমুজ (১৯) Citrullus Vulgaris.

বিলাতি কদু (২০) Cucurbita Pepo De (Vas).

শসাকী জাতীয় প্রায় সমস্ত উদ্ভিদই লতানীয়া কাণ্ড বিশিষ্ট। আকর্ষণী নামক (Tendril) একটি প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ইহারা কোন প্রকার কঠিন পদার্থ অবলম্বন



করিয়া মৃত্তিকা ছাড়াইয়া উঠে। প্রকারভেদে আকর্ষণীর গঠনের তারতম্য হইয়া থাকে। মৃত্তিকার উপরিস্থিত লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছের অগ্রভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা কোন প্রকার অবলম্বন অনুসন্ধান করিতেছে এবং এই প্রকার অবলম্বনের অনুসন্ধানে উহাদের কাণ্ড অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে।

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের অপরাপর লক্ষণাবলীর মধ্যে কতিপয় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের অধিকাংশই লতানিয়া কাণ্ড বিশিষ্ট। শ্বেত ও পীত বর্ণ ব্যতীত ফুলের আর কোন রঙ্ দেখিতে পাওয়া যায় না। শসাকী জাতির আর একটি প্রধান লক্ষণ এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। এই জাতীয় সমস্ত গাছেরই পুষ্প এক লিঙ্গ; অর্থাৎ কেবল পুরুষ অথবা কেবল স্ত্রী। আবার এই জাতীয় গাছের অনেক 'প্রকার' গাছেই উভয় জাতীয় পুষ্প জন্মাইয়া থাকে, যেমন লাউ ও কুমড়ায়। কিন্তু অন্যান্য প্রকারে বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন জাতীয় পুষ্প উৎপন্ন হয়, যেমন পটলে। অনেক স্থলে ক্ষেত্রে যে পটল উৎপন্ন হয় না তাহার



কারণ এই যে, ক্ষেত্রে শুদ্ধ পুরুষ কিম্বা স্ত্রী জাতীয় লতা রোপিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে বিপরীত লিঙ্গ বিশিষ্ট লতা ক্ষেত্রে বসাইলে ফল উৎপন্ন হইতে থাকে। পুংপুষ্প ও স্ত্রী পুষ্পের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা বিশেষ কঠিন নহে। একটি সম্পূর্ণ উভলিঙ্গ পুষ্পের চারিটি আবর্ত্ত থাকে যথা নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম

কুণ্ড (Calyx), দ্বিতীয় ত্রক (Corolla), তৃতীয় পুং নিবাস (Stamen) ও চতুর্থ স্ত্রী নিবাস (Pistil)। এক লিঙ্গ পুষ্পে হয় পুং নিবাস কিম্বা স্ত্রী নিবাস থাকে। শসাকী জাতিতে কুণ্ডের নিম্নভাগ মিলিত ও উপরিভাগ পাঁচটি অংশ বিশিষ্ট ; এবং কুণ্ড নলের উপর অবস্থিত। পুং কেসরের সংখ্যা সাধারণতঃ ৩, কিন্তু কখনও কখনও ৫ বা ২ হইয়া থাকে। কুণ্ড নলের নিম্নে, মধ্যে অথবা উপরিভাগে পুং কেসর সংলগ্ন থাকে। কুমড়া প্রভৃতিতে ইহা দেখিতে অনেকটা ঢেউ খেলানে চুড়ির ন্যায়। স্ত্রী নিবাসের নিম্নভাগ স্থূল, মধ্যভাগ সুত্রবৎ এবং সূত্রবৎ অংশের উপর একটি, তিনটি বিভাগ বিশিষ্ট অংশ সন্নিবিষ্ট থাকে। আমাদের দেশে যে সমুদয় শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ্ দেখা যায় তাহাদের স্ত্রীপুষ্প প্রায়ই একক অর্থাৎ পুংপুষ্পের ন্যায় গোছা গোছা হয় না, কেবল কুমড়ারই উভয় জাতীয় ফুল একক দৃষ্ট হয়। পটল, চিচিঙ্গা ও কুন্দরিকার প্রত্যেকের পার্শ্ব গুলি ঝালরের ন্যায় কাটা। লাউর পুংপুষ্প অপেক্ষা স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ছোট।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শসাকী জাতীয় শঙ্কর উৎপাদন প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। শঙ্কর তিন প্রকার—বর্ণ-শঙ্কর (Genus-hybrids), প্রকার শঙ্কর (Species-hybrids), এবং ভেদ-শঙ্কর (Variety-hybrids)। এস্থলে 'বর্ণ', 'প্রকার' ও 'ভেদে'র কিয়ৎপরিমাণে ব্যাখ্যা আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ ইহা বলিতে পারা যায় যে, যে সমস্ত উদ্ভিদের পরস্পর এত নিকট সম্বন্ধ যে, তৎসমুদয়কে এক গোষ্টির অর্থাৎ এক পরিবারস্থ অন্য সকলের সহিত তুলনায় কতিপয় প্রধান প্রধান লক্ষণ এক বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; এই সকল উদ্ভিদ এক বর্ণ ভুক্ত। শসাকী জাতির অন্তর্গত 'লাফ্ফা' (Luffa) এইরূপ একটি বর্ণ। এক পরিবারস্থ এক একটির সহিত প্রকারের তুলনা করা যাইতে পারে। লাফ্ফা পরিবারে ঝিঙ্গে, তিত ঝিঙ্গে ও ধুন্দুল এইরূপ তিনটি প্রকার। ভেদ এবং প্রকার এতদুভয়ের বিভিন্নতা সময়ে সময়ে অতি অস্পষ্ট। জল, বায়ু, উত্তাপ, ভূমির অধিক অথবা অল্প আর্দ্রতা এবং অন্যান্য আকস্মিক অবস্থা নিবন্ধন একই প্রকার বৃক্ষের নানা প্রকার আকারগত বৈষম্য সংঘটিত হয়। ছোট, বড়, ঋজু, বক্র প্রভৃতি নানাবিধ প্রকার ঝিঙ্গে তাহার উদাহরণস্থল। যখন এইরূপ বৈষম্য বহু পুরুষানুক্রমে সংঘটিত হইতে থাকে, তখন ঐ লক্ষণ সমূহ স্থায়ী হইয়া যায় এবং 'ভেদ' একটি 'প্রকারে' উন্নত হয়। দুইটি বিভিন্ন 'ভেদে'র মধ্যে শঙ্কর উৎপাদিত হওয়া যেমন সহজ, দুইটি প্রকারের মধ্যে শঙ্কর হওয়া তেমন সহজ নহে এবং দুইটি বর্ণের শঙ্কর উৎপাদন করা সুকঠিন। পটল এবং করলা দুইটি বিভিন্ন বর্ণভুক্ত। পটলের রেণু করলার স্ত্রী পুষ্পে প্রয়োগ করিয়া ফল উৎপাদিত হইতে দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ ফলের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। শসাকী জাতির শঙ্করসমূহ সম্বন্ধে এত অধিক

বলার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, শঙ্কর উৎপাদন দ্বারা আকস্মিক 'ভেদ'কে স্থায়ী করিতে পারা যায়। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে, এইরূপ নূতন 'ভেদ' উদ্ভাবন করা অনাবশ্যক এবং যে সকল 'ভেদ' পুরুষানুক্রমে উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে তৎসমুদয়ই চাষ করিয়া গেলে আর কোনও ভাবনা থাকে না। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। যে জাতি যত শঙ্কর উৎপাদনে প্রবল তাহাকে ততই অধিক শঙ্কর উৎপাদন দ্বারা উন্নত করিতে হইবে। কারণ স্বভাবের উপর ভার ভার দিলে অনেক সময় অবাঞ্ছনীয় শঙ্কর উৎপাদিত ফসলের অধোগতি হইতে পারে।

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ জমি ব্যতিরেকে টবেও উত্তমরূপে জন্মান যাইতে পারে। যাঁহারা ফটক, তারের ঘর ও বাঙ্গালা প্রভৃতি সাজাইবার জন্য বিদেশীয় লতা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ সমস্ত লতার পরিবর্ত্তে, শসাকী জাতীয় কতিপয় লতা ব্যবহার করিতে পারেন। কাঁকরোল, চিচিঙ্গে, ছোট জাতীয় লাউ প্রভৃতিতে সুদৃশ্য ফটক প্রস্তুত হয়। এতদ্বারা বাগানের শোভা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিমাণ আহার্য্য ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সে এবং আমেরিকায় শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের যথেষ্ট আদর। লাউ, শসা, কাঁকড়ী, ফুটি প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং বিদেশে রপ্তানি করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে শসা, কুমড়া, লাউ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত নির্ব্বাচনের অভাবে দিনে দিনে অতি অপকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইতেছে। বিশেষতঃ তরমুজ, খরমুজ ও ফুটি প্রভৃতি এই জাতীয় যে কয়েকটি ফল অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া পরিগণিত হয়, সে কয়েকটিরও উৎকৃষ্ট 'ভেদ' সমূহ আজকাল আর প্রায় বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে অপকৃষ্ট জাতীয় ফল দ্বারা বাজার প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। ইহার একমাত্র প্রতীকার নির্ব্বাচন। নির্ব্বাচন ব্যতিরেকে উৎকৃষ্ট জাতির সমুত্থান এবং নিকৃষ্ট জাতির নিরাকরণ সম্ভবপর হইবে না। পূর্ব্বেই শঙ্কর উৎপাদন দ্বারা উন্নতি সাধনের বিষয় বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন দেশ হইতে বীজ প্রবর্ত্তন, দেশীয় বীজ সমূহের মধে উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন এই সমুদয়ই উন্নতির অন্যতম উপায়।

লাউ, কুমড়া প্রভৃতি সমস্ত শসাকী জাতীয় ফসলই দোঁয়াশ মাটিতে উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে; বরং বালির পরিমাণ অধিক হইলে তাদৃশ ক্ষতি হয় না, কিন্তু কর্দ্দমের পরিমাণ অধিক হওয়া উচিত নহে। অনেক স্থলেই লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি গৃহ প্রাঙ্গনেই রোপিত হইয়া থাকে এবং গোয়ালের আবর্জ্জনা ও উনুনের ছাই সার রূপে ব্যবহৃত হয়। গোবর এবং ছাই উভয়ই শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে উত্তম সার। কিন্তু গোবরের আধিক্যে অনেক সময় গাছ কেবল বড় হইয়া থাকে এবং ফল হয় না। তজ্জন্য গোবর সার কিছু কম করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

বিঘা প্রতি ৮ মণ অসিক্ত (unslaked) ছাই এই সমস্ত উদ্ভিদের পক্ষে উত্তম সার বলিয়া পরিগণিত হয়। ছাই প্রয়োগে জমির কৈশিক আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে গাছে অধিক পরিমাণে জল শোষিত হয় এবং ফলও বড় হইয়া থাকে। গাছে জল প্রয়োগ করার সময় যাহাতে গাছের গোড়ায় জল না জমে তৎসম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। গাছের কাণ্ডে জল লাগিলে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়া থাকে।

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের চাষ প্রণালী—সাধারণতঃ দোয়াঁশ মৃত্তিকাই প্রশস্ত।

সার (একর প্রতি)—	নাইট্রোজেন	...	৫০ হইতে ৬০
	পটাস	...	১৫০ হইতে ১৬০
	ফস্ফরিক অম্ল	...	৮০ হইতে ১০০

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের বীজ হইতে সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম হয়।

নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার বীজের অঙ্কুরোদ্গমকাল পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে:—

তরমুজ	...	৮ হইতে ১৩ দিন
খরমুজ	...	৫ ,, ১০ দিন
কুমড়া	...	৫ ,, ১০ দিন
স্কোয়াস	...	৫ ,, ১০ দিন

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ১০০০ গ্রামে প্রায় (১০০০ গ্রাম প্রায় ২ পাউণ্ড) নিম্ন লিখিত পদার্থ গুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

জল	...	৯৫৮·০০৬
নাইট্রোজেন	...	০·৪৯৩
খনিজ পদার্থ	...	৫·৬১০
ফস্ফরিক অম্ল	...	০·৬২৭
পটাস	...	২·৩৯০
সোডা	...	০·০০৮
চূণ	...	০·৪৯৬
ম্যাগ্নেসিয়া	...	০·০০৮

এক একর (প্রায় তিন বিঘা) জমিতে সরিষার খৈল ৬ মণ, ছাই ১০ কিম্বা ১২ মণ, ঘুঁটে চূর্ণ ৩ মণ এবং হাড়ের গুঁড়া ১ মণ মিশ্রিত করিয়া লাউ, কুমড়া শসা, খরমুজ, কাঁকুড়, কাঁকড়ী চাষে ব্যবহার করিলে পর্য্যাপ্ত ফসল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এই রূপ সার প্রয়োগের কথা উল্লেখ করা গেল। ইহাদের প্রত্যেকের চাষ প্রণালী বর্ণনায় সময় বিশেষ সারের কথা বলা হইবে।

আলুর চাষে কীট।

জনৈক কীটতত্ত্ববিদ্ লিখিত।

কৃষি সমাচার পত্রিকার কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ, এফ, আর, এইচ, এস, মহাশয় গোল আলুর চাষ সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে আলোচিত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া কেবল আলোচিত "আলুর শত্রু" সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতেছি। "আলুর কীট" নামক চিত্র পুষা পত্রিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে। চিত্র পরিচয় ও মন্তব্যে এক দুই করিয়া নম্বর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু চিত্রে নম্বর নাই—অতএব চিত্র প্রকাশ এবং চিত্র পরিচয় ও মন্তব্য সকলই বৃথা হইয়াছে। কারণ কাহার বিবরণে কি বলা হইতেছে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। মূল প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে নিম্নে বলিতেছি।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের দেশের লোকের কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান কত অল্প বেশ বুঝা যায়। ঈশ্বরবাবু এফ, আর, এইচ, এস, উপাধিধারী, শিক্ষিত এবং তাহার উপর কৃষিকার্য্যে আস্থাবান এবং ঐ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কীট, পতঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহারই জ্ঞান যখন এত কম এবং ভ্রমপূর্ণ, তখন সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞানের আমাদের বড়ই অভাব। এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা আদৌ ছিল না। কাজেই বাঙ্গালা ভাষায় কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে কোন পুস্তকও ছিল না। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য "ফসলের পোকা" নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়া ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এই পুস্তকের নামের চাকচিক্য না থাকিলেও ইহাতে কীট পতঙ্গের সঠিক বিবরণ আছে। ইহার পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে এরূপ পুস্তক থাকিতেও ঈশ্বর বাবু যে কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে ভ্রমপূর্ণ কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত করুণানিধান সিংহ "কীড়া ও পীড়া" নাম দিয়া কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রচার করেন। করুণা বাবুর যাহা দোষ, ঈশ্বর বাবুরও সেই দোষ। ভারতীয় কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে উভয়েরই জ্ঞান নাই। বিলাত ও আমেরিকায় এই সম্বন্ধে নানা রকম পুস্তক, প্রবন্ধ, পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইঁহারা এই সকল পাঠ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই সাধারণ মধ্যে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, বিলাত বা

আমেরিকার পোকার সঙ্গে অধিকাংশ স্থলেই ভারতবর্ষের পোকা সকলের মিল নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী পোকার কথা বলিতেছি। আমেরিকায় যে পোকা কার্পাসের গুটীর ক্ষতি করে, সে পোকা ভারতবর্ষে কার্পাস স্পর্শও করে না। আবার ভারতবর্ষে যে পোকা কার্পাস নষ্ট করে আমেরিকায় সে পোকাই নাই। অতএব আমেরিকার লিখিত কার্পাসের পোকার বিবরণ যদি ভারতবর্ষে প্রকাশ করা যায়, তবে কি ফল হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। করুণাবাবুর "কীড়া ও পীড়া" এবং ঈশ্বরবাবুর "আলুর শত্রু"র ফলও তাহাই। সুফল আদৌ নাই, কুফল যথেষ্ট আছে। কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লোকে আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে। কিন্তু এইরূপ লেখকের যথোচিত জ্ঞানাভাবে প্রবন্ধ এতই দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া যায় যে, কীট পতঙ্গের বিবরণ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের বিতৃষ্ণা হওয়া অসম্ভব নয়। আলুর পোকা বুঝাইতে যাইয়া ঈশ্বরবাবু লিখিয়াছেন "ইহারা অনেকাংশে ইংলণ্ড দেশীয় 'কেটারপিলার' (Caterpillar) নামক কীটের সদৃশ" "ইংলণ্ডীয় "ফ্লোর বিটল্" (Flour Beetle—Tubo Ferrugenium) নামক কীটের সহিত ইহাদের আকারের সাদৃশ্য আছে। সাধারণ পাঠক কি বুঝিল বা ঈশ্বরবাবু নিজেই কি বুঝিলেন বলিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিলাতের পোকার বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদের দেশের পোকার জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। আমাদের দেশের পোকার জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শ্রীযুক্ত মাকসয়েল লেফ্রয় সাহেব কর্ত্তৃক পুষা কৃষি-কলেজ হইতে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, ইংরাজি অভিজ্ঞ পাঠক তাহা পাঠ করিলে বিশেষ ফল লাভ করিবেন। যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহারা "ফসলের পোকা" পাঠ করিতে পারেন ইহাও পুষা কৃষি-কলেজ হইতে সহকারী কীটতত্ত্ববিদ্ শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত। বলা বাহুল্য পুষা কৃষি-কলেজেই কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইতেছে।

ঈশ্বরবাবু কীটতত্ত্বের জ্ঞানাভাবে এই প্রবন্ধে কীটতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যদি শোলা পোকাকে বাছিয়া লইয়া মারিয়া ফেল, তবে তাহাদের মধ্যে যদি কোনটী গর্ভবতী থাকে, তবে নূতন কীটের জন্ম হইবে।" প্রথমতঃ শোলা পোকা কখনও গর্ভবতী পারে না। শোলা পোকা প্রজাপতিতে পরিণত হইলে তবে গর্ভবতী হয়। আবার—"পোকাদের বিশেষত্ব এই যে, যখন পোকা পতঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই ইহার পেটে ডিম হয়। এই ডিম সঞ্জীবিত করিবার জন্য স্ত্রী ও পুং পতঙ্গের সঙ্গম আবশ্যক হয়। সঙ্গম না করিলেও স্ত্রী পতঙ্গ ডিম প্রসব করিতে পারে, কিন্তু এই রকম ডিম কখনও ফোটে না।" (ফসলের পোকা ১৫-১৬ পৃষ্ঠা)। আরও বিশেষত্ব এই যে, স্ত্রী ও পুং পতঙ্গের সঙ্গম হইলেই গর্ভস্থ ডিম সঞ্জীবিত

হয় না। স্ত্রী পতঙ্গের একটী বিশেষ বীর্য্যস্থালী আছে। পুং বীর্য্য এই বীর্য্যস্থালীতে সঞ্চিত হয় এবং থাকে। স্ত্রী পতঙ্গ যেমন এক একটী ডিম পাড়ে গর্ভ হইতে বাহিরে আসিবার পথে এই ডিম বীর্য্যস্থালীতে সঞ্চিত বীর্য্যের সামান্য প্রাপ্ত হয়। এইরূপে একটীর পর একটী ডিম সঞ্জীবিত হয়। বীর্য্যস্থালীতে বীর্য্য সঞ্চিত রাখিতে পারে বলিয়া পতঙ্গেরা জীবনে একবারের বেশী সঙ্গম করে না এবং পুনর্ব্বার সঙ্গমের আবশ্যকতাও হয় না। একটী পতঙ্গই বহু ডিম প্রসব করে। প্রজাপতিরা প্রায় এক একটীতেই তিন চারি শত ডিম পাড়ে। একবার সঙ্গম করিলেই এক একটী করিয়া যেমন ডিম প্রবস করিবে, সকলেই সঞ্জীবিত হইবে। রাণী মধুমক্ষিকা ৩।৪ বৎসর বাঁচে এবং জীবনে সহস্র সহস্র ডিম পাড়ে, কিন্তু একবার মাত্র সঙ্গম করে। সঙ্গমের পর যদি স্ত্রী পতঙ্গকে কাটিয়া গর্ভ হইতে ডিম বাহির করিয়া লওয়া যায়, তবে সে ডিম কখনও ফুটিবে না, কারণ তাহা সঞ্জীবিত নয়। সঙ্গমের পর স্ত্রীপতঙ্গ স্বেচ্ছায় যে ডিম প্রসব করিবে, কেবল সেই ডিমই সঞ্জীবিত ইহবে এবং কেবল তাহা হইতেই সন্তান জন্মিবে। অতএব ঈশ্বরবাবু যে লিখিয়াছেন "পোকাকে অত্যধিক মাটীর নীচে পুঁতিলে পিপীলিকা প্রভৃতি উহার ডিম্বকে মাটির উপরে তুলিয়া ফেলিতে পারে এবং উহা হইতেও পুনরায় নুতন কীট জন্মিবার সম্ভাবনা আছে" তাহা ভুল।

ঈশ্বরবাবু লিখিয়াছেন, "সার ও অন্যান্য অনেক পদার্থেই স্বভাবতঃ কীট জন্মিয়া থাকে।" একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যথা--"জল দ্বারায় একটী হাঁড়িপূর্ণ করিয়া তাহাতে বাকলসহ কতকগুলি গুবাক অর্থাৎ কাঁচা বা পাকা সুপারী ভিজাইয়া রাখুন। হাঁড়ির মুখ অন্য কোন বস্তুর দ্বারায় ঢাকিয়া দিয়া, তদবস্থায় ঐ আচ্ছাদিত হাঁড়িটী কয়েক সপ্তাহ রাখুন। উহার মুখের আবরণ খুলিলেই দেখিতে পাইবেন যে, কতকগুলি মশা জন্মিয়াছে।" এবং প্রশ্ন করিয়াছেন, "ইহারা কি স্বভাব হইতে জন্মে নাই?" উত্তরে বলিতে পারি যদি ঈশ্বরবাবু অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন যে, মশা আপনা আপনিই জন্মে নাই। পূর্ব্বে মশা ঐ জলে ডিম পাড়িয়াছিল এবং সেই ডিম হইতেই পুনরায় মশা জন্মিয়াছে। ইহা দেখিবার জন্য সুপারি বা অন্য কিছুই ভিজাইয়া রাখিতে হইবে না। "মশারা জলের উপর গাদা করিয়া কাল কাল ডিম পাড়ে। বিশেষতঃ খাল ডোবায় যে জল দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাই বেশী ভাল বাসে। ভাঙ্গা হাঁড়ি, খোলা বা গামলায় জল থাকিলে তাহাতেও ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া কীড়ারা জলেই থাকে। * * * ইহাকেই সাধারণতঃ জলের পোকা বলে। কুণ্ডলী হইয়া জলের মধ্যেই থাকে। তারপর মশা হইয়া ঘরে আসে।" (ফসলের পোকা—১০২ পৃষ্ঠা) ইহাই মশার আচরণ।

কাঁচা বিষ্ঠা বা গোবরেও প্রথমে পোকা ডিম পাড়ে, তবে এই ডিম হইতে কীটের উৎপত্তি হয়। পাকা আমে বাহিরে কোনরূপ ক্ষতচিহ্ন না লক্ষিত হইলেও ভিতরে "মুড়ির" মত শাদা শাদা পোকা দেখা যায়। এই পোকাকে যদি একটী গ্লাসের ভিতর সামান্ত সেঁতসেঁতে মাটীর সহিত রাখা যায়, তবে ৫।৬ দিন পরে দেখা যাইবে, এই পোকা এক রকম হলদে মাছি হইয়া বাহির হইয়াছে। এই মাছিই প্রথমে আমে ডিম পাড়ে এবং এই ডিম হইতেই আমের কীটের জন্ম হয়। আপনা আপনি স্বভাব হইতে কোন পোকাই জন্মিতে পারে না। ফলের মাছি পোকা নাম দিয়া "ফসলের পোকার" ৭৭ পৃষ্ঠায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে এবং ১৪শ চিত্র পটে ইহার সুন্দর চিত্র আছে। ঈশ্বরবাবুর অবগতির জন্য বলিয়া দিতেছি যে, (Mildews) কোন পোকা নয়, ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বিশেষ।

যে সকল পোকা ক্ষেত্রস্থ এবং গোলাজাত আলুর ক্ষতি করে, তাহাদের বিবরণ চিত্রসহ বিশেষভাবে "ফসলের পোকায়" দেওয়া আছে। ঈশ্বরবাবুর প্রবন্ধের জন্য "আলুর কীট" নামক যে চিত্রপট "কৃষি-সমাচারে" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই চিত্রও সুন্দর আছে। সেই জন্য এস্থলে পুনরায় আলুর পোকার আলোচনা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

আর্য্য কৃষিরীতি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন লিখিত পুঁথি হইতে সংগৃহিত।

হল চালন বিধি।

শুভেহর্কে চন্দ্রসংযুক্তে শুক্লযুগ্মেন বাসসা।
শুক্লপুষ্পৈশ্চ গন্ধৈশ্চ পূজায়িত্বা যথাবিধি॥
পৃথিবীং হলসংযুক্তাং পৃথূঞ্চৈব প্রজাপতিম্।
অগ্নেঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভূরি দত্তা চ দক্ষিণাম্॥
ফালাগ্রং স্বর্ণ সংযুক্তং কৃত্বা চ মধুলেপনম্।
অহেঃ ক্রোড়ে বামপার্শ্বে কুর্য্যাদ্ধলপ্রসারণম্।
স্মর্ত্তব্যো বাসবো ব্যাসঃ পৃথু রাম পরাশরঃ।
সম্পূজ্যাগ্নিং দ্বিজং দেব কুর্য্যাদ্ধলি প্রসারণম্॥

রবি ও চন্দ্রশুদ্ধ দিবসে, শুক্ল যুগ্ম বস্ত্র, শুক্ল পুষ্প ও গন্ধাদি দ্বারা যথাবিধি (গণেশাদি ও ক্ষেত্র পালাদি) হল সংযুক্তা পৃথিবী, পৃথু ও প্রজাপতির পূজা করতঃ

অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক যথেষ্ট দক্ষিণা দান করিবেন এবং ফালাগ্রে স্বর্ণ স্পর্শ করতঃ ঘৃত দধি ও আজ্য প্রদান ও মধু লেপন করিয়া সরস ক্ষেত্রে কৃষকের বাম পার্শ্বে (উত্তর মুখে) হল চালন করিবেন। হল চালনের পূর্ব্বে বাসব, ব্যাস, পৃথু, রাম ও পরাশরকে স্মরণ করিয়া অগ্নি, দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করিতে হইবে। বাসবকে অর্ঘ দান করিবার বিশেষ মন্ত্র আছে। উত্তরাভিমুখ হইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

মন্ত্র যথা;—

শুক্ল পুষ্প সমাযুক্তং দধিক্ষীরসমন্বিতম্॥
সুবৃষ্টিং কুরু দেবেশ! গৃহাণার্ঘ্যং শচীপতে!॥

রাঢ়দেশে বাড়ীতে পূজা কার্য্য সমাধানন্তর ক্ষেত্রে হল চালন করিতে যাওয়া রীতি আছে। হল চালনার্থে যাত্রা কালীন পথে যাত্রা বিরুদ্ধ ব্যাপার দর্শন হইলে হল চালনে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। এই সময় শুভযাত্রার অঙ্গ সকল সন্দর্শনে প্রভূত ইষ্ট হয়। যাত্রাকালীন যে গুলি ইষ্ট এবং যাহা স্মরণাদিতেও শুভ হয় এস্থলে তাহা বলিতেছি;—

শুভ যাত্রার সদুপায়।

ধেনুর্বৎস প্রযুক্তা বৃষগজতুরগা দাক্ষিণাবর্ত্তো বহ্নিঃ।
দিব্যা স্ত্রী পূর্ণকুম্ভা দ্বিজনৃপগণিকা পুষ্পমালা পতাকা॥
সদ্যোমাংসংঘৃতংবা দধিমধুরজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যম্।
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহলভতে মানবো গন্তুকামঃ॥

বৎসযুক্তা ধেনু, বৃষ, গজ, তুরগ, দক্ষিণ শিখাবাহী অগ্নি, দিব্যা (সুশ্রী) স্ত্রী, পূর্ণকুম্ভ, দ্বীজ, নৃপ, গণিকা (বেশ্যা), পুষ্পমালা, পতাকা, সদ্যোমাংস, ঘৃত, দধি, মধু, রজত, কাঞ্চন, ও শুক্লধান্য এই সকল দর্শনে এবং এই শ্লোক শ্রবণে ও পঠনে যাত্রাকারী মানব শুভফল প্রাপ্ত হয়েন। যাত্রাকালীন শুভপ্রাপ্তেচ্ছুকদিগের এই শ্লোকটি অভ্যস্থ রাখা আবশ্যক।

হলারম্ভের বিষয়।

নিবিষ্টো বিষ্টরে ভক্তং সংস্থাপ্য জানুনীক্ষিতৌ।
প্রণমেদ্বাসবং দেবং মন্ত্রেণানেন কর্ষকঃ॥
বৃষো মহাকটির্ব্ব্যশ্ছিন্নলাঙ্গুল কর্ণকঃ।
সর্ব্বশুক্লস্তথা বর্জ্যঃ কৃষকৈর্হল কর্ম্মণি॥
হলপ্রসারণং কার্য্যং নীরুগ্‌ভির্ব্বৃষ কর্ষকৈঃ।
ছিন্নরেখা ন কর্ত্তব্যা যথা প্রাহ পরাশরঃ॥
একা তিস্রস্তথা পঞ্চ হলরেখাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একা জয়করি রেখা তৃতীয়া চার্থ সিদ্ধিদা।
পঞ্চমাখ্যাতু যা রেখা বহু শস্যপ্রদায়িনী॥

কুশাসনে উপবিষ্ট মানব জানুদ্বয় ভূমিতে সংস্থাপন করিয়া মন্ত্রাদি দ্বারা বাসবকে প্রণাম করিবে। বিশাল কটিবিষ্ট ছিন্ন লাঙ্গুল ছিন্ন কর্ণ ও সর্ব্ব শুক্ল বর্ণ বৃষ হলপ্রবাহে (হাল পূর্ণায়) নিষিদ্ধ। কর্ষক ব্যক্তি হাল পূর্ণে নিরোগী বৃষ দ্বারা কর্ষণ করিবেক। হলারম্ভ কালে যেন ছিন্ন রেখা না হয়। এক তিন ও পাঁচ রেখাই উক্ত সময়ে প্রশস্ত। এক রেখা জয়করী তিনরেখা অর্থ সিদ্ধিদা, ও পঞ্চম রেখা বহু শস্য প্রদায়িনী বলিয়া কথিত হয়।

এদেশেও আড়াই পাক লাঙ্গল চষার রীতি আছে। আড়াই পাক চষিলেই পঞ্চরেখা হইয়া থাকে। ক্রমশঃ

সরকারী কৃষি সংবাদ।

বিহারে মুর্গা চাষ।—এফ, এম কভেন্ট্রি সাহেব মুর্গা চাষ সম্বন্ধে অনেক তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধান ফল তিনি বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিহারের মাটি ও আবহাওয়া মুর্গা চাষের উপযোগী। বিহারে এমন অনেক জমি আছে, যাহাতে এখন নীল কিম্বা অন্য শস্য ভাল হয় না, তথায় ঐ মুর্গার চাষ ভাল হইবে। তিনি এমন কথা বলেন না যে, অনুর্ব্বরা মাটিই মুর্গা চাষের পক্ষে ভাল। মাটি যত উর্ব্বর হইবে, ততই মুর্গা চাষের অনুকুল হইবে, কিন্তু যে জমিতে মুর্গা চাষ করা হইবে, তাহা হইতে তিন বৎসরের মধ্যে কোন আয় হওয়া সুকঠিন, সুতরাং কোন ভাল জমি লইয়া মুর্গা চাষ আরম্ভ করিলে জমি হইতে আয় হইবার পূর্ব্বে অনেক ব্যয় হইয়া পড়ে, সেই জন্য অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর এবং কম খাজনায় জমি লইয়াই মুর্গার চাষ আরম্ভ করা বিধেয়।

গাছগুলি ৩ কিম্বা ৪ বৎসর না হইলে তাহার পত্র হইতে সূত্র বাহির করা চলে না এবং গাছ ছয় সাত বৎসরের হইলেই তাহাতে শিষ বাহির হইয়া গাছ মরিয়া যায়।

গাছের গোড়ায় যে তেউড় বাহির হয়, একটি হিসাবে তেউড় রাখিয়া সেগুলি স্থানান্তরে বসান যাইতে পারে কিম্বা পুষ্পিত শিষ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া মুর্গার চাষ বাড়ান যাইতে পারে। শিকড় হইতেও মুর্গার চারা বাহির হয়। রিজিডা এবং সিশালানা (Agave Rigida and Agave Sisalana) এই দুই জাতীয় মুর্গাই ভাল এবং দুই জাতীয় মধ্যে কাঁটাযুক্ত মুর্গা অপেক্ষা কাঁটাশূন্য মুর্গাই ভাল। সূত্র বাহির করিতে কাঁটাশূন্য মুর্গায় কম খরচ পড়ে এবং কাঁটাশূন্য মুর্গার সূত্রও

অপেক্ষাকৃত শক্ত। ১৯০৩ সালে এই মুর্গার সূত্র এক টন ৩৮ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। ভারতীয় মুদ্রায় এক পাউণ্ড ১৫৲ টাকা।

দ্বিতীয় বৎসরেও পাতা সংগ্রহ করিয়া সূত্র বাহির করা যাইতে পারে, কিন্তু ছোট পাতা এবং পাতা কম বলিয়া সূত্র কম হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে গাছ পূর্ণ বয়স্ক হয়, তখন গাছে সূত্রের পরিমাণও বাড়ে। প্রত্যেক গাছ হইতে ১৫ হইতে ২০টি, কেহ কেহ বলেন ৩০টি পর্য্যন্ত পাতা সংগ্রহ হইতে পারে। গড়ে ২০টি পাতা ধরিয়া লইলে এবং একরে ১৬০০ গাছ গণনা করিলে এবং প্রত্যেক গাছে এক পাউণ্ড হিসাবে সূত্র হইলে, এক একরে প্রতি বৎসর ৩২০০ পাউণ্ড সূত্র উৎপন্ন হইবে। এই সূত্রের ৩৷৷০ সাড়ে তিন ভাগ কার্য্যোপযোগী বিবেচনা করিলে একরে ১,১২০ পাউণ্ড সূত্র পাওয়া গেল—অর্থাৎ ২ একরে প্রায় এক টন সূত্র জন্মিল। সূত্র নিষ্কাশের অনেক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মেঃ ইউয়িং কোম্পানির যন্ত্রটি ভাল। ইহাতে চিরুণীর দাড়ার মত দাড়া আছে। পাতা আহরণ, সূত্র বাহির করণ, গাড়ীভাড়া, গাঁট বাঁধাই খরচ, জাহাজ ভাড়া, বিমা খরচ ইত্যাদি প্রায় প্রতি টন ১২ পাউণ্ড হয়। ইহার উপর চাষের খরচ ও জমির খাজনা আছে এবং তাহাতে প্রতি একরে ২০৲ টাকার কমে হয় না এবং অতএব দুই একরে ৪০৲ টাকা হিসাবে প্রায় তিন পাউণ্ড প্রতি টনে খরচ পড়িল। এক্ষণে বুঝা গেল যে, এক টন সূত্র বিলাতের বাজারে পাঠাইতে খরচ ১৫ পাউণ্ড। কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতের বাজারে মুর্গার দর ৩০ হইতে ৪০ পাউণ্ড ছিল। এখন দর কমিয়া প্রায় ২৩ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। এই হিসাবে এগেভ বা মুর্গা চাষে প্রতি একরে লাভ ৪ পাউণ্ড বা ৬০৲ টাকা মাত্র।

বঙ্গে রবিশস্য। ১৯১০-১১।—যব, গম, তামাক, পোস্ত এবং কলাই, মুগ, মটর, ফাপর, চীনা, আলু, অন্যকন্দ, ফুটি, তরমুজ, লঙ্কা এবং অন্য মশালা প্রভৃতি সমুদয়ই রবিখন্দের অন্তর্ভুক্ত।

২৪ পরগণা ব্যতীত প্রেসিডেন্সি বিভাগ, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, কটক, রাঁচি প্রধানতঃ বিহারে রবিখন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আশ্বিনের শেষ সুবৃষ্টি হইয়াছিল। অগ্রহায়ণে বিহারে এবং ছোটনাগপুরে বৃষ্টি হইয়াছিল অন্যত্র হয় নাই। পৌষ মাসে কোথাও বৃষ্টি হয় নাই। তারপর মাঘ মাসে সর্ব্বত্র উচিত মত বারিপাত হওয়ায় রবিখন্দের বিশেষ উপকার দর্শে।

১৯০৯ ১৯১০ সালে রবিশস্যের আবাদের পরিমাণ ৬,৬৯৯,৩০০ একর, বর্ত্তমান বর্ষের জমির জমির পরিমাণ ৭,২২৫,১০০ একর রবিশস্য সর্ব্বত্রই ভালরূপ জন্মিয়াছে। প্রায় সকল জেলাতেই ৸৵০ আনা ফসল হইয়াছে, কোথাও কোথাও ষোল আনার উপর। মোটের উপর অনুমান হয় ১,০৮৯,৬০০ হন্দর ফসল পাওয়া যাইবে। বিগত বর্ষের ফসলের পরিমাণ ৯৯৮,৪০০ হন্দর।

পূর্ব্ববঙ্গের রবিশস্য। ১৯১০-১১।—বোরোধান প্রধানতঃ মৈমনসিং, ঢাকা, মালদা, এবং রাজসাহিতে জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে ৭,২০০ একর অধিক পরিমাণ জমিতে উক্ত ধানের আবাদ হইয়াছে। ষোল আনা ফসলেরও আশা করা যায়।

যব চাষের জমির পরিমাণ ৬৫,২০০ একর। ফসল চৌদ্দ আনা হইবে আশা করা যায়।

মটর প্রভৃতি কলাই।—জমির পরিমাণ ৯৫১,৭৯ একর; বিগত বৎসর অপেক্ষা চাষ ৪,৫০০ একর কম। ফসলের পরিমাণ অনুমান তের আনা হইবে।

তামাক।—কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি হেতু তামাক চাষের বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। সেই জন্য কিছু কম জমিতে তামাকের আবাদ হইয়াছে। মাঘ মাস পর্য্যন্ত তামাক চাষের অবস্থা বেশ ভালই ছিল, কিন্তু ইহার পর বেশী শীতে খারাপ হইয়াছে। শিলা-বৃষ্টিতেও ক্ষতি হইয়াছে। ষোল আনা ফসল হইবে না।

গাঁজা।—এতদঞ্চলে প্রায় ৯০০ একর জমিতে গাঁজার আবাদ হয়। ফসল আট আনা রকম হইবে।

শণ।—পাবনা এবং চট্টগ্রামে শণের চাষ সর্ব্বাধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষে ৩০,৫০০ একর পরিমাণ জমিতে শণের চাষ হইয়াছে। ফসল চৌদ্দ আনা হইবে। রাজসাহী ও অন্যান্য জেলায়ও অল্পবিস্তর শণের চাষ হয়।

আলু মন্দ জন্মায় নাই, জই, মশালা, তরিতরকারি ভাল হয় নাই।

বঙ্গের কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র।

সাবর কৃষি-কলেজ।—সাবর কৃষি-ক্ষেত্র বঙ্গীয় কৃষি-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। শ্রীপুর ক্ষেত্রে অতঃপর আর কৃষি-পরীক্ষা করা হইবে না। পুর্ণিয়া, বারহামপুর, কৃষ্ণনগর এবং চুঁচুড়াক্ষেত্রে সরকারি খরচে পাটবীজ উৎপন্ন করা হইত। অতঃপর পাটবীজের জন্য তথায় পাট চাষ হইবে না।

বঙ্গে নীলের পুনরুদ্ধার।—বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ বিহার নীলকর সাহেব-গণের সহিত নীল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। মজঃফরপুর, সিরসিয়া গ্রামে এই অনুসন্ধানাগার স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ বার্গথিল এই কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বর্দ্ধমান এবং কটকে পাট ও ধানের পর্য্যায় চাষ।—

একর প্রতি পাট বীজ ৪॥০ সের।

গোময় সার একর প্রতি ১০০ মণ।

পাট কাটিয়া সেই ক্ষেত্রে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি ধান রোপণ করা হয়।

১। ধানে একর প্রতি ১॥০ মণ সোরা আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি দিতে হয়।

২। পাট এবং আলুর পালটি চাষ।—আলুতে একর প্রতি ২০ মণ রেড়ীর খৈল ব্যবহার করিতে হয়; অথবা ২০০ মণ গোময় ও ৩ মণ সুপার এবং ২ মণ সোরা ব্যবহার করা হয়। পাট চাষের সময় কোন সার ব্যবহার করা হয় নাই। বর্দ্ধমান এবং কটক ক্ষেত্রে এইরূপ পরীক্ষায় সুফল হইয়াছে।

৩। পাটের সহিত কলাইয়ের পালটি চাষও বিশেষ আশাপ্রদ।
কলাই চাষে একর প্রতি ১০০ মণ গোময় ব্যতীত অন্য কোন সারের আবশ্যকতা নাই। ইহা কটক ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইয়াছে।

৪। পাটের পরীক্ষা।—বর্দ্ধমান ও কটকে দেশওয়াল বারপাত এবং হেউতি—এই দুই জাতীয় পাট পরীক্ষায় ভাল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।
পাটে একর প্রতি ১০০ মণ গোময় কিম্বা ৭ মণ রেড়ীর খৈল সাররূপে প্রয়োগে শুভ ফল হয়।

৫। ধানে সার।—একর প্রতি ৫০ মণ গোময়, অথবা একর প্রতি ৬ সের ধঞ্চে বীজ বুনিয়া তাহাই সবুজ সাররূপে ব্যবহার করিতে হয়।
বর্দ্ধমান, কটক এবং ডুমরাঁও এই তিন ক্ষেত্রে এই সার পরীক্ষায় উত্তম বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।
মধ্য প্রদেশের আউস ধান কটকে ভাল রকম জন্মিতে দেখা যায়।
৯ ইঞ্চি অন্তর বীজ ধান রোপণ করিয়া সর্ব্বত্রই ফলন ভাল দাঁড়াইয়াছে।

৬। খড়ি ইক্ষুর চাষ সর্ব্বত্র বেশ লাভজনক। ইকুরি জাতীয় ইক্ষু আর্দ্র স্থানে ভালরূপ জন্মায়।
ইক্ষু চাষে একর প্রতি ২০০ মণ গোময় ও ৮ মণ রেড়ীর খৈল সার প্রযুজ্য।

৭। মজঃফরনগর শাদা গম এবং লাল দেশী কাণপুর গম, অন্যান্য জাতীয় ভারতীয় গম অপেক্ষা কম রোগাক্রান্ত হয়।

৮। ডুমরাঁও জৈ, সারণ জোয়ার, জব্বলপুর ভুট্টা, পাটনা ছোলা, জব্বলপুর ও রায়পুর সরিষা চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট।

৯। আলুর মধ্যে পাটনা ও নৈনিতাল উৎকৃষ্ট।*

১০। আলুতে সার।—একর প্রতি ২০ মণ রেড়ীর খৈল
অথবা ২০০ মণ গোময়+৩ মণ সুপার+২ মণ সোরা।

১১। মেষ্টন লাঙ্গল চাষে অনেকটা সুখকর বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে।

বহুকাল ব্যাপী সরকারী পরীক্ষার ফলগুলি সাধারণে পুনরায় পরীক্ষা করিয়া জেলায় জেলায় সুফল পাইলে, তবে সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া বুঝা যাইবে।

* আমরা তিন বৎসর কাল দার্জ্জিলিঙ ও পাটনা আলুর তুলনায় চাষ পরীক্ষা করিতেছি। দার্জ্জিলিঙ আলু ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় স্থানান্তরে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কৃঃ সঃ।



বৈশাখ, ১৩১৮ সাল।

নব-বর্ষ।

দেখিতে দেখিতে আর একটি বর্ষ কাল-সাগরে বিলীন হইল। সামাজিক জগতে পুরাতন কোন কোন সময়ে কেবলমাত্র স্মৃতিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে এবং কবির ভাষায় কল্য ও কল্যকার অনতিপূর্ব্বকালব্যাপী সপ্ত সহস্র বর্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু জ্ঞান-জগৎ স্বতন্ত্র রকমের। কল্যই ইহার ভিত্তি, অদ্য ইহার মহান্ প্রয়াসের দিন এবং আগামী কল্য ইহার চরম লাভের আকাঙ্ক্ষা। মানবসমাজ গঠিত হওয়ার পর হইতে অ্যাসীরীয়, ব্যাবিলোনীয়, মিশরীয়, গ্রীক্, রোম, তুর্কী প্রভৃতি কত বিশাল সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ও পতন হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞান-সাম্রাজ্যের পতন নাই, ক্ষয় নাই। ইহা ক্রমশঃই বিশাল হইতে বিশালতর হইতেছে। অবশ্য সাধারণ জগতের ন্যায় জ্ঞান-জগতেও ব্যক্তিগত মতের পার্থক্য আছে; বিভিন্ন তন্ত্র আছে ও বহু প্রথা আছে। কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য এক—বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ; উদ্দেশ্য এক বলিয়াই বহু বাদ বিসম্বাদের মধ্য দিয়া প্রকৃত তথ্য চিরকাল প্রকটিত হইতেছে এবং জ্ঞান-সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিতেছে।

কৃষি জ্ঞান-সাম্রাজ্যের অন্যতম বিভাগ। কার্য্যকরী জ্ঞানের হিসাবে ধরিতে গেলে কৃষি-বিজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান। আমরা এস্থলে কৃষি অর্থে যাবতীয় ক্ষেত্রজাত ফসল ও গৃহপালিত মানবের আহারোপযোগী যাবতীয় পশু পক্ষীর কথাই বলিতেছি। এইরূপ সুবিস্তৃত অর্থে ধরিতে গেলে কৃষি শুধু যে শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান তাহা নহে, ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল বিজ্ঞানও বলিতে পারা যায়। কারণ সর্ব্বতোভাবে কৃষিশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে বিজ্ঞানের অন্যূন সাতটি শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা আবশ্যক। যথা ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ্তত্ত্ব, বায়ু বৃষ্টি-জ্ঞান, জীবাণুতত্ত্ব ও কৃষি-ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা। এই সমস্ত বিষয়ে যে সম্পূর্ণ পণ্ডিত হইয়া কৃষি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে কৃষি-

কার্য্যের সহিত এ সমুদয় বিজ্ঞানের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি-কার্য্য করিতে হইলে, তাহাতে উক্তবিজ্ঞান সমূহের যতটুকু আবশ্যক হয় ততটুকু আয়ত্ত করিতে হইবে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্ম কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের বৈজ্ঞানিককৃষির আলোচনা করিতে হইলে, সুতরাং দেখিতে হইবে যে উক্ত প্রত্যেক বিজ্ঞান বিভাগে কতটুকু নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাদের একত্র সমবায়ে ও প্রকৃত প্রয়োগে সাধারণ কৃষি কতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে।

এতদ্দেশে এপর্য্যন্ত এমন সময় অথবা সামর্থ্য আসে নাই যে সাধারণ লোকে সভা সমিতি কিম্বা স্কুল কলেজ গঠন করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কৃষি বিজ্ঞান চর্চ্চা করে। এখনও পর্য্যন্ত ভারত কৃষি-জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে রাজার মুখাপেক্ষী। সুতরাং সাধারণ ভাবে ভারতীয় কৃষি সমালোচনা অর্থে সরকার-প্রতিষ্ঠিত সভা, সমিতি, স্কুল, কলেজ, নবতথ্যানুসন্ধানাগার প্রভৃতির সমালোচনা। এই সমুদয়ের সমালোচনা হইতে ভারতে বৈজ্ঞানিক কৃষির উন্নতির আভাস অনেকটা পাওয়া যায়।

আমাদের পাঠকবর্গেরা জানেন যে ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে যাবতীয় চরম পরীক্ষা ও অনুসন্ধান আপাততঃ পুষাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এস্থলে ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিজ্ঞানের নানা শাখায় বুৎপন্ন অভিজ্ঞদিগের যন্ত্রাগার প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে এবং সমস্ত ভারতের কৃষির সহিত সম্বন্ধযুক্ত পরীক্ষাদি নির্ব্বাহিত হইতেছে।

সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বিভাগে সঙ্কর উৎপাদন দ্বারা গোধুমের উন্নতি সাধন, বালুচিস্থানে ফল চাষ, বিভিন্ন জাতীয় তামাকের লক্ষণ নির্ণয় এবং ভারতীয় উদ্ভিদ সমূহের মধ্যে পরকীয় নিষেকের (Cross-fertilization) মাত্রা নির্দ্ধারণ প্রভৃতি অন্যতম কার্য্য। ভারতীয় ব্যবহারিক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদের চেষ্টায় যে সমুদয় গোধুম-সঙ্কর উৎপাদিত হইয়াছে তাহাদের শস্যের নমুনা বিলাতে পাঠান হইয়াছিল। উক্ত নমুনা সমূহের মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মার্কিন ও ক্যানেডীয় গোধুমের সমকক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে নির্ব্বাচন ও বিশিষ্ট প্রণালীতে সঙ্কর উৎপাদনের অভাবে ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় গোধুম সমূহ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং বাজারেও উহাদের মূল্য কমিয়া যাইতেছিল; এক্ষণে সরকারের চেষ্টায় যদি ভারতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোধুম জন্মায় তাহা হইলে তদপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে?

কৃষি-রসায়ন বিভাগেও বিগত বৎসর কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতীয় বিভিন্ন ফসল সমূহ উৎপাদন করিতে কি পরিমাণ জলের আবশ্যক হয় তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জল যে ভারতীয় কৃষির প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকীয় দ্রব্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং এতদ্দেশে জলের যেরূপ নিয়মিত ব্যবহার ও জল-সংরক্ষণ আবশ্যক হয়

অন্য কোন দেশে সেরূপ হয় না। সুতরাং, কি পরিমাণ জল বিভিন্ন ফসল দ্বারা বায়ুমণ্ডলে বাষ্পাকারে নির্মুক্ত হয় এবং কোন নির্দ্দিষ্ট ফসলের বৃদ্ধির ও পরিপুষ্টির কোন অবস্থায় কত পরিমাণ জল আবশ্যক হয় তাহা জ্ঞাত হওয়া কৃষকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই ; আমরা শেষ ফল জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া রহিলাম। কৃষি-রসায়ন বিভাগে অন্যান্য পরীক্ষার বিষয়ঃ—মৃত্তিকা-উদ্ভূত বাষ্পের সহিত মৃত্তিকার অপরাপর উপাদানের সম্বন্ধ ; কৃষ্ণবর্ণ ক্ষার বিশিষ্ট অনুর্ব্বর জমির পরীক্ষা ও ভারতীয় ধান্য সমূহের রাসায়নিক গঠন। শেষোক্ত বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে 'কৃষকে' সমালোচনা করিয়াছি।

উদ্ভিদ্‌রোগ বিভাগে ভারতীয় পরজীবি ছত্রকী জাতীয় উদ্ভিদ্ সংগ্রহ ও নাম নির্দ্ধারণের কার্য্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ভারতের অন্যান্য উদ্ভিদ্ সমূহ সম্বন্ধে বহু বর্ষ ধরিয়া ও বহু উদ্ভিদজ্ঞ পণ্ডিতের প্রাণপণ পরিশ্রমে যেরূপ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, ছত্রকী জাতী সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই হয় নাই। বস্তুতঃ কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অপুষ্পক উদ্ভিদ্ বিদ্যার চর্চ্চা ভারতে এক রকম ছিল না। সুতরাং এই সমুদয় সংগ্রহ ও নাম করণ যে বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ব্যবহারিক উদ্ভিদ রোগ সম্বন্ধে গোদাবরী জেলার নারিকেল বৃক্ষের মুকুলের "ধসা" সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখযোগ্য। বিগত কয়েক বৎসর হইতে গোদাবরী জেলায় এই ধসা রোগে অনেক নারিকেল গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই রোগের প্রতি-বিধানের জন্য ভারতীয় ছত্রকতত্ত্ববিদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সরকারী অভিজ্ঞেরা যেরূপ পরামর্শ প্রদান করেন তদনুযায়ী কার্য্য হয় নাই। ধসা রোগে আক্রান্ত নারিকেলের বাগানের পক্ষে প্রথমতঃ রোগগ্রস্ত বৃক্ষ সমূহকে উৎপাটন করিয়া পোড়াইয়া ফেলাই অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য। তাহার পর যে সমস্ত বৃক্ষ বিশেষ বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই, অথবা যাহাদিগকে রোগ বিশেষ রূপে আক্রমণ করে নাই, সে সমুদয় বৃক্ষে চুণ ও খৈল, পাঁস, মাছের সার ও লবণ মিশ্রণ প্রয়োগই রোগের অন্যতম প্রতিকার। যে সমুদয় স্থলে এই সকল উপদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে সে সকল স্থানে রোগের প্রাবল্য কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু যেখানে কৃষকেরা তাহাদের চিরন্তন ও বংশগত নবপ্রথা-প্রবর্ত্তন-বিরোধীতার আবেগে উল্লিখিত প্রথায় সন্দিহান হইয়াছে সেইখানেই ফল সুবিধাজনক হয় নাই।

নারিকেল রোগ ব্যতীত বিগত বৎসর চা'র ব্যাধি, কালমরিচ, আদা, লেবু, পেঁপে ও ইক্ষু প্রভৃতির রোগ সম্বন্ধেও কিয়ৎ পরিমাণ অনুসন্ধান চলিতেছিল। ফল যে তেমন ভাল হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তবে এ সকল বিষয় অনুসন্ধানে বিশেষ সময় আবশ্যক হয় এবং আশা আছে যে আগামী বৎসরে এই সমুদয় পরীক্ষা হইতে শুভ ফল পাওয়া যাইবে।

ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদ্ যেরূপ বৃক্ষের বিশেষ অপকার করে কীট দ্বারাও সেইরূপ কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং ছত্রকতত্ত্বের মত কীটতত্ত্বের আলোচনাও কৃষকের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয়। বিগত বৎসর কীটতত্ত্ব বিভাগে কৃষকের পক্ষে শুভজনক কতিপয় বিশেষ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অন্যতম—ভারতীয় কৃষি-সমিতি দ্বারা "ফসলের পোকা" নামক গ্রন্থ প্রকাশ। ভারতীয় কীটতত্ত্ব বিদের অন্যতম সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ দ্বারা এই পুস্তক প্রণীত হইয়াছে এবং ইহাতে কৃষিকার্য্যের অনিষ্টকারী যাবতীয় কীটের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুন্দর ছবির সাহায্যে কীট সমূহের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে ও আমাদের বিশ্বাস যে এই পুস্তকের দ্বারা অনেক কৃষকের উপকার সাধিত হইবে।

অনিষ্টকারী কীট দমনের জন্য যেরূপ চেষ্টা চলিতেছে, শুভকারী কীট প্রতি-পালনেরও সেইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যমে ও চেষ্টায় এড়ী, তুঁত, তসর ও লাক্ষা পোকার চাষের কিয়ৎ পরিমাণ বিস্তৃতি হইয়াছে। বিগত বৎসর অনেক স্থলে সরকারের চেষ্টায় এই সমুদয় পোকার চাষ আরব্ধ হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে উত্তরোত্তর এই সমুদয় শাখায় যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে।

বিভিন্ন ফসল সমূহ উৎপাদন সম্বন্ধে যে কি কি প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ রূপে আলোচনা করিবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাই। তবুও কি কি ফসল সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে তাহা আমাদিগের পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে উল্লেখ করিব। বিগত বৎসর প্রধানতঃ কার্পাস, গোধূম, চীনাবাদাম, ইক্ষু, তামাক, নীল, পাট, শণ, চা, সিমুল আলু ও ধান্য সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিয়াছিল। চীনাবাদামের চাষ গত বৎসর অনেকটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহাদের সুন্দর-বনে জমি আছে তাঁহারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে বিঘা প্রতি লবণাক্ত জমিতে প্রায় ৯—১৪ মণ চীনার বাদাম উৎপাদিত হইয়াছে। কাশ্মীরে এতদিন পর্য্যন্ত চীনাবাদাম চাষের প্রথা ছিলনা। গত বৎসর হইতে ঐ স্থানে চীনাবাদাম উৎপাদিত হইতেছে। কাশ্মীরে চীনাবাদামের উপযুক্ত জমির অভাব নাই। সুতরাং উহার চাষ যে বিস্তৃতি লাভ করিবে তাহারও কোন সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্টতর জাতি প্রবর্ত্তন করিয়া ইক্ষুর গুড় উৎপাদনের মাত্রা অধিক করিবার জন্য অনেক স্থলে পরীক্ষা আরব্ধ হয়। মান্দ্রাজে সমালকোট, বোম্বায়ে মাজরি, যুক্তপ্রদেশে প্রতাপগড় ও বঙ্গদেশে সাহাবাদ, বালেশ্বর এবং বীরভূমে কতিপয় পরীক্ষা হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশে অ্যামোনিয়াম সল্ফেট্ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। অ্যামোনিয়ম সল্ফেট্ ব্যতীত, কুসুম ফুলের বীজের খৈল ও শণের সবুজসার ও ইক্ষুক্ষেত্রে প্রয়োগের বিশেষ উপযুক্ত।

আমরা অন্যান্য ফসলের পরীক্ষাদি সমূহের বারান্তরে আলোচনা করিব। বস্তুতঃ মোট ফল দেখিতে গেলে ফসলাদির পরীক্ষা আশাপ্রদ বলিয়াই বোধ হয়।

আমরা এতক্ষণ সরকারী কৃষির বিষয় বলিলাম। ভারতীয় কৃষি-সমিতি নিজের ক্ষুদ্র চেষ্টায় যতদুর কৃষি-কার্য্যের উন্নতি সম্ভবপর হয় তাহা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। অপরাপর বৎসরের ন্যায় বিগত বৎসরেও তাঁহাদিগের গোবিন্দপুর পরীক্ষা ক্ষেত্রে ফল সব্জী ও ফসল সম্বন্ধে কতিপয় পরীক্ষা নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। এই সমুদয়ের মধ্যে যে সকল পরীক্ষা সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় নাই, আমরা সে গুলির এখানে উল্লেখ করিব না। অপর কতকগুলির ফল এখনও সম্পূর্ণ নির্দ্ধারিত না হইলেও বিগত বৎসরের পরীক্ষায় শেষ ফলের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। শেষোক্ত শ্রেণীর পরীক্ষাবলীর মধ্যে দার্জ্জিলিং ও নৈনিতাল আলুর চাষ একটি। অল্প বৃষ্টিপাত ও বীজের দোষ থাকায় ফলন যদিও সে রকম সুবিধাজনক হয় নাই তথাপি উভয় প্রকারের ফলনের তুলনায় দার্জ্জিলিং আলুর ফলনই বেশী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। কীট অথবা ছত্রক রোগ সম্বন্ধেও দার্জ্জিলিং আলু অধিকতর রোগ-সহ। বর্ত্তমান বৎসরেও এই পরীক্ষা চলিবে এবং আশা করা যায় যে, ইহার ফলে নিম্নবঙ্গের সাধারণ দোয়াঁস মৃত্তিকার পক্ষে কোন জাতীয় আলু উপযুক্ত তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

কাবুলী ছোলার চাষ ক্ষেত্রের তিনটি বিভিন্ন অংশে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। কিন্তু তিন স্থানেই প্রায় এক সময়ে ও একপ্রকার কীট গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে। সম্ভবতঃ কীটের ডিম্ব মটরের মধ্যেই নিহিত ছিল।

কয়েক বৎসর পরীক্ষার পর বিগত বৎসর কাঁটালের কলম-প্রস্তুত-কার্য্য সফল হইয়াছে। গাছ বেশ সতেজ হইয়াছে, কিন্তু যত দিন ফল না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কলমের গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা যায় না। এতদ্ভিন্ন কলমে জনক ও জননী এতদুভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী লক্ষণ সমূহ প্রত্যক্ষ হইবে কি পুং প্রকৃতি, স্ত্রী প্রকৃতি প্রবল হইবে তাহাও বলিতে পারা যায় না। এই প্রকারের সঙ্কর উৎপাদন করিতে যথেষ্ট সময় আবশুক হয়। বিগত বৎসর উৎপাদিত অপরাপর সঙ্করের মধ্যে গোঁড়া ও বাতাবী লেবুর সঙ্কর অন্যতম। ইহারও লক্ষণ সমূহ বিশেষ রূপে বিকসিত হওয়া কালসাপেক্ষ। কুমড়ার স্বকীয় নিষেক (Self-fertilization) সম্বন্ধে বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া ফলগুলি বেশ নিরেট এবং প্রায় বীজশূন্য হইয়াছে।

বিগত বৎসর দেশীয় ও মার্কিন মটর বীজ এক ক্ষেত্রে বপন করা হইয়াছিল। ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহাদের মধ্যে পরকীয় নিষেক ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে। তাহাতে মার্কিণ মটরের ফল ছোট হইয়াছে, কিন্তু পক্ষান্তরে দেশীয় মটর

বড় হইয়াছে। ফল ছোট হইলেও মার্কিন মটর অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ফলিয়াছে এবং এতদঞ্চলের জলহাওয়া সহিষ্ণু হইয়াছে।

অপরাপর বৎসরের ন্যায় ভারতীয় কৃষি-সমিতির প্রশ্ন-বিভাগে অনেকেই অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক প্রশ্নই নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। যথা সবুজ সার, শণ, ধঞ্চে ও নিলসিটি; সুলভ নাইট্রোজেন-প্রধান সার; সুপারফস্‌ফেট্, হাড়ের গুঁড়া ও ছাইর উপকারিতা; বীজ ও কলম দ্বারা চারা প্রস্তুতের বিভিন্ন উপায়; নাইট্রোজেন জীবাণুজ সারের প্রয়োগ প্রণালী; ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য গাছ গাছড়া, যেমন ধুতুরা, আকন্দ, বাকস প্রভৃতির বিক্রয় স্থান ও মূল্য। অপরাপর শিল্পের মধ্যে কাগজ, কাচ, লৌহ পেরেক, অর্গল প্রভৃতি ও বোতাম প্রস্তুত প্রণালী, তামাক পাতা প্রস্তুত, ফল সংরক্ষণ, ফলের সরবত, লেবুর রস, চাটনি তৈয়ারী ও মাখম প্রস্তুতের উপায়ও জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। এই সমস্ত বিষয়ের উত্তর কোন কোন সময় স্বতন্ত্র পত্রদ্বারা এবং কোন কোন সময় কৃষকে উত্তর প্রকাশ দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা কিন্তু আমাদের পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি যে, কৃষিকার্য্যের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধবিশিষ্ট প্রশ্নাদি ব্যতীত অন্যান্য প্রশ্ন আমাদিগের নিকট যেন না পাঠান। কারণ সম্পূর্ণ ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অনেক সময় ও পরিশ্রমের আবশ্যক হয়। আমাদিগের সাধারণ কৃষি সম্বন্ধে প্রশ্নাদির উত্তর দিতে এত ব্যস্ত থাকিতে হয় যে, আমরা অপরাপর প্রকারের প্রশ্নের উত্তর দিতে যথেষ্ট সময় পাই না। যাঁহারা ঔষধার্থ গাছ গাছড়ার কার্য্য করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে আমরা এই অবসরে বলিতে পারি যে, সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ড্রগ্ ষ্টোরস্ ও এজেন্সি (Indian Drug Stores & Agency.) নামক একটি কোম্পানি কলিকাতায় ৯ ও ১১ নং ঈশ্বর মিলের গলিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উঁহাদিগের নিকট গাছ গাছড়া সম্বন্ধে সমস্ত খবরই পাওয়া যাইতে পারে।

আমরা আনন্দের সহিত আমাদিগের অনুগ্রাহকবর্গকে জানাইতেছি যে, বর্ত্তমান বৎসর হইতে 'কৃষকের' কলেবর পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইল। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান বৎসর হইতে প্রত্যেক সংখ্যার 'কৃষকে'ই তদানীন্তন সময়ে উৎপাদনযোগ্য একটি একটি ফসল কিম্বা একটি শ্রেণীর ফসল সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। এই প্রকার প্রবন্ধে আমাদিগের মন্তব্য ব্যতীত, উক্ত ফসল উৎপাদনে বিশেষ পারদর্শী কৃষকগণের মতামতও সন্নিবিষ্ট হইবে। 'কৃষকে' প্রকাশিত বিষয় সমূহও এবার হইতে নূতন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইবে। আমাদের বহুসংখ্যক গ্রাহকগণের অনুরোধে আমরা এই সমুদয় পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছি। আশা করি এই নবভাবে প্রকাশিত ও পরিবর্দ্ধিত 'কৃষক' সকলের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

কৃষি-কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন আমাদিগের মহোদয় গবর্ণমেণ্টকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারি না। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে আমরা কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে পুস্তক পুস্তিকাদি পাইয়া থাকি এবং আমরা আশাকরি যে 'কৃষক' উত্তরোত্তর তাঁহাদিগের অধিকতর সহানুভূতির উপযুক্ত হইবে।

সর্ব্বশেষে আমরা "কৃষকে"র গ্রাহক ও অনুগ্রাহক বর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্যেই "কৃষক" এত দিন পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং আমরা আশা করি তাঁহাদিগের অনুগ্রহেই ভবিষ্যতে "কৃষক" আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

আমাদিগের লেখকগণদিগকেও আমরা এই অবসরে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু নলিনবিহারী মিত্র এম, এ, ; বাবু দুর্গাচরণ মিত্র বি, এ, ; ভারতীয় কৃষি-সমিতির সভ্য বাবু শশীভূষণ সরকার ও বাবু শরৎচন্দ্র বসু এম, আর এ, এস, প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আমাদিগকে 'কৃষক' পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। প্রাদেশিক ও ভারতীয় কৃষি-বিভাগ সমূহের যে সমুদয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাদিগকে প্রবন্ধাদি দিয়া বাধিত করেন, অথচ যাঁহারা স্বীয় স্বীয় নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক আমরা তাঁহাদিগের নিকটেও বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিয়াছি। ফলতঃ সর্ব্ব সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতির উপরেই আমাদের আশা—এবং যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় কৃষি-সমিতি ও 'কৃষক' তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সমিতির ও "কৃষকে"র উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

পত্রাদি।

আহার বেলমা, বর্দ্ধমান।

মহাশয়,

পুষা কৃষি-কলেজে অধ্যাপনা জন্য ছাত্র গৃহীত হইতেছে কি না? যদি গৃহীত হইয়া থাকে, তবে তথায় কিরূপ গুণ-বিশিষ্ট ছাত্র গৃহীত হইয়া থাকে? তথায় ছাত্রগণকে কয় বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়? তথাকার উত্তীর্ণ ছাত্রগণের পরিণাম ফল কিরূপ? অর্থাৎ পুষাকলেজের নিয়মাবলী কৃষকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশিত করিলে অনুগৃহীত হইব।

ভাগলপুর জেলায় অন্তর্গত (স্থানের নাম স্মরণ নাই) কোন স্থানে একটী কৃষি-কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। উভয় কলেজের প্রভেদ কি? এই কলেজের নিয়মাবলী দয়া করিয়া জানাইলে বাধিত হইব। নিবেদন ইতি—

বশম্বদ—

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস।

[পুষা কলেজ সম্বন্ধে সবিশেষ খবর জানিবার জন্য আরও অনেকে পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের অবগতির জন্য আমরা পুষা কলেজের নিম্নলিখিত বিবরণ সন্নিবেশিত করিলাম।

১। পুষা কলেজে শিক্ষার বিষয়,—

(ক) কৃষি-রসায়ন, (খ) ব্যবহারিক উদ্ভিদবিদ্যা, ব্যবহারিক কীটতত্ত্ব, (গ) উদ্ভিদ শরীরতত্ত্ব, (ঘ) জীবাণুতত্ত্ব, (ঙ) কৃষিতত্ত্ব।

এক একটি বিষয় দুই বৎসর ধরিয়া শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং কোন ছাত্রকে একের অধিক বিষয় এককালে শিক্ষা দেওয়া হইবে না। সম্প্রতি জীবাণুতত্ত্ব শিক্ষার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হয় নাই।

২। শরৎকালে ১লা জুন হইতে ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত অধ্যাপনার কাল ধার্য্য হইয়াছে।

ছুটী—১৬ই নভেম্বর হইতে ৫ই জানুয়ারি। বসন্ত কালে পুনরায় ৬ই জানুয়ারি হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা। ছুটী—১লা এপ্রেল হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত।

৩। বর্ত্তমানে ছাত্রের সংখ্যা,—

কৃষি শিক্ষার জন্য ৮ জন ছাত্র, কৃষি-রসায়ন শিক্ষার জন্য ৮ জন ছাত্র, উদ্ভিদ শরীরতত্ত্ব শিক্ষার জন্য ৮ জন ছাত্র, কীটতত্ত্ব শিক্ষার জন্য ৮ জন, উদ্ভিদতত্ত্ব শিক্ষার জন্য ৮ জন ছাত্র, জীবাণুতত্ত্ব শিক্ষার জন্য ৮জন ছাত্র।

৪। কোন প্রদেশ হইতে কত জন ছাত্র লওয়া হইবে তাহা কলেজের প্রধান অধ্যাপক প্রাদেশিক কর্ত্তাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ১লা এপ্রেলের মধ্যে স্থির করিবেন। তিন শ্রেণীর ছাত্র লওয়া হইবে,

(১) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ছাত্র।

(২) ভারতীয় ভূপতিগণের রাজ্য হইতে কৃষি-বিভাগের ইন্স্পেক্টার জেনারেল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ছাত্র।

(৩) সাধারণ ছাত্র।

স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ছাত্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হয় গ্রাজুয়েট হইবে অথবা প্রাদেশিক কৃষি-কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র কিম্বা গ্রাজুয়েটের সমতুল্য কোন প্রকার পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র হওয়া আবশ্যক।

দেশীয় রাজ্য হইতে যে ছাত্র পাঠান হইবে তাহার জন্য প্রথমতঃ নাগপুরে ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলের নিকট আবেদন করিতে হইবে। তিনি পুষার প্রধান অধ্যাপকের সহিত পরামর্শ করিয়া ছাত্র নিয়োগ করিবেন এবং এই শ্রেণীর ছাত্রগণকে এক প্রকার পরীক্ষা দিতে হয়। তাহাতে তাহারা উপযুক্ত কিম্বা অনুপযুক্ত স্থির হয়।

সাধারণ ছাত্রগণের বয়স প্রবেশের সময় ১৯ বৎসরের অধিক হইবে না। তাহাদের দেহ সবল ও সুস্থ এই মর্ম্মে সিভিল সার্জ্জনের পরীক্ষা পত্র থাকা চাই। ছাত্র প্রাদেশিক কৃষি-কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে তথাকার প্রশংসা পত্র অথবা স্থানীয় কোন পদস্থ লোকের প্রশংসা পত্র থাকা চাই।

প্রত্যেক ছাত্রের মাসিক ২৫৲ টাকা খরচ পড়িবে। কলেজে ছাত্রগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। ছাত্রগণ তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত নিজে নিজে করিবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ছাত্রগণের জন্য স্বতন্ত্র ঘর নির্দ্দিষ্ট হইবে। কোন ছাত্র, ডিরেক্টর বা প্রধান অধ্যাপকের অনুমতি ব্যতীত ছাত্রনিবাস পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ছাত্রগণ লাইব্রেরির পুস্তকাদি ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু তাহাদিগকে লাইব্রেরির নিয়মাদি মানিয়া চলিতে হইবে।

অধ্যাপনার সময় প্রধান অধ্যাপকের অনুমতি ব্যতীত ছুটি পাইবে না।

[ভাগলপুরে কৃষি-কলেজ স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে অধ্যাপকের বন্দোবস্ত এখনো ঠিক হয় নাই।] কৃঃ সঃ।

পূর্ব্ববঙ্গ নারায়ণগঞ্জ হইতে কোন পত্র প্রেরক লিখিতেছেন যে, তিনি চীনা বাদামের চাষ করিতে ইচ্ছা করেন—ঐ অঞ্চলে মাট বাদামের চাষ হইতে পারে কি না?

তাঁহার এই পত্রের উত্তরে তাঁহাকে জানান যাইতেছে যে, দোয়াঁস হাল্‌কা মাটীতে চীনা বাদামের চাষ হয়। তাঁহার জমি যদি ঐ প্রকৃতির হয়, তবে তিনি তাহাতে সচ্ছন্দে মাট বাদামের চাষ করিতে পারেন; কিন্তু জমি লোণা হইলে হইবে না।

ঢাকা সরকারী কৃষিক্ষেত্রে মাট বাদাম চাষের পরীক্ষা হইয়াছিল। ক্ষেত্রটির পরিমাণ $\frac{1}{8}$ একর। উৎপন্ন বাদামের পরিমাণ ৪ মণ। এই ফল তত আশানুরূপ নহে। উক্ত ক্ষেত্রের মাটি হাল্‌কা ছিল না। সুতরাং ভারি মাটি বলিয়া তাহাতে চীনা বাদামের চাষ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আপনি ঢাকাক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিলে বিশেষ খবর পাইবেন। কৃঃ সঃ।

টেঁপারিতে ছত্রক রোগ

নিম্ন বঙ্গ এবং ২৪ পরগণায় এই সময় টেঁপারির চাষ আরম্ভ হইবে। টেঁপারি ক্ষেতে প্রায় ছত্রক রোগ দেখা যায়। ২৪ পরগণায় দুই তিনটি স্থান হইতে আমরা ইতিপূর্ব্বে ফল সমেত ছত্র রোগাক্রান্ত টেঁপারির ডাল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। পাতায় ও ফলের উপর ডিম ডিম ছত্রক দৃষ্ট হইয়াছিল। রোগের প্রথমাবস্থা হইতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষেতে বোর্দ্দো মিশ্রণ ব্যবহার করিলে ভাল হয়, ক্রমে গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে মিশ্রণটি ক্রমশঃ কম তেজস্কর করিয়া লইতে হয়। পারমাঙ্গানেট অব পটাসের জল তৈয়ারি করিয়া লইয়া ব্যবহার করিলেও উপকার হয়। যতটুকু পর্য্যন্ত মিশাইলে ঈষৎ গোলাপী রঙের জল না হয় ততটুকু পরিমাণ মিশাইতে হয়। ইহা দেখিতে দানাদার চিনির মত। সুক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ঝাঁজরিযুক্ত পিচকারি দ্বারা গাছে প্রয়োগ করাই বিধেয়। পাতার পিছন পিঠ যাহাতে ধোয়া হয় এমন ব্যবস্থা করা চাই।

সার-সংগ্রহ।

স্বদেশী শিল্প বাণিজ্য

বিগত চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে বঙ্গের শিল্প বাণিজ্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলে কতকটা বুঝা যায়।

কাপড়ের কল

শ্রীরামপুরে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল আঠার লক্ষ টাকা মূলধনে চালিত হইতেছে; ঐ কলে ৮ শত তাঁত ও ৪০ হাজার টাকু, সূতা ও বস্ত্রাদি রঙ করিবার যন্ত্র ও তুলার পরিত্যক্ত অংশে মোটা সূতা প্রস্তুতের যন্ত্রাদি আছে।

পেনসন প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে দেড় লক্ষ টাকা মূলধনে কুষ্টিয়ায় মোহিনী মিলস্ লিমিটেড স্থাপিত হইয়াছে।

হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে ১২ লক্ষ টাকা মূলধনে শ্রীরামপুরে কল্যাণ কটন মিলস্ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ৬ শত তাঁত ও ৩০ হাজার টাকু চলিবে।

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র ও বড় বাজারের কতিপয় মাড়োয়ারী ৫ লক্ষ টাকা মূলধনে কলিকাতা হোগলকুঁড়িয়াতে গণেশ ক্লথ মিলস্ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন; তাহাতে ২৫০ তাঁত চলিবে।

নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ১২ লক্ষ টাকা মূলধনে আর্য্য কটন মিলস্ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে সম্প্রতি ২ শত তাঁত চলিতেছে। হিন্দুস্থানে মিল স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে।

ব্যাঙ্ক

দ্বারবঙ্গের মহারাজা প্রভৃতির উদ্যোগে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধনে ক্যানিং ষ্ট্রীটে ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে।

জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে হেয়ারষ্ট্রীটে হিন্দুস্থান কো অপারেটীভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে।

বীমা

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি,এ, প্রভৃতির উদ্যোগে হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ ইনসিওরেন্স কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে।

দেশালাই

হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ ও বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র জাপান প্রত্যাগত মিঃ পূর্ণচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে টালিগঞ্জে বন্দে মাতরম্ দেশালাইয়ের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

মোজা ও গেঞ্জি

এটর্ণি বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি ২ লক্ষ টাকা মূলধনে মিঃ এফ, এইচ, গজনবী জমিদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে টালিগঞ্জে বেঙ্গল হোসিয়ারী কোম্পানী স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে মোজা গেঞ্জি প্রস্তুত হইতেছে।

ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন বি,এল, মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে একটী মোজা ও গেঞ্জির কল স্থাপিত হইয়াছে।

কটকে বাবু হেমেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে সুন্দর মোজা ও গেঞ্জি প্রস্তুত হইতেছে।

জুতা

অদ্ভুত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম,এ, বি,এল, প্রভৃতি ভদ্রলোক আমেরিকা প্রত্যাগত মিঃ এ, বি, তাহের সাহেবের তত্ত্বাবধানে বুট এণ্ড ইকুইপমেন্ট ফ্যাক্টরী নামে একটী জুতার কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

বিলাত প্রত্যাগত মিঃ বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয়ের একটী জুতার কারখানা আছে। নদীয়া ট্যানারি, মৃজাপুর ষ্ট্রীট।

ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের একটী জুতার কারখানা। ন্যাশন্যাল ট্যানারি, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট।

সাবান

সন্তোষের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর গোয়াবাগানের ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরী।

ডাক্তার নীলরতন সরকারের পার্শি বাগানের ন্যাশন্যাল সোপ ফ্যাক্টরী।

ঢাকার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়াছেন।

পটারী ওয়ার্কস

কাশীমবাজারের মহারাজা ও স্বনামখ্যাত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় জাপান প্রত্যাগত মিঃ সত্যসুন্দর দেবের তত্ত্বাবধানে উন্নত প্রণালীতে কলের সাহায্যে মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত জন্য ট্যাঙ্গরা রোডে পটারী ওয়ার্কস স্থাপন করিয়াছেন।

চুরুট ও সিগারেট

রঙ্গপুরের কর্ম্মবীরেরা এক লক্ষ টাকা মূলধনে রঙ্গপুর টোবাকো ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়াছেন।

পেন্সিল

বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও বাবু শ্রীকালী ঘোষের যত্নে টালীগঞ্জে পেন্সিলের কারখানা হইয়াছে। এখানে সুন্দর পেন্সিল হইবে বলিয়া আশা হইয়াছে।

বোতাম, চিরুণী

জাপান প্রত্যাগত মিঃ এস, কে, দত্ত মাণিকতলায় একটী বোতামের কারখানা খুলিয়াছেন।

নলডাঙ্গার রাজার যত্নে জাপান প্রত্যাগত মিঃ মন্মথনাথ ঘোষের তত্ত্বাবধানে ৫০ হাজার টাকা মূলধনে একটী চিরুণী, বোতাম ও মাদুর প্রস্তুতের কারখানা খোলা হইয়াছে।

চিনি

কাশীমবাজারের মহারাজা, সারদাচরণ মিত্র এম, এ বি, এল, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, কুমার রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) মহন্ত মহারাজ সতীশচন্দ্র গিরি, (তারকেশ্বর) মহারাজ বাহাদুর সিং মুর্শিদাবাদ, রুড়মল গোয়েঙ্কা, সদাগর (বড়বাজার) প্রভৃতি মহাত্মা জাপান ও আমেরিকা প্রত্যাগত মিঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, এস সি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ৫ লক্ষ টাকা মূলধনে দি তারপুর সুগার ওয়ার্কস লিমিটেড খুলিয়াছেন।

বিস্কুট

রাজলক্ষ্মী বিস্কুট বেকারী।
ভি, এস ব্রাদার্সের বিস্কুট।
কে, সি, বসুর বিস্কুট, শ্যামবাজার।
জাপান প্রত্যাগত মিঃ এ, মিত্র বিস্কুটের কারখানা খুলিয়াছেন।

ছুরি কাঁচি

খাঁ এণ্ড কোং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বসু ব্রাদার্স, মজঃফরপুর।

ছাপার কালি

কলিকাতা প্রিন্টিংইঙ্ক ওয়ার্কস, মাণিকতলা মেন রোড।

মোম বাতি

মনোরমা ক্যাণ্ডেল ফ্যাক্টরী, রাজসাহী।

ষ্টীল ট্রাঙ্ক

বঙ্গে নানা স্থানে অতি সুন্দর বিলাতী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ষ্টীল ট্রাঙ্ক তৈয়ার হইতেছে।

বালতীর কারখানা

কলিকাতায় বালতীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিদিন বহু বালতী প্রস্তুত হইতেছে।

ফলরক্ষণ কোম্পানী

মজঃফরপুরের কোন প্রসিদ্ধ উকীলের যত্নে মিঃ অনাথবন্ধু সরকার নানাপ্রকার ফলরক্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

নিব

চোরবাগানের বাবু গোকুল ঘোষ সুন্দর নিব প্রস্তুত করিতেছেন।

লোহার অস্ত্র

চাঁদপুরের গাঙ্গুলী ব্রাদার্স দা, ছুরী প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য অতি সুন্দর অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন।

চামড়া পরিষ্কারের কারখানা।

ডাক্তার নীলরতন সরকার টেংরায় চামড়া পরিষ্কারের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এই কারখানায় অতি উৎকৃষ্ট চামড়া হইতেছে।

কটকের রায় মধুসূদন দাস বাহাদুর অতি সুন্দর চামড়া প্রস্তুত করাইতেছেন।

কাশীমবাজারের মহারাজার যত্নে তথায় এক বৃহৎ চামড়ার কারখানা প্রস্তুত হইতেছে।

আর একটু বিশেষ শুভসূচনা এই যে, আমাদের দেশের যুবকগণকে বিশেষ রূপ শিক্ষা দিবার জন্য ভাল রূপ আয়োজন করা হইয়াছে। অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ এবিষয়ে প্রধান উদ্যোগী তাহার ফল এই

১। শিল্প মন্দির

গত তিন বৎসরে শিল্প শিক্ষার জন্য ন্যূনাধিক বার লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত টি, পালিত মহোদয় বঙ্গীয় শিল্প মন্দির (Bengal Technical Institute) প্রতিষ্ঠা করিয়া উইল দ্বারা আপনার প্রায় সমস্ত সম্পত্তি (মূল্য দশ লক্ষ টাকা) উহার উন্নতি কল্পে উৎসর্গ করিয়াছেন।

২। শিক্ষা-মন্দির

বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বাবু সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের যত্নে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বদেশী শিল্প ও শিক্ষা-মন্দির।—অধুনা এই দুই শিক্ষালয়ের কার্য্য এক স্থানেই নির্ব্বাহিত হইতেছে। উপরে উক্ত ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে কোন কোনটির অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয়, কোনটির বা লোপ হইবার সম্ভাবনা হইলেও এককালে হতাশ হইবার কারণ নাই। এইরূপ ভালমন্দের মধ্য দিয়াই একটা স্থায়ী ভাল হওয়ার সম্ভাবনা।

বন নীল।—এতদ্দেশে বন নীলের গাছ কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন। গাছগুলি ছোট ছোট ঝোপের মত হয়। উর্দ্ধে দেড় কি দুই হাতের অধিক হয় না। ইহার প্রধান মূল বেশ দৃঢ় ও লম্বা হয় ও তজ্জন্যই ইহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অনেক দূরে পর্য্যন্ত যাইতে পারে। ইহা শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদ্ (Leguminoseae) ; সুতরাং বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা ইহার আছে। আমাদের দেশে

বন নীলের সেরূপ আদর নাই কিন্তু মাদ্রাজ অঞ্চলে মাথায় কিম্বা গাড়ী করিয়া এমন কি ৫০ মাইল দূর হইতে বন নীল লোকে সার রূপে ব্যবহার করিবার জন্য তুলিয়া আনে। কথন কথন বহিবার খরচ মণকরা তের চৌদ্দ আনা পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকে। কিন্তু তাহা দিয়াও কৃষকেরা লইতে প্রস্তুত। বঙ্গদেশের উত্তর ও পশ্চিম ভাগে বন নীল পাওয়া যায়। সেখান হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া নিম্নবঙ্গে আবাদ করিলে অল্প খরচে বেশ সবুজ সার পাওয়া যাইতে পারে। বিঘা প্রতি বীজের পরিমাণ দেড় সের। চাষ কলাই চাষের মত। বীজ অঙ্কুরিত হইতে কোন কোন স্থলে কিছু বিলম্ব হইতে পারে বটে কিন্তু বীজ শীঘ্র মরিয়া যায় না। বর্ষার শেষে বীজ বপন করিয়া ৫।৬ মাস বাদে মাটির সহিত চষিয়া দেওয়াই উত্তম প্রথা। ইহা তিলের সহিত ও মিশ্র ফসল রূপে জন্মান যাইতে পারে। পরে তিল উঠিয়া গেলে ইহাকে সার রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গবাদি পশু বন নীল খাইতে ভালবাসে না; ইহাও একটি সবুজ সারের অন্যতম গুণ।

"অন্ন সংস্থান"।—বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার বিষয়ীভূত প্রবন্ধটি মৈমনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে ১৫।১৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় অন্ন সংস্থানের ন্যায় জটিল ও বিস্তৃত বিষয় সম্যকরূপে সমালোচিত হইতে পারে না এবং রাধাকুমুদ বাবু তাহা করিতেও চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পে মনোনিবেশ করিতে আমাদের দেশের ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। কাগজের বাক্স, ফিতা, বোতাম, দড়ি, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ খাদ্য সংরক্ষণ, তৈজসপত্র ও পেরেক কব্জা প্রভৃতি নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে স্বল্প মূলধন দ্বারা কাজ হইতে পারে, অথচ মূলধন শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আইসে। বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ ভিন্ন আর অন্য কোন উপায়ে ধনাগমের সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা রাধাকুমুদ বাবুর প্রস্তাবগুলির সমর্থন করি। পুস্তিকা পাঠে অনেকের এতদ্দেশোপযোগী কয়েকটি ব্যবসায় সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান জন্মিবে।

"Cultivators' Guide" by Rajendra Lal Banerjee of the Bengal Agricultural Department. Price Re. 1. প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কৃষক কার্য্যালয় হইতে এইরূপ একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা উক্ত পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বর্ত্তমান পুস্তকে নূতন জানিবার বিশেষ কিছু নাই। তথাপি রাজেন্দ্রবাবুর উদ্যম প্রশংসাযোগ্য এবং বঙ্গভাষা অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এই পুস্তক যে কাজে লাগিবে তাহা নিশ্চয়। আমরা কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পুস্তকখানিতে ছাপার ও ভাষার কতকগুলি ভ্রম প্রমাদ আছে এবং মূল্যও অপেক্ষাকৃত অধিক। ভবিষ্যত সংস্করণে আশা করি গ্রন্থকার এসব দিকে একটু নজর রাখিবেন।

"Food for Animals in Bengal" by K. B. Dey G. B. V. C. কৃষকের পাঠকবর্গ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দের গোপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকে কুঞ্জবাবু ঐ গুলির ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ

করিয়াছেন। পুস্তকে কৃষকের জানিবার অনেক জিনিষ আছে। গবাদির আহার সম্বন্ধে যে সমুদয় তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা বৈজ্ঞানিক, কৃষকের পক্ষে বিশেষ-রূপে অধ্যয়নযোগ্য। পুস্তকে গরু ব্যতীত ছাগল, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতির খাদ্যাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পশ্বাদির আহার দেশে পাওয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। কুঞ্জবাবুর মতে কলা চাষের দ্বারা এই অভাব অনেকটা মোচন হইতে পারে এবং হইলে সুখের বিষয়। কিন্তু পরীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমরা অবগত নহি। পক্ষান্তরে কলার খোলা, পাতা প্রভৃতিতে রাসায়নিক বিশ্লেষণে পুষ্টিকর দ্রব্য বিশেষ মাত্রায় পাওয়া যায় না। ফলতঃ পুস্তিকা খানি সরলভাষায় লিখিত ও বিশেষ পাঠযোগ্য।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

কৃষিক্ষেত্র।—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন ভাঁটি বান্ধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ।—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুল কপি বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিতে হইবে।

ফুল বাগিচা।—এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়া মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমরা কিন্তু বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূল গুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্ব কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরান্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুলবীজ বপনেরও এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কিন্তু ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়।

REGISTERED No. C 192

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



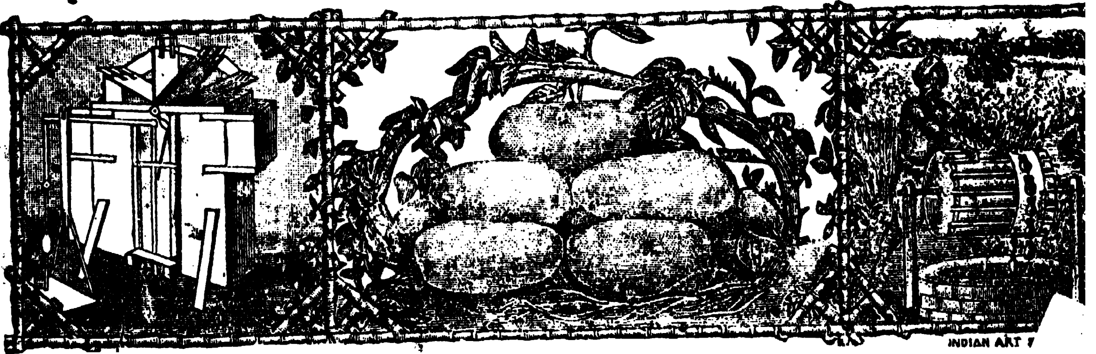
দ্বাদশ খণ্ড,—২য় সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচী পত্র।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক।

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।




কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ খণ্ড। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল। { ২য় সংখ্যা।

সব্জী চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১ম শ্রেণী—পটল

পটল

পটল—মৃত্তিকা বেলে দোয়াঁশ—সার—পগারের মাটি, চূর্ণমিশ্রিত ছাই, পলিমাটি কিম্বা হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে পটল চাষ খুব লাভের হয়।



যে জমিতে পটল চাষ হইবে তাহার চারি ধারে পগার কাটিলে মন্দ হয় না, কারণ জলের ধোয়াটে জমির সারাংশ যাহা কিছু উহাতে সঞ্চিত হইবে, উপযুক্ত

সময়ে সেই পগারের সার মাটী তুলিয়া জমিতে ছড়াইলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইবে। নদীর চরে পটল ভাল হয়। বেলে দোয়াঁস মাটিতে একবৎসর অন্তর শুক্না পাঁকমাটি ছড়াইলে ফলন ভাল হয়। একই ক্ষেত্রে ৪ বৎসরের অধিক পটল ভাল জন্মায় না।

অল্লোচ্চ, খোলা ও সম্পূর্ণ রৌদ্র বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই পটল চাষ ভাল হয়। পটল গাছ বা পাতাকে পল্‌তা বলে। গাছ ও পাতা তিক্ত কিন্তু ফল সুমিষ্ট।

জমির সহিত সার মাটি উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে। গোল আলুর ন্যায় পটলের ক্ষেতের জমিকে গভীর ভাবে কর্ষণ ও মাটী ধুলিবৎ করিতে হইবে। আশ্বিন হইতে কার্ত্তিকের মধ্যে মৃত্তিকা সরস থাকিতে থাকিতে পটলের গেঁড় বা মূল রোপণ করিতে হয়। পটল গাছ অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে কিন্তু নিতান্ত নীরস ও শুষ্ক স্থানে ভাল হয় না। আবার অতি বৃষ্টিতে শীঘ্র মরিয়া যায়।

মূল রোপণ প্রণালী।—পটলের স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় দুই প্রকার লতা হয়। উভয় জাতীয় লতাতে ফুল ফুটিতে দেখা যায় কিন্তু পুং জাতীয় লতায় ফল হয় না। দুই তিন বৎসরের পুরাতন মোটা মূল পুতিলে গাছ তেজস্কর হইয়া ষাঁড়াইয়া যায়, পটল জন্মায় না, অতএব এক বৎসরের নূতন লতার সরু সরু ছোট ছোট মূল বাছিয়া লইয়া ক্ষেত্রে পুতিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসে যখন কেহ পুরাতন পটল-ক্ষেত কর্ষণ করিতে থাকে, তখনই উক্ত রূপ সরু সরু স্ত্রী জাতীয় লতার ছোট ছোট মূল বাছিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। পরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ছয় ফিট অন্তর এক একটী ছোট ছোট মাদা প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক মাদায় চারি ফিট অন্তর দুই তিনটী হিসাবে মূল রোপণ করিয়া তাহার উপরে অল্প অল্প খড় কুটা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, ইহাতে অধিক রৌদ্রের উত্তাপে মূল বা গেঁড়ের মাথা গুলি শুকাইয়া যায় না। দীর্ঘ প্রস্থে রীতিমত জল নিকাশী পয়োনালী থাকা উচিত, কারণ জল বসিলে পটলের মূল পচিয়া যায়। মাদা গুলি সমতল জমি হইতে অন্ততঃ এক ফুট উচ্চ হওয়া উচিত।

ক্ষেত্রের পাট।—কার্ত্তিক মাস হইতে পৌষ মাসের মধ্যে মূল গুলি নূতন ক্ষেত্রে নূতন শিকড় ফেলিয়া গাছ গুলি কিঞ্চিৎ লতাইয়া না উঠিলে, ক্ষেতের মৃত্তিকা নাড়া চাড়া করিতে গেলে মূলের গাত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় গুলি নাড়া পাইয়া অনেক গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতএব কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া শীতকালে বারিপাত হইলে হাল্‌কা কোদালী দ্বারা মধ্যে মধ্যে কোপাইয়া ক্ষেত হইতে তৃণাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে মূল গুলিকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া আবশ্যক। গাছগুলি কিঞ্চিৎ বড় হইলে মাদা গুলিতে বাঁশ ইত্যাদির পুরাতন পাতা বিছাইয়া দিয়া তদুপরি নাড়া খড় অথবা যে স্থানে যাহা সুপ্রাপ্য এরূপ তৃণাদি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে, ইহাতে অনেকগুলি লাভ আছে। প্রথম (১) গাছের

গোড়া ঠাণ্ডা থাকে, (২) মাদায় ঘাস প্রায় জন্মায় না, (৩) গাছের আঁকড়া গুলি ঐ সমস্ত তৃণাদি অবলম্বন করিয়া লতাইয়া যাইবার সুবিধা পায়, (৪) বর্ষাকালে লতা গুলি মৃত্তিকা লিপ্ত হইয়া নষ্ট হইতে পারে না, (৫) কেয়ারীর জল সহজে নিকাশ হইয়া যায় অথচ মৃত্তিকা সরস থাকে এবং তৃণ পত্রাদি পচিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। বঙ্গদেশে কোন কোন স্থানে জল সেচনের প্রথা প্রচলিত নাই, কিন্তু আজকাল অনাবৃষ্টি ও অসময়ে বৃষ্টি হেতু যেরূপ ঋতু বিপর্য্যয় ঘটিতেছে তাহাতে কলবল বা কুপ খননের দ্বারা জল সেচনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব পৌষ মাঘ মাসের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে দুই একবার চৌকা গুলিতে জল সেচন করিতে হইবে। ইহাতে শীঘ্রই গাছগুলি লতাইয়া ফল ধরিতে আরম্ভ করিবে। কৃষকের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, জলুদি ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে, বাজারে চড়া দরে বিক্রয় করিয়া, তাহারা উপরন্তু খরচা বাদে বেশ দু পয়সা লাভ করিতে পারে।

তিন চারি বৎসরের অধিক এক স্থানে পটল ভাল হয় না। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে, অন্য কোন নূতন ক্ষেত প্রস্তত করিতে হয়। প্রতি বৎসর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রীতিমত চাষ দিয়া পুরাতন লতা পাতা পরিষ্কার করতঃ তৈল শস্য সরিষা, রাই, শোরগুজা ইত্যাদি ষান্মাসিক একটী ফসল উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উক্ত ফসল অন্তে ক্ষেতে পুনরায় কিঞ্চিৎ পুরাতন পাঁক মাটী ছড়াইয়া ক্ষেতের শক্তি বৃদ্ধি করিলেই চলে।

বাঙ্গালা দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানা জাতীয় পটল জন্মিতে দেখা যায়। তাহার মধ্যে কাজলী, ধানি, মাকড়া ও পাটনাই পটলই উৎকৃষ্ট। পটলের জালি জন্মাইবার তারিখ হইতে ৫ দিন মধ্যে খাইবার উপযুক্ত হয় সুতরাং ৪।৫ দিন অন্তর ক্ষেত্র হইতে পটল তোলা উচিত নতুবা পাকিয়া যায়। অনেকে কিন্তু সখ্ করিয়া পাকা পটল খাইয়া থাকে। ক্ষেত্র হইতে পটল তুলিবারও একটী নিয়ম আছে, ক্ষেত্রের এক দিক হইতে ক্রমাগত সারিবদ্ধ প্রত্যেক মাদার গাছ হইতে পটল তুলিতে আরম্ভ করিয়া জমির শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া উচিত, তাহাতে কোন মাদা বাদ যায় না সুতরাং পটল তুলিতে বাদ পড়িয়া পাকিবার সম্ভাবনা থাকে না, নতুবা বিপর্য্যস্ত ভাবে পটল তুলিলে সকল গাছ হইতে পটল তুলিতে ভুল হইয়া যায়।

পটলের জন্য জমির অবস্থা বুঝিয়া পূর্ব্বোক্ত সার ব্যতীত খৈল সার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এক বিঘা জমিতে পটল চাষের জন্য পোনের সেরের অধিক মূলের আবশ্যক হয় না। মূল যত সরু হইবে তত কম মূল আবশ্যক হয়। স্ত্রী জাতীয় লতার মূলই রোপণ করিতে হয় কিন্তু তাহার সহিত পুংজাতীয় লতার মূলও কিছু পরিমাণ থাকা আবশ্যক ; কারণ স্ত্রী পুষ্প ও পুং পুষ্প এই দুইয়ে সঙ্কর না হইলে পটল ভালরূপ

জন্মিবে না। এইরূপ হইতে না পাইলে অনেক সময় পটলের ছনিগুলি বোঁটা হইতে খসিয়া পড়িয়া শুকাইয়া যায়।

এক বিঘা জমিতে পটল চাষের খরচঃ—

৪ বার লাঙ্গল দেওয়া	...	...	২৷৷০ টাকা।
মূল রোপণ ও মাদা প্রস্তত	...	...	৩৲ ”
কোপান ও মাটি দেওয়া	...	...	৩৲ ”
জল সেচন	...	...	৩৲ ”
২ বার নিড়ানি	...	...	২৷৷০ ”
মূল খরিদ	...	...	৩৲ ”
জমির খাজনা	...	...	৩৲ ”
			২০৲

এক বিঘা জমিতে পটল খুব কম ফলিলেও ২৫ মণ পটলের কম প্রায়ই হয় না এবং প্রতি বিঘায় ৫০ মণ পর্য্যন্ত পটল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পটল প্রায়ই ১৷৷০ টাকা মণের কম বিক্রয় হয় না এবং প্রথম যখন পটল উঠে তখন সহর নগরে বার আনা, এক টাকা সের বিক্রয় হয়। বাজারে নূতন জিনিষ অথচ আমদানী কম বলিয়া এত দর হয়, কিন্তু প্রচুর আমদানী হইতে আরম্ভ হইলেও বহুদিন ধরিয়া কলিকাতায় বাজারে আট কিম্বা দশ পয়সা সের দর থাকে। এতদবস্থায় এক বিঘা পটল চাষ হইতে খরচ বাদে ৫০৲ কিম্বা ৬০৲ টাকা লাভ হওয়া কোনক্রমে বিচিত্র নহে।

ভারতীয় কৃষি-সমিতির গোবিন্দপুর ক্ষেত্রে একবার একটি পনর কাঠা পরিমাণ জমিতে পটল করিয়া দ্বিতীয় বৎসরে ৬০৲ টাকা মুনফা হইয়াছিল। ঐ জমির মৃত্তিকা দোয়াঁস, জমিটি বহুদিন পতিত ছিল সুতরাং গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থে সারবান, তার উপর পুষ্করিণীর পাঁক মাটি ছড়ান হইয়াছিল। পটল চাষের পূর্ব্বে ইহাতে বেগুন প্রচুর ফলিয়াছিল। বেগুনচাষ বর্ণনার সময় তাহার হিসাব দেওয়া যাইবে। এই দুইটি চাষ তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিদাস বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদে পটলের বহুবিধ গুণ বর্ণিত আছে। ইহার স্নিগ্ধত্ব ও পিত্তনাশক গুণ সর্ব্বজনবিদিত। ইহার পাতার ও পটলের রস ঔষধার্থে সেবন করা হয়।

পটল চাষের নূতন প্রণালী।—বাঁশের কঞ্চির আড়াই বা তিন হাতসউচ্চ এবং যথেচ্ছাভাবে লম্বা করিয়া 'ফেন্‌সিং' অর্থাৎ ঝাঁপের বেড়া প্রস্তত করতঃ ক্ষেত্রের দীর্ঘ প্রস্থ ভাবে উভয়ের মধ্যে ৭ হাত ব্যবধান রাখিয়া, শ্রেণীবদ্ধভাবে, যত সারি হইতে পারে, বসাইয়া দিয়া তাহাদের মধ্যে মধ্যে একটি একটি 'পোষ্ট' অর্থাৎ

খুঁটী পুতিয়া শক্ত করিয়া বেড়া গুলি বাঁধিয়া দিতে হয় এবং ঐ বেড়ার ধারে পূর্ব্বোক্ত ৫।৬ ফিট অন্তর মাদা করিয়া, যথারীতি গাছ লাগাইয়া বেড়ার দুই ধার হইতে পটল লতা উঠাইয়া দিলে, বার মাসই প্রায় সমান ভাবে পটল পাওয়া যায়। অধিকন্তু দুইটি বেড়ার অন্তর্গত তলস্থ ক্ষেত্রে মুখীকচু এবং ওল রোপণ করিয়া, কার্ত্তিক মাস মধ্যে, আরও দুইটি ভাল ফসল পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত পগারের সন্নিকট চারিপার্শ্বে বেড়ার উপর, শাঁক-আলু, ঝুপী আলু, বরবটীর গাছ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা কোন কোন স্থানে, বেড়া ও বরোজের উপর পটল গাছ উঠাইয়া দিয়া চতুরতার সহিত বারমাস ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এ প্রণালী উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকারের জমিতেই খাটিতে পারে। বিশেষতঃ নিম্ন ধরণের জমির পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যে জমিতে বর্ষায় জল জমে তথায় এই প্রকারে পটল চাষের সুবিধা হয় না কিম্বা যাঁহারা ব্যবসায়ের জন্য এককালে আট দশ বিঘা জমিতে পটল চাষ করিবেন, তাঁহাদের এই প্রথায় চাষের সুবিধা হয় না। খুচরা চাষীগণের পক্ষে অথবা ঘর খরচের জন্য চাষের পক্ষে এরূপ মিশ্র চাষই লাভজনক।

পটল গাছের সঙ্গে আরও একটী স্থায়ী তরকারির গাছ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহার নাম ঘৃত কাঁকরোল। ঘৃত কাঁকরোল রন্ধন করিলে প্রকৃতই ঘৃতের ন্যায় গলিয়া যায়। এই গাছ পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক দেখা যায়। ঘৃত কাঁকরোলও পটলের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে বার মাস জন্মায়। ইহার গাত্রে ছোট ছোট নরম কাঁটা আছে। মূলে গাছ হয়, বীজেতে গাছ জন্মে না। এক স্থানে অনেক দিন জীবিত থাকিয়া ফল দান করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশের এক বিঘা জমিতে ২৫ হইতে ৪০ মণ পটল জন্মিয়া থাকে। নদীর চরে ফলন কিছু অধিক হয়। আমাদের গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ বিঘা প্রতি ৫০ মণেরও অধিক পটল ফলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একটা বাগান তুলিয়া দিয়া পটলের ক্ষেত্র রচনা করা হইয়াছিল—জমি হালকা দোয়াঁস, তার উপর পাতা পচা সার পাইয়া আরও হালকা হইয়াছিল—পুষ্করিণীর পুরাতন পাঁক ব্যতীত অন্য কোন সার ব্যবহার করা হয় নাই।

পটল নূতন উঠিলেই খুব দরে বিক্রয় হয়, এমন কি এক টাকা পাঁচসিকা পর্য্যন্ত দর উঠে। যিনি যত শীঘ্র আমদানী করিতে পারেন, তিনি তত অধিক দর পান, কিন্তু এ দর অতি অল্প দিনের জন্য। গড়ে পটলের মণ দেড় টাকা কিম্বা এক টাকা বার আনা ধরিলেও পটল চাষে সুচাষীর ৪০৲ হইতে ৬০৲ টাকা খরচ বাদে লাভ হওয়া অসম্ভব নহে।

২য় শ্রেণী—ঝিঙ্গা, উচ্ছে প্রভৃতি

ঝিঙ্গা

ঝিঙ্গা,—ভুঁইঝিঙ্গা, শিঙ্গা ঝিঙ্গা, বারপাতা ও থুপি ঝিঙ্গা প্রভৃতি কয়েক প্রকার ঝিঙ্গাই সচরাচর বঙ্গদেশে দেখা যায়।

ভুঁই ঝিঙ্গা,—ইহার গাছ মাটিতে লতাইয়া যায় এবং গাছ খুব বড় হয় না। বাঙলা দেশ ছাড়া পশ্চিমে এই ভুঁই ঝিঙ্গা ব্যতীত অন্য ঝিঙ্গার চাষ হয় না। পশ্চিমে ইহার নাম কালী তরুই। বঙ্গদেশের জল হাওয়া ভিন্ন অন্যত্র পালাঝিঙ্গা চাষের সুবিধা নাই, কিন্তু আসামে পালাঝিঙ্গার চাষ হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। বঙ্গদেশে ধান কাটিয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে শীতকালীন বৃষ্টির পর জমি চষিয়া খুঁড়িয়া মাঘ, ফাল্গুন মাসে ভুঁই ঝিঙ্গার চাষ হয়। এই ঝিঙ্গা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলে। ফলও অপরিষাপ্ত হয়। সময় মত বৃষ্টি পাইলে বা সেচন জলের সুবিধা হইলে ইহার চাষ হইতে বেশ দুপয়সা লাভ হয়; কারণ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন তরকারির বড়ই অনাটন, তখন এই ঝিঙ্গা বড় আদরের।

শিঙ্গা, বারপাতা, থুপি প্রভৃতি গুলির চাষ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে আরম্ভ হয়। ইহাদের ফল বর্ষাকালে হয়। শিঙ্গা ঝিঙ্গা গুলি এক হাত দেড় হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। শিঙ্গা ঝিঙ্গার লতা গুলিকে আশ্রয় দিবার জন্য বাঁশের ডগা বা কঞ্চির পালা পুতিয়া দিতে হয়। বর্ষাকালে ইহার লতা মাটিতে লতাইতে পারে না এবং লতাইতে দিলেও তাহাতে ফল হয় না। বারপাতা ও থুপি ঝিঙ্গার চাষ শিঙ্গা ঝিঙ্গারই অনুরূপ। বারপাতা ঝিঙ্গার লতায় বারটি পাতা হইলেই ফল ধরে। আর থলো থলো এক সঙ্গে অনেকগুলি ফলে বলিয়া থুপি ঝিঙ্গার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। থুপি ঝিঙ্গার আকার খুব ছোট। বুদ্ধিমান কৃষক মাত্রেই একটি সমুদয় ক্ষেত্র যুড়িয়া ঝিঙ্গা চাষ করে না, তাহারা বেগুন বা অন্য সব্জী ক্ষেত্রের ধারে ধারে ঝিঙ্গার মাদা দিয়া থাকে। ৪ ফিট অন্তর মাদা দেওয়ার ব্যবস্থা। পালা ঝিঙ্গা সাড়ে সাত তোলা এবং ভুঁই ঝিঙ্গা ১০ তোলায় এক বিঘা জমির চাষ হয়।

সার,—চাষীদের নিকট পগারের মাটি বা পুষ্করিণীর পুরাতন পাঁকমাটি এবং গোশালার ছাই, গোময় ও গোমূত্র মিশ্রিত সার ঝিঙ্গা চাষের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। নিম্ন মাটান জমিতে ভুঁই ঝিঙ্গা হয়, কিন্তু অন্য ঝিঙ্গা চাষের পক্ষে ভিটা মাটি কিম্বা উচ্চ দোয়াঁস বাগানের জমিই উৎকৃষ্ট।

কাঁকরোল, কুন্দরকী,—ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্রের ধারে ধারে ইহার চাষ করাই বিধি। চাষীগণ তাহাই করিয়া থাকে। বাঁশ কিম্বা কঞ্চির

পালায় ইহার গাছ লতাইয়া যায়। কাঁকরোলের ফল রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। কুন্দরকীরও ব্যঞ্জন হয়। ইহা কিন্তু কাঁচা খাইতেও ভাল লাগে। তেলাকুচাও কুন্দরকী জাতীয় ফল। ইহারও ব্যঞ্জন কেহ কেহ খাইয়া থাকে। তেলকুচা এবং কুন্দরকীর ফল পাকাইয়া পোষা পাখীকে খাইতে দেওয়া হয়। তেলাকুচার পাতার রস পিত্তনাশক। কাঁচা দুধের সহিত তেলাকুচা পাতার রস প্রত্যহ খাইলে অম্লপিত্ত রোগ নাশ হয়। ঝিঙ্গা অপেক্ষা ইহার মাদা ফাঁক ফাঁক দিতে হয়। চাষের প্রণালী ঝিঙ্গার অনুরূপ।

করলা, উচ্ছে,—উচ্ছে দুই প্রকার। এক প্রকার ভুঁই ঝিঙ্গার সহিত মাঠে চাষ হয়। বপনের সময় মাঘ, ফাল্গুন। যে উচ্ছে বর্ষার সময় হয় তাহা পালায় হয়। ভুঁই উচ্ছে কিঞ্চিৎ গোলাকৃতি। পালা উচ্ছে ঈষৎ লম্বাকার। পালা উচ্ছের চাষের সময় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ। করলার চাষ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ভিন্ন হয় না। উচ্ছের ন্যায় উহার জন্য পালার ব্যবস্থা করিতে হয়। বঙ্গদেশের করলা অপেক্ষা লক্ষ্ণৌ ও পশ্চিম দেশীয় করলা আকারে খুব বড় হয়। কোন কোনটা ৯ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। প্রতিবৎসর বড় করলার বীজ বিদেশ হইতে আনাইতে হয়। এদেশজাত বড় করলার বীজে চাষ করিলেও ফল ছোট হইয়া যায়। তোলা মাটি ও গোয়ালের সারই উপযুক্ত সার। প্রতি বিঘায় উচ্ছের বীজ ১০ তোলা আবশ্যক। করলা বীজ কিছু অধিক লাগে। ইহাদেরও ৪ ফিট অন্তর মাদা দেওয়া হইয়া থাকে।

ধুন্দুল,—ইহার চাষ ঝিঙ্গারই অনুরূপ। ইহার ফল গুলি ঝিঙ্গা অপেক্ষা ভারি হয় বলিয়া ইহার জন্য একটু শক্ত পালা দেওয়া উচিত। সার ও বীজের পরিমাণ ঝিঙ্গারই সমান। ইহার অপর নাম নেনুয়া বা ঘীয়া তরুই।

চিচিঙ্গা,—ইহার চাষ একটু স্বতন্ত্র রকমের। ক্ষেতের ধারে ভিতে ইহার চাষ চলে না। চিচিঙ্গা গুলি লম্বা হয়। সরল ঋজুভাবে না ঝুলিতে পাইলে ইহার ফল কোক্‌ড়াইয়া যায় এবং ভাল বাড়ে না। ইহার ফলগুলি বাড়াইবার জন্য চাষীরা প্রত্যেক ফলের আগায় ঢিল বাঁধিয়া দেয়। সমুদয় ক্ষেতের উপর ইহার মাদা দিতে হয় ও মাদা গুলির ব্যবধানে ৬ ফিট কিম্বা কিছু অধিক হইলেও ক্ষতি নাই। ক্ষেতের উপর মাচান করিতে হয়। তাহাতে গাছ লতাইয়া উঠে। মাচানের নিচে ফল গুলি ঝুলিতে থাকে। ইহার ভাজা এবং ব্যঞ্জন খাইতে সুমিষ্ট। ফলগুলি একটা এক পয়সা কখন কখন বা দুই পয়সায় সকলে আগ্রহ করিয়া ক্রয় করে। উচ্ছে করলাতে যে সার দিতে হয়, ইহাতেও সেই সার প্রযোজ্য। বীজের পরিমাণ বিঘা প্রতি দশ তোলার কম নহে বরং কিঞ্চিৎ অধিক।

চাষীদের ঝিঙ্গা, করলা প্রভৃতি চাষের সাধারণ নিয়ম এই যে, তাহারা বেগুন প্রভৃতি কোন একটি সব্জীর ক্ষেত করিয়া তাহার ধারে ধারে ঝিঙ্গা করলা প্রভৃতির মাদা দেয়। কত অন্তর এক একটি মাদা দিতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চাষীরা প্রত্যেক মাদায় দুই বা তিনটি বীজ বপন করে। প্রত্যেক মাদায় অন্ততঃ দুইটি চারা বাহির হওয়া চাই —সেই কারণে প্রায় তিনটি বীজ উপ্ত হয়। একটি কোন কারণে নষ্ট হইলে নিশ্চয়ই দুইটি চারা হইবেই হইবে। বৃষ্টির জলের সুবিধা না হইলে, মাদায় টোপা জল দিতে হয়। মাদাগুলির ধার দিয়া বাঁশ কিম্বা কঞ্চির পালা পুতিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক পালা ২॥ কিম্বা ৩ হাতের অধিক ফাঁক হওয়া উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে ঝিঙ্গা প্রভৃতির লতাগুলি সম্পূর্ণ লতাইবার স্থান পায় না। এইরূপে ঝিঙ্গাদি মাদা দিবার চাষীদের আর একটি উদ্দেশ্য এই যে বাঁশের পালায় ঝিঙ্গাদির লতা উঠিয়া একটি দুর্ভেদ্য বেড়া নির্ম্মিত হয়। এমন সুন্দর বেড়া হয় যে, তাহার ভিতর মানুষ গরু সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপে চাষীর ক্ষেত্রটি সুরক্ষিত হয় এবং বেড়া হইতে পরিশ্রমী চাষী হইলে প্রায় চাষের খরচ উঠিয়া যায় ও মধ্যের জমির ফসল হইতে জমির খাজনা বাদ সমুদয় লাভ থাকে।

ঝিঙ্গাদির গাছ, পালাতে লতাইয়া উঠিলেই প্রত্যেক মাদা গুলির গোড়ায় মাটি দিতে হয় ও একটানা আইল বাঁধিয়া দিতে হয়। মাঝে মাঝে কেবল জমির জল নিকাশের জন্য ফাঁক রাখিতে হয়। উপযুক্ত সার মাটি পড়িলে ও সমস্ত ক্ষেতের ধোয়াট আসিয়া এই কিনারাস্থিত গাছগুলিকে খুব তেজস্কর করিয়া তুলে। ধারে ঝিঙ্গা আদির গাছ না থাকিলে ধোয়াট জল এককালে পগারে গিয়া সঞ্চিত হইত।

বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে এবং পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে কিন্তু করলার চাষ ক্ষেত যুড়িয়া হয়। পশ্চিমে করলাতে পালা দেওয়া হয় না এবং আবশ্যকও তত দেখা যায় না। বাঙলার মাটি খুব কর্দ্দমাক্ত হয় বলিয়া এইরূপ পালা ব্যবহারের নিয়ম।

চূণ সার।

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, এফ, আর, এচ, এস, লিখিত।

মানুষে নানাকার্য্যে নানাপ্রকারে চূণ ব্যবহার করিয়া থাকে। গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে চূণ একটি প্রধান মসালা। সৌধশ্রেণী সৌধ নাম চূণ হইতেই পাইয়া থাকে। মানুষে চূণের জল ও চূণ খাইয়া থাকে। দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিতে চূণের আবশ্যক হয়। অম্লকে ক্ষারে পরিণত করিতে চূণই একমাত্র উপায়।

এতদ্ব্যতীত কৃষি কর্ম্মে চূণ অত্যাবশ্যক। সুতরাং চূণ জিনিষটা কি জানিয়া রাখায় লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই। ইহা এক প্রকার ধাতু বিশেষ, কিন্তু এই ধাতু বিযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। কার্ব্বনিক এসিডের সহিত মিলিত ক্যাল্‌সিয়ম কার্ব্বনেটরূপ বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। ঘুটিং, শামুক, খড়িমাটি, চূণাপাথর, প্রবাল, মুক্তা ইত্যাদি দগ্ধ করিয়া চূণ হয়।

ক্যাল্‌সিয়ম উদ্ভিদের একটি খাদ্য। ইহা আবার ভূমিতে উদ্ভিদের খাদ্য রক্ষা করিতে পারে। ক্যাল্‌সিয়ম বিশিষ্ট ভূমির নাইট্রোজেন ও ফস্ফরাস্ রক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে। এই দুইটীই উদ্ভিদের খাদ্য। বৃক্ষাদি যে, ভূমি হইতে চূণ সংগ্রহ করে তাহার প্রমাণ যথেষ্ট। ধান, গম প্রভৃতির ভস্মে শতকরা ৬ ভাগ চূণ পাওয়া যায়।

এতদ্দেশীয় মৃত্তিকায় চূণের অভাব নাই। তবে জমিতে মধ্যে মধ্যে চূণ প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া পড়ে। চূণ প্রয়োগ দ্বারা শক্ত মাটি নরম ও নরম মাটি শক্ত করিয়া লইয়া চাষের সুবিধা করিয়া লইতে হয়।

জমি সংশোধন করিতে, মৃত্তিকাকে ফসল বিশেষের উপযোগী করিতে এবং সাররূপে নানা উদ্ভিদের জন্য ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার উৎপত্তি, গুণাগুণ এবং মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ শরীরে ইহার কর্ম্মাকর্ম্ম অবগত থাকিলে, কৃষিকার্য্যে কিরূপে উহার ব্যবহার হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারা যায়। চূণের যেমন নানাবিধ গুণ আছে, তেমনি স্থলবিশেষে ইহা দ্বারা সমূহ অনিষ্টও ঘটিতে পারে। ক্ষেত্রের অবস্থা মাটির স্বাভাবিক গঠন, এবং প্রস্তাবিত ফসলের অভাব প্রভৃতি অনেক বিষয় বিবেচনা করিয়া তবে উহা ব্যবহার করা উচিত। মৃত্তিকার স্বভাব জ্ঞাত না হইয়া ও নির্দ্দিষ্ট ফসলের পক্ষে কি আবশ্যক, না বুঝিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে ক্ষেত্রে চূণ ব্যবহার করিলে কোন স্থলে উপকার, কোন স্থলে ক্ষতি হয়; সুতরাং উহার ফলের নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করা যায় না। এই কারণে চূণের ব্যবহারে অনেকে সুফল প্রাপ্ত হন, আবার অনেকে নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত

হইয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন ফলের জন্য চূণ কোনরূপে দায়ী নহে। ইহাতে ব্যবহারকারীর বিচক্ষণতার অভাবই সূচিত হয়। উদ্ভিদদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে অল্লাধিক পরিমাণে চূণের অস্তিত্ব দেখা যায়। উদ্ভিদ শরীরে যাবতীয় স্থূল উপাদান মৃত্তিকা হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা মৃত্তিকাতে ঐ সকল উপাদানের অস্তিত্ব সাধারণ চক্ষে দেখিতে পাই না। তাহার কারণ এই যে, উহা মৃত্তিকার সহিত অতি সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকায় চূণের অভাব থাকিলে, উহাতে সুচারুরূপে উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না, কিম্বা জন্মিলেও তেমন সবল ও পরিপুষ্ট হয় না। চূণ, মৃত্তিকা মধ্যে সাক্ষাত ও পরোক্ষ দুই ভাবে কার্য্য করে।

প্রথমতঃ উহার দ্বারা মৃত্তিকার স্বাভাবিক গঠন পরিবর্ত্তিত হয়; এঁটেল মাটিকে যেমন উহা আল্গা রাখে, বেলে মাটিকে আবার তেমনই ঘন সম্বদ্ধ করে। যদি এই উভয় প্রকার মৃত্তিকায় চূণের একবারে অভাব থাকে, অথবা উহাদিগের ভিতর হইতে চূণের অংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে এঁটেল মাটির আর বায়ুমণ্ডল হইতে রস বা বাষ্পীয় পদার্থ গ্রহণের শক্তি থাকিবে না, কিম্বা জল শোষণেরও শক্তি থাকিবে না। অন্য দিকে চূণ বিয়োজিত হইলে বেলে মাটির ধারণাশক্তি (Power of retention) একেবারে কমিয়া যায়, এবং বালির আল্গা ভাবই থাকিয়া যায়। পাকা ঘরবাড়ী যখন নির্ম্মাণ করিতে হয়, তখন বালির সহিত যে চূণ মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়, তাহার একমাত্র কারণ, উহার আল্গা ভাব বিনষ্ট করা, এবং চূণের দ্বারাই উহাকে জমাট বাঁধান হয়। চূণ বিহীন এঁটেল মাটিতে জল প্রদান করিলে উহা সেই জল টানিয়া লইতে পারে না, কিন্তু উহার সহিত অল্লাধিক পরিমাণে চূণ মিশ্রিত করিলে, উহার সেই কঠিন ভাব দূরীভূত হইয়া যায়, এবং এঁটেল মাটি, চূণের পরিমাণানুসারে অল্লাধিক পরিমাণে লঘুত্ব প্রাপ্ত ও জল শোষণ এবং ধারণক্ষম হয়। চূণের অস্তিত্ব যে কেবল মৃত্তিকা মধ্যে দেখা যায়, তাহা নহে; মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি যাবতীয় জীবদেহে চূণের একটা বিশেষ অংশ আছে। মনুষ্য, পশুপক্ষীর অস্থি, মৎস্যাদি জলজন্তুর কাঁটা, শামুক, গুগলির আবরণ এ সকলের মধ্যে অল্লাধিক চূণ আছে। এই চূণ তাহারা মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ করে। মৃত্তিকাতে চূণের অস্তিত্ব হেতু উদ্ভিদগণ উহা আহরণ করিয়া নিজ শরীরে সঞ্চয় করে। এই সমস্ত উদ্ভিদ শরীর বা তৎপ্রসূত ফল শস্যাদি জীবগণ উদরস্থ করে বলিয়া, চূণ তাহাদেরও শরীরে স্থান পায়। মৃত্তিকা মধ্যে চূণের অংশ আছে, সুতরাং তাহাতে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে, তাহাতেও চূণ থাকে এবং যে সকল জলজ প্রাণী জলে বিচরণ করে ও জলাশয়স্থিত গুল্ম লতাদি আহার ও সেই জল পান করিয়া থাকে, তাহারাও জল হইতে শরীর মধ্যে চূণ গ্রহণ করে।

চূণ দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়,—প্রথম, বিশেষ বিশেষ প্রকারের প্রস্তর, ও ঘুটিং বা কঙ্কর হইতে; দ্বিতীয়তঃ শামুখ, গুগলি প্রভৃতি হইতে। যে পাথর হইতে চূণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে চূণাপাথর (Line stone) কহে এবং এই প্রস্তর ভারতের নানাস্থানে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালাদেশে যে চূণের আমদানি হয়, তাহা শ্রীহট্ট হইতে আইসে। সংপ্রতি মধ্য ভারত হইতেও কাঁকর আমদানি হইতেছে, তাহা হইতেও সুন্দর চূণ উৎপন্ন হয়। ঘুটিং ও কাঁকর একই জিনিষ, তবে বাঙ্গালায় যাহাকে ঘুটিং বলা যায়, পশ্চিমাঞ্চলে তাহাকে কাঁকর বলে। পাথর বা কাঁকর অগ্নিতে উত্তমরূপে দগ্ধ করিলে, উহা চূণের উপযোগী হয়। অগ্নিতে দগ্ধ করিলেও উহার কাঠিন্য যায় না। শম্বুকাদিরও কাঠিন্য যায় না। পরন্তু উহা ভঙ্গপ্রবণ হইয়া থাকে। ক্যাল্‌সিয়ম (Calcium) নামক ধাতব পদার্থের সহিত অক্সিজেন (Oxygen) সংযুক্ত যে পদার্থ (Oxide of Calcium), তাহাই চূণের যাবতীয় উপাদান। যেই আবার উহাতে জল দেওয়া যায়, অমনি সেই দগ্ধ প্রস্তর রাশি জল শোষণ করে এবং ফাটিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। গৃহাদি নির্ম্মাণোপলক্ষে যাঁহারা বাটীতে পোড়া ঘুটিং আনিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে, সেই পোড়া কাঁকরে বা পাথরে জল দিলে কিরূপ সহজে উহা আপনা হইতে ফাটিয়া ক্রমশঃ ধূলিবৎ হইয়া যায় এবং যতই চূর্ণ হইতে থাকে, ততই তাহার ভিতর হইতে উত্তাপ ও বাষ্প নির্গত হইতে থাকে। চূণের এই অবস্থাকে সিক্তচূণ (Slaked lime) কহে এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহার উত্তাপ ও দাহিকাশক্তি বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়। ক্ষণকাল এতদবস্থায় অনাবৃত স্থানে রাখিয়া দিলে, বায়ুমণ্ডল হইতে উহা অক্সিজেন আহরণ করিয়া অধিকতর নিস্তেজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তবে উহা কৃষিকার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী হইতে পারে।

চূণের প্রধান উপাদান ক্যাল্‌সিয়াম। ইহা এক প্রকার ধাতু বিশেষ। কার্ব্বনিক এসিডের সহিত মিলিত হইলে ক্যাল্‌সিয়াম-কার্ব্বনেটরূপে ঘুটিং পাথর, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। ঘুটিং পাথর বা শামুক প্রভৃতি পোড়াইলে কার্ব্বনিক এসিড উড়িয়া গিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সাধারণ চূণ—ইহাই ক্যাল্‌সিয়াম-অক্সাইড (ক্যাল্‌সিয়াম ১, অক্সিজেন ১)। ইহাতে জল মিশ্রিত করিলে কলিচূণ প্রস্তুত হয়। যাহাতে শতকরা ৫ ভাগের অধিক খাঁটি চূণ আছে, তাহাই চূণ সার। সেই হিসাবে চূণ, শামুক, ঝিনুক, ঘুটিং, জিপসম চূণসার মধ্যে পরিগণিত।

আমরা উপরে যে জিপসমের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা জানিয়া রাখা উচিত; কারণ ইহা জমিতে বিশেষ সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার একটি বিশেষ গুণ এই যে ইহা ব্যবহারে জমি কথঞ্চিৎ

সরস থাকে। জিপসম একটি যৌগিক পদার্থ। খনিতে ইহা পাওয়া যায়, কিম্বা সলফিউরিক এসিডের সহিত চূণ সংমিশ্রিত করিলে ইহা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। সোডার জল তৈয়ারির কারখানায় যে শুভ্র পদার্থ ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহাই জিপসম।

চূণের সহিত ফস্ফরিক এসিড সম্মিলিত হইয়া আর একটি প্রধান সার উৎপন্ন করে—সেটি ক্যাল্সিয়াম ফস্ফেট। জমির ইহা একটি প্রধান সার। কোথাও কোথাও ইহা খনিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ক্যাল্সিয়াম ফস্ফেট প্রাপ্তির প্রধান উপায় অস্থিজ সার। হাড়ে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ ক্যালসিয়াম ফস্ফেট আছে। ইহা কিন্তু জলে দ্রব হয় না। ইহা এসিডে দ্রব হইতে পারে। সোরা কিম্বা সাধারণ লবণ জলে ইহা কথঞ্চিৎ দ্রব হয়। এই জন্য হাড় চূর্ণ অতি ধীরে ধীরে উদ্ভিদের উপকারে আসে। হাড়ের গুঁড়াকে সহজে উদ্ভিদের কার্য্যে লাগাইতে হইলে সুপার প্রস্তুত করাই শ্রেয়ঃ। হাড়ের গুঁড়া প্রথমতঃ জলে আর্দ্র করিয়া ইহাতে অল্পে অল্পে সলফিউরিক এসিড যোগ করিতে হয়; হাড়ের গুড়ার পরিমাণ যত তাহার প্রায় এক তৃতীয়াংশ এসিড মিলাইতে হয়। (ক্রমশঃ।)

আর্য্য কৃষিরীতি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন লিখিত পুঁথি হইতে সংগৃহিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লক্ষণালক্ষণ নির্ণয়।

হলপ্রবাহ কালেতু কূর্ম্মমুৎপাটয়েদ্‌যদি।
গৃহিণী ম্রিয়তে তস্য তথা চাগ্নিভয়ং ভবেৎ॥
ফালোতপাটে চ ভঙ্গে চ দেশত্যাগো ভবেদ্‌ধ্রুবম্।
লাঙ্গলো ভিদ্যতে বাপি প্রভুস্তস্য বিনশ্যতি॥
ঈশাভঙ্গোভবেদ্বাপি কৃষকো জীবনাক্ষমঃ।
ভ্রাতৃনাশো যুগে ভগ্নে শৌলে চ ম্রিয়তে বৃষঃ॥
যোক্ত্রেচ্ছেদে চ রোগঃ স্যাৎ শস্যহানিশ্চ জায়তে।
নিপাতে কর্ষকস্যাপি কষ্টং স্যাৎ রাজমন্দিরে॥
হলপ্রবাহকালে তু গৌরেক প্রপতেদ্‌যদি।
জরাতিসার রোগেণ মানুষো ম্রিয়তে তদা॥

হলপ্রবাহমানে তু বৃষো ধাবন্ যদি ব্রজেৎ।
কৃষিভঙ্গো ভবেত্তস্য পীড়া চাপি শরীরজা॥
হলপ্রবাহমাত্রস্তু গৌরেক নর্দ্দতে যদি।
নাসালীঢ় প্রকুর্ব্বিত তদা শস্যং চতুর্গুণম্॥
প্রবাহমুক্তমাত্রস্তু গৌরেক স্বনতে যদি।
অন্যস্য লেহনং কুর্য্যাৎ তদা শস্য চতুর্গুণম্॥
হলে প্রবহমানে তু শকৃন্মূত্রং যদা স্রবেৎ।
শস্যবৃদ্ধিঃ শকৃৎপাতে মূত্রে বন্ধ্যা প্রজায়তে॥



হলপ্রবাহকালে যদি জমির আইল ভাঙ্গিয়া যায় অথবা চাষোদ্ভুতশীল মাটী ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে গৃহিণী নাশ বা অগ্নিভয় হয়। ফাল উৎপাটিত হইলে বা ভাঙ্গিয়া গেলে দেশত্যাগ, লাঙ্গল (মুড়ো বা বোঁটা) ভঙ্গে প্রভুবিনাশ, ঈশভঙ্গে গৃহীবিনষ্ট, যোয়ালভঙ্গে বৃষনাশ, যোত ছিঁড়িলে রোগ ভয়, শস্যহানি, কর্ত্তা বিনষ্ট এবং রাজদ্বারে কষ্টপ্রাপ্তি, একটী গো পতিত হইলে জ্বরাতিসার রোগে কর্ত্তা বিনষ্ট, বৃষ দৌড়িয়া পলায়ন করিলে কৃষিনষ্ট এবং শারীরিক পীড়া হয়। আর হলারম্ভমাত্রে একটী গো নাদিলে (গোবর ত্যাগ করিলে) এবং নাসা লেহন করিলে চতুর্গুণ শস্য, মুক্ত মাত্রে একটী গো শব্দ করিলে এবং অন্যকে লেহন করিলে চতুর্গুণ শস্য ও হলারম্ভমাত্রে গোবর ও মূত্রত্যাগে বন্ধ্যা হয় জানিতে হইবেক।

হলপ্রবাহকালে এ সকল ঘটনা প্রায়ই ঘটে না। ঘটিলে ঐরূপ ফল হওয়াই সম্ভব। আমি ইহার অনেক ফল পাইয়াছি, সাধারণে এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এবং শুভাশুভ পরীক্ষা করেন এইমাত্র প্রার্থনা।

হেমন্তে কৃষ্যতে হেম বসন্তে তাম্ররৌপ্যকম্।
ধান্যং নিদাঘকালে তু দারিদ্র্যন্তু ঘনাগমে॥

শীতকালে হলারম্ভে স্বুবর্ণ, বসন্তে রৌপ্য ও তাম্র, গ্রীষ্মকালে ধান্য এবং বর্ষাকালে দরিদ্রতা লাভ হয়।

মৃৎ স্বুবর্ণা সমা মঘে কুম্ভে রজতসন্নিভা।
চৈত্রে তাম্র সমাখ্যাতা ধান্যতুল্যা চ মাধবে॥
জ্যৈষ্ঠে মৃদেব বিজ্ঞেয়া আষাঢ়ে কর্দ্দমাহ্বয়া।
নিষ্ফলা কর্কটে চৈব হলেরুৎপাটীতা তু যা॥

মাঘমাসে হলারম্ভে কর্ষিত মৃত্তিকা স্বুবর্ণসম, ফাল্গুনে রজতসন্নিভ, চৈত্রে তাম্র সমাখ্যাত, বৈশাখে ধান্যতুল্য, জ্যৈষ্ঠে মৃত্তিকাসম, আষাঢ়ে কর্দ্দমসম এবং শ্রাবণে নিষ্ফলমাত্রক হয়।

মাঘ মাসের মৃত্তিকা মধ্যে হিম শিশির প্রবেশ দ্বারা মৃত্তিকা অধিক উর্ব্বরা হয়। অন্যান্যগুলি এইরূপ হিম রৌদ্র ও উত্তাপ এবং বৃষ্টির জলের কারণ বিভিন্ন ফলদায়ক হইয়াছে।

হলপ্রসারণং নৈব কৃত্বা যঃ কর্ষণং ব্রজেৎ।
কেবলং বলদর্পেণ স করোতি কৃষিং যথা॥

যে ব্যক্তি হলপুণ্যাহ না করিয়া বল ও দর্পের সহিত কৃষিকার্য্য করে, তাহার সমস্তই, নিষ্ফলদায়ক হয়।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

মান্দ্রাজে ধান চাষের উন্নতি।

মান্দ্রাজ অঞ্চলে কাষ্ঠ নির্ম্মিত লাঙ্গলের ব্যবহার ছিল। কিন্তু তথাকার কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ ষ্টেটে দেশী লাঙ্গলের অনুরূপ লোহার লাঙ্গল ব্যবহার করা হইতেছে; ইহাতে কাঠের লাঙ্গল অপেক্ষা ভাল কাজ হইতেছে। স্থানীয় কামারেই এই লাঙ্গল নির্ম্মাণ করে এবং দাম ৬৲ টাকার অধিক পড়ে না।

ধান চাষের পক্ষে কোন সার উপযুক্ত তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বহুবিধ পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, গোময়, গোমূত্র এবং গোয়ালের আবর্জ্জনাই একমাত্র সস্তা ও কার্য্যকরী সার। এই প্রকার গোয়ালের সার সযত্নে রক্ষার বিধান করা হইয়াছিল। একটি গর্ত্তে সার সংগ্রহ করিয়া তাহাতে মধ্যে মধ্যে চোনা বা জল সিঞ্চন করা হইত, কারণ তাহা না করিলে সার শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া ব্যবহারের উপযুক্ত হয় না, আবার এরূপ না, করিলে সার গরম হইয়া শুকাইয়া যাইলে সারের তেজ কমিয়া যায়।

এই সার ব্যতীত বননীল বা রেড়ী পাতা সবুজ সাররূপে ব্যবহার করিয়া দেখা হইয়াছে। এই সকল দ্রব্য যদি ক্ষেত্রের সন্নিকটে পাওয়া যায়, তবেই ভাল নচেৎ সংগ্রহ করিয়া ক্ষেতে আনিবার খরচ অধিক হইলে ঐ সার ব্যবহারে কেবল লাভ দেখা যায় না।

রেড়ী এবং নিমের খৈলও ধানের পক্ষে মন্দ সার নহে, কিন্তু যদি স্বস্থানে না মেলে তাহা হইলে ব্যবহার করা চলে না, কারণ দূরদেশ হইতে আনাইবার খরচাই এই সকল খৈল ব্যবহারের পক্ষে একমাত্র প্রতিবন্ধক।

ধান্যক্ষেত্র সারবান করিবার জন্য আর একটি উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। তথায় চাষীগণ ধান উঠাইয়া লইবার পর ক্ষেত্রটি শুষ্ক হইলে মটর, মসুর

প্রভৃতি শিম্বি জাতীয় শস্যের চাষ করিয়া থাকে। এই হিসাবে মান্দ্রাজের ধান্য ক্ষেত্রে মাটবাদামের চাষও হয়। এই শিম্বি জাতীয় শস্য চাষে জমির উর্ব্বরতা শক্তির হানি হয় না পরন্তু ঐ সকল শস্য, সার পদার্থ সংগ্রহ করিয়া পরবর্ত্তী ফসলের জন্য রাখিয়া যায়। বাঙ্গালাদেশেও অনেক জায়গায় ধানক্ষেতে কলাই চাষের বিধি আছে, কিন্তু যে সকল জমি লোণা বা যাহার মাটি খুব শক্ত আটাল তথায় এই প্রকার কলাই আদি চাষের সুবিধা ঘটে না।

পুরাতন পাঁকমাটি ছড়াইয়াও ধানের ফলন বাড়ে। মান্দ্রাজের শিবগিরি ক্ষেত্রে জলাশয়ের পাঁকমাটি গোময়াদি গোয়ালের সারের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করাতে ধান পর্য্যাপ্ত জন্মিয়াছিল।

শিবগিরি ক্ষেত্রে বীজধান একটির হিসাবে রোপণ করিয়া যে ফলন অধিক হয় তাহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তথাকার কার্য্য তত্ত্বাবধারক বলেন যে, বীজধান একটির হিসাবে রোপণ করিলেও তাহা হইতে তেউড় বাহির হইয়া শীঘ্র ঝাড় বাঁধিয়া যায়। অনেকগুলি একসঙ্গে রোপিত হইলে তাহারা ভালরূপ তেউড় ছাড়িতে পারে না সুতরাং অনেকগুলি বীজ ধান অনর্থক নষ্ট করা হয়।

[বঙ্গদেশে কিন্তু বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, দেশ, কাল এবং ক্ষেত্র হিসাবে এক হইতে ১০।১৫ টি তেউড় বসাইবার আবশ্যক হয়। আমাদের বিশ্বাস চাষীরা কখনই বীজধান অকারণ নষ্ট করে না।] কৃঃ সঃ।

মান্দ্রাজে বীজ নির্ব্বাচনের নিয়ম বঙ্গদেশ অপেক্ষা ভাল। বাঙ্গালার চাষীরা বড় অলস স্বভাব তাহারা ক্ষেত্র হইতে ধান সংগ্রহ করিয়া, ধান ঝাড়া মাড়া হইলে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বীজের জন্য রাখিয়া দেয়। ইহার সহিত ভিন্ন জাতীয় ধান্য মিশ্রিত থাকিলে বা সকল বীজ সুপুষ্ট না হইলেও তাহারা ঐরূপ বীজ রাখিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। মান্দ্রাজে ক্ষেতের ধান পাকিলে বীজের জন্য এক একটি শীষ বাছিয়া লইয়া সেইগুলি ঝাড়িয়া মাড়িয়া মাটির জালায় সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হয়। যে ক্ষেত্রে ধান উৎকৃষ্টরূপ জন্মিয়াছে সেই ক্ষেত হইতেই বীজ সংগ্রহ করা হয়।

মান্দ্রাজে ইহা ভালরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ধান জমি কিছু শুকাইয়া আসিলেই তাহাতে লাঙ্গল মই দিয়া কলাই আদি শস্যের চাষ করা উচিত। ইহাদ্বারা তিনটি ফল পাওয়া যায়,—

১। জমিতে পরবর্ত্তী ফসলের আহার সঞ্চিত হয়।

২। জমিতে রৌদ্র বাতাস পাইয়া জমি আলুগা থাকে; এতদ্বারা ধানের শিকড় অপেক্ষাকৃত নিম্ন দেশে প্রবেশ করিতে পারে সুতরাং তাহারা অধিক আহার সংগ্রহে সমর্থ হয়। এই প্রকার ক্ষেতে ধান রোপণ করিলে সেই ধান্য অধিকতর জলাভাব সহ্য করিতে পারে।

৩। জমিতে আগাছা জন্মিতে পায় না।

ধানের জমিতে কলাই আদি শস্য চাষে একটা ক্ষতিও আছে। চাষীরা বলে যে, এইরূপে জমিগুলি আবদ্ধ হইলে গবাবি পশুর চরিবার জমি পাওয়া কঠিন হইবে। ইহা বাস্তবিক উল্লেখযোগ্য আপত্য বটে, কিন্তু এই সকল ধান জমি ব্যতীত আরও অনেক জমি পতিত আছে যাহাতে গো সকল চরিতে পারে কিম্বা গরুর খাদ্যের জন্য ঘাস প্রভৃতি অল্প ব্যয়ে তৈয়ারি করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে। মূল কথা এই যে ঐ প্রকারে ধান জমিতে দ্বিতীয় বার শস্য উৎপাদন করিলে যে লাভ হয় তাহা অপেক্ষা এই ক্ষতি অতি সামান্য।

বঙ্গদেশের শস্যের অবস্থা।—২০শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত। এই প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্র বৃষ্টি পড়িয়াছে। নদীয়া, যশোহর, খুলনা এবং দার্জিলিঙে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে; ২৪ পরগণা মেদিনীপুর, হুগলী. চম্পারণ, মুঙ্গের, পাটনা, সাহাবাদ, সারণ, কটক, পুরী, এবং মানভুমে বারিপাত সামান্য মাত্র হইয়াছে; অন্যত্র খুবই কম। এই বৃষ্টিতে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া বীজ বপনের সুবিধা হইলেও ২৪ পরগণা, দারবঙ্গ, আঙ্গুল, ও পুরীতে অধিক বারিপাতের আবশ্যক হইয়াছে। পাট বোনা এখন চলিতেছে। পাট কোথাও কোথাও খুব নাবী হইয়া গেল। আশুধান বোনা এখনও শেষ হয় নাই। ক্ষেত্রস্থ ইক্ষু এবং অন্যান্য সজীব অবস্থা এখন মন্দ নহে। মুর্শীদাবাদ, দার্জিলিঙ, বালেশ্বর, পুরীতে, হাজারিবাগ ও মানভূমে চাউলের দর চড়িয়াছে এবং খুলনা, ভাগলপুর, কটক ও পালামাউয়ে চাউলের দর পড়িয়াছে। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, মুঙ্গের, পুর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, সম্বলপুর. এবং ছোটনাগপুর সমুদায় জেলায় পশু রোগের কথা শুনা যাইতেছে। ছোটনাগপুরের কেবল সিংভূমে কোন পশু রোগ নাই। হাজারিবাগ বা অন্যত্র পশু খাদ্যের অভাব হয় নাই, কিন্তু পালামউয়ে এবং ২৪ পরগণায় স্থানে স্থানে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে।

পাঞ্জাবে তৈলশস্য ১৯১০।১১

১৯১০ সালে ১৩ লক্ষ একর জমিতে তৈল শস্যের আবাদ হইয়াছিল, ১৯১১ সালে তৈল শস্যের জমির পরিমাণ ১১ লক্ষ একর মাত্র, ১৯১০ আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে অমৃতসহরে সরিষা ৩৷৷৹ কিম্বা ৪৷৷৵৹ আনা দরে মণ বিক্রয় হইয়াছে। অন্য বৎসর অপেক্ষা ৷৷৹ আনা হইতে ১৲ এক টাকা দর কম। অগ্রহায়ণে দর আরও কমিয়া ৪৵৹ আনায় দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু তাহার পর আবার ৪৷৷৵৹ আনা হইয়াছে।

পাঞ্জাবে কি পরিমাণ তৈল শস্য জন্মায় তাহা নিম্নের চারি বৎসরের রপ্তানির তালিকা দেখিলে বুঝাযায়;—

সাল		উৎপন্ন শস্য টন		রপ্তানি টন
১৯০৭	...	১৭২,২৯১	...	৫১,৫৮৯



১৯০৮	...	১০৯,৯৮৫	...	১,৮৭৩
১৯০৯	...	১৮৩,৮৮৬	...	১৯,৩৬৮
১৯১০	...	২২৭,০২৫	...	৯৮,০৫৪
১৯১১	...	১৬৫,০৩১	...	......

বর্ত্তমান বর্ষের রপ্তানি ৫০,০০০ টনের কম হইবে বলিয়া অনুমান হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে তৈল শস্য।—১৯১০। ১১ অনুমান ১,১৯৮,৯০৯ একর পরিমাণ জমিতে রাই এবং সরিষার চাষ হইয়াছে। অন্য বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩ ভাগ জমিতে আবাদ হয় নাই।

তিলের আবাদ অন্য বৎসরের সহিত তুলনায় সামান্য হইয়াছে।

কেবল মাত্র নোয়াখালি এবং মৈমনসিংহে তিলের চাষ হয়। আবাদী জমির পরিমাণ বিগত বৎসর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে।

বঙ্গে তৈল শস্য।—১৯১০। ১১ তিল বাদে অন্য তৈল শস্যের আবাদী জমির পরিমাণ বর্ত্তমান বর্ষে ২,০৮২,৭০০ একর, বিগত বৎসর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক।

একর প্রতি তিসি, রাই ও সরিষা ৬ মণ হিসাবে জন্মিয়াছে এবং অন্য তৈলশস্য ৪॥০ মণ উৎপন্ন হইয়াছে ধরিয়া লইলে সমগ্র প্রভিন্সে ৪৩৯,৯০০ টন তৈলশস্য উৎপন্ন হইয়াছে।

বঙ্গে গোধুম।—১৯১০। ১১ বঙ্গের মধ্যে বিহার, নদীয়া, মুর্শীদাবাদ, হাজারিবাগ এবং পালামাউয়ে গোধুম চাষ হয়।

বর্ত্তমান বর্ষে ১,৩৮২,৫০০ একর পরিমাণ জমিতে গমের আবাদ হইয়াছে, অন্য বৎসর অপেক্ষা আবাদ কম হইয়াছে। মোটের উপর কিন্তু ফলন ভাল হওয়ায় অন্য বৎসর অপেক্ষা অধিক গম উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের উৎপন্ন গমের পরিমাণ ৫৯৯,৮০০ টন, বিগত বর্ষের পরিমাণ ৫৪০,৭০০ টন মাত্র।

গমের দর ১৯০৮ সালে		টাকায় ৭ সের
১৯০৯	,,	,, ৭ সের ৪ ছটাক
১৯১০	,,	,, ৯ ,,
১৯১১	,,	,, ১০ ,,

কোন কোন জেলায় এ বৎসর টাকায় ১৩ সের গম বিক্রয় হইয়াছে। বিগত জানুয়ারি পর্য্যন্ত ১০ মাসের ভিতর ৩,৯৮৬,৫৭৫ মণ গম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। বিগত বৎসর অপেক্ষা ৪৪৬,৪৭১ মণ অধিক রপ্তানি হইয়াছে।



জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল।

বৃটীশ সাম্রাজ্যে ফল উৎপাদন।

বিগত ১৩১৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় "ফলপ্রসঙ্গ" প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, বৃটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে কতজমি ফলের বাগানে আবদ্ধ আছে ; বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখাইব যে বৃটীশ সাম্রাজ্যে কোথায় কি পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয়।

টাসমানিয়া, সিংহল ও ভারতবর্ষের উৎপন্ন ফল সম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রবন্ধে অল্প বিস্তর প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করা হইয়াছে, আমরা এক্ষণে এই সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন ফলের বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

দক্ষিণ আফ্রিকাও ফল উৎপাদনের একটী কেন্দ্র কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় যে কি পরিমাণ ফল উৎপন্ন হয় তাহার কোন সঠিক হিসাবে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় আঙ্গুরেরই আবাদই অধিক। অন্য ফলের বাগানের সহিত তুলনায় প্রায় অর্দ্ধেক আন্দাজ আঙ্গুরেরই বাগান। এখানকার গবর্ণমেণ্টও আঙ্গুর চাষে সহায়তা করিয়া থাকেন। কিন্তু এখান হইতে আঙ্গুর বিদেশে রপ্তানি করিবার আজিও কোনরূপ সুবিধাজনক ব্যবস্থা হয় নাই। আঙ্গুর রপ্তানির জন্য বহু প্রকার পরীক্ষা ও চেষ্টা হইতেছে, তথাপিও বিগতবর্ষে ৩২,৩১৩ পেটি মাত্র আঙ্গুর ইউরোপে রপ্তানি হইয়াছে ; ইহা আশাপ্রদ বলিতে হইবে। কমলা ও অন্যান্য লেবুও প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এবং নাটাল ও কেপকলনিতে কলা, পেঁপে, আতা এবং অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফলও জন্মায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ফল ব্যবসায়ের একটি অন্তরায় আছে। ফল রপ্তানি করিবার জন্য বাক্স প্রস্তুতের উপযোগী কাষ্ঠ এখানে মিলে না। বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

জ্যামেকা দ্বীপপুঞ্জের প্রধান সম্পত্তি ফল। ১৯০৭-৮ সালে তথা হইতে ১১,৫৬,৫৭৫৲ টাকার কমলা, ৩৬,৮২,০০৫৲ টাকার কলা রপ্তানি হইয়াছে। শুদ্ধ বিদেশে ব্যবসা কেন, এই পুষ্টিকর খাদ্য সস্তায় পাইয়া তত্রত্য অধিবাসীগণ স্বচ্ছন্দে এই আহারের উপর নির্ভর করিয়া কালযাপন করিতেছে।

ফিজি দ্বীপে ফলের বাগান কম। কিছু পরিমাণ লেবু উৎপন্ন হয় মাত্রএবং তাহার মূল্য ৯৭,৬৭৮ পাউণ্ডের অধিক নহে।

অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়াতে ১৯০৮ সালের উৎপন্ন ফলের তালিকায় দেখা যায় যে, তথায় ২,৫০৯,৯৬৫ বুসেল বড় ফল, ২৪,৫৮৯ বুসেল ছোট ফল, ৫৬১,৬৭৯ বুসেল আঙ্গুর এবং ১২১,০০০ পাউণ্ড বাদাম জন্মিয়াছিল, এতদ্ব্যতীত ১৪৩৭,১০৬ গ্যালন মদ উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাদের মোট মূল্য ৬৫৫,৪৭৪ পাউণ্ড। বড় ফলের মধ্যে আপেলই প্রধান; তাহার পরিমাণ ১,২৪১,৮২৬ বুসেল।

নিউ সাউথ ওয়েল্‌স রাজ্যে প্রতি বৎসর প্রায় ৩,৮৭৯ টন আঙ্গুর ও অন্য শুষ্ক ফল উৎপন্ন হয়। লেবুজাতীয় ফল ১২,৯৫০,২১৬ ডজন জন্মায় এবং সাধারণ মদ্য ৭৭৮,৫০০০ গ্যালন, সুরাসার ২৮,৮৮৭ গ্যালন উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকলের মোট মূল্য ৫২৩,৯১০ পাউণ্ড। অনেকে এখানে অম্লরসাত্মক লেবু চাষই করিয়া থাকে।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া—১৯০৭ সালে ২৬,৩৬৯ হন্দর আঙ্গুর, ২,৭৪১,৫০৪ গ্যালন কুরাণ্টস্‌ ও অন্য ফল ৩৯,৪০৪ হন্দর, ৩১১,৫৩৮ বাক্স আপেল, ১৪১,১৫০ বাক্স কমলা, মদ্য, ৩৭,৩৭৮ বাক্স অন্য লেবু, এবং ১৬,১৬৪ গ্যালন অলিভ তৈল বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কুইন্সল্যাণ্ড—১৯০৮ সালে ৪,২৩৯,৯৮০ পাউণ্ড আঙ্গুর, ১,৬৫১,১৬৩ কাঁদি কলা, ৫৯৮,৭৯৪ ডজন আনারস, ৪৪০,৩১২ বুসেল কমলা, এবং ৭৭,৬৯৮ গ্যালন মদ্য বিক্রয়ার্থ উৎপন্ন করিতে পারিয়াছিল। আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলের মূল্য ৬৯৯,৭৫৪ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায়—ফলের চাষ সবেমাত্র আরম্ভ হইতেছে বলিলেই হয়। এখানকার প্রধান ফলের চাষ—আঙ্গুর। ১৯০৭ সালে ৯০,১৮৭ হন্দর আঙ্গুর উৎপন্ন হইয়াছিল এবং উক্ত বৎসর ১৫৩,৭৫০ গ্যালন মদ্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

টাস্‌মানিয়ার—কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তথাপি সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রসঙ্গে টাসমানিয়াকে বাদ দেওয়া চলে না। এখানে আপেল চাষেরই প্রাধান্য। ১৯০৮-০৯ সালে ১,০৭০,৫৪৬ বুসেল আপেল জন্মিয়াছে। আপেলের পরই পিয়ারার কথা উল্লেখ করিতে হয়, কিন্তু আপেলের তুলনায় ইহা অতিকম—

উক্ত সালে উৎপন্ন পিয়ারার পরিমাণ ৭১,৩০৬ বুসেল মাত্র। ছোট ছোট ফল ঐ বৎসরে ৩,১১০ টন জন্মিয়াছে। এক টাসমনিয়ায় এক বৎসরের ফল সম্পত্তির মূল্য ৩০০,০০০ পাউণ্ড।

অষ্ট্রেলিয়ায় যদিও অতি বিস্তৃত ফলের বাগান আছে কিন্তু তথায় প্রায়ই বিদেশী ফলেরই আবাদ হয়। তদ্দেশজাত ফল সেখানে খুব কমই আছে এবং এক একটী স্থানে এক ফলেরই প্রাধান্য। কুইন্সল্যাণ্ড হইতে প্রচুর পরিমাণে কলা, আনারস প্রভৃতি রপ্তানি হয়। আরও দক্ষিণে যেমন নিউসাউথ ওয়েল্‌স, ভিক্টোরিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় আঙ্গুর ও লেবু ও বাদাম প্রভৃতি ফলই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভিক্টোরিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া এবং টাসমানিয়ায় ক্রমশঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী ফল যথা—আপেল, পিয়ারা, কুল, পিচ, প্রভৃতিরই প্রাধান্য।

অধিকন্তু এখানে আঙ্গুর চাষের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। এই মহাদেশে প্রায় ৬০,০০০ একার পরিমাণ জমি আঙ্গুর চাষে আবদ্ধ। ফলরূপে ব্যবহারব্যতীত সমগ্র মহাদেশ হইতে ৪,৪৫০,০০০ গ্যালন মদ্য এই আঙ্গুর হইতে উৎপন্ন হয়।

অষ্ট্রেলিয়ায় ফল উৎপাদনের বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ব্যবসায়ের জন্য ফল উৎপন্ন করা এবং সেই ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ মন্দ লাভজনক নহে। এমন কি এখানে ভিক্টোরিয়ার মিলডুরা উপনিবেশে এবং দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় রেনমার্ক নামক স্থানে বিজ্ঞান সম্মত জল সেচনের ব্যবস্থা করিয়া অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর ও ঊষর ভূমিও ফলবান বৃক্ষবাটিকায় পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল ক্ষেত্রের উপর আঙ্গুরের বাগানের সৌন্দর্য্য দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। আঙ্গুর চাষ হইতে আয় বাদ দিলেও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি বৎসর ফলচাষে কোটী কোটী মুদ্রা আয় হয়। যে বিবরণী অবলম্বনে আমরা এই ফল প্রসঙ্গ লিখিতেছি, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯০৯ সালে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৩৬০,০০০ বাক্স ফল ইউরোপে রপ্তানি হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে আরও প্রকাশ যে, ১৯১০ সালে রপ্তানির পরিমাণ ৬০০,০০০ বাক্সের কম নহে। ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত উষর ও অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের অভাব নাই, এখনও মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পতিত রহিয়াছে, ভারতের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে শীত, গ্রীষ্ম, নাতি শীতোষ্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার ফল উৎপাদনের অনুকূল আবহাওয়ায় যাবতীয় সুখাদ্য ফল উৎপন্ন করা বিচিত্র নহে। বোধ হয় ইউরোপ, আমেরিকা বা এসিয়া মহাদেশে এমন কোন ফল নাই, যাহা ভারতের কোন না কোন প্রদেশে উৎপন্ন হইতে পারে। শস্যক্ষেত্রগুলি বাদ দিয়া অন্য জমি বাছিয়া লইতে পারিলে, সেচন জলের সুবিধা করিতে পারিলে এবং একটু বিস্তৃত ভাবে ব্যবসা চালাইবার জন্য ফলের চাষে অর্থ নিয়োগ করিতে পারিলে ভারতে অর্থাগমের একটা নূতন পন্থা উন্মুক্ত হয়। এই কারণে আমরা

সমগ্র বৃটীশ সাম্রাজ্যে ফল উৎপাদন প্রসঙ্গ লইয়া ভারতে এই ব্যবসায়ের কতটুকু পরিসর হইতে পারে, তাহা বারম্বার উল্লেখ করিতেছি।

ফল যত অধিক পরিমাণ উৎপন্ন হউক এবং যেখানেই উৎপন্ন হউক তাহার কাট্‌তি সুনিশ্চিত। দেখা যায়, উত্তর অষ্ট্রেলিয়া যেখানে সবে মাত্র লোকের বসতি আরম্ভ হইয়াছে সেখানেও ইতি মধ্যেই ফলের চাষের উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। তৎস্থানের অধিবাসীগণ স্থির করিয়া লইয়াছেন যে, এখানে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের যাবতীয় ফল উৎপন্ন হইতে পারে। এখানকার চৈনিক অধিবাসীগণ অতি উৎকৃষ্ট আনারস জন্মাইতেছেন। সর্ব্বত্র অতি সুন্দর পেপিয়া জন্মিতেছে এবং টকলেবু, কমলা, বিলাতিগাব, নারিকেল, কলা এবং তুঁত আদি ফল সমূহ ভালরূপ হইতেছে। ক্রমে এই উত্তরাঞ্চলের সহিত রেল লাইন দ্বারা অন্যান্য প্রদেশের যোগ হইলে অষ্ট্রেলিয়া ফল সম্পত্তিতে অদ্বিতীয় হইবে।

নিউ জিলণ্ডে—যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা তথাকার অধিবাসীগণের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত নহে। এখানে কিন্তু অনেকগুলি ঋতুর ভোগ হয় সুতরাং এখানে বিবিধ প্রকার ফলের চাষের খুব সম্ভাবনা, কমলা ও অন্যান্য লেবু এখানে সুন্দর জন্মায়। ফলের চাষ বৃদ্ধির এখানে বিশেষ অবসর আছে।

যুক্ত রাজ্যে—ফল উৎপাদনের পরিমাণের ঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান বিবরণী অবলম্বনে স্থির করা যায় যে, ১৯০৮ সালে যুক্ত রাজ্যে ১৭২,৭৫১ একর জমিতে আপেল, ৯.৬০৪ একরে পিয়ার, ১১,৮৬৮ একর চেরি ; ১৫,৬৮৩ একর কুল, ২৮,৮১৫ একর ষ্ট্রবেরি ; ৯,৩২৩ একর রাস্পবেরি, ২৬,২৪১ একর টেপারি প্রভৃতি এবং ৬০,৮৯২ একরে অন্যান্য ফলের চাষ হইয়াছে। এখানে ফলের চাষের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হইবেই হইবে। বহুতর ফলের যে এখানে বিশেষ আবশ্যক আছে তাহা এক বৎসরে ৪,৬০০,০০০ হন্দর ফল, যাহার মূল্য অনুমান ৩,৭৫০,০০০ পাউণ্ড এই যুক্ত রাজ্যে আমদানী হইতেছে দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

ফল উৎপাদনে আমেরিকা সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। কানাডা ও কালিফর্ণিয়া ফল উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। আমরা দেখিয়াছিলাম ১৯০১ সালে কানাডায় ১৮,৬২৬,১৮৬ বুসেল আপেল, ৫৪৫,৪১৫ বুসেল পিচ, ৫২১,৮৩৭ বুসেল পিয়ারা, ২৪৩০২,৬৩৪ পাউণ্ড আঙ্গুর উৎপন্ন হইয়াছিল ; অন্য ছোট ফলেরত কথাই নাই। বর্ত্তমান বর্ষের উৎপন্ন ফলের পরিমাণ যে দ্বিগুণ হইয়াছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ কানাডা এবং কালিফর্ণিয়া রাজ্যে ফলের বাগান ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ফল উৎপাদনে আমেরিকা আদর্শ ক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের যেরূপ উর্ব্বরা ক্ষেত্র এবং ভারতে এখনও এত বন জঙ্গল, এত পতিত জমি রহিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষ মনে করিলে ফল উৎপাদনে শীর্ষস্থান অধিকার

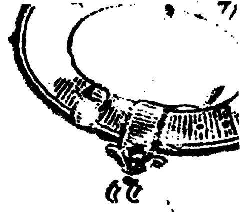
করিতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে জমিতে যব, গম, কলাই, সরিষা বা যে জমিতে সবজী ক্ষেত হইতে পারে ফলের বাগানের জন্য এমন জমির আবশ্যক নাই। যখন অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর, অল্পাধিক উষর ক্ষেত্রেও ফলের বাগান হইতে পারে তখন ভারতে ফলের বাগান যে কত বাড়িতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

সকল দেশেই ফল উৎপাদনের উন্নতি দেখা যাইতেছে। কিন্তু ভারতে ফল উৎপাদনের এত অবসর থাকিতে এখানে কোন সাড়াশব্দ নাই। এখানে জমি আছে, একটু চেষ্টা করিয়া মজুরও মেলে এবং যখন জানা যাইতেছে যে, যে অর্থ ফল উৎপাদনে নিয়োগ করা যাইবে তাহার প্রতিদান আছে, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকা অধ্যবসায়ী ব্যক্তিমাত্রেই উচিত নহে।

বৃক্ষে জলসেচন প্রণালী।

অনেকেরই ধারণা যে গাছের গোড়ায় জল ঢালিলেই গাছ বেশ সতেজ হয়। বৃক্ষ মূলে জল প্রদান বিধি বটে, কিন্তু বৃক্ষের মূলটা যে কি তাহা ভাল করিয়া বুঝা উচিত। বৃক্ষের মোটা মোটা শিকড় গুলি মূল এবং সরু সরু শিকড় গুলিও মূল আবার সরু কিম্বা মোটা সমুদয় শিকড় যাহা মৃত্তিকার ভিতর থাকে তাহাকেও বৃক্ষের মূল বলা যায়। মোটা মোটা শিকড় গুলি জমি হইতে রসাকর্ষণে সমর্থ হয় না। রস প্রান্তস্থিত সরু শিকড় দ্বারাই মোটা শিকড়ের মধ্যদিয়া বৃক্ষাভ্যন্তরে নীত হয়। সেই জন্য কাণ্ডসংলগ্ন মূলে জল না ঢালিয়া সরু শিকড় প্রান্তে জল প্রদান করাই কর্ত্তব্য। গাছের গোড়ায় জল ঢালিলে এই কারণে অনেক সময় গাছ সতেজ না হইয়া বরং ক্রমশঃ নিস্তেজ, দেখিতে শ্রীহীন এবং রুগ্ন হইয়া পড়ে। অনেক সময় এই রূপ জল সেচনের দোষে গাছের সমস্ত পাতা হল্‌দে হয় এবং গাছ ক্রমশঃ রুগ্ন হইয়া মরিয়া যায়। এমত অবস্থায় জল সেচনের জন্য গাছের ঠিক গোড়ায় গর্ত্ত না করিয়া গাছের চারিধারে শিকড়ের প্রান্ত ভাগে জল দিবার জন্য নালা কাটা উচিত। গাছের শাখা প্রশাখার প্রান্তভাগ উপরে যতদূর বিস্তৃত থাকে মৃত্তিকা মধ্যে শিকড়ও ততদূর বিস্তৃত হয় সুতরাং নালা কাটিবার একটা রেখা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়।

বর্ষাকালে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে অনেক বড় বড় ফল বৃক্ষের গোড়ার মাটি খুলিয়া দিয়া জল খাওয়াইবার ব্যবস্থা আছে। কাণ্ডের মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শিকড় প্রান্ত পর্য্যন্ত অল্প বিস্তর মাটি সরাইয়া একটি গর্ত্ত প্রস্তুত করা উচিত। এতদ্বারা অধিকাংশ মোটা শিকড় বাহির হইয়া পড়ে এবং তাহাতে



রৌদ্র বৃষ্টি অবাধে পায় এবং কখন কখন এই গর্ত্ত জলে পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাতে কিন্তু, বৃক্ষের বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে দেখা যায় না বরং লাভই হয়। এই জল অনতি বিলম্বে বৃক্ষের চারিদিকের মৃত্তিকায় শোষিত হইয়া যায় এবং শিকড় প্রান্তেই রসযোগায়। চারা গাছ বা কোমল গাছের পক্ষে এই নিয়ম খাটে না যে সকল গাছের গোড়া খোলা হয় বর্ষান্তে গর্ত্তগুলিতে মাটি চাপা দিতে হয়; গর্ত্তটি ক্রমশঃ পূর্ণ করাই কর্ত্তব্য। এক কালে অধিক মাটি চাপাইলে শিকড় গুলি যেন হাঁপ ছাড়িতে না পারিয়া একটু অসুবিধা বোধ করে। শিকড়ের উপর খুব পুরু করিয়া মাটি চাপানও সুযুক্তি নহে। সার কিম্বা নুতন মাটি শিকড় প্রান্তেই প্রযোজ্য কারণ সেগুলি শিকড় প্রান্তস্থিত জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া রসরূপে পরিণত হইয়া তবে বৃক্ষের আহার যোগাইবে। বৃক্ষের চারি পাশের নালাতে প্রত্যেক বার জল সেচনের পর সেই নালার মাটি খুসিয়া আল্গা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে জল অবাধে উবিয়া যাইতে পারে না এবং এই রূপ করিলে দীর্ঘ সময় অন্তর জল সেচন করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। চাষীরা এই প্রথাকে (যো) বাঁধিয়া দেওয়া বলে। পুরাকালে মুনী ঋষীগণ বৃক্ষকাণ্ড হইতে অনতিদুরে আল বাঁধিয়া জল সেচনের অর্থ বুঝিতেন। ঋষী কন্যাগণ আলবালে (পয়োনালা) জল সেচনের ভার প্রাপ্ত হইতেন।

পত্রাদি।

বৃক্ষে আরক ছিটাইবার স্প্রেয়ার—ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত জে, এ, নাগ প্রমুখ দুই জন কৃষকের গ্রাহক বৃক্ষে ছিটাইবার জন্য স্প্রেয়ার (Tin Hand Sprayer) চাহিয়াছেন। আমরা উক্ত প্রকার টিন স্প্রেয়ার তৈয়ারি করাইবার চেষ্টা করিতেছি। সাধারণ টিন-মিস্ত্রিগণ ইহা তৈয়ারি করিতে পারে না। দুই এক জন ভাল কারিকর আছে তাহারা দর অধিক চায়। দুই টাকা মুল্যে বৃক্ষে কীট নাশক আরক ছিটাইবার উপযুক্ত একটা স্প্রেয়ার তৈয়ারি হওয়া সম্ভব নহে।

সরিষা তৈলের ছোট কল—'কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন যে, এখানে খাঁটি সরিষার তৈল প্রায় দুষ্প্রাপ্য বলিলেই হয়, অতএব আমার ইচ্ছা যে সামান্য রূপ একটি ছোট মেসিন বসাইয়া খাঁটি তৈলের ব্যবসা করি। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম যে এ বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে আপনার নিকট সম্পূর্ণ রূপ তথ্য জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, ও আপনাদের জিজ্ঞাসা করিলে আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ও সন্তুষ্ট চিত্তে জ্ঞাতব্য বিষয় জানান, এই কারণে আমি আপনার কতকটা অমূল্য সময় নষ্ট করিতে সাহস

করিয়াছি, আশাকরি আপনি সে বিষয়ে আমার দোষ মার্জ্জনা করিবেন। এ পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমার এমন একটি কলের আবশ্যক যে, সেটিকে একটি ছোট ঘরে, সহজে ও একজন লোক দ্বারা চালাইতে পারা যায় ও সুবিধা হইলে যাহাতে গোরু ওজুতিতে পারা যায়। তবে পত্র পাঠ মাত্র তাহা জানাইবেন'।

[হাতে চালাইবার বা গরুতে চালাইবার ছোট ঘানি ৫০৲। ৬০৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে। এই ঘানি উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মিত এবং সাধারণ কাঠের ঘানি অপেক্ষা অধিক তৈল অল্পসময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এক প্রকার উন্নত ঘানি আছে যাহা পেট্রোল গ্যাসে চালিত হইতে পারে, তাহা এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল। এই ঘানি আমেরিকায় পাওয়া যায়, দাম অনুমান অন্যূন ৫০০৲ টাকা। ছোট ঘরে বসান চলে ও এক জন লোক দ্বারা সহজে চালিত হইতে পারে।] কৃঃ সঃ।

সার-সংগ্রহ।

স্বদেশী শিল্প বাণিজ্য *

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কাপড়ের কল

শ্রীনাথ মিল শ্যামবাজার। আফিস ১০ শ্রীনাথ দাসের লেন, স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত উদয় কুমার দাস বি, এল, মহাশয়ের তত্বাবধানে পরিচালিত। জামার কাপড় তৈয়ারি হয়।

সাবানের কারখানা।

বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টারি। দমদমা রাণীর রোডে কারখানা স্থাপিত। সুগন্ধ উৎকৃষ্ট সাবান ও বারসোপ প্রস্তুত হয় বলিয়া বিখ্যাত।

বিদ্যালয়।

ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুল, ৯২ বউবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। চিত্রাঙ্কন, ছায়াচিত্র, মাটির পুতুলাদি নির্ম্মাণ-শিল্প বিদ্যাশিক্ষার্থ বাঙ্গালার মধ্যে বেসরকারী একটি অদ্বিতীয়

---

* আমরা বিগত বৈশাখ সংখ্যায় স্বদেশী শিল্প বাণিজ্য, যাহা বিগত চার পাঁচ বৎসরে মধ্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে তাহার একটা তালিকা দিয়াছিলাম। যে গুলি বাদ পড়িয়াছিল তৎপরে আমাদিগকে জানাইবার পর আমরা বর্ত্তমান তালিকা প্রকাশ করিলাম। এখনও যদি কোনটা উল্লেখ যোগ্য শিল্প বাদ পড়িয়া থাকে জানিতে পারিলেই আমরা সাদরে প্রকাশ করিব।

বিদ্যামন্দির। এই বিদ্যালয়টি বহু পূর্ব্বে স্থাপিত কিন্তু সম্প্রতি চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। কাঠের এবং ইলেকট্রো ব্লক এখানে যেমন সুন্দর তৈয়ারি হয় এমন কলিকাতার মধ্যে অতি কম জায়গায় হইয়া থাকে।

ক্রুস।

বঙ্গীয় ক্রুস কারখানা। কলিকাতায় সেণ্টজেমস্ লেনে এই কারখানা অবস্থিত।

মাথার চিরুনি।

আলু প্রভৃতির শ্বেতসারে প্রস্তুত চিরুনি। গঙ্গাধর শিল্প-মন্দির নামে এই কারখানার নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা বালিতে অবস্থিত।

মণি ব্যাগ।

এস, কে, বসু এণ্ড সন্স ইহার প্রস্তুত কারক। মিরজাফর লেনে এই কারখানা স্থাপিত।

মাটির পুতুল।

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস পাল দ্বারা প্রস্তুত। ইহাদের বংশাবলী এই কার্য্যেই নিরত কিন্তু আগে বড় একটা খরিদ্দার মিলিত না। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে দেশে বিদেশে খরিদ্দার মিলিতেছে এবং ইহাঁরা জাতিব্যবসার বিশেষ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আলুমিনিয়ম সামগ্রী।

ভারতীয় আলুমিনিয়াম কোম্পানির কারখানা মান্দ্রাজে। আজকাল এই ধাতু নির্ম্মিত বাসন খুব চলিত হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশে খুব চলিতেছে। এই কারণে ইহার উল্লেখ করা গেল।

ছুরি কাঁচি।

পূর্ব্ব তালিকায় প্রসিদ্ধ ছুরি কাঁচি প্রস্তুত কারক প্রেম চাঁদ মিস্ত্রির নামোল্লেখ করা হয় নাই। ইঁহার প্রস্তুত ছুরি কাঁচি অতি সুন্দর ও কর্ম্মোপযোগী।

বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল।

গন্ধহীন বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল তৈয়ারি করিতে ৫২ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে বি, কে শর্ম্মা মহাশয় সিদ্ধহস্ত।

জুতার পালিশ।

আর, সি, বসু ব্রাদার্সের বাদামি ও সাদা জুতার পালিশ চমৎকার হইয়াছে।

বঙ্গের আর্থিক অবস্থা।

পশ্চিম বঙ্গের ১৯০৯-১০ সালের ইনকম ট্যাক্স বিভাগের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। চাকুরী ও ব্যবসায় হইতে লোকে কত টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, তাহা ঐ রিপোর্ট পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়।

লোক সংখ্যা			বার্ষিক আয়ের পরিমাণ
১৬,২৮৪			১০০০ হইতে
			১২৫০ টাকার ন্যূন
৬১৬৫			১২৫০—১৫০০ ঐ
৪৬১৫			১৫০০—১৭৫০ ঐ
৩৮৯৮			১৭৫০—২০০০ ঐ
৩০,৯৬২			
৪৫৮২	২০০০	,,	২৫০০
৮৭৬৬	২৫০০	,,	৫০০০
৩৭৭৬	৫০০০	,,	১০০০০
১৩৭৮	১০০০০	,,	২০০০০
৪১২	২০০০০	,,	৩০০০০
১৭১	৩০০০০	,,	৪০০০০
৮১	৪০ ০০০	,,	৫০,০০০
১৬৯	৫০,০০০	,,	১,০০,০০০
১৭৩	১০০০০০	,,	এর উর্দ্ধ
২৭০৪			

পশ্চিম বঙ্গে প্রায় ৫॥ কোটি লোকের বাস, তন্মধ্যে ভূম্যধিকারী ব্যতীত কেবল মাত্র ৩০৯৬২ জনের আয় বার্ষিক ১০০০ হইতে ২ হাজার টাকা এবং ২৭০৪ জনের আয় ২ হাজার হইতে লক্ষাধিক টাকা।

কেবলমাত্র ১৬৯ জনের আয় ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ টাকা এবং ১ লক্ষ টাকার বেশী আয় কেবলমাত্র ১৭৩ জনের। আমরা কত গরীব, সকলে তাহা ভাবিয়া দেখুন।

গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়া ২৩০১ জন বার্ষিক ১০০০ হইতে ২০০০ টাকা এবং ২৭০৪ জন ২০০০ হইতে লক্ষাধিক টাকা পাইয়া থাকেন। লক্ষাধিক টাকা কেবলমাত্র ১ জন পাইয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়া অতি অল্প লোকই হাজার টাকার উপর বেতন পান।

পূর্ব্ব বঙ্গের ১৯০৯ ১০ সালের ইনকম্ ট্যাক্সের রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হয় নাই। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ১৯০৮—০৯ সালের শাসন বিবরণী পাঠ করিলে অবগত হওয়া যাইবে যে ১৭,১৬৩ জনের আয় হাজার টাকার উপর। পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় ২॥কোটি লোকের বাস। তন্মধ্যে কেবলমাত্র ১৭১৬৩ জনের আয় হাজার টাকার বেশী।

বাঙ্গালাদেশের সহিত ইংলণ্ডের আয়ের তুলনা কর। ইংলণ্ডের লোক সংখ্যা ৫ কোটির বেশী নয় অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষাও কম। ইংলণ্ডের ২,১৯৪৯৫ জনের আয় ২৪০০ হইতে ৩০০০ টাকা, ১,৯৫,২২০ জনের আয় ৩০০০ হইতে ৪৫০০ টাকা, ১,০৭,৯৪৯ জনের আয় ৪৫০০ হইতে ৭৫০০ টাকা, ৪৭৮৬৭ জনের আয় ৭৫০০ হইতে ১৫০০০ টাকা এবং ১৬০০৮ জনের আয় ১৫ হাজার টাকার বেশী।

উপরি-উক্ত বিবরণী হইতে আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়।

সমস্ত বঙ্গদেশে প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ লোক; ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ৭৫ হাজার লোক বৎসর হাজার টাকার উপর উপার্জ্জন করেন। কি করিলে এই ভীষণ দরিদ্রতা দূর হইতে পারে, সকলে একান্তমনে তাহার উপায় উদ্ভাবন না করিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। এতদবস্থায়—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের প্রতি সাতিশয় আগ্রহান্বিত না হইলে আমাদের আর অন্য উপায় কি আছে?

কুঁচিলা।

অনেকেই অবগত আছেন এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মতের Nux Vomica নামক ঔষধ কুঁচিলা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু এই কুঁচিলা কি এবং কোথায় পাওয়া যায় তাহা অনেকেই জানেন না। হরিতকী, মাজুফল প্রভৃতির ন্যায় কুঁচিলার গাছও এদেশের অরণ্যে আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্বোপকূলস্থ অরণ্যেই ইহা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কুঁচিলার গাছ বিশাল ছায়াপ্রদ ও সুদৃশ্য। শরৎকালে ইহার হরিদ্বর্ণ শাখায় যখন গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধারণ করে তখন গাছ গুলি বড় সুশোভন হয়। ফল গুলি দেখিতে অনেকটা এদেশের নোনা বা আতার মত। ফল গুলি যতদিন না পুষ্ট হয় বা পরিপক্ক হয় ততদিন উহার রঙ সবুজ থাকে, ক্রমে যত পরিপক্ক হয়, ততই হরিদ্রাভ দেখা যায়। সাধারণতঃ আশ্বিনের শেষে ও কার্ত্তিক মাসে কুঁচিলা ফল পাকিয়া থাকে। নোনা বা আতার অভ্যন্তরে যেমন নরম শাঁস ও বীজ থাকে কুঁচিলার অভ্যন্তরেও সেইরূপ শাঁসের সহিত বীজ থাকে। কিন্তু নোনা বা আতার বীজ যেমন ছোট ছোট, কুঁচিলার বীজ সেরূপ নহে, ইহা অনেকটা গাব বা সপেটার বীজের মত। এই ফল গুলি পাকিলে বানর ও বন্য পক্ষী সকল উহার শাঁস অতিশয় তৃপ্তির সহিত ভোজন করে। পক্ষীরা শাঁস খাইয়া বীজ গুলি ফেলিয়া দেয় কিন্তু বানরেরা উহা বীজ সমেত উদরস্যাৎ করিয়া থাকে। কুঁচিলার শাঁস খাইয়া বানর ও পক্ষীরা যে পরিতুষ্ট হইয়া থাকে, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় কুঁচিলার অভ্যন্তরে একাধারে অমৃত ও গরল বিদ্যমান থাকে। এই ফল

পাকিলে পক্ষী সকল এত আনন্দিত হয় যে এই সময়ে তাহাদিগের নানাপ্রকার চীৎকার শব্দে অরণ্যানি প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। পক্ষীদিগের চঞ্চুপুট পরিত্যক্ত এই সকল বীজে গাছের তলা ছাইয়া পড়ে। বানরদিগের পুরীষ মধ্যেও এই বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা সময়ে অরণ্যবাসী লোক সকল এই সমস্ত বীজ সংগ্রহ করে ও তাহা জলে ধুইয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে বা হাটে বিক্রয় করে। বানর প্রভৃতি জন্তুদিগের পুরীষ মধ্যে যে সকল বীজ পাওয়া যায় তাহা অতিশয় নিকৃষ্ট এবং তাহা পরিষ্কার করাও কষ্টসাধ্য এজন্য তাহা অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। পক্ষীদিগের চঞ্চুপুট ত্যক্ত বীজ সকলই বড়বড়, তাজা ও পরিষ্কার, উহা উচ্চ মূল্যেই বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময়ে জঙ্গলী লোকে পুরীষ সংসৃষ্ট বীজ উৎকৃষ্ট বীজের সহিত মিশাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এই জন্যই বাজারে দুই তিন শ্রেণীর কুঁচিলা দেখিতে পাওয়া যায়।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পূর্ব্বঘাট, বিশেষতঃ গঞ্জাম, গোদাবরী ও নেলোর জেলাতেই প্রচুর পরিমাণে কুঁচিলা পাওয়া যায়। সরকারী জঙ্গল মহলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রতি বৎসর সেলামী গ্রহণ করিয়া এই বীজ সংগ্রহ করিবার অধিকার প্রদানের জন্য নিলাম ডাক হইয়া থাকে, যে কেহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেলামী প্রদান করিতে স্বীকৃত হয় তাহাকেই বীজ সংগ্রহ করিবার লাইসেন্স দেওয়া হয়। কিন্তু সকল বৎসর দর সমান থাকে না। কুঁচিলার বাজার যখন যেরূপ থাকে, তদনুসারে নিলাম ডাক হইয়া থাকে। এই জন্য কোন কোন বৎসরে দশ হাজার মণেরও অধিক কুঁচিলা খটিতে মজুত দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোপকূলের কুঁচিলা কোকনদ বন্দর দিয়াই দেশ বিদেশে চালান হইয়া থাকে। এই জন্য উক্ত অঞ্চলের কুঁচিলা "কোকনদের কুঁচিলা" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। তথা হইতে যাহা রপ্তানি হয় তাহা প্রধানতঃ কোচিনে চালান হইয়া থাকে। কলিকাতা, আলেপী, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে অতি অল্পই প্রেরিত হয়। কোচিন, কুঁচিলার একটি প্রধান আড়ঙ্গ বলিয়া মহাজনেরা সেখানেই উহা অধিক পরিমাণে চালান দিয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুর পাহাড়ের সমস্ত কুঁচিলাই কোচিনে বিক্রয় হয়। এই কুঁচিলা অতিশয় উৎকৃষ্ট এই জন্য কোচিনের নামে বিকাইবে বলিয়া অন্য স্থানের কুঁচিলাও তথায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। কার্ত্তিক মাসে কোচিনে যাইলে প্রত্যেক মহাজনের উঠানে পর্ব্বত প্রমাণ কুঁচিলার রাশি রৌদ্রে শুকাইতেছে দেখা যাইবে। যে সকল কুঁচিলা ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় প্রেরিত হয় তাহা তথা হইতে বোম্বাই বন্দর দিয়া রপ্তানি করা হয়। কেবল ইংলণ্ড বা আমেরিকা নহে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভারতবর্ষ হইতে কুঁচিলা প্রেরিত হইয়া থাকে। অতি অল্প পরিমাণ মাত্র সিংহল দেশ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহাতে দেখা যাইতেছে ইংলণ্ড হইতে

যে Nux Vomica Tincture বা আমেরিকা হইতে যে হোমিওপ্যাথিক মতের Nux এদেশে আমদানী হইয়া থাকে, তাহা এদেশের কুঁচিলা হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চিকিৎসকেরা বলেন মনুষ্য দেহের মেরুদণ্ডের উপর কুঁচিলা আশ্চর্য্য রূপ কার্য্য করিয়া থাকে। পক্ষাঘাত, প্রভৃতি রোগে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ হইয়া থাকে। সাধারণ বা অঙ্গ বিশেষের বলহীনতার জন্য অল্প পরিমাণে Nux Vomica বা কুঁচিলার সার ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। • গণ্ডগ্রাম অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস যে, দুই বৎসরকাল যদি প্রতি দিন একটি বা দুইটি করিয়া কুঁচিলার বীজ সেবন করা যায় তাহা হইলে কোন প্রকার বিষধরের দংশনে প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকে না। এই কারণেই বোধ হয় কিছু দিন পূর্ব্বে সর্পদংশনের চিকিৎসায় ষ্ট্রিক নাইন ব্যবহারের কথা শুনা যাইত। কিন্তু কি জানি কেন চিকিৎসকেরা ইহার উপর এখন আর সেরূপ নির্ভর করেন না।

কুঁচিলা হইতে যেমন Tincture Nux Vomica প্রস্তুত হয় সেইরূপ ইহা হইতে ষ্ট্রিকনাইন (Strychnine) ও ব্রুয়াইন (Brueine) প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুঁচিলার বীজ মধ্যে ষ্ট্রিকনাইনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াই উহার গুণাগুণের বিচার করা হইয়া থাকে।

এদেশ হইতে কুঁচিলা লইয়া গিয়া ইউরোপীয়েরা তাহার সার নিষ্কাষণ করিয়া আবার এদেশেই তাহা আনিয়া বিক্রয় করিতেছেন ও তদ্বারা লাভ করিতেছেন, আর আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। বিলাতে ৮॥• শিলিঙ করিয়া হন্দর দরে কুঁচিলা বিক্রয় হইয়া থাকে, কিন্তু মান্দ্রাজে সেই কুঁচিলার দর তিন টাকা করিয়া হন্দর অপেক্ষা অধিক নহে। এই দরের তুলনা করিয়া দেখিলে এদেশে টীংচার ও ষ্ট্রিক নাইন প্রভৃতি প্রস্তুত করিলে কিরূপ লাভ হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝা যাই-তেছে। বিদেশে রপ্তানির জন্য না হউক, কেবলমাত্র এদেশে যাহা ব্যবহৃত হয় সেই পরিমাণে ঐ সকল কুঁচিলার সার প্রস্তুত করিতে পারিলে যথেষ্ট হয়। অধুনা এদেশে রসায়ন শাস্ত্রের কিছু কিছু চর্চ্চা হইতেছে এবং দুই একটি রাসায়নিক কারখানাও সংস্থাপিত, হইতেছে আমাদিগের বোধ হয় যদি কেহ কোকনদ, কোচিন বা কালি-কটে কুঁচিলার সার প্রস্তুত করিবার কারখানা করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে অল্প দিনেই তিনি লাভবান হইতে পারেন। এদেশে সিঙ্কোনা হইতে যে কুইনাইন প্রস্তুত হইতেছে তাহার ব্যবসা বেশ চলিতেছে, তবে Nux Vomicaর কারখানাই চলিবেনা কেন? আমরা এ বিষয়ে দেশের রসায়ন শাস্ত্রবিদ্‌গণের মনোযোগ বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছি।

বিলাতে ফলের আমদানি—অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ইংলণ্ডে বৎসরের পর বৎসর ফলের আমদানি বাড়িয়া যাইতেছে। অর্থের অভাব নাই, গ্রাহকের অভাব নাই; সুতরাং বাড়িবারইত কথা। ১৯০৯ সালে তিন কোটি টাকার আপেল, দেড় কোটি টাকার কদলি, ষাট লক্ষ টাকার লেবু, সাড়ে তিন কোটি টাকার কমলা লেবু ও পঁচাত্তর লক্ষ টাকার নাসপাতি বিলাতের লোকের রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়াছে। আর কত দেশের লোক এই সমুদয় ফল সরবরাহ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। আমরা অবশ্য এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২।৪টি মাত্র ফলের নাম করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন অনেক রকম ফল বিলাতে যায়। এক্ষণে সমস্যা এই যে, পৃথিবীর এই সুমহান ফল ব্যবসায় ভারতের কোন স্থানে আছে কিম্বা হইতে পারে কি না? আপাততঃ তিলমাত্র স্থান নাই। ভবিষ্যতে হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচনা করার পূর্ব্বে দেশীয় ফলের বাগান দেশের অভাব মোচনের উপযোগী কি না তাহা দেখা আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে, কতিপয় বড় বড় সহর ব্যতীত অনেক স্থানেই সময়ের ফল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না এবং ফলও উচ্চ শ্রেণীর নহে। পক্ষান্তরে যে সমুদয় স্থানে অধিক মাত্রায় ফল উৎপাদিত হয়, তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পস্থান হইতে দূরদেশে ফল চালান দেওয়ার সুবিধা আছে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত যে ফল উৎপাদনের সমধিক চেষ্টা হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য। নিম্ন ভূমিতে ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপী লেবু ও কলার বাগান দেখিয়াছেন কি? দেরাদুন, কুলু, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে আপাততঃ স্বল্পায়াসে যেরূপ উত্তম শ্রেণীর মেওয়া উৎপাদিত হয়, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করিলে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জিত হইতে পারে। আবশ্যক কেবল কর্ম্ম-বীরের।

পূর্ব্ববঙ্গে তামাকের চাষ—কয়েক বৎসর হইতে পূর্ব্ববঙ্গে যে তামাক চাষের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে তাহা আমাদের অনেক পাঠকই অবগত আছেন। আজ কাল পুরাতন রঙ্গপুর কৃষিক্ষেত্র তামাকের পরীক্ষা বুড়ীরহাট ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ১৯০৭-১৯০৮ সালে উৎপাদিত তামাকের মধ্যে সুমাত্রা, কনেক্‌টিকট ও তুর্কী জাতীয় তামাকের নমুনা বিলাতে যাচাই করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে যে সুমাত্রা জাতীয় তামাক চুরুট মোড়াইয়ের জন্য বিশেষ উপযোগী। ইহা মধ্যম শ্রেণীর চুরুটে চলিতে পারে; দোষের মধ্যে ইহার শিরাস্থূল ও শ্বেতবর্ণ ও ছাই কৃষ্ণ বর্ণ। কনেক্‌টিকট তামাক চুরুটের ভিতরে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত। ইহা কিন্তু মোটা তামাক। অনুমান এই যে, অত্যন্ত উর্ব্বরা জমিতে উৎপাদিত হওয়ায় তামাক এত মোটা হইয়া গিয়াছে। তুর্কী জাতীয় তামাকের নমুনায়, তুর্কী তামাকের যে বিশেষত্ব আছে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। পটাশ তামাকের অন্যতম

ক্ষার। কিন্তু পটাশ দিতে হইলে কার্ব্বনেট অব্ পটাশ দেওয়া ভাল এবং উহা গাছ তুলিয়া বসাইবার কয়েক মাস আগে দেওয়া ভাল। সল্‌ফিউরিক্ অ্যাসহাইড্রাইড পদার্থের সংযোগে ছাইএর বর্ণ কাল হইয়া যায়। সলফেট্ অব্ পটাশ সার রূপে ব্যবহার করিলে এইরূপ হয়। সুতরাং উক্ত দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন কোন কোন জমিতেও পূর্ব্বোক্ত পদার্থ পাওয়া যায়। সেরূপ স্থলে সামান্য মাত্রায় চুণ ব্যবহার করিলে দোষ সংশোধিত হইতে পারে। গাছে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক পাতা থাকিলে তামাকের পাতা অত্যন্ত বড় অথবা মোটা হইয়া যায় না। অধিক নাইট্রোজেন সংযুক্ত সার প্রয়োগের ঐরূপ ফল হইয়া থাকে। তামাক উৎপাদকদিগের পক্ষে এই সমস্ত মন্তব্য বিশেষ রূপ বিবেচনা যোগ্য।

নিমগাছ হইতে উপকার—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই নিমগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলে ইহাকে পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া গণনা করা হয় এবং হিন্দু মাত্রেই নিমগাছ কাটিতে বা উহার কাষ্ঠ বা পল্লব পুড়াইতে সঙ্কোচ বোধ করেন।

নিমগাছ হইতে মানুষের অশেষ উপকার সাধিত হয়, এমন কি পশুপক্ষীর ও ইহা উপকারে আইসে। নিমের সুপক্ক ফল পক্ষীগণের সুখাদ্য। নিমের পাতা ফল, ছাল, বীজ নানা প্রকারে মানুষ ও গবাদি পশুর ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। নিমের পাতা, ছাল এবং নিমের তৈল সদা সর্ব্বদাই লোকে ব্যবহার করে। নিমপাতার জল ক্ষতস্থান ধোয়াইবার এক প্রধান উপকরণ। নিমপাতার গরম জলে পা ধোয়াইলে ঘোড়ার পায়ের বেদনা ভাল হয়।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আষাঢ় মাস।

সব্জীবাগ।—শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শীতের শসা, লাউ, বিলাতি বেগুন, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইতাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে।

পালম্ শাক, টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মকাই (ছোট মকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আল্‌গা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুলবাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থস, কক্সকোম, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ

লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল, প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান।—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন--ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানা প্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং layering করা বলে।

আনারসের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বর্ষার জল খাওয়াই-বার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়া উচিত এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছ গুলি দস্তুরমত গজাইয়া উঠিবে।

শস্যক্ষেত্রে—কৃষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতকস্থানে কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পাট বোনা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন স্থানে পাট তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে নূতন পাট এই সময় বাজারে আমদানী হয়। দক্ষিণবঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু এখানেও পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং সব্জী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কপি চারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াইশুঁটী প্রভৃতি আমদানি হয়।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কক্সকোম্ব, কেপ গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।

REGISTERED No. C 192

কৃষক

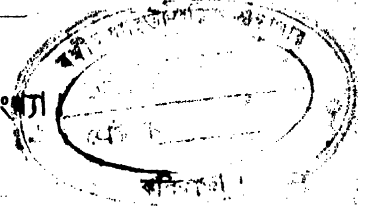
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

আষাঢ়, ১৩১৮।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



দ্বাদশ খণ্ড,—৩য় সংখ্যা।



সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

আষাঢ়, ১৩১৮।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচীপত্র।

আষাঢ়, ১৩১৮ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ খণ্ড। } আষাঢ়, ১৩১৮ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

সব্জী চাষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কুমড়া প্রভৃতি চাষের সাধারণ বিবরণ।

মিঠা কুমড়া, বিলাতী কুমড়া—

পশ্চিমে ডিঙ্গেলা, বাঙলায় কুমড়া, উড়িষ্যায় বৈতাড়ু, বিহারে কোঙ্‌রা বলে।



মৃত্তিকা—ভিটামাটী ও সর্ব্বপ্রকার নদীচর এবং মাঠান জমি গুলিতে ভাল জন্মে। ইহার পক্ষে অল্লোচ্চ ধরণের জমিই শ্রেষ্ঠ। এঁটেল ও দোয়াঁস উভয় মাটীই কুমড়ার পক্ষে উপযুক্ত।

আকৃতি ভেদে মিঠা কুমড়া তিন রকম দেখিতে পাওয়া যায়।

লম্বা ও গোল কুমড়া প্রায় বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলে জন্মায়। হুগলী জেলায় গোল কুমড়ার চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। বৈদ্যবাটীর হাটে এই কুমড়া আমদানী হয়। পূর্ব্ববঙ্গে একপ্রকার চাকারমত কুমড়া জন্মায় তাহা এক একটা ওজনে এক মণ পর্য্যন্ত ভারি হইয়া থাকে। বৈদ্যবাটীর কুমড়া চৈত্র বৈশাখে আমদানী হয়। পূবে কুমড়ার শ্রাবণ ভাদ্রে আমদানী অধিক হইয়া থাকে।

সার—সাধারণ গোবর সার ও পুষ্করিণীর তোলা মাটীই ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

কাল নিরূপণ—এদেশে মাঘ মাসে বীজ বপন করিয়া চৈত্র মাস মধ্যে মিঠা কুমড়ার খুব বেশী ফলন হইতে দেখা যায়। বিজ্ঞ চাষী কখন কখন কার্ত্তিক মাসেই কুমড়ার বীজ বপন করিয়া থাকে। গাছ জন্মিয়া ছোট হইয়া থাকে পরে মাঘ ফাল্গুনে গাছ গজাইয়া উঠে ও ফল ধরে। শীতকালে চারা হইতে বিলম্ব হয় সেই জন্য কার্ত্তিক মাসে গাছ তৈয়ারী করিলে ভাল হয়। আবার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ পুতিয়া ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মধ্যেও কুমড়া ফলিতে দেখা যায়। কিন্তু বাসন্তী ফলন অপেক্ষা বর্ষাতী ফলন অনেক কম হয়।

বর্ষাকালে গাছ অতিশয় ধাপাইয়া যায়, সুতরাং সে গাছের ডগা কাটিয়া খাইলে তবে ফল ফলিতে আরম্ভ হয়। বর্ষার সময় গাছকে এদেশে মাচায় তুলিয়া দিতে হয়। ইহার গাঁইটে গাঁইটে শিকড় জন্মে সুতরাং লাউ কুমড়া গাছ মাটিতে লতাইতে পাইলে গাছগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক দূর ব্যাপ্ত হয় ও অধিক ফল প্রসবে সমর্থ হয়। ক্ষেতের মধ্যে যে গাছটি সমধিক তেজস্কর সেই গাছের সুপুষ্ট কুমড়া বীজের জন্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বীজের জন্য ভাল কুমড়া উৎপন্ন করিতে হইলে একটা গাছে দুই তিনটির অধিক ফল রাখিতে নাই। বাঙলার সুনিপুণ চাষীরা বলে যে, যে কুমড়াটী বীজ রাখিতে হইবে, সেটী যে ডগায় জন্মে, সেই ডগাটীর শিকড় মাটীতে বসিলে, ঐ ডগার দুই বা আড়াই হস্ত পশ্চাৎভাগ হইতে কাটিয়া মূল গাছ হইতে পৃথক করিয়া দিলে, ফলটী খুব বড় হয়। মাঠে যে লাউ, কুমড়া হয় তাহার ৬ ফিট × ৬ফিট অন্তর মাদা প্রস্তুত করিতে হয়। এক বিঘা জমিতে কুমড়ার আবাদ করিতে ১০ তোলা বীজ আবশ্যক হয়। প্রতি মাদায় ৫ কিম্বা ৬টি বীজ বপন করিতে হয়। চারা জন্মিলে যে চারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজস্কর এমন দুইটি চারা রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়।

ফলন—এক বিঘা জমি যাহার মাপ ১৪৪০০ ফিট তাহাতে ৪০০ কুমড়া গাছ বসিতে পারে। গাছের মরা হাজা বাদ ৩০০ গাছে ফল হইবে ধরিয়া লইলে এবং প্রত্যেক গাছে অন্ততঃ ৩টার অধিক কুমড়া ফলিলে এক বিঘায় ১০০০ কুমড়া হওয়া অসম্ভব নহে। উহা হইতে পচা ও খারাপ ফল বাদ দিয়াও আনুমাণিক গড়ে ৫ সের ওজনের ৫০০ কুমড়া নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

দেশী কুমড়া, চাল কুমড়া, ছাঁচি কুমড়া

মৃত্তিকা—ঘরের পোতার মাটী ও বাগানের জমিই উত্তম : সাধারণ দোয়াঁস জমিতেই ইহার চাষ হয়।

সার—ঈষৎ ক্ষার মাটী, আবর্জ্জনা, এবং গোবর সারই উপযুক্ত।

কাল নিরূপণ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টির সময় বীজ বপন করিতে হয়। মাদা করিয়া বীজ পুতিতে হয়। প্রতি মাদায় ৪ কিম্বা ৫টী বীজ পোতা বিধি। মিঠা কুমড়ার অনুরূপ ইহার চাষ। মাটী অপেক্ষা মাচা বা চালেরউপরে কিছু অধিক পরিমাণে ফল ফলে। ইহা এদেশের লোকে শুক্ত ও অন্যান্য ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খায়। কবিরাজেরা বলেন অপক্ক কুমড়া বিষবৎ, পক্ক কুষ্মাণ্ড অমৃততুল্য। কুষ্মাণ্ডখণ্ড রক্তপিত্ত পীড়ার একটী প্রধান ঔষধ। কুমড়ার মিঠাই বাজারে যথেষ্ট বিক্রয় হয়। এই কুমড়াশ্বেতবর্ণ ও লম্বাকৃতি। পূর্ব্বাঞ্চলে গোলাকৃতি একপ্রকার দেশী কুমড়া জন্মে। উহা খুব অধিক ফলে।

গিমা কুমড়া বা চুণা কুমড়া

মৃত্তিকা—মাঠেই ভাল হয় ; দোয়াঁস জমিতেই ইহার চাষ উপযুক্ত।

সার—'পলিমাটীই' ইহার উত্তম সার। গোয়ালের আবর্জ্জনা ও সার রূপে ব্যবহার করা হয়।

কাল নিরূপণ—ইহাও ছাঁচি কুমড়ার ন্যায় শাদা রঙের, কিন্তু মিষ্ট কুমড়ার ন্যায় চাকা চাকা। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে লাউ, কুমড়ার মত মাদা করিয়া চারা করিতে হয়, আর চৈত্র মধ্যে ফল পাকিয়া গাছ মরিয়া যায়। ইহা পূর্ব্ববঙ্গের চর জমিগুলিতে অধিক জন্মাইতে দেখা যায়।

বীজ বপন ও অন্যান্য পাইট মিঠা কুমড়ার অনুরূপ।

লাউ, কদু

তিলে, তুম্বা, শিঙ্গে ইত্যাদি নানাপ্রকারের শসা আছে

মৃত্তিকা—ভিটা মাটী, বাগান ও উচ্চ মাটান জমিতে ভাল হয়।

সার—ঈষৎ ক্ষার মাটী, আঁইস জল, চাল ধোয়া জল, গোবর সার এবং গোয়ালের আবর্জ্জনাই উত্তম সার।

কাল নিরূপণ—ইহা শিশিরের খন্দ। ভাতের সময়ও হয়। এদেশে লাউয়ের বীজ আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ মাসে পুতিয়া বার মাসই ফল খাইতে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক মাদায় ৫ কিম্বা ৬টা বীজ পোতার নিয়ম। লাউ গাছ মাটীতে খুব অধিক বড় হয় না। শাদা দেশী লম্বা লাউ খুব ফলে বেশী। গ্রীষ্মকালে এই লাউয়ের মাঠে চাষ হয়। বর্ষাকালে মাচায় যে লম্বা লাউ হয় তাহা মেটো লাউ অপেক্ষা লম্বা হয়। পূর্ব্ববঙ্গে একপ্রকার লাউ আছে তাহা ৬।৮ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়।

লাউ অনেক ব্যঞ্জনে ব্যবহার হয়। লাউয়ের ঝোলের ঠাণ্ডা গুণ আছে। লাউয়ের চাট্‌নি এবং রায়তা খুব উপাদেয়। হাকিমি মতে মাংসের সহিত লাউব্যবহার বড়ই উপকারপ্রদ।

আর্দ্র হাওয়াতে লাউ আকারে খুব বাড়ে। সুদক্ষ চাষীরা এই কারণে মাচানের তলায় লাউয়ের নীচে গামলায় জল রাখিয়া দিয়া থাকে। তাহারা ফলন বাড়াইবার জন্য লাউয়ের গাছে মধ্যে মধ্যে চাউল ধোয়া জল, মাছ ধোয়া জল, পোড়ামাটি দিয়া থাকে। বীজের পরিমাণ, এক বিঘা জমিতে লাউয়ের ক্ষেত করিতে ১০ তোলার অধিক বীজের আবশ্যক হয় না। মাদায় গাছ জন্মাইয়া কমজোর গাছ গুলি তুলিয়া ফেলা হয় বলিয়া পরিমাণে বীজ কিছু অধিক আবশ্যক।

লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ক্ষেতের জমির খাজনা সমেত বিঘাপ্রতি ১২৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকার অধিক খরচ পড়েনা। চৈতে লাউ কুমড়ার কেবল মাত্র দুই তিন বার জল সেচনের আবশ্যক হয়। সেই কারণে ঐ সময় চাষে খরচও কিছু অধিক লাগে। ভালরূপ ফলন হইলে এক বিঘা একটা ক্ষেতে খরচ বাদ ৫০৲ টাকার উপর আয় দাঁড়াইতে পারে। সাধারণতঃ খরচ বাদ ২০৲ টাকার নীচে লাভ হয় না। নদীর চরে কখন কখন এক বিঘা ক্ষেত হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মুনফা হয়।

শসা, ক্ষীরা

মৃত্তিকা—ভিটা মাটী, বাগান ও উচ্চ মাটান জমিতে ভাল হয়। দোয়াঁস জমিই প্রশস্ত। মাকৃড়া শসা পশ্চিম দেশেই বেশী হয়।

সার—সাধারণ গোবর সার এবং গোয়ালের ছাই মাটি মিশ্রিত আবর্জ্জনাই ইহার উত্তম সার।

কাল নিরূপণ—মাকৃড়া শসা ছোট হয় আর দেশী শশা বড় ও লম্বা হয়। চৈতে অপেক্ষা দেশী শশার চারা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বসাইতে হয়। মাকৃড়া শসা

ফাল্গুন চৈত্রে ফলে, আর দেশী আষাঢ় হইতে আশ্বিন মধ্যে ফলে। শসাকে পালা ও ভুঁই এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

পালা শসা, বর্ষাকালে পালায় হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। ভুঁই শসা বৎসরে দুই বার হয়—বৈশাখে একবার চারা হয় এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আর একবার চারা হয়। বৈশাখী চারায় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে ফল হয়, কার্ত্তিকী চারা ফাল্গুন চৈত্রে ফলে।

পালাশসা অপেক্ষা ভুঁই শসার ফলন অধিক। শসা ক্ষেতের পাইট অনেক এবং খরচও অধিক। শসা ক্ষেতের ঘাস চাঁচিয়া গাছের মাদা গুলি উঁচু করিয়া দিতে হয়। জল নিকাশের পথ পরিষ্কার থাকা চাই। ক্ষেতে জল বসিলে শসা গাছ অতি শীঘ্র পচিয়া যায়। পালা শসা অনেক প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সবুজ লম্বা, শাদা লম্বা কাঁটাযুক্ত সবুজ এইপ্রকার সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। দেশী পালা শসা ২ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কিন্তু বিলাতী আমদানী একপ্রকার এমারও শসা আছে ইহার বর্ণ ঘোর সবুজ, পাকিলে ঈষৎ রক্তাভ হয়, দেখিতে মনোহর, লম্বায় তিন ফিট পর্য্যন্ত হয়, তুলিবার পর অনেক দিন রঙের বৈলক্ষণ্য হয় না। আজ কাল অনেকেই এদেশে ইহার চাষ করিতেছেন। শসাক্ষেতে শিয়ালের উপদ্রব প্রায়ই হয়। এই জন্ত হইতে ফসল রক্ষা করিতে হইলে শসাক্ষেতে রীতিমত বেড়া দিতে হয়, দুই তিন ইঞ্চি ফাঁক বাঁশের বেড়া দিতে হয় এবং মাচান ও তদুপরি টঙ বাঁধিয়া রাত্রে ক্ষেতে পাহারা দিতে হয়। শসা চাষে যেমন পরিশ্রম আছে লাভ সমধিক, একবিঘা শসাক্ষেত হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে দেখা গিয়াছে, ন্যূনকল্পে ৫০৲ টাকার কম লাভ হইবে না।

ভুঁই-শসা—ভুঁয়েতে হয় বলিয়া ইহার নাম ভুঁই শসা। দুইরকম ভুঁই শসা দেখা যায়, একরকম শাদা ও সবুজ মিশান রঙ, আকৃতি ঈষৎ বাঁকা। ঐ শসা গুলি ৬ কিম্বা ৮ ইঞ্চির অধিক বড় হয় না। আর এক রকম ইহা অপেক্ষা ছোট সোজা গোলাকৃতি। ইহার খোসা পুরু, কচি থাকিলেও কাঁচা খাওয়া যায় না। পাকিলে তরকারি খায়। সব শসাই কচি অবস্থায় কাঁচা খাওয়া যায়। পাকিলে পাঁড় শসা বলা হয়, উহার তরকারি খাওয়া হয়। ভুঁই শসাই ফলে অধিক বলিয়া ইহার চাষে পালা শসা অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হয়। মাঠে, ভুঁয়ে চাষ হয় বলিয়া ভুঁই শসার ক্ষেতে জন্তু জানোয়ারের উৎপাত অধিক হয়।

বীজের পরিমাণ—পালা শসা চাষে ৫ তোলা বীজ বিঘা প্রতি যথেষ্ট। কিন্তু ভূঁইশসা বীজ হাতে ছিটাইয়া বোনা হয় সেই জন্য বীজ ১০ তোলারও অধিক লাগে। গাছ বাহির হইলে ক্ষেতের মাঝে মাঝে তেজাল গাছগুলি রাখিয়া অন্য গাছগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। পরে ক্ষেত চাঁচিয়া গাছের গোড়ায় গোড়ায় মাটি দিতে হয়। পালা শসার চারা মাদা করিয়া বসান বিধি।

খেঁড়ো

মৃত্তিকা—বেলে দোয়াঁস ও চর জমি।

সার—পলিমাটি উত্তম সার। শসাতে গোবর প্রভৃতি যে সার দেওয়া হয় ইহাতেও সেই দিতে হয়।

কাল নিরূপণ—কাঁকুড় ফুটীর ন্যায় মাঘ, ফাল্গুনে ইহার চাষ। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল তৈয়ারি হয়।

বীজের পরিমাণ—বিঘা প্রতি তিন তোলা। ৪ ফিট অন্তর মাদা দিতে হয়।

খাইতে শসার মত। শসারমত কাঁচা ও ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাওয়া যায়। বীরভূমে ইহা খুব উৎপন্ন হয়।

কাঁকুড়. কাঁকড়ী

মৃত্তিকা—বালি দোয়াঁস। নদীর চরে খুব ভাল জন্মায়।

সার—পলিমাটিই উত্তম সার। লাউ কুমড়ায় অন্য সারও দেওয়া হয়।

কাল নিরূপণ—চৈত্র বৈশাখ মাসে বীজ বপন করিতে হয়।

চাষের প্রণালী কুমড়ারই মত। ভূঁই শসার মত বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। এক বিঘা জমিতে দশ তোলা বীজ বোনা হয়। মাটি সরল থাকা আবশ্যক কিন্তু অধিক আর্দ্র হইলে গাছ পচিয়া যায়। আবশ্যকমত জল সেচন করিলে ভাল হয়। কাঁচায় ইহার ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খায়। কাঁকুড় পাকিলে তাহাকে ফুটী বলে। তখন ইহা গুড়, চিনি কিম্বা মধু দিয়া খাইতে হয়।

কাঁকড়ী কাঁকুড় প্রায় এক জাতীয় ফল, উভয়ের চাষ একই প্রকার। কাঁকড়ী অনেকটা শসার আকার, একটু বাঁকা। পশ্চিম দেশে ইহার চাষ অধিক হয়।

গোমুখ, ফুটী

কাঁকুড় পাকিলে তাহাকে ফুটি বলে বটে, কিন্তু আসল ফুটিতে আর এই ফুটিতে তফাৎ আছে। কাঁকুড় কাঁচা অবস্থায় মিষ্ট, তরকারি রাঁধিয়া খাওয়া যায় কিন্তু ফুটি কাঁচা তিক্ত, ইহার তরকারি খাওয়া যায় না। ফুটি লম্বা ও গোল এই দুই রকম হয়। কাঁকুড় হইতে যে ফুটি হয় আসল ফুটি পাকিলে তাহা অপেক্ষা নরম

ও রঙ অপেক্ষাকৃত শাদা হয়। গোমুখ, ফুটির একটা প্রকার মাত্র। গোমুখ পাকিলে ফুটি অপেক্ষা রঙ শাদা হয়। ইহার গাত্র সম্পূর্ণ মসৃণ, ফুটি বা কাঁকুড়ের ন্যায় ডোরা কাটা হয় না। চাষ প্রণালী কাঁকুড়েরই মত। পাকিলে গুড়, চিনির রস, বা মধু দিয়া খাইতে হয়।

তরমুজ

ফাল্গুন চৈত্র মাসে বীজ বুনিতে হয়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকে। তরমুজ পাকিলে সবুজ রঙ ঈষৎ ফিকে হয় এবং আঙ্গুলের টোকা দিলে ফাঁপা বলিয়া বোধ হয়। এদেশের মধ্যে গোয়ালন্দের তরমুজই খুব বড় হয়। এক একটা ৩০ সের পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। আমেরিকান তরমুজেরও এদেশে চাষ হইতেছে। তাহার এক একটার ওজন ৫০ সের পর্য্যন্ত। ভাগলপুর, সাহারাণপুর ও সাজাহানপুরের তরমুজের খুব খ্যাতি আছে। পদ্মা, যমুনা প্রভৃতি বালির চড়ায় বালির ভিতর প্রকাণ্ড তরমুজ হইয়া থাকে। মরুভূমে বালুকাস্তূপ হইতে তরমুজ খুঁজিয়া পথিক তাহাদের তৃষ্ণাদূর করে। চাষের জন্য বিঘা প্রতি দশ তোলা বীজের অধিক আবশ্যক হয়না।

তরমুজ অনেক প্রকারের আছে লম্বা, গোল এবং বোতলাকৃতি এই তিন রকমই সচরাচর দেখাযায়। গোয়ালন্দের তরমুজ লম্বাকৃতি, গোল তরমুজের চাষ হুগলী জেলাতেই অধিক, ২৪ পরগণায় গোল এবং লম্বা দুই রকমই আছে। লম্বা তরমুজ গুলিই আকারে বড় ভারি হয়। সাহারাণপুরে বোতলাকৃতি তরমুজ পাওয়া যায়।

কুমড়ার ন্যায় ৪ কিম্বা ৫ হাত অন্তর মাদা দিতে হয়। নদীর চরে এক বিঘা জমিতে পচা সড়া বাদ, বড় হইলে ৫০০ তরমুজ পাওয়া বিচিত্র কথা নহে ও ছোট হইলে আরও বেশী হয়।

খরবুজা (লক্ষ্ণৌ)

সুমিষ্ট লক্ষ্ণৌ খরবুজা, ফলের মধ্যে উপাদেয়। অযোধ্যা বা আধুনিক ফয়জাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বড়বাঁকী প্রভৃতি জেলায় যে যে স্থান দিয়া ঘর্ঘরা, সরযু ও শোণ নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সমস্ত নদীতীরস্থ চর জমিতেই প্রচুর পরিমাণে খরবুজা উৎপন্ন হয়। খরবুজা ঠিক আমাদের দেশীয় গোলাকার কাঁকুড়ের ন্যায়। ইহার ইংরাজী নাম Sweet melon (সুইট মেলন)। অনেক স্থানে ইহা জন্মায় বটে, কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ের খরবুজা এবং সফেদা আম্রের সুমধুর রস, প্রায় অন্য স্থানে আস্বাদন করিতে পাওয়া যায় না।

চাষ এবং কাল নিরূপণ—খরবুজা প্রধানতঃ নদীর চর এবং বালুকাময় জমিতেই উৎকৃষ্ট জন্মায়। পশ্চিম দেশীয় কৃষকেরা মাঘের ১৫ই হইতে ফাল্গুনের

শেষ মধ্যে নদীর চরে দুই বা আড়াই হস্ত অন্তর একটী একটী মাদা করিয়া তাহা এক এক টুকরি পুরাতন গোবর সারে পূর্ণ করতঃ তাহাতে তিনটি হিসাবে বীজ পুতিয়া দেয়। আর আবশ্যক বোধ করিলে চারা না হওয়া পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে অল্প অল্প জলসেচন করিয়া থাকে। তরমুজ, খরমুজ, কাঁকুড় প্রভৃতি খন্দ অধিক পরিমাণে অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে। পশ্চিমে বারিপাত খুব কম, কিন্তু তথায় ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জন্মায়। খরবুজা, কাঁকুড় এবং তরমুজ যতই গরম বাতাস বহিতে থাকে ততই আকারে একটু বড়, পুষ্ট এবং সুস্বাদু হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পশ্চিম দেশে খরবুজার ক্ষেতের নিকট দিয়া গেলে খরবুজার সৌরভে প্রাণমন পুলকিত হইয়া থাকে। যিনি কখন লক্ষ্ণৌ নগরীর এই সমুদয় ক্ষেতের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালায় কালনিরূপণ এবং বপন প্রণালী—বাঙ্গালায় বারিপাত অধিক হয় এবং কীটপতঙ্গাদির অধিক উৎপাত দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য খরবুজা অধিক হয় না। এদেশে পৌষ হইতে মাঘ মধ্যে যেমন একবার বৃষ্টি হইবে, অমনি নদীচর এবং তন্নিকটবর্ত্তী খোলা ময়দান গুলিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে মাদাপ্রস্তুত করিয়া পরিমাণ মত সার দিয়া ৩।৪টী হিসাবে খরবুজার বীজ পুতিতে হইবে। ঐ সময় হইতে চারা গুলি ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। খরবুজার গাছ দেখিতে ঠিক কাঁকুড় গাছের ন্যায়, গোলাকার চাকা পাতা বিশিষ্ট। ইহা ত্রৈমাসিক ফসল। ইহার বীজ প্রায় কাঁকুড়ের বীজের ন্যায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট ও মোটা। গাছগুলি লতাইতে আরম্ভ করিলে ঐ সকল ক্ষেত ভাল করিয়া কোপাইয়া, বা পাতা লতা কুটী প্রভৃতি যাহা কিছু সুবিধা হইবে তাহাই বিছাইয়া দিতে হইবে। উহার উপর গাছ লতাইয়া ফল ধরিতে থাকিবে। নতুবা বালুকার উত্তাপে গাছ বা ফল উভয়ই হাজিয়া যাইতে পারে। লক্ষ্ণৌ ছাড়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর, আগ্রা জেলার নদীকূলেও প্রচুর পরিমাণে খরবুজা উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত মধ্যভারতের অন্তর্গত উজ্জয়িনীতেও খরবুজা জন্মায়। কিন্তু এ সকল অপেক্ষা লক্ষ্ণৌ এবং আগ্রার খরবুজাই উৎকৃষ্ট। অন্যান্য স্থানের ফল তত সুস্বাদু নহে। প্রকৃত লক্ষ্ণৌ এবং আগ্রা নগরীর খরবুজা খাইবার সময় খাঁটি দুগ্ধের সুমিষ্টতা বা সুগন্ধযুক্ত ক্ষীর ভোজনের ন্যায় ভ্রম হয়।

অন্য প্রদেশে খরবুজার রপ্তানি।—ক্ষেতে লক্ষ্ণৌ খরবুজা পাকিবার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্থানীয় বাজারে প্রতি সের ৵০ বিক্রয় হয়। খরবুজা নূতন উঠিলে ॥০ সেরও বিকায়। ফলগুলি দেখিতে গোলাকার, গাত্রে কাল কাল দাগ আছে। এই ফল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিলে স্থানীয় মহাজনেরা প্রত্যহ শত শত টুকরি ভরিয়া নানাস্থানে রেলওয়ে পার্শেলে রপ্তানি করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করে। খাঁটী লক্ষ্ণৌ খরবুজা কলিকাতার বাজারে আমদানী হইতে কম দেখা যায়।

চূণ সার

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, এফ, আর, এচ, এস, লিখিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সদ্যোজাত চূণ বড়ই উত্তাপ সংযুক্ত; এজন্য উহা ভাঁটী হইতে আনিয়াই জমিতে না দিয়া কোন স্থানে পাতলা ভাবে ছড়াইয়া রাখিলে বায়ু মণ্ডল হইতে বায়ু ও কার্ব্বনিক এসিড নামক বায়বীয় অম্ল উহাতে প্রবেশ করিয়া উহার উত্তাপের হ্রাস করে ও স্বভাব পরিবর্ত্তন করে। ইহাতে উহার দহন শক্তিও কমিয়া যায়। বলা বাহুল্য, দুই চারি দিনের অধিক ঐরূপ অবস্থায় রাখা উচিত নহে। কারণ অধিক দিবস অনাবৃত স্থানে থাকিলে রাত্রিকালের শিশিরে চূণের উপরিভাগ জমাট বাঁধিতে কিম্বা বৃষ্টি লাগিলে সমস্ত চূণই ডেলা বাঁধিয়া যাইতে পারে। ডেলা বাঁধিয়া গেলে, উহার কার্য্যকারিতা হ্রাস হইয়া যায়। এই অবস্থায় উহা ক্ষেত্রে প্রদান করিলে কোন স্থলে অধিক, কোন স্থলে অল্প চূণ পড়ে; তাহাতে ক্ষেত্রের সকল ফসল উহার উপকারিতা সমভাবে সম্ভোগ করিতে পারে না।

বর্ষাগমের অন্ততঃ এক মাস অগ্রে কিম্বা বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইলে যখন মৃত্তিকার আর্দ্রতা না থাকিবে, এরূপ সময়ে ক্ষেত্রে চূণ দিতে হয়। আর্দ্রাবস্থায় মাটিতে চূণ দিলে, মাটি ও চূণে মিলিত হইয়া কঠিন ডেলা বাঁধিয়া যায়। চূণ কর্দ্দম প্রধান জমিকে হালকা এবং বালু প্রধান জমিকে অপেক্ষাকৃত সরস করে। চূণের স্বভাবই এই যে কালক্রমে উহা মৃত্তিকার নিম্নস্তরে তলাইয়া যায়। ক্ষেত্রে চূণ ছড়াইবার একটী বিশেষ প্রণালী আছে; ক্ষেত্র যখন শুষ্ক থাকিবে, তখন উহার উপরে আস্তে আস্তে চারিদিকে সমপরিমাণে চূণ ছড়াইতে হইবে। বায়ুর বেগ প্রবল থাকিলে অনেক চূণ উড়িয়া যায়, সুতরাং সেরূপ সময়ে উক্তকার্য্য হইতে বিরত থাকিলে ভাল হয়। তাহা ছাড়া চূণ দিবার পূর্ব্বে একবার ক্ষেত্রে হল চালনা করাইয়া লইলে আরও ভাল হয়। চূণ দেওয়া হইয়া গেলে, উহাকে মৃত্তিকার সহিত সমভাবে ও সূক্ষ্মরূপে মিলিত করিবার জন্য বারম্বার জমিকে চষিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। এক দিনে বারম্বার লাঙ্গল না দিয়া, চারি দিবস অন্তর একবার করিয়া লাঙ্গল দিলে অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার পাওয়া যায়। কারণ প্রতি দুইবার লাঙ্গল দিবার মধ্যবর্ত্তী যে কয় দিবস সময় পাওয়া যায় তাহাতে নিম্নস্থিত মৃত্তিকা উপরে আসিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে অনেক বাষ্পীয় ও বায়বীয় পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে।

তদ্ভিন্ন মৃত্তিকার যে দোষ ছিল, তাহা বায়ুমণ্ডল, আলোক ও সূর্য্যোত্তাপ দ্বারা সংশোধিত হইয়া যায়। অধিকন্তু সেই বিমিশ্রিত চূণও বায়ুমণ্ডল হইতে বহুল পরিমাণে কার্ব্বনিক এসিড্ সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। এইরূপে কয়েক দিন অন্তর মৃত্তিকা কর্ষণ করিলে, মৃত্তিকাভ্যন্তর যতটা কর্ষিত হইয়াছে, তাহার সমস্ত মাটি পর্য্যায়ক্রমে সংশোধিত হইয়া এবং বাহ্য পদার্থ সংগ্রহ করিয়া অধিকতর উর্ব্বরা হইয়া থাকে।

চূণের সাক্ষাত অপেক্ষা পরোক্ষ ক্রিয়াই অধিক। মৃত্তিকা মধ্যে এমন অনেক পদার্থ থাকে, যে তৎসমুদয় সার হইয়াও উদ্ভিদের উপকারে আসে না। তাহারা চূণের প্রভাবে উদ্ভিদের আহারোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয়।

হিউমস (Humus) নামক মৃত্তিকায় যে অঙ্গারক পদার্থ থাকে তাহাও চূণের অভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে না, বরং যেখানে এই হিউমসের আতিশয্য থাকে, অথচ চূণের ও অভাব থাকে, সেস্থলে প্রথমোক্ত পদার্থের অম্ল-প্রাচুর্য্য বশতঃ জমির ও উদ্ভিদের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই অম্ল-প্রধান জমিকে ক্ষার জমি (Sour land) কহে। অম্লাক্ত জমিতে চূণ দিলে, জমির অম্ল-দোষ কাটিয়া যায়, অধিকন্তু চূণের সংযোগ হেতু হিউমস্ বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহার উপযোগী হইয়া থাকে। মৃত্তিকার অন্তর্গত সিলিকেট্ Silicate নামক যে ধাতব পদার্থ থাকে, তাহাও চূণের সংস্পর্শে আসিয়া বিশ্লেষিত হইয়া পড়ে। সুতরাং যে সার পদার্থ ইতিপূর্ব্বে তাহাতে আবদ্ধ ছিল, তাহা এক্ষণে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হইয়া থাকে।

মৃত্তিকায় চূণ সংযুক্ত হইলে তন্মধ্যস্থিত অনেক যৌগিক পদার্থকে উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেয়; সুতরাং প্রথম প্রথম ইহার দ্বারা চাষ আবাদের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু সেই জমি অল্প দিন মধ্যে (দুই চারি বৎসর) এমন ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, তখন উহার কোন রকম পোষণ করিবার শক্তি থাকে না। এই জন্য ইউরোপীয় চাষীদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ হইয়া গিয়াছে যে Lime enriches the father but beggars the son অর্থাৎ চূণ পিতাকে ধনী করিয়া তুলে বটে কিন্তু পুত্রকে ভিক্ষুকে পরিণত করে।

চূণের তীক্ষ্ণতা বা উগ্রতা এবং প্রয়োগের পরিমাণ অনুসারে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত উহার কার্য্যকারিতা থাকিতে দেখা যায়। এইজন্য চূণ প্রয়োগ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক। নূতন ও তীব্র চূণের উত্তাপ ও তীব্রতা হ্রাস হইতে অনেক সময় লাগে। তাহা ব্যতীত তীব্রতার জন্য মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত অনেক সার পদার্থেরও গুণের হ্রাস হইয়া থাকে।

অপরন্তু, চূণের তীব্রতা থাকিতে উহাতে কোন ফসলই জন্মিতে পারিবে না। তবে যদি আবাদ করিবার পূর্ব্বে অধিক সময় পাওয়া যায়, তবে তীব্র চূণ দিতে

তত আপত্তি নাই। বরং ইহা দ্বারা আরও উপকার হইতে পারে; মৃত্তিকার মধ্যে যে সমুদয় কীট থাকে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। আমরা নানাবিধ গাছ পালায় চূণ প্রয়োগ করিয়াছি, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নূতন ও পুরাতন চূণ, অধিক ও অল্প পরিমাণ প্রয়োগ করিয়াও দেখিয়াছি, সুতরাং চূণ হইতে কখন ভালফল পাইয়াছি আবার কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ভবিষ্যতে সে সকল ক্রমে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ

উদ্ভিজ্জ্য ভেষজ্য ব্যবসায়

শ্রীবিষ্ণুচরণ ভড় লিখিত

আজ কাল আমাদের দেশে চাকুরীই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। যেমন তেমন একটা চাকুরী হইলেই লোক সুখী হয়। মাস কাবারের পর টাকা আনিতে পারিলেই হইল। সে টাকায় বোধ হয় যে, মাসের অর্দ্ধেক দিনও কুলায় না; তবে অমন চাকুরীর লাভ কি?

এমন স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের পথ আছে যে, তাহাতে বেশ মনের সুখে ও শান্তিতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। চাকুরীর আশা ত্যাগ করিয়া যাহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহারাই চরমে বেশ দুই পয়সা সংস্থান করিয়া লইয়াছেন ইহা আমরা নিত্যই দেখিতেছি। ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিতে হইলে বলিতে পারা যায় যে, কত নিরন্ন পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়া সামান্য ॥০ আট আনা ১৲ এক টাকা পুঁজি লইয়া চিনার বাদাম, কাবলী মটর, ডালভাজা, অবাক জলপান, কুল্পীবরফ, কেরোসীন তৈল, আলু, দাল কড়াই, গুড় প্রভৃতি এবং ৪৲। ৫৲ টাকা পুঁজি লইয়া কাপড়, গেঞ্জী ইত্যাদি ফেরি করিয়া স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছে, এবং কিছু পুঁজিও করিতেছে। পরে মুদির দোকান খুলিয়া বসিতেছে এবং বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। কিন্তু আমাদের ঐরূপ অধ্যবসায় ও মনের জোর নাই, আর আমরা ঐ প্রকারে ব্যবসা করিতেও ইচ্ছুক নই। তাহার কারণ অত কষ্ট স্বীকার করে কে? আমরা কেবল অধিক মূলধন ফেলিয়া এক দোকান খুলিয়া শীঘ্রই বড় মানুষ হইতে ইচ্ছা করি। লোভই আমাদের অবনতির প্রধান কারণ। আমরা অধিক মূলধন পাই না এবং সেরূপ ব্যবসাও করিতে পারি না। পরে সাত পাঁচ ভাবিয়া সামান্য বেতনের চাকুরীর জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই।

এখন পর্য্যন্ত ভেষজের ব্যবসায়ে কেহ তেমন লিপ্ত হন নাই। এই ব্যবসার দিকে কেহই তেমন লক্ষ্য করিতেছেন না। বোধ হয় মনে করিয়া থাকেন যে ইহা বেদেদিগের ব্যবসায়, ইতর শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভদ্রলোকে কেন ইহা করিবে? কিন্তু ভদ্রসন্তানগণ যদি এই ব্যবসায়ে মনোযোগ দেন তাহা হইলে এই ব্যবসায়ে ভবিষ্যৎ উন্নতির বিশেষ আশা থাকে। এই ব্যবসাটী বেশ আয়কর। কিন্তু ইহা সত্বেও একার্য্যে কেহই এখন পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন নাই। অতি অল্প আয়ের চাকুরী না করিয়া, যদি গাছ গাছড়া সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আনিয়া ব্যবসায়ীদিগকে বিক্রয় করা যায় তাহা হইলে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। ভেষজের ব্যবসায় অনেকের বেশ জীবিকা চলিতে পারে। বিশেষ কিছু পুঁজির আবশুক হয় না। সামান্য পুঁজিতেই এই ব্যবসা চলিতে পারে। লোকসানের এমন কিছু সম্ভাবনা ইহাতে নাই। তবে সতর্কতা, বিবেচনা ও কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। অন্য ব্যবসায়ের ন্যায় এই ব্যবসায়েও সেই সমুদয় গুণের আবশুক। চাষ করা পরের কথা, উপস্থিত যে সব গাছগাছড়া বনে জঙ্গলে জন্মাইতেছে তাহাই সংগ্রহ করিতে পারিলে বোধ হয় বড় বড় ব্যবসায় চলিতে পারে। বনৌষধি গাছড়া প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই সকল গাছড়াকে বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয় না। এই সকল গাছড়া যেখানে সেখানে, পথে, ঘাটে, মাঠে, বনে, জঙ্গলে ও পাহাড়ে জন্মিয়া থাকে। এই জন্য এ সমুদয়ের নিমিত্ত বিশেষ কিছু পরিশ্রম করিতে হয় না। কেবল সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলেই হইল। এক ঋতুতে সকল প্রকার গাছ জন্মায় না। এক এক ঋতুতে এক এক প্রকার গাছ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু গাছড়া সংগ্রহে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশুক।

যেখানে বীজ আবশুক, সেখানে বীজগুলিকে প্রথমে বেশ পরিষ্কার করিয়া পরে রৌদ্রে বেশ শুষ্ক করিয়া কুটাকাটী গুলিকে কুলায় পাছড়াইয়া বস্তায় পুরিয়া রাখিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতে হইবে। এরূপ না করিলে শীঘ্র পোকা লাগিয়া নষ্ট হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে এরূপ নিয়মে রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারা যায়। যে সকল গাছের মূল আবশ্যক, সে স্থানে প্রথমে মূল গুলিকে তুলিয়া বেশ করিয়া মূলের মাটী ধুইয়া ফেলিয়া পরে কাটা কুটী বাছিয়া শুষ্ক করিয়া বস্তায় পুরিয়া রাখিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে হাওয়ায় কিম্বা রৌদ্রে দিতে হইবে। যে গাছের ছাল আবশুক, প্রথমে গাছ হইতে ছাল ছাড়াইয়া ছাল গুলিকে বেশশুষ্ক করিয়া বস্তায়, কিম্বা ছাল লম্বায় বড় হইলে (আঁটী বাঁধিবার মত হইলে,) আঁটী বাঁধিয়া রাখিতে

হইবে। যে সকল গাছের পাতা আবশ্যক প্রথমে গাছ হইতে পাতা তুলিয়া ডাল পালা বাছিয়া বস্তাবন্দি করিয়া রাখিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে রৌদ্রে কিম্বা হাওয়াতে দিতে হইবে।

এই সকল বনৌষধি গাছ গাছড়া ভারতের বাহিরে অনেক স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। কলিকাতার বড় বড় বণিকগণ প্রতি বৎসর কত শত মণ কুঁচিলা, হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, চালমুগরা, ভেলা, আদা, শুঁট, বেলশুঁট, পিঁপুল, চিরেতা, অগুরু ও তেঁতুল প্রভৃতি ও কত প্রকার গাছের আঠা রপ্তানী করিয়া থাকেন। আমাদের ঐ সকল দেখিয়াও চৈতন্য হইতেছে না। আমরা কেবল ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আমাদের ঘরের পার্শ্বেই ঐ সকল জঙ্গল কেবল চক্ষুতে দেখিতেছি। আর অপর লোকে আসিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে ঐ সকল জিনিস সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছে°। মাড়োয়ারী বণিকগণ জঙ্গলের জঙ্গলীর নিকট হইতে হরিতকী, বহেড়া, আমলকী ও কুঁচলে ইত্যাদি নাম মাত্র মূল্য দিয়া খরিদ করিয়া দেশ বিদেশে চালান দিয়া কত পয়সা রোজগার করিতেছে। আমরা ঐ রূপে সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিতে কেন পারি না তাহা কে বলিবে!

পাঠকগণের মধ্যে কেহ যদি বনৌষধির ব্যবসায়ে ব্রতী হন, তাহা হইলে কার্য্য ক্ষেত্রে দেখিতে পাইবেন যে এ ব্যবসায়ে লাভ ছাড়া লোকসানের সম্ভাবনা কম। যে সকল জিনিসের অধিক কাটতি তাহার দিকে লক্ষ্য রাখাই বিশেষ আবশ্যক।

গার্হস্থ্য ঔষধাবলী *

অতিসার—বেলশুঁঠ, জায়ফল, জীরা, মুথা প্রত্যেকে সমান পরিমাণে আতপ চাউলের চেলুনী দিয়া বাটিয়া ৫ রতি বটিকা করিবে, কর্পূরের জল দিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর ১টী করিয়া খাওয়াইলে অতিসার বন্ধ হয়। অবশ্য বয়স ভেদে মাত্রার হ্রাস করিতে হইবে।

শিশুদিগের—জন্য বটের ঝুরির টুকরা ৪।৫টী, মৌরি ৪।৫টী, বেনার মূল ৪।৫টী টুকরা একত্রে আতপ চাউল ধোয়াজল দিয়া হাত ঘসা করিয়া দিনে ২।৩ বার খাওয়াইলে বন্ধ হয়।

° এই প্রসঙ্গে আমরা কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনরঞ্জন সেন লিখিত কতিপয় গাছ গাছড়ার মুষ্টিযোগ এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম।

অজীর্ণ—শাঁকের চুণ ১, গোলমরিচ ১, সৈন্ধব লবণ ১ জল কিম্বা লেবুর রস দিয়া বাটিয়া ৵০ আনা পরিমাণ বটিকা জল কিম্বা লেবুর রস দিয়া সেব্য।

কাগজী বা পাতি লেবুর রসে /০ আনা সৈন্ধব বা বিট লবণ দিয়া খাইলে উপকার হয়।

লবঙ্গ ও বিট লবণ ১, মৌরী ১, যোয়ান ১, সিদ্ধি ১, লেবুর রসে বাটিয়া ৫ রতি বটিকা করিয়া আতপচাউলের চেলুনীর জল সহিত সেবন করিলে অপাক নিবারণ হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

অনিদ্রা—সুশুনি শাকের ঝোল খাইলে সুনিদ্রা হয়।

তেলাকুচার পাতা, কাঁচা হলুদ কোন তৈলের সহিত ফেনাইয়া মস্তকে ও পদে মালিস করিলে নিদ্রা হয়; ক্ষুদে পেঁয়াজের রস পদ তলে মালিস করিলেও হয়।

অম্ল পিত্ত—চা খড়ির গুঁড়া ৴০ আনা বা সোডা ৴০ জল দিয়া খাইলে পেট-খুঁচুনী, কড়ার নিচে কামড়ান, গলা ও বুক জ্বালার শান্তি হয়। বহুকালের পুরাতন চূণ ১ ভাগ, পুরাতন তেঁতুল গাছের চটা ভস্ম ১ ভাগ, ৵০ মাত্রায় পলতার রস ও ডাবের জল অনুপানে সেবন করিলে অম্লপিত্ত ভাল হয় ও খুব যন্ত্রণার সময়ে ২ ঘণ্টা অন্তর ঐ পুরিয়া খাইলে অম্লশূল উপশম হয়। রাত্রে ধনে, নালতে ও মিছরি একত্রে ভিজাইয়া প্রাতে খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

অর্শ—খোসা তোলা কৃষ্ণ তিল বাটা ॥০ তোলা, মাখন ॥০ তোলা, মিছরি ॥০ তোলা নাগেশ্বর ফুলের রেণু ৵০ আনা একত্রে খাইলে উপকার হয়।

কুকুর শোকার রস গাওয়া ঘৃতের সহিত পাক করিয়া বর্ত্তিতে দিলে উপকার হয়।

আগুনে পোড়া—আমের কেশীর জল করিয়া রাখিলে ঐ জল পোড়া স্থানে দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যায় ও ফোস্কা হয় না। হাঁসের ডিমের কুসুম, ঘৃতকুমারীর রস এবং মাখন একত্রে ফেটাইয়া পোড়া স্থানে দিয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিলে জ্বালা যায়।

আমাশায়—বিহি দানা ।০ আনা, ঈষগ্‌ গুল ।০ আনা, বাবলা আটা ।০ আনা, মিছরি ।০ আনা, ৴।০ পোয়া গরম জলে সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া প্রাতে ছাঁকিয়া শিশির মধ্যে রাখিতে হইবে, অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে ২।৩ দিনে রক্ত আমাশায় নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

কচি কুলের পাতা ৵০, যোয়ান ৵০, সৈন্ধব লবণ ৴০ আনা, গোল মরিচ /০, জল দিয়া বাটিয়া খালি পেটে সেবন করিলে ২।৩ দিনে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

একশিরা—আপাঙের শিকড় বাঁধিলে ভাল হয়—জয়ন্তী পাতা, নিশিন্দা পাতা, বেলপাতা, ধুতুরা পাতা অল্প বাটিয়া রুটির মত করিয়া আগুনে সেঁকিয়া কোষে বাঁধিলে ব্যথা ও ফোলার উপশম হয়।

এঁড়েলাগা—লবঙ্গ, যোয়ান, মৌরি, হরিতকী, আমলা, চিরতার ফুল, যবক্ষার, সোহাগার খৈ প্রত্যেকে সমানভাবে একত্রে মিশাইয়া ২ রতি করিয়া জলের সহিত দিবসে ২।৩ বার সেব্য।

কাউরের ঘা—শোরগোঁজা জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে ৩।৪ দিনে ভাল হইয়া যায়। কচ্ছপের খোলা পোড়াইয়া খাঁটী সরিষার তৈল দিয়া লাগাইলে আরোগ্য হয়।

কান পচা ও ব্যথা—বাঘের গোঁপ এক গাছি কানের মধ্যে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দুর হয়।

ঘোড়ার বিষ্ঠার রসে অর্দ্ধ রতি সমুদ্র ফেণ চূর্ণ দিয়া ঐ রস কর্ণের মধ্যে দিলে যন্ত্রণা যায়, প্রতি দিন কর্ণ পরিষ্কার করিয়া শামুকের পোঁটা সরিষার তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল ২।৩ ফোঁটা কাণের মধ্যে দিলে কাণের পুঁজ পড়া ভাল হয়।

কামল (ন্যাবা)—আনারস অর্দ্ধ ছটাক চিনির সহিত প্রত্যহ ২।৩ বার খাইলে ২ ৪ দিনের মধ্যে ফল হয়, মেদি পাতার রস খাইলেও হয়।

পলতার রস, কাঁচা হলুদের রস ও চূণের জল একত্রে প্রত্যহ ২ বার খাইলে অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

কাশ—বচ, জ্যেষ্ঠমধু, পিঁপুল, কুড় প্রত্যেকে সমানভাবে একত্রে মিশাইয়া ✓০ আনা মাত্রায় মধুর সহিত দিনে ২।৩ বার অবলেহনে উপকার হয়।

শিশুদিগের—ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ও কাল তুলসী পত্রের রস মধুর সহিত অবলেহন করিতে দিবে।

ক্রিমি—পলাশ বীজ, সোমরাজ, বন যোয়ান, বিটলবণ, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমান সমষ্টির, সম পরিমাণ জাঙ্গি হরিতকী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ইহার এক আনা পরিমাণ; ছোট খেজুর গাছের গেঁড়ো ও চূণের জল অথবা আনারসের পাতার রস ও চূণের জল সেবন করিলে ক্রিমি বেশ আরোগ্য হয়।

খোস—আকন্দর আটা, গাঁজা, মোমছাল বা নিম পাতা সরিষার তৈলে ভাজিয়া তৈল ছাঁকিয়া লইবে, ঐ তৈল খোসে লাগাইলে ২।৫ দিনে ভাল হইবে।

ঘুংরী—সানছে শাকের শীকড় ৩।৪ রতি শ্বেত চন্দন ঘসা একত্রে বাটিয়া দিবসে ২ বার সেবন বিধি।

গরল—কাঁচা হলুদ, নিম পাতা ও আয়াপানের পাতা বাটিয়া লাগাইলে ভাল হয়।

গলাভাঙ্গা—কচি কুল পাতা ঘিয়ে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া সদাসর্ব্বদা ঐ চূর্ণ মুখে রাখিলে ভাল হয়।

গা বমি বমি—মৌরির জলে কুলখড়ি ঘষিয়া খাইলে ভাল হয়।

ত্রিফলার ও ধনে ভিজার জলে কিছু মধু প্রক্ষেপ দিয়া খাইলে ভাল হয়।

ঘা—ধুনা, সরিষার তৈল, মোম, আকন্দর আটা একত্র ফুটাইয়া মলম করিয়া লাগাইলে ঘা ভাল হয়।

চষিপোকা—মেটে সিন্দুর লাগাইলে চষি পোকা সারে।

চোকউঠা—রসত, ঘৃতকুমারীর রস, ২।৩ রতি আফিম একত্রে মিলাইয়া চক্ষুর চারি দিকে প্রলেপ দিলে ৩।৪ দিনে চোক উঠা আরোগ্য হয়।

চোঁয়া ঢেকুর—মিছরির জলে ৫।৬টা গোলমরিচের গুঁড়া দিয়া পান করিলে ভাল হয়; অথবা লেবুর রসে সৈন্ধব লবণ দিয়া খাইলেও হয়।

টাকপড়া—প্রথমে ডুমুর পাতা দিয়া ঘষিয়া জবা ফুলের কলি ঘসিয়া দিলে ভাল হয়; কেশুত্তে, হীরাকস, ছোট পেঁয়াজ ও চিনি একত্রে বাটিয়া টাক স্থলে প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

ঠুন্‌কো—পুরাতন ঘৃত, সফেদা ও আফিম একত্রে প্রলেপ দিলে নিশ্চয় ঠুন্‌কো আরোগ্য হয়।

ঠোঁট ফাটা—মাখন ও ২।১ রতি ফট্‌কিরি চূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ঠোঁট ফাটা নিবারণ হয়।

দাঁতে পোকা—বড় পানার শিকড় ও কর্প্পূর একত্রে পোকার গর্ত্তে দিলে পোকা মরিয়া যায়—গোল মরিচ চূর্ণ ও কর্প্পূর দিলে উপস্থিত যন্ত্রণা কমে—দাঁতের পোকার জন্য গাল ফুলিলে আফিম ও মুসব্বর একত্রে গরম করিয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

পাঁকুই—রাত্রে শয়ন কালে বাতাসা চূর্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে দিলে আরোগ্য হয়; কেবল তেল নেকড়া দিয়া রাখিলেও বিশেষ উপকার হয়।

পা ফাটা—আমের আটা ও মোম ফাটা স্থানে দিলে আরোগ্য হয় মোম ও ধুনা একত্রে গালাইয়া দিলে ও হয়।

পিত্ত বৃদ্ধি—ধনে, মিছরি ও মালতে ভিজান জল খাইলে সারে।

পিপাসা—নারিকেল জলে ধনে ও মৌরি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া পরে ঐ জল ছাঁকিয়া পান করিলে উৎকট পিপাসার শান্তি হয়।

পেট জ্বালা—ধনে, আমলা ও চিরতা একত্রে ভিজাইয়া ঐ জলে কিছু চিনি দিয়া খাইলে পেট জ্বালা উপশম হয়।

পেট ফাঁপা—সোরা গুলিয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিলে পেট ফাঁপা বন্ধ হয় ও বায়ু নিঃসরণ হইয়া পেট ফাঁপা কমে; সোরা, আমলা, নিশাদল ও কৃষ্ণ তিল বাটিয়া ঐরূপ প্রলেপ দিলেও হয়।

পেটব্যথা—হরিতকী, বহেড়া, আমলকী ও লবঙ্গ প্রত্যেকে সমান জলে ভিজাইয়া রাখিবেন; পরে ছাঁকিয়া লইয়া একটু কর্পূর ও ৫।৭ ফোঁটা চুণের জল মিশাইয়া সেবন করিলে পেটব্যথা কমিয়া যায়।

বুক জ্বালা—৵০ আনা সোডা জলের সহিত খাইলে বুক জ্বালা সারে।

বুকে ব্যথা—যজ্ঞডুমুরের আটা লাগাইলে বুকের ব্যথা ভাল হয়; জায়ফল ও বেলের শিকড়ের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলে বুকের ব্যথা আরোগ্য হয়।

বোলতা কাঁমড়ান—কাল কচুর আটা ঐ স্থানে দিলে আরোগ্য হয়। তারপিন তৈল কিম্বা কেরোসিন দিয়া মর্দ্দন করিলে জ্বালা শান্তি হয়।

মাথা ধরা—পিঁপুল ও শ্বেত-অপরাজিতার মূল মনসা পাতার রসে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে মাথা ধরা ছাড়ে।

মুখের ঘা— ভেড়ার দুগ্ধ লাগাইলে দুই তিন দিনে আরোগ্য হয়, জাঁতিপাতা খয়ের, সোহাগার খৈ একত্রে ঘৃতের সহিত পাক করিয়া ঐ ঘৃত মুখে লাগাইলে ভাল হয়।

মুত্ররোগ— নিলবরি সুরা স্থল পদ্মের পাতার রসে বাটিয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়।

মেচেতা—রক্ত চন্দন, বটের কুঁড়ী ও ঘৃতে ভাজা মসূর দাল দুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিলে মেচেতা আরোগ্য হয়।

আজকালকার কালে বৌ-ঝিয়েরা এই পরম কল্যাণকর ঔষধাবলীর কথা জানেন না বলিলেই চলে। কোন ঔষধ তাঁহারা আদৌ প্রস্তুত করিতে জানেন না, অনেকে নাম পর্য্যন্তও জানেন না।

বড় এলাইচের খোসা, রাঁধুনি, লবঙ্গ, খৈ, কালমেঘ, সমুদয় সমান ভাগ একত্রে জল দিয়া খুব মিহি করিয়া বাটিয়া বটী করুন বা নিমকি গজার মত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবেন। সপ্তাহে দুই দিন স্তন দুগ্ধের সহিত অল্প করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইলে তাহাদের শরীর ভাল থাকে ও যকৃত দোষ হয় না।

শ্রীজনরঞ্জন সেন, কবিরাজ।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

কাঁটাশূন্য মনসা—ইতিপূর্ব্বে কাঁটাশূন্য মনসা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। আমেরিকাতে ইহার চাষের পরীক্ষা হইতেছিল; এক্ষণে বঙ্গদেশে কটক, পুরী, চাইবাসা, সাবর এবং রাঁচি কৃষিক্ষেত্রে কাঁটাশূন্য মনসা চাষের পরীক্ষা হইয়াছে। মনসা দুই জাতীয়। এক জাতীয় মনসার ফল হয়, অন্য জাতীয় মনসার ফল পরিপুষ্ট হয় না। সাত প্রকার ফলশূন্য এবং চারিপ্রকার ফলপ্রসূ মনসা বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। পচা, হাজা বাদ সর্ব্বসমেত ৩৯টি গাছ লইয়া পরীক্ষা হয়। উল্লিখিত ক্ষেত্র সমূহে সেইগুলি পরীক্ষার জন্য বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল,—

কটক	...	...	...	...	৮
পুরী	...	...	...	...	৫
চাইবাসা	...	...	...	...	১০
সাবর	...	...	...	...	৮
রাঁচি	...	...	...	...	৮

যে গুলির ফল পরিপুষ্ট হয় না, সেই জাতীয় মনসা গুলি এখানে বেশ ভাল অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল এবং মাটিতে বসাইবার পর তাহাদের শিকড় গজাইয়া শীঘ্র মাটিতে ধরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু যে গুলি ফলপ্রসূ তাহার একটি গাছও বাঁচে নাই।

রাঁচি ক্ষেত্রের ডগলাস্ সাহেব ১৯০৯ সালের ৭ই অক্টোবর গাছগুলি পাইয়া সবগুলি জমিতে বসাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটা মরিয়া যায়। প্রত্যেক দিবস বৈকালে সেগুলিতে জল দেওয়া হইত। ১৫ দিনের মধ্যে গাছগুলির প্রত্যেক চোক হইতে ছোট ছোট কলা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন তাহাতে চুলের মত কাঁটা দেখা গেল। শীতকালে মার্চ্চমাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদের বাড় বৃদ্ধি স্থগিত ছিল। গ্রীষ্মারম্ভে গাছগুলি ক্ষিপ্রগতিতে বাড়িতে লাগিল এবং এই সময় তাহাদের গাত্রে কোন প্রকার কাঁটার চিহ্ন দেখা যায় নাই; তবে প্রত্যেক গ্রন্থিতে একরূপ কণ্টকবৎ অংশ বাহির হইল। সেগুলি কিন্তু কণ্টক নহে, অতিশয় নরম এবং বোধ হয় পৌষ্পিক পত্রের রূপান্তর মাত্র। গাছগুলি এখন বড় হইয়াছে এবং এই সকল গাছ হইতে শাখা প্রশাখার টুকরা কাটিয়া কলম করিয়া লইলে নূতন গাছ তৈয়ারি হইতে পারিবে।

১৯০৭ সালে কালিফর্ণিয়া হইতে কতকগুলি কাঁটাশূন্য মনসা গাছ আনান হয়। সেইগুলি সাবর ক্ষেত্রে পতিত জমিতে রোপিত হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে গাছগুলি রোপিত হইয়া ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে ২ ফিট পর্য্যন্ত বড় হইয়াছিল। গাছের গায়ে চোক হইতে যে সকল কলা বাহির হইয়াছিল সে গুলির পরিমাণ ৪॥০ ইঞ্চ এবং ৮ টি কলার ওজন ২ সের ৯ ছটাক। ১৯০৭ সালে রোপিত ১২টা গাছ হইতে ২ বৎসরে ৫৪টা শাখা কর্ত্তিত করা হইয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, দুই বৎসরে প্রায় আঠার সের গবাদির খাদ্য মিলিল। সুতরাং এখানে মনসার চাষ গবাদির খাদ্য হিসাবে খুব আশাপ্রদ নহে।

রাঁচিতেই ইহার পরীক্ষা কথঞ্চিৎ সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কটকে ও সাবরে ফল কিছুতেই আশানুরূপ নহে। অন্যত্র, সকল স্থানেই ইহার গাছ মরিয়া গিয়াছে। অনুমান এই যে, এই গাছ বর্ষাকালে আনীত হইয়াছিল বলিয়া এ দশা প্রাপ্ত হইল। ভবিষ্যতে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফেব্রুয়ারি মাসে মনসা গাছ আনীত হইবে।

কাসাভা—কাসাভা বা শিমুলআলু চাষের উপর অনেকের ঝোঁক পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে মতামত জানিবার জন্য অনেকে আমাদিগকে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা অদ্যাবধি কাসাভা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছুই বলিতে পারি নাই। গভর্ণমেণ্ট বিবরণী পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, এই খন্দ অত্যন্ত অনাবৃষ্টিসহ এবং ইহার ফলনও খুব বেশী এবং ইহা অসময়ে ও অন্নকষ্টের দিনে মনুষ্য গবাদির খাদ্য যোগাইতে পারে। আমরা আমাদের গোবিন্দপুর বাগানের ক্ষেতের ধারে ধারে যে কাসাভা বা শিমুল-আলু চাষ করিয়াছিলাম তাহা হইতে কোন স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই; বস্তুতঃ আমরা কাসাভা সম্বন্ধে এতাবৎকাল অন্ধ বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিয়া আসিতেছি।

এক্ষণে ১৯০৯।১০ সালের কৃষি বিষয়ক উন্নতি সম্বন্ধীয় বিবরণী হইতে জানিতে পারিতেছি যে, শিমুল আলুর চাষ অধিকাংশ প্রদেশেই আশানুযায়ী ফলপ্রদ হয় নাই। এই খন্দ যে অত্যধিক অনাবৃষ্টিসহ বা ইহা যে দুর্ভিক্ষ কালে একটা প্রধান অবলম্বনীয় খাদ্য তাহা বলিয়া বোধ হয় না। বোম্বাই প্রদেশের সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে ইহার পরীক্ষা হইয়াছিল—কোথাও ইহা ভাল রকম জন্মে নাই। উৎপন্ন মূলের পরিমাণ এত অল্প যে ইহার চাষে কোন লাভ হওয়া সম্ভব নহে। পঞ্জাবে চারিটি প্রধান কেন্দ্রে—অম্বালা, গুরুগ্রাম জেলার ধারেয়া, পাঠানকোট এবং লায়ালপুরে কাসাভা চাষের বিবিধ প্রকার পরীক্ষা করা হইয়াছে। এখানে উইয়ের উপদ্রবে কাসাভা চাষ হওয়া সুকঠিন। ডালের কটিং হইতে গাছ জন্মায় কিন্তু ইহার মূল উইয়ে নষ্ট করে। পঞ্জাবে শুক্না জায়গায় এই গাছ

মরিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। যেখানে জল সেচনের বন্দোবস্ত হইয়াছিল তথাও ফলন খুব অধিক নহে—একর প্রতি ১০,০০০ পাউণ্ড—কমবেশী ৫,০০০ সের মাত্র। বঙ্গদেশে কোথাও স্বতন্ত্র ভাবে ক্ষেতে কাসাভার চাষ হওয়ার বড় অসুবিধা আছে। গাছগুলি বড় ভঙ্গপ্রবণ; একটু প্রবল বাতাসে ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

সয়বীন—ইহা এক প্রকার বরবটি জাতীয় সিম—গবাদি ও মানুষ সকলেরই খাদ্য। ইহার দাল করিয়া খাইতে খুব উপাদেয়। এসিয়া মহাদেশই ইহার জন্মভূমি; এক্ষণে যবদ্বীপ, মাঞ্চুরীয়া ও জাপানে ইহার খুব আদর হইয়াছে ও প্রচুর চাষ হইতেছে। সিম্বী জাতীয় উদ্ভিদ হিসাবে ইহার চাষে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়। গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ইহার চাষে উপকারিতা আছে। বোম্বাই প্রদেশে যে জমিতে ভুট্টার আবাদ হয়, সেই সব জমিতে দুইটী ভুট্টা শ্রেণীর মাঝে মাঝে এবং বঙ্গদেশের চা-বাগান সমূহে 'চা' গাছের ভিতর যদি এই সিমের চাষ করা যায়, তাহা হইলে এককালে দুইটা ফসল পাওয়া যায়। ইহাতে জমির উর্ব্বরতা কমিয়া না গিয়া বরং বৃদ্ধি হয়। এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বাংশে ও চীনদেশে খাদ্যশস্য হিসাবে ইহার আদর দিন দিন বাড়িতেছে।

সাধারণ শস্য সংবাদ—আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে। আমন ধান ও হৈমন্তিক ফসলের জন্য জমিতে চাষ দেওয়া সুচারুরূপে চলিতেছে। শারদীয় খন্দের জন্য অনেক জমি তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। যুক্তরাজ্যে ইক্ষুর অবস্থা ভাল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলায় রৌদ্রাভাবে 'চা' আবাদের ক্ষতি হইতেছে। পঞ্জাবে ক্ষেত্রস্থ ফসল ভালরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। মুলতানে তুলা এবং জোয়ার ক্ষেতে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছে এবং ক্ষতি করিতেছে। বোম্বাই বিভাগেও সুবৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। মান্দ্রাজেও ক্ষেত্রস্থ ফসলের ক্রমশঃ ভাল অবস্থাই দেখা যাইতেছে। খাদ্য শস্যের মূল্য সমগ্র ভারতে প্রায় সমভাবেই আছে।



আষাঢ়, ১৩১৮ সাল।

কাশ্মীর-কৃষি।

কাশ্মীর সম্বন্ধে অনেকের অতিরঞ্জিত ধারণা রহিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে ভূস্বর্গ বলিয়া থাকেন। কোন কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ প্রাকৃতিক শোভায় কাশ্মীরের কতকগুলি স্থান জগতে অদ্বিতীয়। কিন্তু কতিপয় ইংরাজ গ্রন্থকারের পুস্তকে কাশ্মীর দেশের যে সমুদয় চিত্রিত বর্ণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত কাশ্মীরে তাহাদের অধিকাংশেরই তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সমুদয় চিত্র যে কতকটা কল্পনাসম্ভূত তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃত কাশ্মীর দৃশ্যে একটা সঙ্কীর্ণতার ভাব নাই ; গাছ ঘর অথবা প্রদর্শনী ক্ষেত্রে সজ্জিত গাছ পালার মত একটা কৃত্রিম পারিপাট্য নাই ইহা—বিশাল, বিস্তৃত, দিগন্তব্যাপী ; অপরাপর সীমান্ত প্রদেশের ন্যায় ইহাতে নগ্নতার চিহ্ন নাই ; এখানে প্রকৃতি দেবী নানাবর্ণে বিভূষিত।

যাহা হউক, এক্ষণে কাশ্মীর দেশের বিবরণ সংক্ষেপতঃ আলোচনা করা যাউক। কাশ্মীরের পূরাবৃত্ত ও ইতিবৃত্ত প্রদান করা এখানে অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কাশ্মীর অনেক বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন দেখিয়াছে। হিন্দুর পর মুসলমান, মুসলমানের পর শিখ এবং শিখের পর ইংরাজ কাশ্মীর অধিকার করিয়াছে। কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজা ডোগরা বংশীয়। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজা গোলাপ সিংহ প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যে ইংরাজের নিকট হইতে কাশ্মীর কিনিয়া লন। পুরাতন হিন্দু রাজ্যের চিহ্ন স্বরূপ এখনও মার্ত্তণ্ডের বিশাল মন্দির, রামপুরের মন্দির ও আরও কয়েকটি ছোটখাট মন্দির কঙ্কালসার হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাণ্ডবদিগের নামের সহিত কাশ্মীরের অনেক স্থানের নাম ঘন সংশ্লিষ্ট। ইহার মূলে যাহাই থাকুক, ইহা স্থির নিশ্চয় যে পুরাতন কাশ্মীর পাণ্ডুপুত্রগণের পরাক্রম ও শৌর্য্যবীর্য্যের বিষয় অনবগত ছিল না।

কাশ্মীর প্রবেশ করিবার দুইটি রাস্তা আছে—তাহার মধ্যে মোগল সম্রাটদিগের রাস্তা একটি। ইহা কাশ্মীরের দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়া পীরপঞ্জল পাহাড় অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরকে পঞ্জাবের সহিত যুক্ত করিয়াছে। এই রাস্তা এখন অল্প লোকেই ব্যবহার করিয়া থাকে এবং অনেক স্থানে ইহা দুরারোহ। অপর রাস্তাটি রাওলপিণ্ডি হইতে আরম্ভ করিয়া কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর পর্য্যন্ত চলিয়াছে। ইহা ১৮ ফুট বিস্তৃত এবং ইহাতে দুইটি দুইটি টোঙ্গা, অর্থাৎ দ্বি-অশ্ব পরিচালিত বিশেষ প্রকারের যান, চলিতে পারে। রাওলপিণ্ডি যে নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলের একটি সুবৃহৎ ষ্টেশন তাহা অনেকেই জানেন। সাধারণ লোকে ইহাকে পিণ্ডি বলিয়া থাকে। কাশ্মীর যাইতে হইলে প্রথমতঃ পিণ্ডি হইতে ৩৯ মাইল ব্যবধানে মরী পাহাড়ে যাইতে হয় এবং পুনরায় মরী হইতে (২০ মাইল দুরে) কোহালা নামক স্থানে ইংরাজ রাজ্য ছাড়িয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে হয়। কোহালা একটি নদীতীরবর্ত্তী স্থান; এখানে যে লৌহসেতু আছে, তাহার পর পারেই কাশ্মীর রাজ্য। কোহালা হইতে শ্রীনগর ১৩২ মাইল। ইহার মধ্যে ৯৭ মাইল রাস্তা (অর্থাৎ কোহালা হইতে বারমূলা) ঝিলম (পুরাতন বিতস্তা) নদীর পার্শ্বদেশ দিয়া গিয়াছে। বাকি ৩৫ মাইল রাস্তা অনেকটা সমতল ভূমির উপর দিয়া ও জনপদের মধ্য দিয়া শ্রীনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঝিলমই কাশ্মীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নদী। ইহা কাশ্মীরের দক্ষিণে ভেরীনাগ নামক পার্ব্বত্য অঞ্চলের ঝরণা সমূহের ক্রোড়ে জন্মলাভ করিয়া কাশ্মীর, সীমান্তপ্রদেশ ও পঞ্চনদ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদে মিলিত হইয়াছে। কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যে ১২২ মাইল অর্থাৎ ভেরীনাগ হইতে বারমূলার নিম্নে কিয়দ্দূরে কিচ্ছমা নামক একটি স্থান পর্য্যন্ত ঝিলম বাহনোপযোগী। তাহার পরেই ইহার বারিরাশি উন্নতাবনত শৈলরাজির ক্রোড় অতিক্রম করিয়া ভীষণবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থান হইতে কোন প্রকার জলযান চলা অসম্ভব। কিচ্ছমা হইতে অনতিদূরে মোহরা নামক স্থানে এই উদ্দাম জল প্রবাহ হইতে তাড়িৎ শক্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে ও তাড়িৎও সংগৃহীত হইতেছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত রাজপ্রাসাদ আলোকিত করা ব্যতীত এই তাড়িত শক্তি কোন কল কারখানায় নিয়োগ করা হয় নাই।

কাশ্মীরের চারিদিকেই বিশাল পর্ব্বত শ্রেণী। উত্তরে নাঙ্গা পর্ব্বত ২৬,১৮২ ফুট উচ্চ, দক্ষিণে গোয়াসুব্রারী (১৭,৮০০ফুঃ) ও অনন্তনাথ (১৭২২১ ফুঃ); শেষোক্তটী একটী বিখ্যাত তীর্থ। পূর্ব্বদিকে হরমুখ পর্ব্বত (১৬ ৯০৩ ফুঃ) ও পশ্চিম দিকে পঞ্চনদ ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পর্ব্বতমালা। যাহাকে প্রকৃত কাশ্মীর অথবা কাশ্মীর উপত্যকা বলে, তাহা প্রায় ৮৪ মাইল লম্বা ও ২০-২৫ মাইল চওড়া। সমস্ত কাশ্মীরের বর্গফল ৮০,৯০০ বর্গ মাইল। উত্তর হইতে দক্ষিণে ৩১০ মাইল এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ৪০০ মাইল। জম্বু, কাশ্মীর ও কয়েকটি সীমান্ত জেলা লইয়া

কাশ্মীর রাজ্য ; ইহাদের বর্গফল যথাক্রমে ৫২২৩, ৭১২২ ও ৪৪৩ বর্গ মাইল হইবে। তিনটি সমান্তরাল পর্ব্বতমালা কাশ্মীর দেশের উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার সর্ব্ব উত্তরে কারাকোরাম পাহাড় ; কারাকোরাম পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ,—মাউণ্ট গড্‌উইন অষ্টেন। ইহাই পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। কারাকোরামের নিম্নে দুইটি সমান্তরাল পর্ব্বত শ্রেণী উত্তর পশ্চিমে ধাবিত হইয়াছে। এইগুলি হিমালয়ের অংশ।

সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশেই দেশের বর্গফলের অনুপাতে প্রকৃত পক্ষে চাষের জমি অনেক কম। কাশ্মীরেও তদ্রূপ। ঝিলমের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অত্যুন্নত তটে পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া স্তরে স্তরে জমি প্রস্তুত করা হয়। তাহাতেই চাষ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সিন্ধু ও গঙ্গার অন্তবর্ত্তী বিশাল সমতল ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হইলেই এই প্রকার স্তর চাষ (Terrace Cultivation) অচিরেই নয়ন পথে পতিত হয়। পঞ্চনদের বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র সমূহের পৃষ্ঠ ওয়াজিরাবাদ ষ্টেসন ছাড়াইলেই ঈষৎ আন্দোলিত বলিয়া বোধ হয়। রাওলপিণ্ডির ২।৪ ষ্টেসন পূর্ব্ব হইতেই ভূপৃষ্ঠের এই আন্দোলন বিশেষ রূপে দৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতেই ভূপৃষ্ঠ অসমতল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাওলপিণ্ডি ছাড়াইয়া মরী পাহাড়ের দিকে যাইতে যাইতে কতকগুলি সুবিস্তৃত ময়দান দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক সেগুলি সমতল নহে। মরী পাহাড় পৌঁছিবার অনেক পূর্ব্ব হইলেই স্তর চাষ নয়ন গোচর হয়। টঙ্গা রাস্তার দিকে ঝিলমের তীরে এরূপ চাষ অপেক্ষাকৃত অল্প, অন্য তটেই অধিক। এই সমুদয় স্থানের গৃহগুলির একটুকু বিশেষত্ব আছে। গৃহগুলি স্তর গাত্রেই নির্ম্মিত। দেওয়াল কাষ্ঠের, কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা, অথবা মৃত্তিকা এবং টুকরা পাথরের তৈয়ারী। দরজা প্রভৃতি স্তরের উন্মুক্ত দিকে অবস্থিত এবং পশ্চাতের দেওয়াল একেবারে পর্ব্বত গাত্রে সংলগ্ন। ছাতের উপর মাটি ফেলিয়া পিটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা ইহার উপরবর্ত্তী স্তরের সহিত সমক্ষেত্রে অবস্থিত। প্রধানতঃ ইহার কারণ এই যে, বৃষ্টির জল উপরবর্ত্তী স্তর হইতে নামিয়া আসিয়া ঘরের প্রাচীরে আঘাত করিতে পারে না। ছাত বহিয়া ঘরের সম্মুখে পড়িয়া নিম্নবর্ত্তী স্তরে চলিয়া যায়। গৃহগুলি প্রায়ই অত্যন্ত নিম্ন এবং জানালার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এইরূপে তৈয়ারী করার অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে দারুণ শীতের সময় তুষার-কণা-বাহী প্রচণ্ড বাতাস ঘরের মধ্যে অবাধে প্রবাহিত হইয়া পুরবাসী গণকে আকুলিত করিয়া তুলিতে পারে না। অবশ্য এই প্রকারের গৃহ মফঃস্বলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সহরের মধ্যে গৃহ অন্য ভাবে প্রস্তুত।

কোহালা ছাড়াইয়া কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিলে প্রথমতঃ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বড় বেশী চাষ আবাদ রাস্তার ধারে দৃষ্ট হয় না। দোমেল পর্য্যন্ত প্রায় এইরূপ।

দোমেলেই কৃষ্ণগঙ্গা আসিয়া ঝিলমের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। দোমেলের পর হইতে ক্রমশঃ চাষ আবাদ বেশী হইয়াছে এবং যেখানে টঙ্গা রাস্তা নদী তট হইতে সরিয়া গিয়াছে, সেই খানেই প্রায় ধান ভূট্টা প্রভৃতির চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কোহালা হইতে বারমূলা পর্য্যন্ত টঙ্গা রাস্তা ঝিলমের তট দিয়া গিয়াছে। রাস্তার একদিকে গগনস্পর্শী হিমালয়ের পর্ব্বত রাজি; অন্য দিকে ২০০ হইতে ৫০০।৬০০ শত ফুট নিম্নে ঝিলম নদী বিষম বেগে প্রবাহিত হইতেছে। অনভ্যস্ত পথিকের অনেক স্থানে ইহা দেখিয়া হৃদকম্প উপস্থিত হয়। এই সমুদয় স্থানের স্বাভাবিক অবস্থা এরূপ নহে যে, অধিক চাষ বাস হইতে পারে। কিন্তু বারমূলা হইতে টঙ্গা রাস্তা উপত্যকা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। ঐ স্থানে রাস্তার উভয়পার্শ্বে ধান, মকাই, লঙ্কা, কড়মশাক, মোরগফুল প্রভৃতির চাষ পথিকের নয়নগোচর হইয়া থাকে। যাঁহারা সখের জন্য কাশ্মীর পর্য্যটন করিতে যান তাঁহারা ইহার অধিক কাশ্মীরের কৃষি দেখিতে পান না। তবে গুলমার্গ নামক পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যাবাসে গমন করিলে ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক চাষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদিগকে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কাশ্মীর যাইতে হইয়াছিল। এই কার্য্য জঙ্গলসংক্রান্ত। সুতরাং নিকটবর্ত্তী টঙ্গা রাস্তা হইতে অধিকাংশ সময়েই ৫০।৬০ মাইল দূরে এবং সময়ে সময়ে এমন কি দেড়শত দুইশত মাইল দূরেও যাইতে হইত। সুতরাং কাশ্মীরবাসীগণের কৃষিপ্রণালী দেখিবার সুযোগ যথেষ্টই হইয়াছিল। উপত্যকার মধ্যে অনেক স্থানেই সামান্য আন্দোলিত ক্ষেত্র আছে। অপরাপর ক্ষেত্রগুলি পর্ব্বত হইতে দূরে কিম্বা পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। শেষোক্ত প্রকারের ক্ষেত্রকে খাড়ওয়া বলে। সমতল ক্ষেত্রের ও খাড়ওয়ার মৃত্তিকার মধ্যে গঠন প্রণালীর তফাৎ আছে। পর্ব্বত হইতে দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রের জমি অপেক্ষা খাড়ওয়ার জমি সময়ে সময়ে উৎকৃষ্টতর বলিয়া বোধহয়। খাড়ওয়ার জমির গঠন অনেকটা আলগা; সমতলের জমি তদপেক্ষা কঠিন। ইহাদিগকে যথাক্রমে বেলে দোয়াঁশ ও কাদা দোয়াঁশ বলিতে পারা যায়। আমরা বিশ্লেষণ দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে কতিপয় স্থানের জমি সমধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন যুক্ত। এই সমুদয় প্রায় নিবিড় অরণ্যের নিম্নভাগে অবস্থিত।

কাশ্মীরে নিম্নলিখিত ফসল গুলি উৎপাদিত হইয়া থাকে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রত্যেক ফসলের নামের পার্শ্বে উহার কাশ্মীরী প্রতিভাষা ও আন্দাজ যে পরিমাণ জমিতে উৎপাদিত হইয়া থাকে তাহার বর্গ ফল প্রদত্ত হইল। অঙ্ক গুলির অধিকাংশই Lawrence's Valley of Kashmir হইতে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের অঙ্কের সহিত কিছু পার্থক্য

হইতে পারে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য যখন কাশ্মীরের সঠিক কৃষি বিবরণী লেখা নহে, তখন এই অঙ্ক সমুদয় হইতেই কাশ্মীর কৃষির অনেকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

১।	ধান	...	ধান	...	...	১৮৯,৩৫২
২।	ভুট্টা	...	মকাই	...	...	১৩০ ৬৪৪
৩।	কার্পাস	...	কাপাস্	...	...	১৩০,৪৮৯
৪।	জাব্রাণ	...	কাঙ্গ	...	...	
৫।	তামাক	...	তামাক	...	...	৩৮৬
৬।	*হপ্	...	হাপিস	...	...	
৭।	কাঙন	...	সোল্	...	...	
৮।	চিনা	...	পিং	...	...	
৯।	† মোরগ ফুল	...	গণ্হার্	...	...	
১০।	বক্‌হুইট	...	ক্রুম্বা	...	...	
১১।	মুগ	...	মুঙ্গ			
১২।	মাষ কলাই	...	মা	...	...	৪৩,৮৭০
১৩।	মাঠ কলাই	...	মোঠি			
১৪।	ফরাশ সিম	...	রাজমা	...	...	
১৫।	তিল	...	তিল	...	...	৩,৭২৭
১৬।	গোধূম	...	কণক	...	...	২৯,৮৪০
১৭।	যব	...	উইস্কা			
				...	...	৩০,১০৩
১৮।	‡ তিব্বত যব	...	গ্রিম্			
১৯।	পোস্ত (আফিং)		আফিং	...	...	৫১
২০।	সরিষা	...	তিলগোগ্লু	...	...	
২১।	ঐ অন্যপ্রকার	...	তরজ্ তারচপ্	...	...	
২২।	ঐ　ঐ	...	সুন্দিজি	...	...	
২৩।	তিসি	...	আলিস্	...	...	২১,৭৮৫
২৪।	মটর	...	কাইড়্	...	...	
২৫।	বাকলা সিম	...	বাগ্লা	...	...	
২৬।	যোয়াণ	...	আজোয়েণ্	...	...	

উক্ত কয়েকটি ফসলই কাশ্মীরের প্রধান ফসল। অনেকে কাশ্মীর চাউলের নাম শুনিয়া হয়তঃ মনে করিবেন যে কাশ্মীরে অত্যুৎকৃষ্ট জাতীয় ধান্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই সমুদয় পোলাওয়ের চাউল হিমালয়ের নিম্ন দেশস্থ দেরাদুন, পিলিভিত্, নেপাল তরাই প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়া থাকে।

* হপ্ একপ্রকার সিদ্ধি জাতীয় গাছ। ইহার কাণ্ড লতানিয়া; ইহা হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়। † গন্‌হার মোরগ-ফুল জাতীয় গাছ। প্রায় ৩/৩॥ ফুট লম্বা হয়। শ্বেত ও রক্ত বর্ণভেদে ইহার দুই জাতি। ইহার বীজ দরিদ্র কৃষাণগণ চিনা প্রভৃতির ন্যায় সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে। ফুল, তরকারি প্রভৃতি রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ‡ তিব্বতের যব ছোট জাতীয়, কিন্তু বিশেষ তুষার পাত সহ।

কাশ্মীরের চাউল অত্যন্ত মোটা। যাঁহারা কলিকাতায় বালাম চাউলে অভ্যস্ত তাঁহাদিগের পক্ষে একপ্রকার অখাদ্য বলিলেও হয়। এখানে বাঁশমতি নামে টাকায় চারিসের দরে যে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট চাউল বিক্রয় হয় তাহা পঞ্জাব হইতে আমদানি হয়। উৎকর্ষের হিসাবে এদেশের কোন ফসলেরই প্রশংসা করিতে পারা যায় না। তথাপি বোধ হয় পুরাকালে এতদ্দেশে উৎকৃষ্ট জাতীয় ফসল উৎপাদিত হইত। ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল রাজকর্ম্মচারীগণ ও জমিদারগণের অত্যাচারে সে সমুদয়ের চাষ কৃষকগণ ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কাশ্মীরী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে যে খাঁপুরের মুগ, লালীপুরের ঘৃত, রামপুরের তরী তরকারী, হিরপুরের দুধ, নিপুরের চাউল, নন্দপুরের ছাগ এবং রায়পুরের আঙ্গুর—ইহাদের তুলনা কুত্রাপি দেখা যায় না। কিন্তু এই সমুদয় জায়গায় উক্ত দ্রব্য সমূহ পাওয়া সুকঠিন কিম্বা পাওয়া গেলেও তৎসমুদয় উৎকৃষ্টতা অপেক্ষা অপকৃষ্টতার জন্য অধিকতর উল্লেখ যোগ্য।

ফসলের অপকর্ষতার অন্যতম কারণ এই এখানে বীজ নির্ব্বাচণের প্রথা অল্পই পরিচালিত। কর্ষণও অগভীর। হলবাহী গবাদি বঙ্গদেশের ন্যায় অনাহারে দুর্ব্বল ও পরিশ্রমে ক্লান্ত। ইহা ব্যতীত কাশ্মীরী চাষী অলস্ ও তাহাদের কার্য্য শৃঙ্খলা বিহীন। কোন গ্রামের পার্শ্বস্থ রাস্তায় প্রভাতে উঠিয়াই দেখিতে পাওয়া যায় যে অত্যন্ত মলিন বস্ত্র পরিহিতা স্ত্রীলোকগণ পরিধেয় কাপড়ের এক অংশে ভাত বাঁধিয়া লইয়া মাথায় ঝুড়ি করিয়া ক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছে। ইহারাই ধান ছিটান, জমি নিড়ান প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে। অগভীর মৃত্তিকায় অবহেলায় ধান্য বীজ ছড়াইয়া এবং তাহাতে সামান্য মাত্র সার প্রদান করিয়া যেরূপ ফসল উৎপাদিত হইতে পারে, তাহাই হইয়া থাকে। তথাপি মৃত্তিকা সাধারণতঃ উর্ব্বর বলিয়া পরিমাণে ফসল নিতান্ত কম হয় না। কিন্তু উৎকর্ষতায় এই সমুদয় বঙ্গদেশীয় তৃতীয় শ্রেণীর ফসল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

জলসেচন সম্বন্ধে কাশ্মীরের অবস্থা প্রায় আমাদের দেশের ন্যায়। খাল ২।৪ স্থানে আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পুকুর একবারেই নাই। ঝরণা (ইহাকে এখানে চস্‌মা বলে) হইতে যে জল আসিয়া স্থানে স্থানে জমিয়া থাকে, তাহা হইতেই অনেক ক্ষেতে জল সেচন করা হইয়া থাকে। বর্ষার সময় যে পরিমাণ সাধারণ বৃষ্টিপাত হয় তাহা যদি সংগৃহীত হইত তবে জলাভাব হইত না। কিন্তু অনেক স্থলে আমরা দেখিয়াছি যে ফসল সমূহ জলাভাবে খর্ব্বাকৃতি হইয়াছে। অবশ্য পঞ্জাব হইতে ক্রমশঃ উত্তর দিকে শুষ্ক চাষেরই (Dry cultivation) চলন অধিক। কিন্তু দোয়াঁস জমিতেই শুষ্ক চাষে সুবিধা হয়। উপরের মৃত্তিকা বেশ ভাঙ্গিয়া যায় এবং নিম্নের মাটির রস সূর্য্যোত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কাশ্মীরের নিম্নতল মাটি প্রায় কাদা দোয়াঁস। সুতরাং ডেলা বাঁধিয়া যায় এবং রস সংরক্ষণ করিতে পারে না।

পশু খাদ্য কাশ্মীরে অনেটা সুলভ। উইলো willow পাতা ও ডালই অত্যধিক পরিমাণে পশুখাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। কারণ ইহা সর্ব্বত্রই জন্মায়। মাঘ ফাল্গুন মাসে দারুণ শীতে ও নিহার পাতে যখন দেশ একবারে তুষারধবল হইয়া উঠে, গাছ-পালায় একটী মাত্রও পাতা থাকে না, তখন এই উইলো অথবা দেশীয় ভাষায় বেত পশুগণের জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। ইহার সহিত বিচালী

ও ভুট্টার ডাঁটা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন অপর অনেক প্রকার গাছের পাতা ও ডালও পশুখাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। চাষের সময় ধানক্ষেতের ধারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস জন্মায়। এই সমুদয় ঘাস হইতে দড়ি প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বেত পাতা ঢাকিয়া রাখা হয়। জলাশয়ে নাঁরি নামক যে চাঁচড়া জাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মে তাহা উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। স্কুড় নামক একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ও যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়ান হয়। লোকের বিশ্বাস যে ইহাতে দুগ্ধের পরিমাণ অধিক হয়। গৃহস্থের গৃহের পার্শ্বে বেত, ফ্রাষ্ট (poplar) উপরে সংরক্ষিত রজ্জু আচ্ছাদিত পশুখাদ্য একটি অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। আয়তনে এক একটি খাদ্যস্তূপ ৬ হাত চওড়া ও ১০।১২ হাত লম্বা হইবে। মৃত্তিকা হইতে প্রায় ৮।৯ হাত উচ্চে স্তূপগুলি অবস্থিত, মনে হয় যেন কোন বিশাল দেহ বিহঙ্গম স্বীয় অবয়ব অনুসারে বিশাল নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে।

শাক সব্জীর মধ্যে কাশ্মীরে নিম্ন লিখিত কয়েক প্রকার উদ্ভিদ্ উৎপাদিত হইয়া থাকে। ইহাদের সঙ্গে কাশ্মীরী নাম প্রদত্ত হইল।

বাঁধাকপি (পাতাকপি জাতীয়)			...	কড়ম শাগ
শালগম	...	...	...	গাগ্‌জি
বিলাতী কুমড়া	...	...	...	
কাঁকড়ি	...	...	...	আল্
শসা	...	...	...	লট্
টোমাটো	...	...	...	রুয়াঙ্গন
লঙ্কা	...	...	...	মৃচওয়াঙ্গন
বেগুন	...	...	...	ওয়াঙ্গন
আলু	...	...	...	আলু
অ্যাসপারেগ্যাস্	...	...	...	
এণ্ডিভ্	...	...	...	
লেটুস্	...	...	...	
গাজর	...	...	...	গাজর
পেঁয়াজ	...	...	...	প্রাণ
পালঙ্গ	...	...	...	পালক

ইহার মধ্যে কড়মের শাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাত ও কড়মের শাগ কাশ্মীরীর জাতীয় খাদ্য। প্রবাদ আছে যে, যে কাশ্মীরে যাইবে, সে কড়মের শাগ ও ভাত না খাইয়া আর ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু বাঁধাকপি বলিলে ঠিক কড়ম শাগের প্রতিকৃতি বুঝিতে পারা যায় না। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Brassica Oleracea Var caulorapa। বাঁধাকপির ন্যায় ইহার সুপুষ্ট কাণ্ড নাই। কেবল পাতা এবং তাহাও খুব বড় নহে। খাইতে যে সুস্বাদু তাহাও নহে; তবে এক শ্রীনগর ভিন্ন অপর কোন স্থানে গৃহস্থের বাটীতে কড়মের শাগকে ছাড়াইয়া উঠিবার উপায় নাই। বেগুন অতি নিকৃষ্ট জাতীয়; আমাদের দেশের কুলি বেগুনের ন্যায়। পালঙ্গ শাগ সব সময় পাওয়া যায় না। একটা সুখের বিষয় এই যে, শ্রীনগরের অনতিদূরবর্ত্তী ডাল হ্রদে বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। ঐ স্থান

হইতে শ্রীনগর অধিবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ উপাদেয় আহার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এখানে আমরা আরও দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব—এই দুইটি পানিফল ও পদ্ম এবং সালুক। এই দুইটিই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

কাশ্মীরী ভাষায় পানিফলকে সিঙ্গারা, এবং পদ্মের মূলকে পান্‌পোষ ও শালুকের মূলকে বাম্‌পোষ বলিয়া থাকে। পঞ্জাবে পদ্ম ও শালুকের মূলকে নেন্দ্রু বলে। ভারতের সর্ব্ববৃহৎ হ্রদ উলার কাশ্মীরে অবস্থিত। ইহাতে ও অন্যান্য স্থানে উৎপাদিত সিঙ্গারার জন্য কাশ্মীর দরবার প্রায় পঁয়ত্রিশ সহস্র টাকা পাইয়া থাকেন। পদ্ম ও শালুকের মূলে উক্ত রূপ কোন প্রকার আয় নাই, তবুও উহা ইতর সাধারণ ও ধনী, সকলের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। সিঙ্গারা সাধারণ লোক দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উলার হ্রদের সমস্ত সিঙ্গারা সোপর্ নামক উলার হ্রদের বন্দরে একত্রিত হয় এবং তথা হইতে নানা স্থানে চালান হয়। আমাদের পক্ষে এই সমুদয় খাদ্য নূতন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কাশ্মীরবাসীগণের পক্ষে এই সকল নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য।

সামান্য প্রবন্ধের মধ্যে কাশ্মীর কৃষি বিষয়ে সমস্ত বিষয় লিখিয়া নিঃশেষ করা অসম্ভব। তথাপি আমরা এস্থানে কাশ্মীরের ও সাধারণ পার্ব্বত্য প্রদেশের কৃষি প্রণালী সম্বন্ধে অনেকটা আভাস্ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান সভ্যজগতের নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী সমূহ এখনও এসমুদয় অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ কাশ্মীরে সেরূপ উন্নতিশালী কৃষিবিভাগ নাই। যদি তাহা থাকিত তাহা হইলে চিরউর্ব্বর কাশ্মীর উপত্যকা শস্যভারে নিপীড়িত হইয়া উঠিত। যে পরিমাণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আমাদের কৃষাণগণ ক্ষেত্রে ব্যয় করিয়া থাকে এবং বঙ্গদেশের সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিবর্গের যেরূপ কৃষি-কার্য্যের উপর লক্ষ্য পড়িয়াছে যদি কাশ্মীরে সেইরূপ অবস্থার অভ্যুদয় হইত তাহা হইলে বাস্তবিকই কাশ্মীর ভূস্বর্গে পরিণত হইত। এই সমুদয় অভাবে কাশ্মীর এখনও দরিদ্র, এখনও কৃষাণগণের অভাব অসীম ও কষ্ট জীবন নিরাশা পরিপূর্ণ।

পত্রাদি।

বিক্রয়ার্থ ফসল উৎপাদন—বিগত দুই তিন মাসের মধ্যে আমরা ব্যবসায়ার্থ চাষ বাসের পরামর্শ-দানার্থে বহু অনুরোধ পত্র পাইয়াছি। কিন্তু যতক্ষণ না জমি স্বচক্ষে দেখা যায় এবং স্থানীয় নানা প্রকার অনুসন্ধান লওয়া যায়, ততক্ষণ কোন স্থানটি চাষের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলা কঠিন। মোটের উপর এই কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, যেখানে এই রকমের কৃষিক্ষেত্র রচনা করিয়া লাভজনক হইয়াছে, তথায়ই ক্ষেত্র রচনা করা কর্ত্তব্য, এবং যে কোন স্থানেই ক্ষেত্র রচনা করা হউক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য ঃ—

১। কি সর্ত্তে জমি সংগ্রহ হইবে ?

২। যে চাষের জন্য জমি লওয়া হইতেছে জমি সেই চাষের উপযুক্ত কি না ?

৩। উত্তরের এবং প্রবল পূবে বাতাস হইতে ফসল রক্ষার কোন উপায় আছে কি না ?

৪। রেল ষ্টেসন হইতে ক্ষেত্রটি কত দূরে অবস্থিত ?
৫। নিকটে কোন ভাল হাট বাজার আছে কি না ?
৬। সেচন জলের সুবিধা আছে কি না ?
৭। জন মজুর মিলিবে কি না এবং কি হারে তাহাদের বেতন ?

গাছের নাম নিরূপণ—ইহা একপ্রকার রাস্না জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার ফুল সুন্দর এবং সুগন্ধযুক্ত। দার্জ্জিলিঙে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শাস্ত্রীয় নাম (Anectochilus) এনেকটিচিলস।

আঙ্গুর গাছে লাল মাকড়সা—গন্ধক সংযোগে সাবানের জল দ্বারা গাছের পাতাগুলি ধৌত করা সুন্দর ব্যবস্থাই হইয়াছে। তলায় গন্ধকের ধোঁয়া দিলেও মাকড়সার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে।

সার-সংগ্রহ।

এলুমিনিয়াম্।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে একটি অভিনব ধাতুর গুণ, ব্যবহার ও উপযোগিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ধাতুটি যে একটি অভিনব ব্যবসায়ের উৎকৃষ্ট উপাদান তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

আজকাল কলিকাতার বাজারে, দুই এক দোকানে, ঈষৎ নীলাভ অথচ শ্বেত বর্ণের এক প্রকার নূতন ধাতুনির্ম্মিত গেলাস, রেকাব প্রভৃতি কয়েক প্রকার সামান্য সামান্য বাসনের আমদানী দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বাসনগুলি যে ধাতুতে গঠিত তাহাকে এলুমিনিয়াম্ বলে। উহা একটি অমিশ্র ধাতু। উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অতি কম বলিয়া উহা প্রায় সকল ধাতু অপেক্ষা হাল্‌কা; উহা জল অপেক্ষা ২$\frac{১}{২}$ গুণ মাত্র ভারি, সুতরাং উহা যে অত্যন্ত হাল্‌কা ধাতু তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। এতাধিক হাল্‌কা বিবেচনায় উহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কেহ যেন সন্দিহান না হয়েন। উহার আর একটি গুণ এই যে অম্লতার সংস্পর্শে উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

এলুমিনিয়াম্ ধাতু দ্বারা আমাদের দেশের গৃহস্থালী সংক্রান্ত ব্যবহারোপযোগী বহুবিধ সুন্দর সুন্দর বাসন প্রস্তুত হইতে পারে, এবং সেই সকল বাসন বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা।

বঙ্গদেশে এলুমিনিয়াম্ ধাতুর কারখানা দেখা যায় না। যদি কোন উদ্যোগী ব্যক্তি, আবশ্যকীয় মূলধন সংগ্রহ পূর্ব্বক যন্ত্রের সাহায্যে, বাঙ্গলা দেশীয় গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী এলুমিনিয়ামের বাসন প্রস্তুত করতঃ ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তিনি যে প্রভূত লাভবান হইতে পারেন তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী বাসন ব্যতীত উহা দ্বারা এমন অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, যাহা মিউনিসিপ্যালিটি, ডাক্তারখানা ও সৈনিকদলের মধ্যে বহুল

পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে এলুমিনিয়াম্ ধাতুর মূল্য এত কম যে গরীব লোকেও তন্নির্ম্মিত বাসন সহজে ক্রয় করিতে পারে।

মান্দ্রাজ নগরে এলুমিনিয়াম্ ধাতুদ্বারা বাসন প্রস্তুতের একটি কারখানা আছে। উক্ত কারখানা ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথমে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মান্দ্রাজ শিল্প বিদ্যালয়ের একাংশরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। পরে উহা ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম্ কোম্পানির হস্তে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কোম্পানী অল্প সময়ের মধ্যেই কারবারের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। মান্দ্রাজে ক্রমেই এলুমিনিয়াম্ গঠিত বাসনের আদর বাড়িতেছে। এজন্য বৎসর বৎসর অধিকতর মালের কাট্‌তি হইতেছে।

মান্দ্রাজের কারখানার এলুমিনিয়াম্ ধাতু নির্ম্মিত বাসনের কাট্‌তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে হারে উহার কাট্‌তি বাড়িতেছে তাহাতে সহজেই অনুমান হয় যে, অল্পকাল মধ্যেই উহা একটি প্রধান ব্যবসায় মধ্যে গণ্য হইবে।

কয়েক বৎসরের মধ্যে এক মান্দ্রাজ শিল্প বিদ্যালয় হইতেই প্রায় প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় হইয়াছে এবং বিয়াল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার পাউণ্ডেরও অধিক মূল্যের এলুমিনিয়াম্ ইংলণ্ড হইতে মান্দ্রাজে আনীত হইয়াছে।

ক্রমশঃ মালের কাট্‌তি বেশী হইতেছে বলিয়া যে এলুমিনিয়াম্ ধাতুর মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। মূল্য বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক কয়েক বৎসরের মধ্যে উহার মূল্য প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমিয়া গিয়াছে। কোন ধাতুর মূল্যের ন্যূনতার সহিত তন্নির্ম্মিত দ্রব্যেরও মূল্য যে কম হয় ইহা স্বতঃসিদ্ধ, এবং দ্রব্যের মূল্য যত কম করিবে তাহার কাট্‌তিও তত বাড়িবে ইহা নিশ্চয়। সুতরাং ভবিষ্যতে এলুমিনিয়াম্ নির্ম্মিত বাসনের বহুল কাট্‌তি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এক পোয়া ওজনের এলুমিনিয়াম্ দ্বারা একটি পরিমাণ গেলাস প্রস্তুত করিতে ধাতুর মূল্য ও মজুরি সহ।৶. আনার বেশী পড়ে না। উক্তরূপ একটি গেলাসের বর্ত্তমান বাজার দর ৫৶৹ আনার কম নহে।

বাঙ্গলা দেশে একটি কারখানা খুলিয়া যদি এলুমিনিয়ামের বাসন ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করান যায় তাহা হইলে বর্ত্তমানে উক্ত ধাতু নির্ম্মিত যে সমস্ত বাসন বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ বাসন প্রস্তুত করাইয়া প্রচলিত দরের অর্দ্ধেক মূল্যে বিক্রয় করিলেও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে।

অধুনা এলুমিনিয়াম্ নির্ম্মিত যে সমস্ত দ্রব্য বাজারে দেখা যায় তাহার সংখ্যা অল্প হইলেও তাহা নিভাজ ধাতু দ্বারা প্রস্তুত। লৌহ, তাম্র, রঙ্গ, দস্তা প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর ধাতুর সহিত উক্ত ধাতু মিশ্রিত করিলে নানাবিধ মিশ্র ধাতু তৈয়ারি হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা মানব সমাজের আবশ্যকীয় নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

রাজ্যাভিষেকে নূতন গালিচা।—রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে পাতিবার জন্য নূতন মখমলের গালিচা তৈয়ার হইয়াছে। এবার গ্লাসগোতে এই গালিচা তৈয়ার হইয়াছে। ১৯০২ সালের রাজ্যাভিষেকে ওরষ্টেরসায়ারে গালিচা খানি তৈয়ারি হইয়াছিল। গালিচা খানি অত্যন্ত মূল্যবান সে পক্ষে সন্দেহ নাই। অর্থ নীতিজ্ঞেরা বলেন যে বার বার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে এরূপ অর্থ ব্যয়ের আবশ্যক দেখা যায় না। ১৯০২ সালের গালিচা বর্ত্তমান অভিষেক কার্য্যে

ব্যবহার চলিত। কিন্তু রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে এরূপ মিতব্যয়ীতার সার্থকতা দেখা যায় না। উপরন্তু বক্তব্য এই গালিচাখানি রাজার ঘরেই থাকে না। যাঁহারা অভিষেক ব্যাপারে পৌরহিত্য করেন, তাঁহারাই প্রায় দখল করেন, সুতরাং সেখানি প্রত্যর্পণ করিতে বলা ঠিক নহে। আমাদের কিন্তু আর একটি বক্তব্য এই যে, গালিচা খানি ভারতবর্ষ হইতে হইলে অতুলনীয় হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাজ্যাভিষেকে পুষ্পসজ্জা।—রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বিলাতে কভেণ্ট গার্ডেন রঙ্গালয় সুন্দর পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল। প্রায় ১০০০০০ ফুলে রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরটি ঢাকিয়া ফেলা হইয়াছিল। রাজার বসিবার স্থানটির চারিদিকে ঈষৎ লাল রঙের গোলাপ গুলি মেডেলের আকারে সাজান হইয়াছিল—তাহাতে হলদে গোলাপদ্বারা বৃটীশ সাম্রাজ্যের সমস্ত অধীন রাজ্য গুলির নাম লেখা। পুষ্প সজ্জার রীতি অভিনব এবং মনোহরত বটেই।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

শ্রাবণ মাস।

সব্জীবাগান।—এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই, বরবটী, বেগুন, শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা জলদি তথাপি মোকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষের এখনও সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা।—দোপাটী, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা,) এমারন্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, (Sun-flower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাত্‌লা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কাটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুলকলম করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত

নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছের ফেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজে হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

যাঁহারা বেড়ার বীজ বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুরমত গজাইতে পারে।

শস্যক্ষেত্র।—কৃষকের এখন বড় মরশুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণবঙ্গে পাট নাবি হয়। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাসে বীজ ধান্য বপনের উপযুক্ত সময়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি বিচলিত করা কর্ত্তব্য। সুপারী গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোময় দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা বা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এ মাসে পুঁতিলেও হইতে পারে। বেগুন, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোয়াঁস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে, সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁকআলুর বীজ পুতিবে। শাঁকআলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আলা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউশ ধান কাটে।

REGISTERED No. C 102

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

শ্রাবণ, ১৩৩৮।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



দ্বাদশ খণ্ড,—৪র্থ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

শ্রাবণ, ১৩১৮।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিনার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচীপত্র।

শ্রাবণ, ১৩১৮ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

'কৃষকে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।



রাজা সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

১৯১০ সালের ৭ই মে শনিবার জর্জ্জ ফ্রেডারিক আর্নেষ্ট এলবার্ট পঞ্চম জর্জ্জ নাম ধারণ করিয়া পিতৃ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ১৮৬৫ সালে ৩রা জুন মারলবরা রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজকীয় কৃষি-সমিতি ও উদ্যান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইনিও এই উভয় সমিতির পৃষ্ঠপোষক এবং কৃষি ও উদ্যান সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যে ইনি সম্পূর্ণ আস্থাবান। ১৯০৫ সালে ভারত পরিদর্শনকালে ভারতের অনশনক্লিষ্ট প্রজাগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ভারতশাসনে অধিকতর সহানুভূতির প্রয়োজন। এক্ষণে তিনি ভারতের দীন প্রজাগণের দুঃখ বিমোচনে কার্য্যতঃ যত্নবান হইবেন বলিয়া সকলেই আশা করিতেছে এবং বোধ হয় এই কারণেই আগামী ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে স্বয়ং শুভাগমন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

// কৃষক //

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ খণ্ড। | শ্রাবণ, ১৩১৮ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

সব্জী চাষ

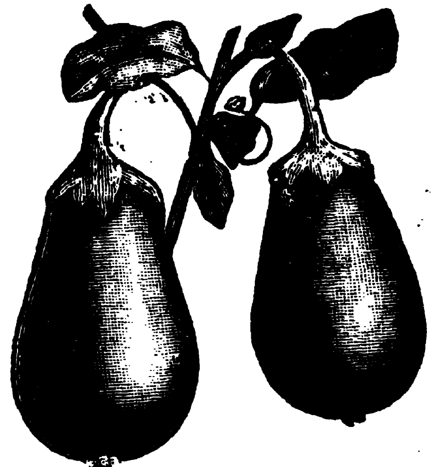
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বেগুন, বাইগুন, ভাঁটা

উদ্ভিদ্ শাস্ত্রের হিসাবে বেগুন সোলানেসি (Solanaceæ) বর্গের অন্তর্গত। গোল আলু, লঙ্কা প্রভৃতিও এই বর্গভুক্ত। এতদ্দেশে বেগুনের দুইটি বিভিন্ন জাতি দৃষ্ট হয়। ১ম শ্রেণীর ফলের আকৃতি গোল—মুক্তকেশী, মাকড়া, ছাতারে, এলোকেশী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।



মাকড়া বেগুন।

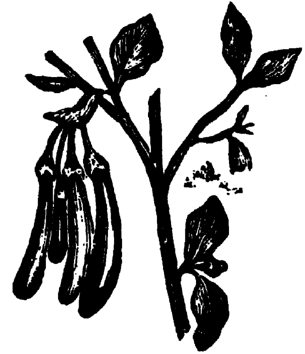


মুক্তকেশী বেগুন।

২য় শ্রেণীর ফলের আকৃতি লম্বা—ইহাই কুলি বেগুন। ইহার ফল গোছা গোছা থাকে।



কুলি জাতীয় গোয়ালন্দের লম্বা বেগুন।



চৈতে বা কুলি বেগুন।

চৈতে বা কুলি বেগুনকে কোন কোন উদ্ভিদ্‌বিৎ ইহাকে Solanum longum এবং গোল বেগুনকে Solanum Melongena বলিয়া থাকেন। ফলতঃ উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রকারগত (Specific) পার্থক্য না হইলেও উহা যে অপরিবর্ত্তনশীল ভেদগত (varietal) পার্থক্য, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

অতি পুরাকাল হইতে ভারতে বেগুন চাষ হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃতে ইহার নাম বার্ত্তাকু। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে অনেক স্থলে ইহাকে ভাঁটা বলিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহা ওয়াঙ্গম নামে পরিচিত। নিম্নবঙ্গের উষ্ণমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যন্ত শীতপ্রধান স্থানেও বেগুন উৎপাদিত হইতে দেখা যায়।

গুণাগুণ—বেগুন ত্রিদোষ নাশক তরকারি।

বেগুন বর্ষা ও শীত উভয় ঋতুতে ফলে। বেগুন একটু পাকিয়া উঠিলে, স্বভাবসিদ্ধ ইহাতে ক্ষার জন্মায়। সেই ক্ষার পদার্থটী মনুষ্য শরীরে অনিষ্টজনক। কিন্তু বেগুন কচি অবস্থায় কোন অনিষ্ট করে না। এই কারণে লোকে চৈত্র মাস অন্তে, গাছ গুলি তুলিয়া ফেলিয়া দেয়। একই গাছে পৌষ মাসের উৎপন্ন ফলে যত খোসা পাতলা এবং আস্বাদনে মধুর হইবে, চৈত্র বা শ্রাবণ মাসের সেই গাছের ফলে, তাহার দ্বিগুণ ছাল পুরু ও আস্বাদনে অনেক তফাৎ অনুভূত হইবে। এক বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত একই ক্ষেত্রে বৎসরান্তে বৈশাখ মাসে গাছের ডাল ছাঁটিয়া দিয়া, ক্ষেত্রটিতে নূতন করিয়া চাষ, সার, এবং বর্ষাগমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে জল সেচন দ্বারা গাছকে জীবিত রাখিলে, অসময়ে ন্যূনাধিক পরিমাণে ফলভোগ করা যাইতে পারে। অসময়ে বেগুন পাইলে লোকে তত ভাল মন্দ

বিচার করে না, এই কারণে অসময়ের বেগুনে লাভও যথেষ্ট হয়। এদেশের অধিকাংশ জেলার লোকে কিন্তু এই প্রণালীতে কার্য্য করে না : ফলের গুণ খারাপ হয় বলিয়া কাটিয়া ফেলিয়া নূতন চারা বসানই সুপ্রশস্ত বলিয়া বিবেচনা করে।

সাধারণতঃ বেগুন দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়। যথা :—আউস এবং আমন। আউস বেগুনের জ্যৈষ্ঠ মাসে চারা পুতিয়া ভাদ্র মধ্যে ফল ধরে। আমন বেগুন শ্রাবণে লাগাইয়া আশ্বিন মধ্যে বেগুন হয়।

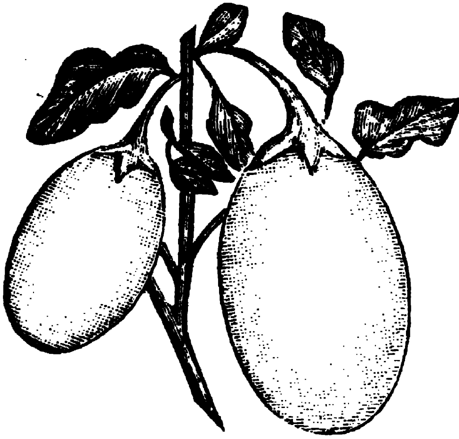
মৃত্তিকা এবং চাষ—বেগুনের চাষের পক্ষে দোয়াঁশ অল্পোচ্চ মাঠান জমি, ঠিক করিয়া লইয়া,—যদি পতিত থাকে, তাহা হইলে, মাঘ ফাল্গুন মাসের বৃষ্টি হওয়ার পরেই ভাল করিয়া ৩।৪ বার চাষ দিয়া, নূতন মাটি ছড়াইয়া ও মই দিয়া মাটি বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। তৎপরে গোয়ালের সার, উনান পরিত্যক্ত ছাই, পুষ্করিণীর পাঁক, গৃহের গাত্রের লোণা মাটী, যে দিন যে পরিমাণ সংগৃহীত হইবে, তাহাই প্রত্যহ ক্ষেতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। ক্ষেত্রটি চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিলে জমি খুব তেজস্কর হইয়া থাকে। ইহাকে জমির 'হামনা' বলিয়া থাকে। কর্ষিত ক্ষেতকে ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে আলোক এবং বায়ু প্রবেশ করিয়া ঐ জমিকে খুব উর্ব্বরা করে। যেমন প্রথম বৈশাখে নূতন বৃষ্টি হইবে, অমনি পুনরায় ঐ ক্ষেতকে ৪।৫ বার দীর্ঘ প্রস্থে লাঙ্গল উত্তমরূপে মই দিয়া মাটি সমতল, ধূলিবৎ ও তৃণ শূন্য করিয়া রাখিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বা মাঝামাঝি জমিতে যো* হইলেই বেগুনের চারা রোপণ করিতে হয়। এদেশে আষাঢ় মাসে একবার খুব রৌদ্র হয়, চলিত কথায় তাহাকে 'আষাঢ়িয়া ধূপ' বলে। সেই অবস্থায় চারাগুলিকে ক্ষেতে জল দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। এই ধূপে লাগান চারা, বৃষ্টি পাইলে, অতি ত্বরায় তেজস্কর ও ঝাড়াল হইয়া পড়ে।

আউসে বেগুনের গাছ তৈয়ারি হইয়া উঠিলেই, আমন অর্থাৎ হৈমন্তিক বেগুন ক্ষেতে বসাইবার উদ্যোগ করিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে বিধিমত জমিতে চাষ ও সার দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া রাখা আবশ্যক। আউস ও আমন ব্যতীত আর একপ্রকার বেগুনের বাঙলা দেশে চাষ হইয়া থাকে। এই বেগুন চৈত্র মাসে ফলে। এইজন্য ইহার নাম চৈতে বেগুন, যেমন শীতের বেগুনকে কেহ কেহ পৌষে বেগুন বলিয়া থাকে। মাঘ মাসের মধ্যেই চৈতে বেগুনের চারা তৈয়ারি করিতে হয়, ফাল্গুন মাসের প্রথমেই ক্ষেতে চারা বসাইতে পারিলে চৈত্র মাসে ফলিতে আরম্ভ হয়। ইহার গাছ খুব ঝাড়াল না হইলেও প্রতি গাঁইটে থলো থলো বেগুন ফলে।

* বৃষ্টি পাতের পর জমিতে জল শুখিয়া গেলে মাটি সরস থাকিবে অথচ খুব ভিজা থাকিবে না। মাটি কোদাল দ্বারা কোপাইলে কোদালে জড়াইয়া ধরে না এবং মাটি সহজে হাত দিয়া গুঁড়ান যায়, ঢেলা বাঁধে না। মাটির এই অবস্থাকে 'যো' হওয়া বলে। এই সময় বীজ বপন ও চারা রোপণ করিতে হয়।

বেগুন গুলি লম্বাকৃতি ও সরু। ইহাতে শাঁস অধিক থাকে না কিন্তু যে সময় তরকারি খুব অভাব সেই সময় পাওয়া যায় বলিয়া লোকে আদর করিয়া ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। দাম, আউসে কিম্বা পৌষে বেগুন অপেক্ষা সস্তা। এই বেগুন কল কারখানার সন্নিকট কুলি বাজারে খুব আমদানী হয়। সস্তা বলিয়া কারখানার কুলি মজুরেরাই বেশীভাগ এই বেগুন ক্রয় করিয়া থাকে। এই কারণে ইহা কুলিবেগুন আখ্যাও পাইয়াছে। ইহা প্রায়ই ওজন দরে বিক্রয় হয়। প্রায়ই চারি কিম্বা পাঁচ পয়সা সের বিকায় কিন্তু তরকারির আমদানী না থাকিলে আট পয়সা সেরও বিকাইতে দেখা যায়।

শাদা বেগুন প্রায় মুক্তকেশীর আকারের। ফলন প্রায় মুক্তকেশীর মত। মুক্তকেশীর মত খোসা পাতলা, খাইতেও সুস্বাদু, ইহার আউস ও পৌষ দুইটি খন্দই পাওয়া যায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে মুক্তকেশী অপেক্ষা ইহার গাছ ও ফলে কম কাঁটা হয়, কোন কোন গাছে আদৌ কাঁটা হয় না।



শাদা আউস ও পৌষীয় বেগুন।

আউসে, পৌষে ও চৈতে এই রকম বেগুনেই, বাজারে বেগুনের আমদানী জাগাইয়া রাখে। আবার ইহাও দেখা যায় যে মুক্তকেশী বা মাকৃড়া বেগুন যদি ক্রমান্বয়ে মাসে মাসে চারা করিয়া চাষ করা যায় তাহা হইলে বার মাসই ভাল বেগুন পাওয়া যায়।

বীজতলা বা হাপর—এদেশে প্রায়ই গৃহস্থের আঙ্গিনা বা উঠানের এক পার্শ্বে অথবা গোয়াল ঘরের ধারে, ৪।৫ হাত চতুষ্কোণ বিশিষ্ট উচ্চ জমি কোপাইয়া হাপর প্রস্তুত করা হয়। ঐ হাপরে আন্দাজ মত সার এবং ঘুঁটের ছাই মিশাইতে হয়। ঐ হাপরে অন্য কোন প্রকার সার না দিলেও চলিতে পারে, কারণ যে স্থানে হাপর প্রস্তুত করিবার স্থান নির্দ্দেশ করা হইল, ঐ স্থান গুলি স্বভাবতঃই গৃহ এবং গোয়াল পরিত্যক্ত সারে, অত্যন্ত উর্ব্বরা হইয়া থাকে। হাপরে সারের আতিশয্য হওয়া উচিত নয়, যে ক্ষেতে বেগুন চাষ হইবে সেই ক্ষেতের সারের অনুপাতে বরং কিছু কম হওয়া উচিত, তাহা না হইলে ক্ষেত্রে রোপিত চারাগুলি সমানানুপাতে সার না পাইয়া খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, চারা যত মধ্যমাকার, খাট খাট, ঝাড়াল ও শক্ত হইবে, সেই চারাই বেশী দিন স্থায়ী হইয়া সুফল প্রদান করিবে। ধাপাল চারার গাছ অধিক দিন বাঁচে না।

বীজতলা বা হাপর ছায়াতে হইলে চারাগুলি লম্বা হইয়া উঠে কিন্তু দেখিতে বেশ নধর দেখায়, সে চারা ভাল তাত বাত সহিষ্ণু হয় না। চারাগুলি ক্ষেতে বসাইবার পূর্ব্বে নিয়মিত রৌদ্রে জল খাওয়াইয়া বেশ টেঁকসহি করিয়া লইতে হয়। চারাগুলি কোমল অবস্থায় প্রখর রৌদ্র বা অত্যধিক বর্ষণ সহ্য করিতে পারে না, তাহাদের রক্ষা করিতে নারিকেল পাতা প্রভৃতির আচ্ছাদন আবশ্যক। আচ্ছাদন, সকাল সন্ধ্যা বা আবশ্যকমত খুলিয়া রাখিতে হয়। ৪ হাত × ৪ হাত পরিমিত স্থানে এক আউন্স (২॥ তোলা) বেগুন বীজ বপন করা চলে। ইহাতে যে চারা উৎপন্ন হইবে তাহাতে ১ বিঘা জমির চাষ হইবে।

বেগুন বীজ মাদা দিবার দিন হইতে এক মাস মধ্যে রোপণ যোগ্য হইতে দেখা যায়। বেগুনের বীজ হাপরে বুনিয়া তাহার উপর এক ইঞ্চি আন্দাজ ধূলিবৎ মাটী চাপা দিতে হয়। কিন্তু ঐ মাটী, বীজের উপর আলগা, পাতলা করিয়া চালিয়া না দিলে সকল চারা ফোটে না। বীজগুলি অধিক মাটি চাপা পড়িলে অঙ্কুরগুলি মাটি ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারে না। বীজতলির উপর বিচালি (খড়) দিয়া জল সিঞ্চন করিলে অঙ্কুর ফুটিবার সহায়তা হয়, কারণ ইহাতে প্রথমতঃ বীজ অঙ্কুরিত হইবার উপযুক্ত উত্তাপ সংরক্ষিত হয়, দ্বিতীয়তঃ খোলা মাটীর উপর জল পড়িলে মৃত্তিকা মধ্যস্থিত বায়ু চলাচলের ছিদ্র পথগুলি বুজিয়া যায় এবং উপরের মাটী কঠিন হইয়া অনেক বীজ ফুটিয়া উপরে উঠিতে পারে না। খুব আল্‌গা মাটিতে বীজ বুনিলে জল পাইয়া বীজগুলি মাটির নিম্নস্তরে চলিয়া যাইতে পারে, এই হেতু বীজতলার মাটি ছোট তক্তা দিয়া চাপিয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন মৃত্তিকাতে বীজ বপন করা কর্ত্তব্য।

উই বা পিপীলিকার মাটি খুব তেজস্কর। ইহাতে বীজ অঙ্কুরণ শক্তি নিহিত আছে। উই এবং পিপীলিকার মুখের লালা হইতে মৃত্তিকা এই প্রকার সঞ্জিবনী শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই হেতু বেহারের চাষীরা বীজতলায় উইমাটি ছাড়াইয়া থাকে। বাঙলা বিহার ও অযোধ্যায় অনেকানেক স্থানে উই ঢিবি দেখিতে পাওয়া যায়। উই বা পিঁপ্‌ড়ের মাটিকে কাজে লাগাইতে পারিলে তাহাদের দ্বারা যে ক্ষতি হয় তাহার কতকটা পূরণ হইতে পারে।

রোপণ প্রণালী—হাপরে চারাগুলি ১০।১২ অঙ্গুলি বড় হইয়া উঠিলে, তখন উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে নাড়িয়া পুতিতে হয়। অধিক লম্বা চারা পোতা ভাল নয়। ক্ষেতে চারা নাড়িয়া পুতিবার (Transplant) সময়, এক গাছি লম্বা রসি লইয়া ঐ ক্ষেতের উপর লাইন বন্দী করতঃ ২ বা ১৸০ হাত অন্তর ঠিক সমান দূরত্ব রাখিয়া এক একটি চারা গর্ত্ত মধ্যে পুতিতে হইবে। চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে উহাদের মূল শিকড়ের অগ্রভাগ সহিত অন্যান্য সরু সরু শিকড় গুলিও ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাকে (Root pruning) 'খাশি' করা বলে। খাশি করা গাছের তেজ

অধিক ও ফল বড় হয়। চারা রোপণের সময় কোন একটি পাত্রে কতকটা ঘুঁটের ছাই নিজের কাছে রাখিতে হয়। কোন কোন চাষীর বিশ্বাস যে, প্রত্যেক চারাটি পুঁতিবার পূর্ব্বে ঐ চারার মূলে ছাই মাখাইয়া রোপণ করিতে পারিলে, গাছে বড় একটা পোকা ধরে না। ইহাতে গাছ খুব ভাল হয়। চারা যদি এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার অব্যবহিত পরেই পোতা যায়, তবে সে চারা প্রায়ই মরে না।

এমেরিকান বেগুন

তরকারির মধ্যে বেগুন একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম, বাঙলা, উড়িষ্যা সকল স্থানে বিভিন্ন জল হাওয়ায় জন্মায়। বারাণসীর পর পারে রামনগরে অতি সুস্বাদু এবং সুবৃহৎ বেগুন জন্মে। পূর্ব্ববঙ্গের রঙপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে এক একটা কুমড়ার মত বড় বেগুন হয়। এমেরিকান ছয় সেরি একপ্রকার বেগুন সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছে।



এমেরিকান ছয় সেরি বেগুন

ইহার মত বড় বেগুন এদেশে কোথাও ফলে না। এদেশের বিশেষতঃ বাঙলার বেগুন বড় ফাঁপা সুতরাং বড় হইলেও ওজনে কম হয়। এমেরিকার এই বেগুন নিরেট এবং ভারি। একটা বেগুন ওজনে ছয় সের পর্য্যন্ত হয়। খাইতে সুস্বাদু, বেনারসের বেগুন ইহা অপেক্ষা কিছু ছোট। এই এমেরিকান বেগুনের একটা প্রধান গুণ এই যে ইহার গাছের ডালে, পাতায় ও ফলের বোঁটায় আদৌ কাঁটা হয় না।

ইহা সুমিষ্ট কি না ঠিক বলা যায় না। ইহার গাছ খুব ঝাড়াল হয়, বড় উঁচু হয় না। গাছে কিন্তু ৩ কিম্বা ৫ টার অধিক ফল হয় না এবং অধিক দিন ধরিয়া ফলে না। বিশেষ যত্ন না করিলে সব বেগুন সমান বড় হইবে না। অন্য বেগুনের

মত সামান্ত ভাবে চাষ করিলে দুই একটা বেগুন নষ্ট হওয়াও বিচিত্র নহে কিন্তু দেশী বেগুনের ফল ছোট হইলেও ফলে অনেক বেশী। ব্যবসায়ের হিসাবে এদেশে দেশী বেগুনের চাষই আয়কর। এমেরিকান বেগুনের গাছ শীত ফুরাইলে মরিয়া যায় কিন্তু দেশী বেগুন বারমাস রাখিলেও থাকে ও ফল দেয়। পুরাতন ডালগুলি কাটিয়া ক্ষেতে জলসেচন করিতে পারিলে নূতন ডাল গজায় ও অপেক্ষাকৃত ভাল ফল হয়। সাধারণতঃ কিন্তু গাছ পাঁচ বা ছয় মাসের পুরাতন হইয়া আসিলেই ফল ছোট হইয়া যায়। এক বৎসর গাছ রাখিলে একটা বেগুন গাছ হইতে দুই শত ফলের অধিক পাওয়া যায়।

গোয়ালন্দের লম্বা বেগুন।

এই বেগুন চৈতে বা কুলি বেগুনের মত হইলেও ইহা অপেক্ষা লম্বায় অনেক বড়, কুলি বেগুনের অপেক্ষা মোটা, ইহা মুক্তকেশী প্রভৃতি বেগুনের ন্যায় পৌষ মাসেই ফলে। কুলী বেগুনের সহিত অনেক পার্থক্য থাকিলেও গাছ এবং ফলে কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। চৈতে বেগুন হিসাবে ইহার চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চৈত্র মাসে ফলিলে ইহার ফল ছোট হয়। ইহা কুলি বেগুনের মত থলো থলো ফলে না।

বেগুন ক্ষেতে সার—বেগুন ক্ষেত তৈয়ারি করিবার সময় তাহাতে মাটি ও গোবর ও ছাই প্রভৃতি মিশ্র সার দিবার কথা বলা হইয়াছে। বেগুন ক্ষেতে সরিষার খৈল দিলে ফলন খুব বাড়ে। ক্ষেতে চারা বসাইবার পর চারা দেড় বা দুই ফুট বড় হইলে ক্ষেত কোপাইয়া বা ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া গাছের গোড়ায় সরিষার খৈল দিতে হয়। সরিষার খৈল পচাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষেতে ইতিপূর্ব্বে অন্য সার দেওয়া থাকিলে এক্ষণে ১ মণ খৈল সারই যথেষ্ট। বেগুনের চারা বসাইয়া তিন চারিটি পাতা বাহির হইলেই গোড়ায় মাটি দিয়া ভাঁটি টানিয়া দিতে হয়। সার দিয়া পুনরায় আর একবার এবং আবশ্যকমত মধ্যে একবার গোড়ায় মাটি দিতে হয়। গাছের গোড়ায় জল বসিলে বা গোড়া বাতাসে নড়িতে থাকিলে বেগুন গাছ ফলে না। বেগুন ক্ষেতে জলনিকাশি পয়োনালা ঠিক থাকা চাই।

ফলন—প্রতি মরসুমে একটা সতেজ বেগুন গাছ হইতে ১০০ শত বড় ফল নিশ্চয়ই আশা করা যায়। প্রত্যেক বিঘায় ১৬০০ শত বেগুন চারা বসিতে পারে। সব গাছ সমান ফলে না, দুই দশটি গাছ মরিয়া যায়, সকল গাছের ফল বেশ বড় হয় না। কতকগুলা ফল শুকাইয়া ও পচিয়া নষ্ট হয়, যাহা হউক হাজা, পচা ও পোকা খাওয়া কানা বেগুন বাদ দিলেও এক বিঘা বেগুন চাষ করিয়া ১০০ মণ বেগুন উৎপন্ন হইতে পারে। কলিকাতা বা কলিকাতার নিকটে ১ মণ বেগুনের পাইকারি দর কখন ১৲ টাকার কম হয় না।

বেগুন চাষে খরচ—প্রতি বিঘায় হলকর্ষণ ও সার ৭৷৷০ টাকা, বীজ খরিদ ও চারা বসান ও জল সেচন ২৷৷০ টাকা, কোপান নিড়ান, ভাটি টানা ৬৲ টাকা,

জমির খাজন ৩৲ টাকা। খরচ বাদে ফসলের তারতম্য অনুসারে এক বিঘা বেগুন চাষ হইতে ৭৫৲ হইতে ১০০৲ টাকা মুনফা হইতে পারে।

বিশেষ কথা—পতিত বাগান জমিতে গাছ, পালা, বন কাটিয়া তাহাতে বেগুন চাষ করিলে বিনা সারে এক বা দুই বৎসর বেগুন প্রচুর জন্মায়। আমাদের গোবিন্দপুরের ক্ষেতে একটা বাঁশবাগান তুলিয়া দিয়া তাহাতে কেবলমাত্র পাঁকমাটি ছড়ান হইয়াছিল। প্রথম বৎসর বেগুন চাষ করিয়া বিঘাতে ১৫০ টাকা আয় দাঁড়াইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসর সেই ক্ষেত হইতে অন্য কোন সার না দিয়াও ৮২৲ টাকা মুনফা হইয়াছিল।

বেগুনের ব্যাধির মধ্যে কাণ্ডে, শাখায় ও ফলে পোকা লাগা অন্যতম। কাণ্ডের কীড়া শ্বেতবর্ণ, প্রজাপতি ধূসরবর্ণ। কাণ্ডের নিম্ন অংশেই ইহা দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারাই ফসলের সমধিক অপকার হয়। শাখার পোকা সাধারণতঃ উপরের কোমল শাখা সমূহে দৃষ্ট হয়। ইহার কীড়া শ্বেতবর্ণ; প্রজাপতি শ্বেতবর্ণ সবুজ দাগ বিশিষ্ট পক্ষ যুক্ত। বেগুনের ফলের পোকার কীড়া ঈষৎ পিঙ্গলাভা বিশিষ্ট; প্রজাপতি শ্বেতবর্ণ ও ধূসর কাল রঙের ফোঁটাযুক্ত পক্ষ বিশিষ্ট। এই সমুদয়ের প্রতিকার—আক্রান্ত গাছ সকল তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা। ক্ষেত্রের নিকটে বন বেগুন, কণ্টিকারী প্রভৃতির গাছ থাকিলেও সেগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। কারণ অনেক সময়ে ঐ সমুদয় গাছ হইতেই পোকা আসিয়া বেগুন গাছ আক্রমণ করে।

ছত্রক রোগের মধ্যে 'ধসালাগা' ও 'তুলসী মারা' বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রধানতঃ জমিতে জল বসিয়াই এই সকল রোগের কারভূত জীবাণুর পরিপুষ্টির সহায়তা করে। সাধারণ কৃষকের বিশ্বাস যে, বেগুনের মূল শিকড় না কাটিয়া দিলে এই সকল রোগের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইহা অমূলক। অবশ্য জমি কোপাইবার সময় শিকড় কাটিয়া গেলে জীবাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশের সুবিধা হয়। তৎপরে তন্তু মধ্যে প্রবেশ করিলে জীবাণুকে নিরাকরণ করা একপ্রকার অসম্ভব। যে স্থলে এই ফসল ধসা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে সে স্থানে ২।১ বৎসর বেগুন চাষ না করাই ভাল। এক প্রকার পোকা আছে তাহা স্বধু বেগুন কেন, লাউ, কুমড়া করলা, ঝিঙ্গা প্রভৃতিরও অনিষ্ট করে। পোকার কীড়া প্রথমাবস্থায় সবুজ রঙের, গায়ে কাঁটা থাকে, তাই ইহার নাম কাঁটালে পোকা, ইহারা পাতা কুরিয়া খাইয়া ঝাঁজরা করিয়া দেয়। ফসলের পোকার খবর 'ফসলের পোকা' নামক পুস্তকে সবিশেষ জানিতে পারা যায়। বেগুনের ডাঁটার, ফলের, শাখার পোকার চিত্র ঐ পুস্তকে দেখুন।

পোকাক্রান্ত পাতা ভাল করিয়া পুড়ান বা কেরোসিন তৈলের জলে ফেলিয়া পোকা মারা ছাড়া উপায়ন্তর নাই। পোকাকে অবাধে বাড়িতে দিলে অতি সত্বরে ক্ষেতটি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এমন অবস্থায় সে ক্ষেতে দুই কিম্বা এক বৎসর বেগুন চাষ না করাই ভাল। বেগুন ক্ষেতে তুঁতের জল ও কর্পূরের জল পিচকারি দ্বারা ছিটাইলে পোকার উপদ্রব কতকটা কমিতে পারে।

বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা

শ্রীকেদারনাথ দাস লিখিত

আমাদিগের দেশে সাধারণতঃ যে সকল প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হয় তাহা বিদেশী প্রণালী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ব্যয়সাধ্য, সুতরাং বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আমাদিগের চিরপ্রচলিত প্রণালীগুলি কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবে উন্নত করিয়া সহজ ও সুলভ করা আবশ্যক। জর্ম্মানি, মরিসস্, জাভা প্রভৃতি স্থান হইতে সুলভ চিনি বহুল পরিমাণে আমদানি হওয়ায় আমাদিগের বিশুদ্ধ স্বদেশী চিনি মহার্ঘতা হেতু লুপ্ত-প্রায় হইতে বসিয়াছে। যদিও বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু কেহ কারণানুসন্ধানে উদ্যোগী না হওয়ায় এবিষয়ে চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না। সামাজিক শাসন বা অন্যান্য বিবিধ উপায়ে এই ব্যবসায়ের ভিত্তি দৃঢ় করিবার অশেষ চেষ্টা সত্বেও ইহার প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য না থাকায় কার্য্যক্ষেত্রে আমরা আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। বিদেশ অপেক্ষা আমাদিগের দেশে অনেক বিষয়ে সুবিধা আছে। তথাকার সামান্য কুলি মজুরের পারিশ্রমিক এখানকার ক্ষুদ্র কেরাণীদিগের সমতুল্য বা বরং অধিক ; কার্য্যকুশল ব্যক্তিদিগের ত কথাই নাই। এখানে ১০৲ ১২৲ টাকায় যে ফিটার (মিস্ত্রি) বা ৩০৲ ৪০৲ টাকায় যে প্যান-ম্যান পাওয়া যায় উহার চতুর্গুণ বা পঞ্চগুণ বেতনেও সেখানে সেরূপ লোক পাওয়া সুকঠিন। কারখানা করিয়া উপযুক্ত স্থানের দুর্ম্মূল্যতাও এখানকার হিসাবে সেখানে অনেক বেশী ; গৃহাদি নির্ম্মাণ ব্যাপারেও তদ্রূপ। অবশেষে প্রস্তুত দ্রব্যাদি সমুদ্রপথে এখানে পাঠাইবার খরচও বড় কম নহে। এই সকল ও অনেক অপরাপর অসুবিধা সত্বেও যে বিদেশী বণিকেরা আমাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় অনায়াসে লাভবান হইতেছেন তাহার কারণ কি ?

অধুনা স্বদেশী আন্দোলনে উৎসাহিত হইয়া অনেকে চিনির ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পুরাতন দেশীয় প্রণালী বা কলকারখানার সাহায্যে রাব (গুড়), শক্কর (raw sugur) প্রভৃতি উপাদান হইতে চিনি প্রস্তুত করিতেছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা চিনি-কুঠির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু বিদেশীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সম্ভাবনা কোথায় ? যে সকল কারখানাতে পূর্ব্বোক্ত উপাদান হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, তৎসংলগ্ন মদ চোলাই খানাই উহাদের স্থায়িত্বের প্রধান উপায় ; কেবল চিনির আয়ে উহাদের ব্যয় সঙ্কুলান হয় না, লাভ ত দূরের কথা।

দারুখানার (Distillery) আয়ে কোন গতিকে লোকসান পুরাইয়া কিঞ্চিৎ লাভ হয় মাত্র। জর্ম্মানির সহিত প্রতিযোগিতাই ইংলণ্ডের কারখানা সমূহের অবনতির একমাত্র কারণ। জর্ম্মানি, মরিসস্ প্রভৃতি স্থানে একবারে রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। ইংলণ্ডের অধিকাংশ স্থানে রাব, শক্কর ইত্যাদি উপাদান হইতে চিনি প্রস্তুত হয় সুতরাং ইহাদের ব্যয় বাহুল্য অবশ্যম্ভাবী।

উপায় কি ?

আমাদের দেশে এই ব্যবসায় স্থায়ী ও উন্নত করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা উচিত—

(ক) প্রধানতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে ইক্ষু আবাদ করিয়া তাহা ষ্টীম পরিচালিত কলে মাড়িয়া রস হইতে একবারে চিনি প্রস্তুত করা, ইহাতে চিনি প্রতি মণ ২৷৷৹-৩৲ টাকা খরচে প্রস্তুত হইতে পারে।

(খ) ইক্ষু খরিদ করিয়াও এ কার্য্য চালান যাইতে পারে—ইহা মধ্যম উপায়—ইহাতে প্রতি মণ ৫৲-৬৲ টাকা হিসাবে পড়তা পড়িবে।

এই উপায়ে চিনি প্রস্তুত পক্ষে সহজ হইলেও সাধারণ গৃহস্থ বা অল্প পরিমাণে চিনি প্রস্তুতকারকদিগের আয়ত্বাধীন নহে। জমিদার, ধনী, মহাজন বা সম্মিলিত মূলধনে যাঁহারা কার্য্য করেন, তাঁহারা মনযোগ করিলে উক্ত উপায়ে অল্প সময়ের মধ্যে বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবেন। একটি সামান্য কারখানা স্থাপন করিতে হইলেও অন্ততঃ পশ্চিমাঞ্চলের মাপের ৪০০ চারি শত বিঘা জমি আবশ্যক। প্রতি বৎসর ২০০ দুই শত বিঘা জমি ইক্ষু উৎপাদনের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। ১৫ই পৌষ হইতে ১৫ই চৈত্র পর্য্যন্ত ইক্ষুমাড়াই করিবার প্রশস্ত সময়। এই অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে তদুপযোগী নবাবিষ্কৃত যন্ত্রাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

(১) যন্ত্রাদি—প্রধানতঃ Steam পরিচালিত Crushing Plant (মাড়াই কল) একটি ও Vacuum Pan একটি বিশেষ আবশ্যক। তদ্ব্যতীত Turbine (তুরপীন) ২।১টী ও অন্যান্য কয়েকটী খুচরা জিনিস অল্প ব্যয়ে হইতে পারে। সর্ব্ব সমেত মোট আনুমানিক ৩০০০০৲ কি ৩৫০০০৲ হাজার টাকা মূল্যের যন্ত্রাদির সাহায্যে ২০০ দুই শত বিঘা জমির উৎপন্ন ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত কার্য্য সমাধা হইতে পারে। এই উপায়ে প্রত্যহ ১০০ এক শত মণ আন্দাজ চিনি প্রস্তুত হইবে।

(২) আবাদের প্রণালী—সাধারণ গৃহস্থ বা কৃষকেরা যেরূপ ভাবে আবাদ করে তাহা অপেক্ষা উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করিতে হইবে। কৃষকেরা সারাদি (Manure) অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং যাহা কিছু অভিজ্ঞতা আছে তাহাও অর্থাভাবে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে অক্ষম। সুতরাং

ইহাদের দ্বারা আশানুরূপ ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা নাই। যদি জমিতে সময়ানুযায়ী আবশ্যক মত সারাদি নিক্ষেপ করা যায় এবং ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে শেষে অধিক পরিমাণে ফল লাভ হইবে, সর্ব্ব প্রথমে এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত।

(৩) ইক্ষু মাড়া—গৃহস্থেরা গরু দ্বারা চালিত যন্ত্রে ইক্ষুমাড়াই করে, ইহাতে ১০০/ এক শত মণ ইক্ষু হইতে প্রায় ৫০/ মণের অধিক রস বাহির হয় না। কিন্তু বাষ্প (Steam) পরিচালিত মাড়াই কলে ঐ পরিমাণ ইক্ষুতে ৮০/ আশি মণ পর্য্যন্ত রস বাহির হইতে পারে অর্থাৎ দেড় গুণ অধিক রস পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রকরণে আবাদ ও এই প্রকারে মাড়াই হইলে উৎপন্ন রস সাধারণ গৃহস্থেরা যে পরিমাণে পাইয়া থাকে তাহার দুই তিন গুণ অধিক হইবে। রসই চিনির উপাদান—আমাদিগের দেশে এত কম রস আদায় হয় বলিয়াই চিনির দাম এত বেশী পড়িয়া যায়।

রস হইতে একবারে চিনি

(৪) গৃহস্থেরা ইক্ষুরস হইতে রাব বা গুড় তৈয়ারিতে প্রতি মণ প্রায় ১৲ এক টাকা হিসাবে খরচ করিয়া থাকে, ইহাতে চিনির মূল্য প্রতি মণ ২৷৷০-৩৲ টাকা বেশী হয়, কারণ ২৷৷০-৩/ মণ রাব বা গুড় না হইলে ১/ এক মণ চিনি হয় না—যখন একবারে রস হইতে চিনি তৈয়ারি হইতে পারে, তখন গৃহস্থেরা রাব তৈয়ারি করিতে যে খরচ করিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। যে খরচে রাব তৈয়ারি হয়, সেই খরচেই চিনি তৈয়ারি হইতে পারে।

(৫) পাকপ্রণালী—দেশীয় প্রণালীতে আমরা চিনি কম পাই, তাহার প্রধান কারণ আরও দুইটী।

(ক) চিনি সদ্য প্রস্তুত না হওয়ায় রসে অম্লের (এসিডের) অংশ বেশী জন্মায়, অম্লাধিক্য হইলে উৎপন্ন মাল কম হয়।

(খ) রসটা তিনবার কড়া জ্বালে পাক করিতে হয় (ইহাতে চিনির রঙ অপেক্ষাকৃত কাল হয়) এবং কড়া পাকে কতক অংশ জ্বলিয়া যাওয়ায় উৎপন্ন চিনি কম হয়, বাষ্প পরিচালিত ভ্যাকুয়াম কড়ায় (Vocuum Pan) পরিমিত আঁচে একবার মাত্র পাকাইলেই ঐ উপাদান হইতেই পরিষ্কার চিনি অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে, সুতরাং এই পাক প্রণালীই উত্তম ও লাভজনক।

(৬) রিফাইন বা পরিষ্কার করণ—বিদেশে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায়ই Bone Charcoal বা হাড়ের কয়লা দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। আমাদের দেশীয় প্রথা মতে এই অস্পৃশ্য বস্তুর কোন আবশ্যক নাই। ইহার পরিবর্ত্তে সাধারণ শেওলা প্রভৃতির দ্বারা অতি সুন্দররূপে বিশুদ্ধভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ইহা অপেক্ষা

সহজ বা উৎকৃষ্টতর উপায় আর দেখা যায় না। বিদেশী চিনি দেখিতে যতই পরিষ্কার হউক উহার স্থায়িত্ব গুণ কম, অল্প সময়ের মধ্যে বস্তা রসিয়া যায় ও এসিড আক্রমণ করে। ঐ চিনি হইতে তখন এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়, সুতরাং পূর্ব্বেকার ন্যায় তত কার্য্যোপযোগী থাকে না। শেওলা দ্বারা পরিষ্কৃত দেশী চিনি অনায়াসে তদপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী হয় এবং তাহাতে সদ্‌গন্ধ ব্যতীত কখন কোনপ্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না, অতএব পরিষ্কার করা সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় প্রথাই সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য।

আমরা বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় যে সকল কারণে সমর্থ নহি, তাহা এই—প্রথমতঃ আবাদের সময় জমির উর্ব্বরতার প্রতি লক্ষ্য না থাকায় উৎপন্ন কম হয়। দ্বিতীয়তঃ—মাড়াই কার্য্যের অসম্পূর্ণতা হেতু রস অনেক কম পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ—কড়া পাকে রস জ্বাল দেওয়ার দরুণ রঙ খারাপ হয় এবং অনেক অনুৃতি বাদ যায়, আর গুড় করিয়া তাহা হইতে চিনি তৈয়ারি করিলে তদুপরি আরও কিছু অনর্থক খরচা বাড়িয়া যায়।

নিম্ন লিখিত উপায়ে পূর্ব্বোক্ত অনিষ্ট সমূহের প্রতিকার হইতে পারে।

(১) নিজ আয়ত্তাধীনে উপযুক্ত পরিমাণ জমি রাখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করা।

(২) বাষ্প পরিচালিত কলে মাড়াই কার্য্য সম্পন্ন করা।

(৩) বাষ্পের আঁচে ভ্যাকুয়ম কড়ায় (Vocuum Pan) রস পাক করা।

(৪) শেওলা দ্বারা পরিষ্কার করা।

তাহা হইলে অতি সুলভে উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ চিনি নিঃসন্দেহে পাওয়া যাইবে। আমরা কারবার সুত্রে ত্রিহুত অঞ্চলে সাকড়ি মোকামে আছি। এখানে অধিক পরিমাণে ইক্ষুর আবাদ হয় সুতরাং রাব ও গুড় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গত পৌষ মাসে আমরা ইক্ষুরস হইতে একবারে চিনি প্রস্তুত করিবার পরীক্ষা করিয়া বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছি; অবশ্য আমাদের আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির অভাবে সাধারণ নিয়মে বলদ দ্বারা ইক্ষু মাড়াই করিতে ও কড়া পাকে রস জ্বাল দিতে হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

পরীক্ষার ফলাফল

১০০ এক শত মণ ইক্ষুতে ৬২॥০ মণ রস বাহির হইয়াছিল। ঐ রস হইতে ৬।০ চিনি ও ৬।০ মণ সিরা বা ছোয়া পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ পরিমাণ রসে রাব প্রস্তুত করিয়া চিনি করায় ৪।০ মণের অধিক চিনি পাওয়া যায় নাই। উৎপন্ন চিনি বেনারস চিনি অপেক্ষা কোন অংশে হীন হয় নাই।

বিনা কলের সাহায্যে কেবল মাত্র চিরপ্রচলিত সাধারণ উপায় অবলম্বন করিয়া যখন আমরা রস হইতে চিনি তৈয়ারি করিলে প্রায় ২ মণ চিনি বেশী পাইতেছি, তখন আধুনিক কল কারখানার উন্নত উপায়ে আরও বেশী ফল লাভ করিব তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? ইহাও বক্তব্য যে আমরা পৌষ মাসে এই কার্য্য পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তখন প্রকৃত পক্ষে ইক্ষুদণ্ড গুলি মাড়াই করিবার উপযোগী হয় নাই। মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে ঐ পরীক্ষা করিলে নিশ্চয় আরও অধিক চিনি পাওয়া যাইত। কারণ ইক্ষু পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে উহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শ্বেত সার (Starch) জন্মে না।

আয় ব্যয়ের হিসাব

আমি পূর্ব্বে যে প্রকার কল কারখানার প্রস্তাব করিয়াছি তাহার আনুমানিক আয় ব্যয়ের তালিকা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ব্যয়—৪০০ চারি শত বিঘা জমির মালগুজারি ৫৲ হিঃ	...	২০০০৲
তন্মধ্যে ২০০ বিঘার আবাদী খরচা বিঘা প্রতি ৭৫৲ হিঃ	...	১৫০০০৲
ইক্ষু মাড়িয়া চিনি প্রস্তুত করিবার খরচা বিঘা প্রতি ১০০৲ হিঃ	...	২০০০০৲
মোট খরচা	...	৩৭০০০৲
আয়—প্রতি বিঘা ৫০ মণ হিসাবে উৎপন্ন চিনি ১০০০০ হাজার মণ, মণকরা ৭৲ টাকা হিঃ বিক্রয় মূল্য	...	৭০০০০৲
ঐ হিসাবে ছোয়া ১০০০০ মণ মণকরা ১৷৷০ টাকা হিঃ	...	১৫০০০৲
যে ২০০ শত বিঘা জমি গর আবাদী থাকিবে তাহাতে অনায়াসে সামান্য ফসল জন্মাইয়া পরে ইক্ষুর জন্য তৈয়ারি করিতে পারা যায় সুতরাং উহাতেও খরচা বাদে ২০০০৲ টাকার ফসল পাইবার সম্ভাবনা	...	২০০০৲
		৮৭০০০৲
পূর্ব্ব লিখিত খরচা বাবদ	...	৩৭০০০৲
মোট লভ্যাংশ।	...	৫০০০০৲

এই হিসাব আমাদের পরীক্ষায় যে ১০০ মণ ইক্ষুতে ৬৷০ মণ চিনির বিষয় লিখিত হইয়াছে তদনুযায়ী হিসাব দেওয়া হইল। যদি পূর্ব্ব প্রচলিত কল কারখানার সাহায্যে চিনি প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যয়ে উক্ত লভ্যাংশ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। বরং উহা অপেক্ষা বেশীও হইতে পারে। কেবল ষ্টীম চালিত মাড়াই কলে ইক্ষু মাড়াই করিয়া ভ্যাকুয়ম প্যানে না পাকাইয়া দেশী

উপায়ে পাকাইলেও উক্তরূপ লভ্যাংশ হইতে পারে। যেহেতু পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে বলদ দ্বারা চালিত মাড়াই কলে যে রস উৎপন্ন হয় তাহাতেই ৬।০ মণ চিনি জন্মে। সুতরাং ষ্টীম পরিচালিত মাড়াই কলে ৮০ মণ রস পাওয়া গেলে ৮ মণ পর্য্যন্ত চিনি অনায়াসে পাওয়া যাইবে। ৬।০ মণ হিসাবে উৎপন্ন হইলেও আমরা বিদেশীয় দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারি। ৮ মণ হইলে ত কথাই নাই। আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকেরা উক্ত পরিমাণ জমি বা কল কারখানা চালাইবার উপযোগী অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ বিধায়, সদাশয় জমিদার ও ধনী কিম্বা মহাজনদিগের এ বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তাঁহাদিগকে এই বিষয় সম্যক ভাবে জ্ঞাপন করাই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের দেশস্থ যে কোন জমিদার এ কার্য্যে ব্রতী হইলে সফল কাম হইতে পারিবেন। যেহেতু ৪০০।৫০০ বিঘা কর্ষণোপযোগী জমি নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে নাই এমন জমিদার খুব অল্পই আছেন। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় ভূম্যধিকারী মহাশয়েরা এই সকল আপাততঃ কষ্টকর কিন্তু পরিণামে ধ্রুব লাভজনক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠা বোধ করেন। ইঁহারা সমাজের মেরুদণ্ড। ইঁহাদের উদাসীনতায় সমগ্র সমাজ নিশ্চল।

জন সাধারণের সম্মিলিত মুলধনে কারখানা করিলেও একার্য্য চলিতে পারে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে এসব কার্য্য সম্মিলিত মুলধনেই পরিচালিত হইয়া থাকে। সেখানকার শ্রমজীবিরা কোনও মতে উদরান্নের সংস্থান করিয়া কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা কোনও কোম্পানির ২।১ টী অংশ ক্রয়ে নিয়োজিত করে। আমাদের দেশের সঞ্চয়ী লোকেরা কোম্পানির কাগজ ক্রয়ে যেরূপ সিদ্ধহস্ত, বিলাতের জন সাধারণ সম্মিলিত মুলধনের কারবারের অংশ ক্রয়ে তদ্রুপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সেই জন্য তাঁহাদের উন্নতিও সর্ব্বতোমুখী। যত দিন আমাদের দেশের লোকেরা ঐরূপ সম্মিলিত মূলধনে কারবার করিয়া অশেষ উপকারিতা ও আত্যন্তিক আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে না পারিবেন ততদিন আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সুদূরপরাহত। যাহা হউক যাঁহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে এ বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে দেশের একটী গুরুতর অভাব মোচনের আশা করা যায়।

দধি।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত।

দধি অতিশয় উপাদেয় খাদ্য। ইহা লঘু পথ্য, পাচক, রুচিকারক ও বাত-নাশক ; কিন্তু স্নিগ্ধ, এই জন্য কফ ও কাস (ব্রঙ্কাইটিস্) রোগে ইহা সেবন অনুচিত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দধির বহুগুণ বর্ণনা আছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে মহিষের দধি গুরুপাক ;

ছাগ দধি অজীর্ণ, শ্বাস, কাস ও অর্শ রোগে ফলপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ঘোল অথবা মাটাতোলা দুগ্ধের দধি অজীর্ণের মহৌষধ। দধিতে ঘৃত থাকিলে ইহা গুরুপাচ্য হয়। মহিষ দুগ্ধে অধিক পরিমাণে এবং ছাগদুগ্ধে অল্প পরিমাণে মাখন থাকে বলিয়া মহিষ দুগ্ধ বা দধি গুরুপাক এবং ছাগদুগ্ধ বা দধি লঘু বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ বাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের দেশে হাম জ্বরে ও আমাশয় রোগে দধি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ টাইফয়েড্ নামক বিষাক্ত জ্বরে, আমাশায় প্রভৃতি অন্ত্ররোগে এক্ষণে দধির ব্যবস্থা করিতেছেন। সুস্থ ব্যক্তির মলনাড়ীতেও কলেরা, আমাশায়, টাইফয়েড্ প্রভৃতি বিষাক্ত ব্যাধির জীবাণু থাকিতে পারে। অবস্থা বিশেষে ইহারা ভয়াবহও হইয়া থাকে। দধির জীবাণুদ্বারা এক বা দুই দিন মধ্যে এই সমস্ত বিষাক্ত জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এমন উপকারী সুখাদ্য দধি প্রস্তুত প্রণালী সকলেরই জানা আবশ্যক।

ঘরে ঘরে দধি প্রস্তুত করিবার নিয়ম জানা আছে কিন্তু তাহা যে প্রণালীতে প্রস্তুত হয় তাহাতে ঐ দধি সম্পূর্ণ গুণবিশিষ্ট হয় না। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দধি প্রস্তুত সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দুগ্ধে একপ্রকার শর্করা থাকে তাহাকে দুগ্ধ শর্করা (ল্যাক্‌টোজ) বলে। বায়ুমণ্ডলে অনেক প্রকার জীবাণু (উদ্ভিদণু) বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে ল্যাক্‌টিক্ নামক একপ্রকার জীবাণু দুগ্ধ শর্করা গ্রহণ করিয়া ল্যাক্‌টিক্ এসিড্ নামক একপ্রকার অম্ল প্রস্তুত করে। ইহাতেই দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। বায়ুমণ্ডলের ল্যাক্‌টিক্ এসিড্ জীবাণুর সহিত অন্যান্য জীবাণুও দুগ্ধে আসিয়া অন্যপ্রকার কার্য্য করে বলিয়া বায়ুমণ্ডলের জীবাণুর উপর নির্ভর করিলে বিশুদ্ধ দধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই জন্য দুগ্ধে দধির জোড়ন দিয়া দধি প্রস্তুত করিতে হয়। অনেক গৃহিণী দুগ্ধে দধির জল প্রদান করিয়া দধি করেন, ইহাতে ঠিক দধি হয় না, কারণ দধির জলের অম্ল দুগ্ধের কতকাংশ ছানায় পরিণত করিয়া থাকে। কেহ কেহ দুগ্ধে তেঁতুল দিয়া দধি করেন কিন্তু ইহাতেও দধির কতকাংশ ছানা হয় এবং ইহা দ্বারা প্রকৃত দধি হয় না কারণ ল্যাক্‌টিক্ এসিড্ জীবাণু ব্যতীত দধি প্রস্তুত হইতে পারে না। কেহ কেহ দধির পাত্রে দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া দধি প্রস্তুত করেন, কিন্তু ইহাতেও খাঁটি দধি প্রস্তুত হয় না, কারণ পাত্রের অম্লদ্বারা দুগ্ধের কতকাংশ ছানায় পরিণত হয়। সকলেই জানেন যে কাঁসার পাত্রে দধি পাতিতে নাই, কারণ ইহাতে দধির অম্লে কাঁসার কলঙ্ক উঠিয়া দধি বিকৃত হয়। পাথরের পাত্রে দধি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নূতন মৃৎপাত্র সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। নূতন মৃৎপাত্রের বালী ঘসিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। মৃৎপাত্রে দধি করিতে হইলে উহা

উত্তম রূপে ধৌত করিয়া অগ্নির উত্তাপে ইহার অম্লত্ব নষ্ট করিয়া লইতে হয়। পাথুরে কিম্বা এনামেল করা লোহার পাত্রে দধি করিতে হইলে উহাও উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইতে হয়। কাঁচা দুধে উত্তম দধি হয় না, কারণ ইহাতে বায়ুমণ্ডলের নানা রূপ জীবাণু অবস্থিত থাকায় ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সংঘটন হইয়া থাকে। অধিক উষ্ণ অর্থাৎ ফারেন্‌হিট্‌ তাপমান যন্ত্রের ১০৪ ডিগ্রির অধিক উত্তপ্ত (যে দুগ্ধের উত্তাপ আঙ্গুলে সহ্য হয় না) দুগ্ধে জোড়ন দিলে দধির জীবাণু মরিয়া যায় এবং উত্তম দধি প্রস্তুত হয় না। ঈষদুষ্ণ অর্থাৎ মনুষ্য শরীরের সম পরিমাণ উত্তাপ বিশিষ্ট দুগ্ধ, দধির জীবাণুর অতিশয় প্রিয়। এই রূপ উষ্ণ দুগ্ধ নূতন মৃত্তিকা পাত্রে ঢালিয়া অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ দধি, দুগ্ধের এক পার্শ্বে দিয়া পাত্রের সহিত আস্তে আস্তে লাগাইয়া দিতে হয়। এক সের দুগ্ধে অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ জোড়ন দেওয়া উচিত। অধিক জোড়নে দুধের কতকাংশ ছানায় পরিণত হয়। জীবাণু পাত্রের এক ধার হইতে যেরূপ সজোরে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে এদিক ওদিক কিম্বা দুগ্ধের মধ্য স্থলে জোড়ন দিলে জীবাণু সেইরূপ সতেজে কার্য্য করিতে পারে না এবং দধিও উৎকৃষ্ট হইবে না। দুগ্ধে জোড়ন দিয়াই পাত্র নির্দ্ধারিত স্থানে রক্ষা করিতে হয়, দধি প্রস্তুত হইবার কালীন নাড়া চাড়া পাইলে জীবাণু বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় উত্তম দধি প্রস্তুত করিতে পারে না। অনভিজ্ঞ লোক কখনই অতি উত্তম দধি প্রস্তুত করিতে পারে না। এই জন্য গোপগণও সকলে "খাসা" দধি প্রস্তুত করিতে পারে না। শীতকালে অপরাহ্ন ১ বা ২ টার সময়ে দধি বসান উচিত এবং ২।৩ ঘণ্টা ইহা রৌদ্রে রাখিলে শীঘ্র দধি প্রস্তুত হয়। নচেৎ শীতকালে দধি জমিতে বিলম্ব হয়। এইকালে দধির পাত্রের তলায় ভস্ম রাখিলে দুগ্ধ শীঘ্র শীতল হয় না এবং শীঘ্র দধি প্রস্তুত হয়। দুধ আল দিবার সময়ে সেরকরা অর্দ্ধপোয়া চিনি দিলে মিষ্ট দধি হইয়া থাকে। গোপগণ খাঁটি দুগ্ধে সের করা এক পোয়া জল মিশ্রিত করিয়া ঐ জল আল দিয়া মারিয়া পরে দধি প্রস্তুত করে এই দুগ্ধে উত্তম দধি হয়। জল মিশ্রিত না করিলে দধি আরও সুস্বাদ হয়, কিন্তু ইহা অসুস্থ লোকের পক্ষে গুরুপাচ্য হইয়া থাকে। কোন কোন গোপ এক সের দুগ্ধে এক সের জল মিশ্রিত করিয়া, আলে ইহার কিঞ্চিৎ মাত্র মারিয়া দধি প্রস্তুত করে। বলা বাহুল্য যে এই দধি নিকৃষ্ট হয়।

উত্তম দধিতে জল দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং ইহাতে দানা দানা ছানা থাকিবে না। ইহা সুস্বাদু ও অম্ল মধুর। দধির জীবাণু সুস্থ শরীরেও মনুষ্যের অতিশয় হিতকারী। গরম দ্রব্যের সহিত দধি ভক্ষণ নিষিদ্ধ, কারণ ইহাতে জীবাণুর বিনাশ হইতে পারে। দধি প্রস্তুত হইলে পর এক দিনের অধিক সময় ইহা ভাল থাকে না। অত্যন্ত অম্ল দধি অনুপকারী। রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে দধি মন্থন করিয়া মাখন তুলিয়া উহা ভক্ষণ করিতে দেওয়া উচিত।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

পাটনা আলুতে পোকা—

পাটনা আলুতে আগে পোকা ধরিত না কিন্তু এক্ষণে এক প্রকার পোকার উপদ্রব হইয়াছে। ইটালী দেশে এই পোকাতে আলুর ফসল নষ্ট করে। আলুর পাতায় ও ডাঁটার ভিতর কীড়া প্রবেশ করিয়া মাজ খাইতে থাকে। ইহাতে আলু গাছের ডগা ও পাতা শুকাইয়া যায়। পাতার বোঁটার গোড়াতে যে হল্‌দে দাগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই পোকার বিষ্ঠা। কীড়া সকল জমির ফাটলে প্রবেশ করিয়া আলু পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। পোকাগুলি আলুর সঙ্গে গুদামে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় গ্রীষ্ম ও বর্ষার সময় বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। পোকাগুলি আলুর চোখের ভিতর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া কীড়া বাহির হইলে তাহারা সুড়ঙ্গ কাটিয়া আলুর ভিতর প্রবেশ করে। সুড়ঙ্গ দ্বারে যে বিষ্ঠা ত্যাগ করে তাহা দেখিয়া ইহাদের অস্তিত্ব ঠিক করা যায়। এক পক্ষ ধরিয়া খাইয়া বাড়ে, তার পর আলুর ভিতর পুত্তলি হয় ও অনন্তর পতঙ্গ হইয়া বাহির হয় এবং নিকটস্থ আলুতে ডিম পাড়ে। এক মাসের মধ্যেই তাহাদের জীবনলীলা শেষ হয়।

১৯০৭ সালে দানাপুরে এই রোগ প্রথম দেখা দেয় এবং ১৯০৮ সালে ইহা বাঁকীপুর পাটনা ও নিকটস্থ স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রদেশের কৃষি পরিদর্শক এই ব্যাপার ব্যবহারিক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদের গোচরে আনেন এবং রোগদমনের বহুবিধ চেষ্টা হয়। চাষীগণকে বালি চাপা দিয়া আলু রক্ষা করিবার উপদেশ দেওয়া হয়। বালি চাপা দিয়া রাখিলে পতঙ্গগুলি আর আলুর গায়ে ডিম পাড়িতে পারে না। কীড়াক্রান্ত আলুর পাতা ও ডাঁটাগুলি পুড়াইয়া ফেলিলে কীড়াগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। গুদামে আলো রাখিলেও উপকার হয়। পতঙ্গগুলি আলুতে ডিম পাড়িবার লোভ ছাড়িয়া আলোতে যাইয়া পুড়িয়া মরে। প্রাদেশিক কৃষি-সমিতি একটি গুদাম ভাড়া করিয়া বালি কিম্বা নিমপাতা চাপা দিয়া বীজ আলু রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর কতকগুলি আলু আগে ফিনাইলের জলে ধুইয়া শুকাইয়া তারপর নিম পাতা কিম্বা বালি চাপা দিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অন্য উপায়ে আলু রক্ষা অপেক্ষা বালি চাপা দিয়া রাখাই ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

১৯১০ সালে উক্ত সমিতি হইতে পুনরায় আলু রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয়। অন্য উপায় অপেক্ষা বালি চাপা দিয়া আলু রাখিলে অর্দ্ধেকের উপর আলু নষ্ট হইতে পায় না। ক্রুড অয়েল জলের সহিত মিশাইয়া তাহাতে আলু ধুইয়া পরে বালি

চাপা দিয়া রাখা সকল স্থানে সুবিধা জনক নহে। বিহারে এই প্রকারে আলু রাখিলে অনেক পচিয়া যায় কিন্তু মধ্য প্রদেশে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যাহা কেবলমাত্র বালি চাপা দিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই আলু পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, যদিও ঐ আলুতে কীড়া দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সে গুলি সমুদয়ই মৃত।

আলু রক্ষা করিতে হইলে চাষীগণ নিম্নলিখিত উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে লাভবান হইতে পারে—

১। খটখটে শুক্না গুদামে আলু রাখিতে হয়। গুদাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই, যেন তথায় আলুর পোকা না থাকে।

২। গুদামের মেজে জমি হইতে উচ্চ হইবে ; বর্ষায়ও যেন সেঁত সেঁতে না হয়। মেজেতে চেটাই বিছাইয়া তার উপর আলু রাখিবে।

৩। গুদামজাত করিবার পূর্ব্বে আলু এক একটি করিয়া বাছিয়া লইবে যেন তাহার মধ্যে কীড়া থাকিয়া না যায়।

৪। এক এক থাক আলু রাখিয়া তাহার উপর বালি চাপা দিতে হইবে যেন একটিও আলু বাহির হইয়া না থাকে।

৫। মাঝে মাঝে পচা আলু বাহির করিয়া ফেলা উচিত ও পুনরায় বালি চাপা দেওয়া উচিত। কোনটিতে যদি পোকা থাকে, তবে তাহা পোকা ছাড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

৬। ক্ষেত হইতে আলু তুলিবার সময় আগুণ জ্বালিলে পতঙ্গ গুলি পুড়িয়াও মরিতে পারে।

শস্যের সহজে পরিমাপ—

গোলাতে ভুট্টা থাকিলে, গুদামে আলু থাকিলে বা গাদায় শুষ্ক ঘাসের ওজন কি প্রকারে জানা যাইতে পারে, কুইন্সল্যাণ্ড কৃষি-পত্রিকা তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দিয়াছেন। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

২ ঘন ফুট বাছাই করা শুক্না ভুট্টার ওজন এক বুসেল। ভুট্টার গোলার ঘন ফুট মাপিয়া লইলে তাহাতে কত ভুট্টা-দানা আছে তাহা জানিতে বিলম্ব হয় না। কোন একটি গোলা দীর্ঘে ৩০ ফিট, প্রস্থে ১২ ফিট, এবং উর্দ্ধে ৮ ফিট হইলে—

৩০ × ১২ × ৮ = ২,৮৮০ ঘন ফিট গোলার পরিমাণ হইল ; তাহাকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে ১,৪৪০ বুসেল ভুট্টার ওজন পাওয়া যাইবে।

আলুর পরিমাণ বাহির করিতে হইলে গুদামের যত ঘন ফিট পরিমাণ হইবে তাহাকে ৮ দ্বারা বিভাগ করিলে ভাগ ফল তত বুসেল আলু হইবে। ঘাসের গাদার ঘন ফিটকে ৫১২ দ্বারা বিভাগ করিলে ভাগ ফল তত টন ঘাস হইবে।

এড়ি রেশম পোকার বীজ সরবরাহ—

চাষের জন্য এড়ি রেশম পোকার বীজ সব সময়ে মেলে না। অভাবে খারাপ বীজ লইয়া চাষ করিতে হয়। কিছু দিন হইল কীট তত্ত্ববিদ লেফ্রয় সাহেব বীজ সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য একটা বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

(১) নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র হইতে নির্দ্ধারিত মূল্যে বীজ সরবরাহ করা হইবে।

(২) যাঁহাদের বীজের আবশ্যক তাঁহারা তাঁহাদের নাম ধাম লিখাইয়া রাখিবেন এবং বীজ কোন সময় আবশ্যক জানাইবেন।

(৩) যাঁহারা নির্দ্ধারিত মূল্যে ভাল বীজ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক বা অন্য কাহারও সহিত বীজ বদল করিতে ইচ্ছুক তাঁহারাও নাম ধাম ঠিকানা জানাইয়া রাখিবেন।

বিক্রয় জন্য বীজের নিম্নলিখিত মূল্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে—

২০০	॥০ আনা।	১০,০০০	২৲ টাকা।
৫০০	৸০ ,,	১৬,০০০ (এক আউন্স)	২॥০ টাকা।
১০০০	১৲ টাকা।	৩২,০০০ (২ ,,)	৩॥০ টাকা।
৫০০০	১॥০ টাকা।		

যাঁহারা বীজ বদল করিতে বা ক্রয় বিক্রয় করিতে চান তাঁহাদিগকে (১) এই নির্দ্ধারিত মূল্য মানিয়া চলিতে হইবে; (২) সময় থাকিতে জানাইতে হইবে, কখন্ তাঁহারা তাঁহাদের উদ্বৃত্ত বীজ বিক্রয় করিবেন; (৩) কখন্ বীজ বদলাই করিতে পারেন; (৪) কখন্ তাঁহাদের বীজ আবশ্যক; (৫) প্রত্যেক বৎসর নূতন বীজ কোন মরসুমে আবশ্যক এবং প্রত্যেক বৎসরে কোন মরসুমে উদ্বৃত্ত বীজ তৈয়ারি হইতে পারে। এই বন্দোবস্তে এড়ির পোকা প্রতিপালনের বিশেষ সুযোগ হইবে। কোন কোন জেলায় রেশম চাষীগণ জুলাই মাসে বীজ চান তাঁহাদের নিকট হইতে মার্চ্চ মাসে উদ্বৃত্ত বীজ পাওয়া যাইতে পারে। আবার কেহ মার্চ্চ মাসে বীজ সংগ্রহ করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে জুলাই অগষ্ট মাসে উদ্বৃত্ত বীজ পাওয়া যাইবে।

বড় চাষীগণ বিক্রয়ের জন্য সকল মরসুমেই অনেক ডিম দিতে পারেন এবং রেশম চাষের প্রধান কেন্দ্রে সব সময়েই প্রায় বীজের দরকার এবং সর্ব্বদা বীজও বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখা হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় আর এক মহৎ সুবিধা এই যে সুদূরবর্ত্তী স্থান যথা গুজরাট, বেহার, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, উত্তর ভারত হইতেও বীজ বদলাই করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে বিশেষ খবরের জন্য পুষা তত্ত্বানুসন্ধানালয়ে, ইম্পিরিয়াল কীটতত্ত্ববিদের নিকট পত্রাদি লেখা কর্ত্তব্য। তাঁহার ঠিকানা—H. M. Lefroy Esqr., Imperial Entomologist Agricultural Research Institute, Pusa, Bengal.

আবহাওয়া ও শস্য সংবাদ—

২০শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত—যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে আশু সুবৃষ্টি সূচনা দেখা যাইতেছে না। ভাদ্র আশ্বিন মাসেও বর্ষা আশানুরূপ হইবে না বলিয়া সরকারী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রায়ই অধিকাংশ স্থলেই সুবৃষ্টি হয় নাই। উত্তর ভারতের কোন কোন স্থানে, মান্দ্রাজের উত্তরাংশে, এবং কাশ্মীরে অতি বৃষ্টি হইয়াছে।

বৈশাখ হইতে ২০শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশে, আসাম, ছোটনাগপুর এবং বিহারে উচিতমত বারিপাত হইয়াছে, কিন্তু উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, ভারতের পূর্ব্বোত্তরাংশ, মধ্য প্রদেশ এবং ভারতের অন্যান্য সকল স্থানেই বৃষ্টির অভাব অনুভূত হইতেছে।

বহু স্থানের হৈমন্তিক শস্য বীজ বপন ও ধান্য রোপণ বন্ধ রহিয়াছে। বীজধান ও ক্ষেত্রস্থ অন্যান্য শস্য শুকাইতেছে। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃই বাড়িতেছে। গবাদি পশুরও খাদ্যের ও পাণীয় জলের অভাব বোধ হইতেছে।

অল্প দিন হইল বোম্বাইয়ের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু সর্ব্বত্রই আরও বৃষ্টির আবশ্যক। সুরাটে এখন বৃষ্টি হইলেও আর তথাকার ধান্য বীজ রক্ষা হইবে না।

পঞ্জাবেও বৃষ্টির অভাব। যেখানে সেচন জলের সুবিধা নাই তথায় ক্ষেতের শস্য শুকাইতেছে।

হুগলী, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণায় বৃষ্টির অভাবে চাষ আবাদ বন্ধ হইয়া আছে। প্রেসিডেন্সিবিভাগে নদীয়া জেলায় বৃষ্টি হইলেও অধিকাংশ জেলাতেই বৃষ্টি নাই।

ভারতে ফলের ব্যবসা—বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফল সংরক্ষণ করিতে এবং ফলের বাগানের উন্নতি করিতে পারিলে ভারতে অনেকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে। এ কথা সকলেই জানিতেছেন, কিন্তু কেহই প্রাণ মন দিয়া ফল উৎপাদন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। সম্প্রতি মজঃফরপুরে ফল সংরক্ষণের একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং উক্ত কারখানার সংরক্ষিত ফল কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ার্থ আসিয়াছে। বঙ্গদেশ কিম্বা আসামের আর কোথায়ও রীতিমত ফলের ব্যবসায়ের কথা শুনা যায় না। অনেকেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে, কিছু দিন হইল বাঙ্গালোরের সাত মাইল দূরে বিকাশীপুর নামক স্থানে একটি ফলের বাগান তৈয়ারি হইতেছে। বাগানটির পরিমাণ ১১২ একর, জমিফলের বাগানের উপযুক্ত। এই বাগানে পূর্ব্ব হইতেই অষ্ট্রেলিয়া দেশীয় অনেক ফলের গাছ আছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে সুবিজ্ঞ উদ্যান পালক আনাইয়া বাগানটি বিধিমত ফলের গাছে সুসজ্জিত করা হইতেছে। এই যৌথ কারবারের মূলধন ১॥ লক্ষ টাকা। এখানকার উৎপন্ন ফল দেশবিদেশে সংরক্ষিত করিয়া পাঠান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই বাগানটির নাম স্বভেলস্ ষ্টেট্। এই বাগানে আপেল, পিচ, কুল, এপ্রিকট, কুরান্টস্ ও ৩০০০ আঙ্গুর গাছ আছে। একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী হইতে ১৫০ ফিট উর্দ্ধে জল উঠান হয় এবং সেই জল এক মাইল দূর পর্য্যন্ত চালিত হয় এবং ৯০০০ গ্যালন জল তুলিতে দেড় কিম্বা দুই আনা মাত্র খরচ। এক গ্যালন জলের ওজন কমবেশী ৫ সের।



শ্রাবণ, ১৩১৮ সাল।

ভারত সীমান্তে ক্ষেত্রজ ও বন্য ফল।

সকলেই জানেন যে ভারতের উত্তর সীমা, পর্ব্বতরাজ হিমালয়। কিন্তু হিমালয় সম্বন্ধে জন সাধারণের একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। তাঁহারা হিমালয় বলিতে কেবল একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ হিমালয় নামক পর্ব্বতশ্রেণী দৈর্ঘে, প্রায় ১৫০০ শত মাইল হইবে এবং ইহা প্রস্থে ১৫০ হইতে ২০০ মাইল। জীবজন্তু, উদ্ভিদ অথবা ভূ-তত্ত্ব হিসাবে হিমালয়ের সকল স্থান সমান নহে। এই সমুদয় বিষয়ের পার্থক্য হিসাবে হিমালয়ের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে—যেমন সিকিম হিমালয়, নেপাল হিমালয়, পঞ্জাব হিমালয় ইত্যাদি। মোটামুটি ধরিতে গেলে হিমালয়কে দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়—উত্তরপশ্চিম হিমালয় ও উত্তরপূর্ব্ব হিমালয়। এই দুই ভাগের প্রাকৃতিক গঠনের অনেক তারতম্য আছে। উত্তরপশ্চিম হিমালয় সমতল ভূমি হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, ইহার দক্ষিণ গাত্র প্রায়ই নগ্ন এবং আদিম পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণে আর একটি অপেক্ষাকৃত অল্পোচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী রহিয়াছে। শেষোক্তকে শিবালিক শৈলমালা বলে। শিবালিক শৈলমালা ও আদিম হিমালয়ের মধ্যে কতকগুলি উন্নত উপত্যকা দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ইহাদের নাম দুন। দেরাদুন ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বপশ্চিম হিমালয়ের পর্ব্বত মালা যেন সহসা সমতল হইতে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের দক্ষিণ গাত্র নানাপ্রকার উদ্ভিদে সুশোভিত এবং এই পর্ব্বতমালার দক্ষিণে আর কোন পর্ব্বতমালা নাই। এ স্থলে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। হিমালয়ের সর্ব্ব দক্ষিণে তরাই নামক স্থান হিমালয়কে ভারতের সমতল ক্ষেত্র হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। তরাইয়ের অধিকাংশ স্থানই দুর্গম। বড় বড় ঘাস, শালবন ও অন্যান্য লতাগুল্ম প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। ইহা বন্যজন্তু ও ম্যালেরিয়ার আবাস ভূমি। কোন কোন স্থানে জঙ্গল কাটিয়া চাষ হইতেছে বটে, কিন্তু সমস্ত তরাইয়ের অনুপাতে তাহার পরিমাণ নগণ্য।

হিমালয়ের দুন নামক স্থানগুলি প্রায়ই নাতি-শীতোষ্ণ। অবশ্য আমাদের নিম্নবঙ্গ অপেক্ষা এই সকল স্থানে শীত ও বর্ষা উভয়ই কিছু অধিক। এ সকল স্থলে জমি বেশ উর্ব্বর, বিশেষতঃ এ সমুদয় স্থানে যথেষ্ট ফল জন্মিয়া থাকে।

আমরা বাজারে যে সমুদয় ফলকে সাধারণতঃ মেওয়া বলিয়া থাকি সে সকলের অধিকাংশই উত্তরপশ্চিম হিমালয়ের নানাস্থান—কুলু, কাশ্মীর, হরিপুর প্রভৃতি ও পেশোয়ার, কোহাট, ব্যন্নু প্রভৃতি স্থান হইতে আসে। এই সমুদয় ফলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান—আখরোট্, আঞ্জীর, ডালিম, পীচ, আলুবোখরা, সেও, নাসপাতি, বাদাম, পেস্তা, আঙ্গুর ও কিসমিস্। আঞ্জীরের নাম বোধ হয় কেহ কেহ অবগত নহেন। ইহা একপ্রকার ডুমুর। মেওয়াওলাদের দোকানে ইহা মালা গাঁথিয়া রাখে। উহার একটি খুলিয়া লইয়া কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলেই ডুমুরের সহিত সাদৃশ্য অনুভূত হইবে। এই সমুদয় ফল ভিন্ন, পার্ব্বত্য লোকেরা আরও কয়েকপ্রকার ফল ব্যবহার করে এবং তাহাদেরও কলিকাতায় আমদানি আছে।

চিল গোজা তাহার মধ্যে একটি। ইহার রঙ অনেকটা কাল ও ধূসর বর্ণ মিশ্রিত। আকৃতি দেশী খেজুরের আঁটির ন্যায়—সরু, গোল, ও প্রায় ১৷০ ইঞ্চ লম্বা। উপরের খোসা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ভিতরে বাদামের ন্যায় শাঁস পাওয়া যায়। ইহা Pinus Gerardiana নামক এক জাতীয় চিড় গাছের * ফল। স্থানীয় লোকে বিশেষতঃ শিখদিগের বালক বালিকাগণ ও স্ত্রীলোকেরা তৃপ্তির সহিত আহার করে। উর্ণী—ইহাও বাদামের ন্যায়; ভিতরে শাঁস পাওয়া যায়। ইংরাজীতে ইহাকে হেজল (Hazel nut or Filbert) অথবা ফিল্‌বার্ট বলে। ইহা Corylus colurna নামক গাছের ফল। বন্য অবস্থাতেই এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ফলগুলি ছোট। কিন্তু পিরপঞ্জাল পাহাড়ে (কাশ্মীর) বড় বড় বাদামের মত ফল পাওয়া যায় এবং ফলও বাদামের ন্যায় খাইতে সুস্বাদু।

ইংরাজীতে যাহাকে Plum বলে, স্থানীয় পার্ব্বত্য ভাষায় তাহার নাম আলুচা। আলুচার বৈজ্ঞানিক নাম Prunus communis var inisititia। ইহা শুষ্ক অবস্থায়

---

* অনেকে পাইন (Pine) গাছকে দেবদারু বলিয়া থাকেন। কিন্তু সেটা অসঙ্গত। Cedrus Deodara নামক হিমালয়ের বৃক্ষ রাজকেই এই নামে অভিহিত করা উচিত। বাস্তবিকই ইহা দেবদারু অর্থাৎ দেবতাগণের বৃক্ষ। ইহা, যে স্থলে পাইন জন্মে তাহার অনেক উপরে জন্মিয়া থাকে এবং ইহার দেহও বিশাল। সিমলায় দুই জাতীয় চিড়েরই আধিক্য দৃষ্ট হয়—P. longifolia ও P. excelsa। স্থানীয় লোকেরা প্রথমোক্তকে চিড় ও শেষোক্তকে কয়েড় বলিয়া থাকে। অবশ্য স্থান ভেদে নামেরও প্রভেদ আছে। কিন্তু চিল্, চিড়, এই দুই নামের প্রাধান্য অধিক। সুতরাং আমরা পাইনেকই চিড় নামে অভিহিত করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে আমাদের দেশের দেবদারু ও পার্ব্বত্য দেবদারুর মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই।

এতদ্দেশে আমদানি হয় এবং আমাদের নিকট আলুবোখারা নামেই পরিচিত। সমস্ত পশ্চিম হিমালয়ে,—গড়ওয়াল প্রদেশ হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত, আলুবোখারা অথবা আলুচার গাছ বন্য অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। Prunus গণে (Genus) অনেকগুলি উপাদেয় ফলের বৃক্ষ আছে। P. Amygdalus বাদাম। কাশ্মীরে ও উত্তর পঞ্জাবে স্থানে স্থানে ইহার চাষ হয়। একবারেই পত্রশূন্য গাছে রক্তাভ বেগুনি রঙের ফুল দেখিতে অতি সুন্দর। প্রত্যেক বৎসরেই বহু পরিমাণে বাদাম পেশওয়ার দিয়া এতদ্দেশে আমদানি হয়। P. Armeniaca ইহা আমাদের নিকট খোবানি নামে পরিচিত; স্থানীয় নাম জর্দালু। উত্তরপশ্চিম হিমালয়ের শুষ্ক ও কাঁচা খোবানি প্রচুর পরিমাণে খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীরের অন্তর্গত লে নামক স্থানে আশ্বিন মাসে শত শত মণ খোবানি আসে। আফ্‌গানিস্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে খোবানি আমদানি হয়। অনেক পার্ব্বত্য গ্রামেই খোবানির গাছ নিতান্ত সাধারণ বৃক্ষ। P. Cerasus বন্য অথবা অম্ল চেরি। স্থানীয় নাম গিলাস্। ইহা অপেক্ষা মিষ্ট চেরী অথবা P. Avium লোকে অধিক পছন্দ করে। সাহেবরাও মিষ্ট চেরী পাইলে বিশেষ আনন্দিত হন। এই দুই জাতীয় ভিন্ন আরও এক প্রকার চেরী আছে। ইংরাজিতে ইহাকে Bird cherry বলে এবং পাহাড়ীরা কালা কাঠ বলে। ফল অপকৃষ্ট কিন্তু ভক্ষণযোগ্য। পাতা বেশ পুষ্টিকর পশুখাদ্য। পদ্মকাষ্ঠ নামক গাছও একপ্রকার চেরী—P. Puddum—আছে। ইহা স্থানীয় লোকে ভক্ষণ করে, কিন্তু সাহেবেরা প্রধানতঃ (Cherry brandy) চেরী ব্রাণ্ডি নামক সুরাসার তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যবহার করেন। পিচ ও নেক্টারিণ উভয়ই এই গণের, P. Persica নামে অভিহিত। এই সমুদয় গাছই বন্য ও কর্ষিত উভয় অবস্থাতেই জন্মিয়া থাকে; তাহাতে ফলের অবশ্য তারতম্য হইয়া থাকে।

আখরোট পার্ব্বত্যপ্রদেশের অন্যতম ফল। সমস্ত পার্ব্বত্য গ্রামেই গ্রামবাসীগণের আঙ্গিনায় ২।১টা আখরোটের গাছ আছে। এতদ্ভিন্ন পতিত জমিতে অনেক স্থলে সুবৃহৎ আখরোটের বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আখরোটের দুইটি জাতি দৃষ্ট হয়—একজাতির খোলা পাতলা; ইহা কাগজী আখরোট এবং অন্য জাতির খোলা পুরু। কাগজী আখরোট প্রধানতঃ কাশ্মীর ও চম্বা প্রদেশে উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে এবং ইহার দামও অধিক।

কাশ্মীরে তুঁত গাছের অত্যন্ত বাহুল্য। চেনার নামক বিশাল বৃক্ষ ও তুঁত এবং আখরোট এই তিনটিকে কাশ্মীরে রাজকীয় বৃক্ষ বলিয়া থাকে। অর্থাৎ রাজার অনুমতি ভিন্ন এই সমুদয় বৃক্ষ ছেদন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ছোটনাগপুর ও পশ্চিম অঞ্চলে অনেক নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি যেরূপ মহুয়ার সময় ফুল

প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করে, কাশ্মীরে তুঁতও সেইরূপে ব্যবহৃত হয়। অনেক দরিদ্র কাশ্মীরী কৃষক এক বেলা তুঁত ভক্ষণ করিয়াই কাটাইয়া দেয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশের আঙ্গুর অন্যতম ফল। কিন্তু আঙ্গুর চাষের যতদূর উন্নতি হওয়া সম্ভব, চাষ প্রণালীর সেরূপ কিছুই উন্নতি হয় নাই। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া একদিকে পেসওয়ার, ব্যন্নু, কোহাট ও অন্য দিকে হাজারা ও কাশ্মীরে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত এবং শ্বেত ও কৃষ্ণ উভয় জাতীয় আঙ্গুরের অনেকপ্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। গুচ্ছ আঙ্গুর অপেক্ষা বাক্স আঙ্গুর চাষের পাইট অনেক অধিক, কিন্তু উদ্ভিদতত্ত্বের হিসাবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কম। কাশ্মীরে আজকাল দ্রাক্ষা চাষের উপর দরবারের নজর পড়িয়াছে এবং কতকগুলি ফরাসী ও ইতালীয় জাতীয় দ্রাক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কাশ্মীরের অনেক স্থানই যে দ্রাক্ষা চাষের আদর্শ জমি তাহার কোন সন্দেহ নাই, তবে পরীক্ষাগুলি এখনও পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ফল উৎপাদন করে নাই। পূরাকালে কাশ্মীর যে উৎকৃষ্ট জাতীয় দ্রাক্ষা উৎপাদন করিত, তাহা এখন সাধারণতঃ উৎপাদিত হয় না। তাহার স্থান অপকৃষ্ট ফল-প্রসবী দ্রাক্ষালতা দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। এখনও যদি উৎকৃষ্টতর জাতি নির্ব্বাচিত হয় এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আঙ্গুর উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে অচীরেই কাশ্মীর তাহার দ্রাক্ষা চাষ সম্বন্ধে পুরাতন উচ্চ স্থান পুনপ্রাপ্ত হইতে পারিবে।

উত্তরপশ্চিম হিমালয়ের অনেক স্থানে দাড়িম্ব বৃক্ষ বন্য অবস্থায় জন্মিয়া থাকে। কোহালা হইতে বারমূলা যাওয়ার পথে প্রায়ই দাড়িম্বের ঝোপ্ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি অবশ্য অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ফলে অল্প। কিন্তু এই সমুদয় ফল রঙ তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে দাড়িম্বের চাষ রহিয়াছে ও এই সমুদয় স্থানের উৎপাদিত দাড়িম্ব বেশ সুস্বাদু ও বড়। কিন্তু দাড়িম্ব চাষের যে পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। অনেকগুলি বাগানই পুরাতন এবং গাছের অবয়ব দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সমুদয়ের বয়স যথেষ্ট হইয়াছে। নূতন বাগান কিম্বা নব-রোপিত বৃক্ষের পরিমাণ কম। কাশ্মীর ব্যতীত পেশওয়ার ও কাবুলের দিক হইতে ভারতে অনেক দাড়িম্ব আমদানি হয়। রাওলপিণ্ডি এই সমুদয় ফল বিতরণের কেন্দ্র।

প্রকৃতপক্ষে আহারোপযোগী ফল না হইলেও বিহিদানাকে ফলের মধ্যে গণ্য করিতে পারা যায়। বিহিদানা অথবা বিহি বৃক্ষের বীজ অত্যন্ত মূল্যবান দ্রব্য। ইহার সের প্রায় ২॥০ হইতে ৩৲ টাকা। পারস্য, আফগানিস্থান ও কাশ্মীর হইতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে এতদ্দেশে আমদানি হয়। কাশ্মীর হইতেই বৎসরে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার বিহিদানা রাওলপিণ্ডিতে আসিয়া থাকে। ইহার যেরূপ

বিলাতে কাট্‌তি আছে তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে এখন যে পরিমাণে বিহিদানা উৎপাদিত হয়, তাহার চতুর্গুণ উৎপাদিত হইলেও বাহিরে কাট্‌তি হইবার অসুবিধা হইবে না।

বিহিদানার নিকট আত্মীয়—সেও এবং নাসপাতি। উভয়ই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পার্ব্বত্য অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। নাসপাতি অপেক্ষা সেও উচ্চতর প্রদেশের গাছ। লাহোর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চপ্রদেশে নাসপাতির বাগান দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্থানে স্থানে ইহা এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল প্রসব করে যে অনেক সময় উদ্বৃত্ত ফল নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। দেরাদুনে এইরূপ অবস্থা আমাদের দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল। সেও, পেশওয়ার ও আফগানিস্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হয়; কিন্তু কাশ্মীরের সেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রত্যেক শৈত্যযুক্ত উপত্যকায় সেওর চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অসময়ে শ্বেতবর্ণ ফুল হইতে দেখা যায় কিন্তু তাহা হইতে প্রায়ই ফল হয় না, প্রত্যেক বৎসর বারমূলার অনেক সংখ্যক সেও নিম্নপ্রদেশে প্রেরিত হইবার জন্য আসে, সেওর কয়েকটি উৎকৃষ্ট জাতি অত্যন্ত কোমল, দেরাদুনে প্রেরিত হইবার অনুপযোগী, সেগুলি প্রেরিত হয় না। যে সমুদয় কাশ্মীরী সেও বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট জাতীয় নহে।

পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার ফল ব্যতীত আরও অনেকপ্রকার ফল সীমান্ত প্রদেশে দৃষ্ট হয়। সেগুলি কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের নিকট পরিচিত নাই এবং স্থানীয় লোকেরাও তৎসমুদয় উৎপাদন করিতে বিশেষ প্রয়াস পায় না। কিন্তু এ সমুদয়ই যে নিকৃষ্ট জাতীয় ফল তাহা বলিতে পারা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাশ্মীরের বন্য ষ্ট্রবেরী, ব্ল্যাকবেরী ও কারাণ্টের বিষয় বলিতে পারা যায়। আলমোরার উদ্যান উৎপাদিত ষ্ট্রবেরীর সহিত কাশ্মীরী বন্য ষ্ট্রবেরীর পার্থক্য সামান্য এবং সে পার্থক্যও চাষ দ্বারা অপসারিত হইতে পারে। ফলতঃ সীমান্ত প্রদেশের ফুল, ফল অথবা ফসলের প্রতি এখন জনধারণের মনোযোগ বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হয় নাই, যদি সাধারণের মন আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমরা অনেক উৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ্য খাদ্য ঐ সমুদয় স্থান হইতে পাইতে পারিতাম।

উদ্ভিদ ও মানব জীবনের একতন্ত্রীতা—মৈমনসিংহে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, তাঁহার অভিভাষণের উদ্ভিদ্‌জগৎ সম্বন্ধীয় উক্তির সারমর্ম্ম আমরা প্রকাশ করিলাম।

আমাদের প্রতিবেশী উদ্ভিদ্‌গণের যে নীরব বাক্যহীন জীবনস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সহিত আমাদের জীবন স্রোতের একতন্ত্রীতা আছে কি? আমরা যেমন বাহিরের আঘাতে সাড়া দিই, বৃক্ষও সেরূপ সাড়া দেয় কি না? এবং এই

সাড়া দিতে কত সময় লাগে ? বাহিরের অবস্থানুসারে সাড়া দিবার সময়ের তারতম্য হয় কি না ? আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের আঘাত ভিতরে বহন করে, উদ্ভিদেরও সেরূপ স্নায়ুসূত্র আছে কি না ? স্নায়ুর স্রোতের গতির পরিমাণ কত ? এবং বিভিন্ন অবস্থায় এই গতির হ্রাস বৃদ্ধি হয় কি না ? আমাদের হৃৎপিণ্ড যেমন আপনাপনি স্পন্দিত হয়, বৃক্ষেরও এরূপ কোন পেশি আছে কি যাহা স্বতঃস্পন্দিত হইয়া থাকে ? "স্বতঃস্পন্দন" এ কথার অর্থ কি ? মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তে যে এক প্রচণ্ড আঘাতের স্রোত প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে চিরকালের মত অভিভূত করে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে বৃক্ষও কি তাহার চরম মুহূর্ত্তে এইরূপ আঘাতের বশবর্ত্তী হইয়া নির্জ্জীব ও নিস্পন্দ হয় ?

এ সকল প্রশ্নের সমাধান কে করিবে ? অধ্যাপক বসু বলেন যদি বৃক্ষ তাহার জীবনেতিহাস নিজেই তাহার আপন অক্ষরে, আপন ভাষায় প্রকাশ করে, তবেই আমরা এ সকল তথ্যের যথাযথ বিবরণ পাইতে পারি। কিন্তু বৃক্ষকে তাহার জীবন বৃত্তান্ত লিখান অসম্ভব ব্যাপার। বড় আনন্দের বিষয় যে গত কয়েক বৎসরের অপ্রতিহত চেষ্টায় আচার্য্য বসু ভারতীয় শিল্পীর সাহায্যে এক অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া এই নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপারকেও সম্ভবপর করিয়াছেন। এই "তরুলিপি" যন্ত্রের সাহায্যে তরুর প্রতি মুহূর্ত্তের বৃদ্ধি, স্বতঃস্পন্দন ও মৃত্যুর শেষ আঘাত সমস্তই তাহার নিজ অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবে। স্নায়ু প্রবাহের গতি নিরূপিত হইবে এবং স্বতঃস্পন্দনের অদ্ভুত রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। ফলতঃ বিজ্ঞানাচার্য্যের বহু বৎসরের সাধনার ফলে আমরা এখন সম্যক উপলব্ধি করিতেছি যে, উদ্ভিজ্জীবন ও আমাদের জীবন একই সূত্রে গ্রথিত। বহুর মধ্যে একত্ব দর্শন ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম সীমা। বিশ্বতন্ত্রীর একই তন্ত্রের মূর্চ্ছনা এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড। সবই এক সুরে বাঁধা। ভারতের নিজস্ব এই সার সত্যের পুনঃ প্রচার করিয়া তিনি আমাদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

বিজ্ঞানাচার্য্যের কতিপয় পরীক্ষা (Experiment) আমরা বিবৃত করিলাম—আঘাত প্রাপ্ত হইলে বৃক্ষের সাড়া দিতে কত সময় লাগে ? ভেকের পায়ে চিমটি কাটিলে তাহার সাড়া দিতে সেকেণ্ডের শতাংশের একাংশ লাগে, সতেজ লজ্জাবতী-লতাকে আঘাত করিলে সে সাড়া দিতে প্রায় ইহার ছয় গুণ সময় লয়। আবার আঘাতের তারতম্যে সাড়া দিবার সময়ের তারতম্য হয়। আমরা যেমন ক্লান্ত বা শীতার্ত্ত হইলে আঘাতে সাড়া দিতে অধিক সময় লই, বৃক্ষও অবিকল সেইরূপ লয়। সকাল বেলা যখন আমরা নিদ্রা হইতে উঠি তখন যেমন জড়তা বশতঃ শীঘ্র কোন আঘাতে সাড়া দিই না, বৃক্ষের অবস্থাও সকালে ঠিক এইরূপ। আবার শীতকালে আঘাত পাইলে প্রকৃতিস্থ হইতে আমাদের যেমন অধিক সময় লাগে গাছেরও শীতকালে আঘাত পাইয়া সারিতে সেইরূপ অধিক সময় লাগে। গ্রীষ্মকালে যে আঘাত সারিতে বৃক্ষ ১৫ মিনিট সময় লয়, শীতকালে তাহা হইতে সারিতে হইলে প্রায় দ্বিগুণ সময় লয়।

আমাদের স্নায়বীয় স্রোতের বেগ যেমন উষ্ণতায় বৃদ্ধি এবং শৈত্যে হ্রাস হয়, বৃক্ষের স্নায়বীয়বেগও এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উষ্ণতায় বৃক্ষের স্নায়বীয়বেগ প্রায় ৭ গুণ বর্দ্ধিত হয়। আমাদের স্নায়ু সকল এক স্থান হইতে অন্যস্থানে সংবাদ প্রেরণ করে। অধ্যাপক বসুর উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষের স্নায়বীয় সংবাদ

প্রেরণ নির্ণয় করা যাইতে পারে এবং এই সংবাদ প্রেরণে কত সময় লাগে তাহাও নির্ণীত হয়। ভেক দেহের স্নায়বীয় বেগের তুলনায় বৃক্ষের স্নায়বীয় বেগ অপেক্ষাকৃত মন্দ, কিন্তু অন্য ইতর জাতীয় জীবের তুলনায় দ্রুতগামী। আমাদের স্নায়ুতে বৈদ্যুতিক স্রোত প্রেরণ করিলে যেমন এক স্থান উত্তেজিত এবং অপর স্থান অবসাদগ্রস্ত হয় ও স্নায়ুর সংবাদ বহন ক্ষমতা একেবারে লোপ পায়; বৈদ্যুতিক স্রোতে বৃক্ষ স্নায়ুর অবস্থাও ঠিক এইরূপ হয়।

আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেমন আপনা আপনি নিস্পাদিত হয়, বৃক্ষেও আমরা এইরূপ স্বতঃ স্পন্দন দেখিতে পাই, বন চাঁড়ালের পাতার নৃত্য স্বতঃ স্পন্দন ভিন্ন আর কিছুই নহে। জীব বাহিরের নানাশক্তি সঞ্চয় করিতেছে। আলোক, উত্তাপ ও খাদ্য দ্রব্যের সঞ্চিত শক্তি পরিপূর্ণ হইয়া যখন উচ্ছলিত হয় তখনই স্বতঃস্পন্দন আরম্ভ হয়। ভেকের হৃদয় কাটিয়া বাহির করিলে যেমন তাহার স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, বন চাঁড়ালের পাতা কাটিয়া লইলেও ইহার নৃত্য বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, কিন্তু যেমন সূক্ষ্ম নলের সাহায্যে ভেক হৃদয়ে রক্তের চাপ দিলে স্পন্দন ক্রিয়া অবিরত চলিতে থাকে, বন চাঁড়ালের পাতাও এইরূপ নলের সাহায্যে উদ্ভিদ রসের চাপ পাইলে অবিরত স্পন্দিত হইতে থাকে। ইথর বা ক্লোরোফরম্ প্রভৃতি বিষ ক্রিয়ার ফল জীব ও উদ্ভিদ হৃদয়ে ঠিক একরূপ।

অবশেষে আমরা যেমন এক ভীষণ আঘাতের তাড়নায় চিরদিনের মত নিস্তব্ধ হই—আর কোন আঘাতের সাড়া দিই না—বৃক্ষের জীবনেও এমন এক মুহূর্ত্ত আইসে যখন সে কোন এক ভীম আঘাতের প্রহরণে একেবারে নিস্পন্দ হইয়া যায়। মৃত্যুর সেই দারুণ আঘাতে হঠাৎ এক বৈদ্যুতিক স্রোত বৃক্ষ শরীরে প্রবাহিত হয় এই সময়ে "তরুলিপি" যন্ত্রের উর্দ্ধগামী রেখা হটাৎ নিম্নদিকে ধাবিত হইয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়। বৃক্ষও আর কোন আঘাতে সাড়া দেয় না।

পত্রাদি

ছোট সরিষা তৈলের কল—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব শর্ম্মা কল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় জানিতে চান—কলটি কাষ্ঠের কিম্বা লোহার? সহজে বসাইতে পারা যায় কি না? কলটি ভঙ্গপ্রবণ কি না? কে এই কল ব্যবহার করিতেছেন তাহার নাম ঠিকানা? কলটি বসাইতে কত খরচ?

[তদুত্তরে আমরা লিখিতেছি যে, কলটি লোহার—একজন সামান্য লোকে বসাইতে পারে। বসাইবার খরচ খুব সামান্য। ২॥×২॥ ফিট স্থানের মধ্যে বসান যায়। কল খুব শক্ত—প্রায়ই ভাঙ্গে না, ভাঙ্গিলে সহজে মেরামত হয়। অনেক লোকে এই কল ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ঠিকানা আমরা রাখি না। কল প্রস্তুতের জন্য আমাদের কারখানা নাই। আবশ্যক হইলে আপনাকে কল তৈয়ারি করাইয়া দেওয়া যায়। অথবা মনে করিলে আপনিও কলিকাতার মেঃ কে, এল, মুখার্জ্জি বা বরণ কোম্পানি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লোহার কারখানা হইতে তৈয়ারি করাইয়া লইতে পারেন।]　　কৃঃ সঃ

তুলা-বীজ—শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়, ৮ ভূদেববাবুর বাটী, চুঁচড়া।

তুলা-বীজ (যাহা হইতে তৈল বাহির করা যাইতে পারে) কোথা হইতে সুবিধা দরে ও অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে? কোন স্থানের বীজ হইতে অধিক পরিমাণে তৈল বাহির করা যায় অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন।

[যেখানেই সূতার কল আছে সেই খান হইতে তুলা বীজ পাওয়া যাইতে পারে। বাঙলায় বাউড়িয়া, শ্যামনগরে ডানবার কটন মিল এবং শ্রীরামপুরে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে সূতা তৈয়ারি হয়। বম্বেতেও সূতার কল আছে। এই সব কল হইতে মিশ্রিত তুলা বীজ পাওয়া যায়। কোন প্রদেশের বীজ হইতে কি পরিমাণ তৈল হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। এ বিষয় অনুসন্ধান করা যাইবে।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের ঠিকানা চান—কিছু দিন গত হইল তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ঠিকানা দেওয়া বৃথা।] কৃঃ সঃ।

ঈশ্বরবাবু ও আলুর কীট

আমাদের দেশের সাধারণ কৃষকদিগের উপকারের জন্যই যে আলুর চাষ সম্বন্ধে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, ইহা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব সাধারণ কৃষকদিগকে আলুর পোকা বুঝাইতে যাইয়া "ইংলণ্ডীয় কেটারপিলার" (Caterpillar) এবং "ইংলণ্ডীয় ফ্লোর বিটল" (Flour Beetle) ইহাদের উপমা দিয়া যে, কোন ভুল করেন নাই, ঈশ্বরবাবু তাহা সপ্রমাণ করিতে যাইয়া বৃথা বাক্যব্যয়ে মুদ্রিত দুই পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। এই উপমাতে কৃষকেরা যাহা বুঝিবে, অষ্ট্রেলিয়ার হিপ্পোপোটেমাসের (Hippopotamus) সহিত উপমা দিলেও যে তাহাদের ইহা অপেক্ষা কম জ্ঞান জন্মিবে বলিয়া মনে হয় না। "ন্যায়" "সদৃশ" কথার দ্বারা যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, সেই উপমারই ভুল দেখান হইয়াছে। যে বস্তুর সহজে উপলব্ধি হয় না, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্যই উপমার ব্যবহার। ঈশ্বরবাবুর উপমার দ্বারা আলুর পোকা কিরূপ সহজবোধ্য হইয়াছে, পাঠকগণ বিচার করিবেন। বিলাত প্রভৃতিতে প্রকাশিত পুস্তিকাদির জ্ঞানই যে এইরূপ লেখকের সম্বল এই উপমা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। আমাদের দেশে কি "কেটারপিলার" নাই? বিলাত অপেক্ষা বহুসংখ্যক আছে। ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরবাবু আলুর শোলা পোকা ছাড়া আরও দুই প্রকার মাত্র দেখিয়াছেন। "ফসলের পোকায়" এই সকলকে শুঁয়া ও সূতলী পোকা বলা হইয়াছে। শুঁয়া পোকা আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানেন। পূর্ব্ববঙ্গে শুঁয়া পোকার নাম "বিছা"। অনেকের গায়ে লোম থাকে না, তাহাদিগকে "সূতলী" পোকা বলে। সাধারণ পাঠককে এবং কৃষকদিগকে কীট পতঙ্গের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য মশা, মাছি, তেলাপোকা, ছার প্রভৃতি যে সকল পোকা সকলেই দেখিয়াছে এবং সকলেরই নজরে পড়ে "ফসলের পোকায়" তাহাদের উদাহরণ দেওয়া উত্তম হইয়াছে। ঈশ্বরবাবুর ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এই সকল আবর্জ্জনা হইতে পারে,—সাধারণের পক্ষে নয়। অনুসন্ধান করিলে তিনি জানিতে পারিবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবতত্ত্ব বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে প্রধান পুস্তক তেলা পোকা সম্বন্ধে লিখিত।

ছার, মশা, মাছি ইত্যাদি প্রাকৃতিক ইতিহাসে (Natural History) স্থান পাইবার উপযুক্ত কিনা, এই প্রশ্ন করিয়া তিনি প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানের

পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। অথচ নিজের ভ্রম স্বীকার করিতে তিনি প্রস্তুত নন। ভ্রম দর্শাইয়া দিলে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক—গালি বর্ষণে কুণ্ঠিত হন নাই।

আমেরিকায় যে পোকায় কার্পাস গুটীর ক্ষতি করে, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম (Chloridea Obsoleta F.) আমেরিকায় ইহার সাধারণ নাম (Boll-woam) অর্থাৎ গুটী নষ্টকারী পোকা। আমাদের দেশে ইহারা কার্পাস খায় না—ছোলা, জনার, বাজরা প্রভৃতি আক্রমণ করে। ফসলের পোকার ৮ম চিত্রপটের ৪ চিত্রে এবং ৫ চিত্রে ইহার প্রজাপতির চিত্র দেওয়া আছে। সাধারণ লোকে আমাদের দেশে ইহাকে লেদা পোকা বলিয়া থাকে। ফসলের পোকায় ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠায় ঐ নামেই ইহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশের যাহারা (Boll-worm) অর্থাৎ কার্পাস গুটীর অনিষ্টকারী পোকা, তাহাদের বিবরণ চিত্রসহ ফসলের পোকার ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। "পার্থক্য" "প্রভেদ" ইত্যাদি যাহা কিছু আছে পাঠকগণ ইহা হইতে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন এবং পোকা সংগ্রহ করিয়া আপনারাই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন যে, ইহা "আকাশ কুসুম" নহে।

মিলডিউ (Mildew) সম্বন্ধে ঈশ্বর বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, "সমালোচক যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক।" তথাপি ভুল করিয়াও যে ঠিক করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। বাঁশ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে যাইয়া যদি সাপের বর্ণনা করা যায় তবে তাহাতে যে দোষ হয় এস্থলে তাহাই হইয়াছে। ঈশ্বর বাবু যে কীট বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাকে ইংরাজিতে Mealy bugs কহে। ফসলের পোকায় ইহাকে "ছাতরা" বলা হইয়াছে। Mildew কে সকলেই "ছাতা" কহিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর বাবু "ছাতা" ও "ছাতরা"তে "ডাল খিচুড়ি" করিয়া ফেলিয়াছেন। মৃত বস্তুতে ছাতরা হয় না ছাতাই হইয়া থাকে। ছাতরা পোকা জীবিত গাছের রস চুষিয়া খায়। মৃত বস্তুতে থাকিতে পারে না।

পোকা পতঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সঙ্গমের পূর্ব্বে তাহার পেটে ডিম থাকে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। পাঠকগণ যদি রেশম, তসর, আসামের এণ্ডি কিম্বা মুগার যে কোয়া বা গুটী হইতে প্রজাপতি বাহির হয় নাই, এরূপ ৫।৭টী গুটী সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইহা দেখিতে পাইবেন। গুটী গুলিকে এক একটী করিয়া পৃথক করিয়া রাখিবেন, যাহাতে প্রজাপতিরা বাহির হইয়া সঙ্গম করিতে না পারে। খুব সম্ভব যে প্রজাপতি গুলি বাহির হইবে, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুং পতঙ্গ দুইই থাকিবে। কোন্‌টী স্ত্রী ও কোন্‌টী পুং পতঙ্গ. চিনিবার উপায় আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে বেশ সহজ হইবে না। প্রজাপতি গুলিকে পৃথকভাবে রাখিয়া দেখিবেন যে, সঙ্গম ব্যতিরেকেও স্ত্রী পতঙ্গেরা ডিম পাড়িবে। অবশ্য এ ডিম ফুটিবে না। বাহির হইবার পরে প্রজাপতিদের পেট ছুরী কিম্বা কাঁচি দিয়া ফাড়িয়াও দেখিতে পারেন এবং স্ত্রী প্রজাপতিদের পেটে ডিম আছে দেখিতে পাইবেন। কোন কোন প্রজাপতিকে সঙ্গম করিতে দিবেন এবং সঙ্গম ত্যাগ করিলে আর দ্বিতীয়বার সঙ্গম করিতে দিবেন না। সঙ্গমের পর যখন স্ত্রী প্রজাপতি ৫০।৬০টী ডিম পাড়িবে, তখন ইহাকে আর ডিম পাড়িতে না দিয়া মারিয়া ফেলিবেন এবং পেট ফাড়িয়া পেটের ভিতরের ডিম বাহির করিয়া রাখিবেন। দেখিতে পাইবেন যে, সে ৫০।৬০টী ডিম স্ত্রী প্রজাপতি স্বেচ্ছায় প্রসব করিয়াছে, তাহাই ফুটিবে এবং অপর ডিমগুলি ফুটিবে না। যদি ঐ ৫০।৬০টী ডিম

পাড়িবার পর প্রজাপতিকে মারিয়া রাখিয়া দেন এবং পেট ফাড়িয়া ডিম বাহির না করেন, তাহা হইলেও দেখিবেন যে, পেটের ডিম ফুটিবে না। পাঠকগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন ইহা আমাদের ইচ্ছা। এস্থলে বলিয়া রাখি যে, শোলা পোকা ও তসর প্রভৃতির কীট সকলেই এক জাতীয়। ইহাদের সম্বন্ধে যাহা দেখিবেন, শোলা পোকাতেও ঠিক তাহাই দেখিবেন।

হংসীতে হংসীতে কখনও সঙ্গম হওয়া অসম্ভব। স্ত্রী ও পুরুষেই সঙ্গম হয়। স্ত্রীতে স্ত্রীতে বা পুরুষে পুরুষে সঙ্গম হয় না। ইহা নিতান্ত ভুল ধারণা। বরাবর হংসীকে পৃথক করিয়া রাখিয়া দেখিবেন যে, সঙ্গম ব্যতিরেকে হংসী বাওয়া ডিম পাড়ে এবং মুরগীতেও এরূপ সঙ্গম ব্যতীত সচরাচর বাওয়া ডিম পাড়িয়া থাকে। এই সকল দ্বারাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সঙ্গমের পূর্ব্বে ডিম সৃষ্ট থাকে। ক্ষুদ্র জীবাণু (Protorzoa) ব্যতীত সকল জীবেরই জন্মের সহিত স্ত্রীজাতির পেটে পরিবর্দ্ধিত কিম্বা অপরিবর্দ্ধিত অবস্থায় ডিম্ব থাকে। এই ডিম সঞ্জাবিত করিবার জন্যই পুং জাতির সহিত সঙ্গম আবশ্যক। আবার পুং বীর্য্য গ্রহণ করিবার জন্য ডিমকে প্রস্তুত হইতে হয়। এইরূপ ডিমকে পরিপক্ক বলা যাইতে পারে। কেবল পরিপক্ক ডিমই সঞ্জীবিত হইতে পারে। অপরিপক্ক ডিম সঞ্জীবিত হইতে সক্ষম নয়। সঞ্জীবিত হইবার পর ডিমের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া দ্বারা ডিমের ভিতর শিশু পরিস্ফুটিত হয় এবং পরে ডিমের আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হয়। প্রায় সকল জীবেরই ডিম এইরূপে পরিস্ফুটিত হয়। কোন কোন জীবের ডিম মাতার উদরেই ফোটে এবং পরে জীবন্ত শিশু প্রসূত হয় (Viviparous); আবার অনেক জীবেই ডিম প্রসব করে (oviparous) এবং ডিম বাহিরে পরিস্ফুটিত হয়।

অধিকাংশ কীটই ডিম প্রসব করে। কয়েক প্রকারের কীট আছে, তাহারা জীবন্ত শিশু প্রসব করে। যেমন "জাব পোকা" (ফসলের পোকা—৩৯ পৃষ্ঠা ও ৩২ চিত্র) ইহাদের আরও বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের পুং জাতি প্রায় দেখা যায় না, এবং স্ত্রী পতঙ্গেরা পুং পতঙ্গের সংস্রব ব্যতীতই সন্তান প্রসব করে (Parthenogenesis)। ইহাদিগকেই ঈশ্বর বাবু নিজ প্রবন্ধে "উকুন রোগ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফসলের পোকায় ইহার চিত্র ও বিবরণ আছে। জীবতত্ত্বের এত সূক্ষ্ম বিচার বোধ হয় এস্থলে অনাবশ্যক। উপরি উক্ত পরীক্ষা দ্বারা সকলেই স্থির করিতে পারিবেন যে, কীটতত্ত্ববিদ্ ডিমের উৎপত্তি ও সঞ্জীবন সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই ঠিক। ডিমের আবরণে একটী অতিক্ষুদ্র ছিদ্র (micropylo) আছে, এই ছিদ্র দিয়াই পুংবীর্য্য (spermatozoon) প্রবিষ্ট হয় এবং ডিমকে সঞ্জীবিত করে।—(ক্রমশঃ।)—জনৈক কীটতত্ত্ববিদ্।

সার-সংগ্রহ।

যা হয় তা রয় না *

এরণ্ড রাম বলিয়াছেন যে, বিধাতা অপরিমিত ভাবে সৃষ্টি করেন। সমুদয় জীব যদি জীবিত থাকিত, তাহা হইলে এক এক জাতি প্রাণীতেই পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া

* শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

যাইত, অন্য প্রাণীর নিমিত্ত তিলমাত্র স্থান থাকিত না। যদি না রাখিবে তবে এত সৃষ্টি কর কেন? তাহার উত্তর স্থির হইয়াছে যে—তিন সম শক্তি দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, এই শক্তিত্রয়ের প্রভাবে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। তথাপি জিজ্ঞাসা করি—কেন? সংসারের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিলে কতক পরিমাণ এ সমস্যার মীমাংসা হয়। কিন্তু সে কথায় এখন প্রয়োজন নাই।

উদ্ভিদ্ ও নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণীগণের মধ্যেই অসংখ্য পরিমাণে সৃষ্টি দৃষ্ট হইয়া থাকে। একবার এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া মোটামুটি একটা হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম। তখন গ্রীষ্মকাল। বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় লোহিত বর্ণের ছোট ছোট ফল গুলি ঘোর হরিৎ বর্ণের পত্রের ভিতর হইতে উকি মারিতে ছিল। দিগ দিগন্তর হইতে নানা বর্ণের পক্ষী আসিয়া কলরব করিয়া সেই সমুদয় ফল ভক্ষণ করিতেছিল। বৃক্ষে কতগুলি শাখা আছে, প্রতি শাখায় কতগুলি প্রশাখা আছে, প্রতি শাখায় কতগুলি ফল আছে, প্রতি ফলে কতগুলি বীজ আছে, এইরূপ হিসাব করিয়া মোটামুটি আমি স্থির করিলাম যে, এই বৃক্ষে এ বৎসর ৮,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ বীজ বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল একটী গাছে এতগুলি বীজ হইয়াছে। গাছটী অতি বৃহৎ নহে, মাঝারি গোচের গাছ। এই ভারতে এরূপ কত অশ্বত্থ গাছ আছে। সে সমুদয় গাছে প্রতি বৎসর কত বীজ হয়! সে বীজ হইতে যদি বৃক্ষ উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে আমাদের আর পা রাখিবার স্থান থাকিত না। অশ্বত্থ গাছেই ভারত পূর্ণ হইয়া যাইত।

যে উদ্ভিদের দিকে তুমি যাইবে, সেই উদ্ভিদ্ হইতেই এইরূপ অপরিমিত বীজ উৎপন্ন হয়। একটী ধান্য হইতে যদি প্রথম বৎসর এক শত ধান্য হয়, তাহা হইলে চিঁড়ের বাইশ ফেরে সেই এক ধান্য হইতে দশ বৎসরে ১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০, ০০,০০০ ধান্য উৎপন্ন হইবে। কিন্তু যা হয় তা রয় না, তাই রক্ষা। তা না হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে অন্ততঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশে, এক ধান ব্যতীত অন্য উদ্ভিদের জন্য স্থান হইত না। বিলাত হইতে কোন লোক এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ্ লইয়া আমেরিকার ফ্লরিডা নামক নদী গর্ভে রোপণ করিয়াছিলেন। সে স্থানের জল বায়ু ও মৃত্তিকা দেখিয়া উদ্ভিদের হৃদয় প্রফুল্ল হইল। দিন দিন তাহার সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইল যে, অবশেষে সে নদী দিয়া জাহাজের যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল। অনেক টাকা খরচ করিয়া সেই জঙ্গল দূর করিলে তবে পুনরায় জাহাজের পথ পরিষ্কৃত হইল। এই নীবিড় উদ্ভিদের শাখা প্রশাখায় জড়িত হইয়া অনেক জাহাজ বিপন্ন হইয়াছিল। (ক্রমশঃ।)

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ভাদ্র মাস।

কৃষি-ক্ষেত্র। যে সকল জমিতে শীতকালের ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া চষিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সার মিশ্রিত গামলা বা কাঠের বাক্সে কপিবীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতাসার মিশ্রিত করিতে পারিলে

ভাল হয়। জলদি ফসলের জন্য ইতিপূর্ব্বেই চারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যক মত হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কোন কোন সুনিপুণ চাষী থেঁতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর "৬।৮" ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা বা বিচালি গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজ ক্ষেত্রে জল ছিটাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে তাহাতেও এই সময় উত্তমরূপ চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীতকালের জন্য লাউ, কুমড়া বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৩।৪ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজ গুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না।

ওল ও মানকচু এই তুলিবার সময়। এই সময় তাহারা খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে এই মাসের শেষে কার্য্য আরম্ভ হইবে। পাটনাই ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান এতদিন হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery), এসপারেগস (Asparagus) ও দুই এক জাতীয় টমাটোর (Tomato) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট, পাটনাই শালগম ও গাজর, পালম, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী তৈয়ার করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মূলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান।—লিচু, লেবু প্রভৃতি ফল গাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে তাহাদের গুল কলম করা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখনও চলিতেছে।

বীজ নারিকেল, হইতে চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে।

যে সকল নারিকেল, গাছ হইতে পাকিয়া ও শুকাইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগকে গলন নারিকেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয় ও আবশ্যক মত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

ফুলের বাগান।—বালসম (Balsam). জিনিয়া (Zinnia). কনভলভিউলাস মেজার (Convolvulus Major) আইপোমিয়া (Ipomoea) প্রভৃতি ফুল গাছ তৈয়ার করিবার এই সময়। কতকগুলি জাপানী লিলি আছে সেগুলি জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বসান উচিত, কারণ সেগুলির বর্ষাতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় প্যান্সী, এষ্টার, মিগ্নোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বপন করা উচিত।

REGISTERED No. C 102

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

ভাদ্র, ১৩১৮।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



দ্বাদশ খণ্ড,—৫ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।



ভাদ্র, ১৩১৮।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট. দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচীপত্র।

শ্রাবণ, ১৩১৮ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL.

Devoted to Gardening and Agriculture. Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulation. It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3 8. 1 Column Rs. 2.
½ Column Rs 1-8.

MANAGER—"KRISHAK,"
102, Bowbazar Street, Calcutta.

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

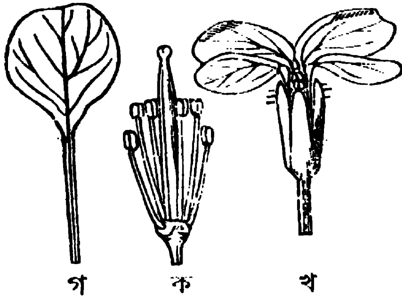
১২শ খণ্ড। | ভাদ্র, ১৩১৮ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

সব্জী চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সর্ষপ জাতীয় উদ্ভিদের চাষ

সরিষা, রাই, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, সালগম, মূলা, তারামণি প্রভৃতি যে জাতির অন্তর্ভুক্ত তাহাকে উদ্ভিদ শাস্ত্রে Cruciferae (ক্রুসিফেরি) বলে। ইহাদের স্রক্ অথবা পাপড়ি চারিটি, পরস্পর অসংলগ্ন এবং বাহির হইতে দেখিতে ক্রুশের মত। ক্রুশাকার যথা + । এই ক্রুশাকার পাপড়িকে প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণনা করিয়া উদ্ভিদবেত্তাগণ সর্ষপ, বাঁধাকপি ও মূলা প্রভৃতি বিভিন্ন আকার-বিশিষ্ট উদ্ভিদকে এক জাতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা এই জাতিকে সর্ষপকী নামে অভিহিত করিব।



সর্ষপকী জাতীয় উদ্ভিদের ফুল।

(ক) মুকুলিত অবস্থা।

(খ) প্রস্ফুটিত ফুল ও দল।

(গ) ফুলের পাপ্ড়ি।

সর্ষপকী জাতির অন্যতম ক্ষেত্রজ ফসল—সর্ষপ ও রাই। মিলিত বঙ্গে ও আসামে সর্ষপ ও রাইয়ের চাষ ৬০ লক্ষ বিঘার কম হইবে না। স্থানভেদে রাই ও সরিষার অনেক প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ঐ সমুদয় ভেদের আলোচনা করিব না। আমরা উপরে যে কয়েকটি সর্ষপ জাতীয় উদ্ভিদের নাম করিয়াছি, তাহাদের প্রায় সকল জাতিরই বীজ হইতে অল্পবিস্তর তৈল পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তারামণি ও হালিমের তৈল কোন কোন স্থানে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে মূলা, সালগম প্রভৃতির তৈল সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদ্যানজাত সর্ষপ জাতীয় উদ্ভিদের আলোচনা করিব। এই জাতীয় উদ্যানজাত ফসল সমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কপিই অন্যতম। কপির চাষ কত দিন হইতে যে এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সঠিক বলিতে পারা যায় না; তবে ইংরাজরাজত্বে যে ইহার চাষের সমধিক প্রচলন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কপি গোষ্ঠী ইংলণ্ড, ওয়েলস্, চানেল্ দ্বীপ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপের সমুদ্র উপকুলের অধিবাসী। কপি শব্দের ইতিহাস হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পুরাতন কেণ্টিক ও স্ল্যাভ্ ভাষায় কপির নাম ক্যাপ (Kap) ও ক্যাব। অন্যান্য ভাষায় ইহার নাম—ফরাসি—কেবস্'; ল্যাটিন—কোল্; জর্ম্মন—কোল্ ইত্যাদি। কোন কোন সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিত কপির নাম করম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিত পিক্টের মতে কপির সংস্কৃত নাম কলম্ব। কিন্তু এতদ্‌সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ রহিয়াছে এবং ইহাও স্থির নিশ্চয় যে, মধ্য এসিয়া হইতে আর্য্য উপনিবেশ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে উভয় দিকে বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে বন্য অবস্থায় কপি ইউরোপীয় সমুদ্রের উপকূলে জন্মিত এবং তৎকালীন অর্দ্ধ সভ্য জাতি সমূহ দ্বারা উহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত।

মূল, কাণ্ড, পত্র ও পুষ্পের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির পার্থক্যে কপির নানাজাতি বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সমুদয়ের তারতম্য লইয়াই জগৎ-বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিদ্ স্যর জোসেফ্ হুকার সমস্ত কপিজাতির নিম্নলিখিতরূপ বিভাগ করিয়াছেন:—১ম শিরহীন শ্রেণী অর্থাৎ ইহারা বাঁধাকপির ন্যায় বাঁধে না। বাঁধাকপির যে অংশ বাঁধিয়া থাকে, তাহাকে উদ্যানতত্ত্ববিদগণ শির বলিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ফুলকপির যে অংশে পুষ্পমুকুল সমুদয় ঘন সন্নিবিষ্ট সে স্থান হৃদয় নামে অভিহিত হয়।

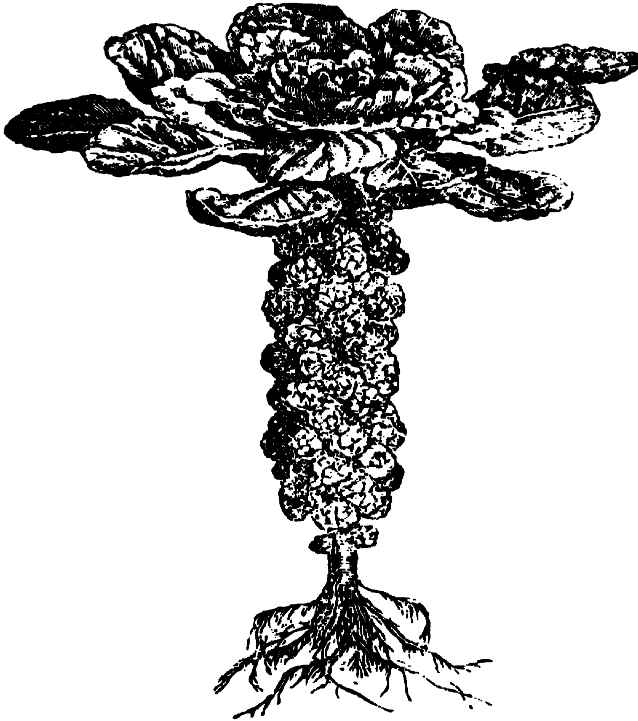


কেল বা বোরকোল। ইহাই বাঁধাকপির আদিম অবস্থা।

কেল, চীনা কপি, গো‍খাদ্য কপি সমস্ত গুলিই এ জাতীয় কপির অন্তর্গত। ইহাদের কোনটির পাতা বাঁধে না। ঘন সম্বদ্ধ পাতাবিশিষ্ট বাঁধাকপি এই কেল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

স্কটল্যাণ্ডের কেল, গোখাদ্য কপি ও বোরকোলও এই জাতির অন্তর্গত। যে জাতি কেল নামে অভিহিত হয় তাহার পাতা বেশ সুপুষ্ট, কাণ্ডের গ্রন্থিমধ্য দীর্ঘ এবং উপরিভাগের দিকে পত্রগুচ্ছ বদ্ধ নহে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান কপির সহিত পুরাতন বন্য কেলের সাদৃশ্য কমই দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত হুকার বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম জালবৎ গুটিকাযুক্ত শ্রেণী—স্যাভয় জাতীয় কপি ইহার উদাহরণ। এই জাতীয় কপির পত্রের উপরিভাগ এত ঘন সন্নিবিষ্ট গুটিকাকার কুঞ্চন বিশিষ্ট যে তৎসমুদয় জালের মত বলিয়াই বোধ হয়। পাতার প্রান্তভাগও কোঁকড়ান। পূর্ব্বকালের স্যাভয় কপির পাতা আদৌ বাধিত না। কিন্তু বর্ত্তমান স্যাভয় কপির মধ্যভাগ (হৃদয়াংশ) অল্পবিস্তর বাঁধিয়া থাকে।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রধান উদাহরণ ব্রসেলস্ স্প্রাউট। ইহার পত্রকক্ষে অথবা পত্র



ব্রসেলস্ স্প্রাউট বা গাঁটকপি।

কাণ্ডের গাত্রে ছোট ছোট গোলাকার বাঁধাকপির আকারের কুঁড়ি হইয়া রহিয়াছে।

সংযোগের চিহ্নের কক্ষে ছোট ছোট গোলাকার কুঁড়ি উৎপাদিত হয়। ইহার প্রত্যেকটিই এক একটি ক্ষুদ্রাকার বাঁধাকপি। কাণ্ডের উপরিভাগ পত্রগুচ্ছ বিশিষ্ট। প্রথমতঃ বেলজিয়ম দেশে উদ্ভুত হয় বলিয়া এই জাতীয় কপির নাম ব্রসেলস্ স্প্রাউট হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহার কাণ্ডের নিম্নাংশে পাতা থাকে না, কিন্তু কার্টার কোম্পানির এক প্রকার ব্রসেলস্ স্প্রাউট আছে, যাহার নিম্নভাগের পাতাগুলি অনেকটা সোজাসুজিভাবে জন্মিয়া থাকে।

চতুর্থ শ্রেণী প্রকৃত শিরযুক্ত। শ্বেত ও লোহিতবর্ণের সমস্ত বাঁধাকপিই এই শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের বিশেষ বর্ণনা অনাবশ্যক। পঞ্চম শ্রেণী স্ফীত কাণ্ডযুক্ত।

ওলকপির যত প্রকার জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ই এই শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ষষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ শ্রেণীতে ফুলকপি ও ব্রোকেলি স্থাপিত হইয়াছে।* ইহাদের প্রধান লক্ষণ এই যে, পুষ্পমুকুল সমূহ অসাধারণ ভাবে পরিপুষ্ট হয় এবং অপরিস্ফুট মুকুলরাশি ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া একটি কঠিন পুষ্পগুচ্ছ উৎপাদন করে। যেরূপ বাঁধাকপির আদিম অবস্থা পরস্পর অসংলগ্ন পত্রবিশিষ্ট কেল, তদ্রূপ ফুল-কপিরও আদিম অবস্থা স্বতন্ত্র পুষ্পদণ্ড বিশিষ্ট এক জাতীয় কপি। বর্ত্তমান সময় মাণ্টা দেশীয় অসংখ্য পুষ্পদণ্ড বিশিষ্ট ব্রোকেলিতে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

মূলের জন্য কপি উৎপাদিত হইতে কমই দেখা যায়। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বিদ্ বহিন্ বলিয়াছেন যে বাভেরিয়া দেশে, বিশেষতঃ বোহিমিয়ার নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে সালগম অথবা গাজরের ন্যায় মূলের জন্য একপ্রকার কপি উৎপাদিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে উহার বড় একটা প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না।

বংশ পরম্পরা ক্রমে বন্যকপির বিশেষ বিশেষ অংশের পুষ্টি সাধিত হইয়া ও বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নির্ব্বাচিত হইয়া আজ কাল নানাপ্রকারের কপি উৎপাদিত হইয়াছে। বন্য কপি ও বর্ত্তমান যুগের বাঁধা কিম্বা ফুল কপি পাশাপাশি রাখিলে বিচক্ষণ উদ্ভিদ্‌বিদ্ ভিন্ন অপরে কেহ বুঝিতে পারিবেন না যে প্রথমটি শেষোক্ত প্রকারের কপির পূর্ব্ব পুরুষ। উপবর্ত্তিক পত্র বিশিষ্ট ৪ ৫ ফুট বড় ওয়েলস্ দেশীয় কপি দেখিলে একটি গুল্ম বলিয়াই বোধ হয়। উদ্যানজাত সাধারণ সবজীর সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। জারসি দেশীয় কেল্ ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্য্যজনক। ইহার কাণ্ড এত পুষ্ট ও তন্তুবিশিষ্ট হয় যে ইহা হইতে ছড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সমুদয় পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ওলকপি উৎপাদিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা অসম্ভব। তবে পাঠকবর্গের ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে ফুল কপির ফুল ও বাঁধাকপির নিরেট পত্রাংশ কিম্বা ওলকপির স্ফীত কাণ্ডাংশ একবারেই উৎপাদিত হয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতাব্দীর কৃষকগণ পুষ্পে, পত্রে ও কাণ্ডে কপির পরিবর্ত্তনশীলতার আভাস পাইয়া ক্রমাগত গুচ্ছবদ্ধ ফুল কিম্বা পত্র বিশিষ্ট জাতি এবং স্থূলকাণ্ড বিশিষ্ট জাতির নির্ব্বাচন আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ কাল আমরা সুবৃহৎ ঘন সংলগ্ন পত্র ও পুষ্পগুচ্ছ এবং স্ফীত কাণ্ড কপি দেখিতে পাই। যখন বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে ফুল কপির পুষ্প দণ্ড বাহির হইয়া ফুল হইতে আরম্ভ হয়,

* বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রোকেলি ও ওলকপির চিত্র তাহাদের চাস প্রণালী বর্ণনার সময় দেওয়া হইয়াছে।

বাঁধা কপির গ্রন্থিমধ্য কাণ্ডাংশ লম্বীভূত হওয়ার জন্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে এবং পত্র অসংলগ্ন হয় অর্থাৎ বাঁধেনা এবং ওলকপি সাধারণ কাণ্ডের ন্যায় কোমল ও ক্ষীণ হয় তখনই আমরা কপি বংশের ইতিহাসের আভাস পাই। জগতের প্রত্যেক প্রাণী অথবা উদ্ভিদ্, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এইরূপে নিজের বংশের পরিচয় দিয়া থাকে।

মূলা সর্ষপকী জাতির আর একটি সুপরিচিত ফসল। মূলা প্রকৃত পক্ষে মূল অথবা কাণ্ড নহে। মূল ও কাণ্ড উভয়ের বর্দ্ধিতাংশই মূলা। চীন ও জাপান হইতে পূর্ব্বদিকে সমস্ত দেশেই বহু পুরাকাল হইতে যে মূলা উৎপাদিত হইত তাহার উল্লেখ পুরাতন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য অবস্থায় মূলা আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল ককেসস্ পর্ব্বতের দক্ষিণাঞ্চলেই বন্য অবস্থায় মূলা দৃষ্ট হয়। কোন কোন উদ্ভিদ্‌বিদের মতে মূলা Raphanus raphanistrum নামক এসিয়া ও ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ দেশ সমূহে দৃষ্ট একপ্রকার বন্য মূলার রূপান্তর মাত্র। এই বন্য মূলা সমুদ্রের উপকূলে বালুকাময় হাল্‌কা জমিতে কিম্বা পরিত্যক্ত ক্ষেত্র সমূহে জন্মিয়া থাকে। বন্য ও ক্ষেত্রজ মূলার মধ্যে পার্থক্য এই যে ক্ষেত্রজ মূলার ফল স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, অর্থাৎ ফলে প্রত্যেক বীজের জন্য পর্দ্দা দেওয়া এক একটি স্বতন্ত্র অংশ রহিয়াছে। বন্য মূলার মূল, ক্ষীণ ও ক্ষেত্রজ মূলার মূল, স্থূল। এই সমুদয় যে কর্ষিত অবস্থায় উৎপাদিত হওয়া সম্ভব তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জমি আল্‌গা ও সারযুক্ত হইলে মূলা বড় হয় এবং জমি কঠিন ও সারহীন হইলে মূলা ছোট হয়। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, পূর্ব্বকালে সাধারণ লোকে মৃত্তিকার তারতম্যে মূলার পরিবর্ত্তনপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়া ইহা সব্জী রূপে উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বন্য মূলাই বর্ত্তমান মূলার পূর্ব্ব পুরুষ কি না তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না।

মূলার ন্যায় সালগমেরও ভোজনীয় অংশ মূল ও কাণ্ডের সমষ্টি। ইউরোপের অনেক স্থানেই বন্য অবস্থায় সালগম দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে নাতিশীতোষ্ণ ও দক্ষিণ এসিয়ার সালগম প্রায় কর্ষিত অবস্থাতেই দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যদিগের সহিতই এসিয়ার দক্ষিণ অংশে সালগম আসিয়াছিল। জাতিভেদে সালগমের অনেক প্রকার নাম আছে, এগুলি নির্ব্বাচন দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছে। বন্য সালগমের মূল আজকালকার সুপুষ্ট উদ্যানজাত শালগমের সমকক্ষ না হইলেও উহারও পুষ্টির মাত্রা নিতান্ত অল্প নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সর্ষপকী জাতির অনেক উদ্ভিদের বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। সালগম ও মূলার বীজে তৈলের মাত্রা অল্প। জীব জগতে

সাধারণ নিয়ম এই যে, শরীরের একটি অংশের অতিপুষ্টি হইলে অপরাংশ অপেক্ষাকৃত অল্প পুষ্ট হইবে। যে স্থলে মূল, পাতা, কাণ্ড অথবা পুষ্প অতি পুষ্ট সেখানে ফল ও বীজ অল্প পুষ্ট—যেমন নানাজাতীয় কপি, সালগম ও মূলা। পক্ষান্তরে যেখানে ফল ও বীজ অত্যন্ত পুষ্ট সেখানে উদ্ভিদের অন্যান্য অংশের অতিপুষ্টির কোন লক্ষণ নাই—যেমন সরিষা, রাই, তারামণি ও হালিম। আবার সুপুষ্ট অংশ লইয়াই ব্যবহারের তারতম্য। পত্র পুষ্প কাণ্ড ও মূল সুপুষ্ট বলিয়া কপি, সালগম, মূলা, সবজী ফসল এবং বীজ সুপুষ্ট ও তাহাতে তৈলের মাত্রা অধিক বলিয়া সর্ষপ প্রভৃতি তৈল শস্য। উভয় শ্রেণীর ফসলেরই ব্যবহার রহিয়াছে, কিন্তু তৈল অধিক দিন রাখিতে পারা যায় ও এক স্থান হইতে অন্যস্থানে সহজে লইয়া যাইতে পারা যায়; এই জন্যই ব্যবসায় জগতে তৈলের অধিক আদর এবং তৈল প্রসবী ফসলেরও সেই অনুপাতে অধিক প্রাধান্য।

কপি প্রভৃতি চাষের জন্য মৃত্তিকা বিচার

সাধারণতঃ মৃত্তিকা তিন প্রকার—বালি মাটি, এঁটেল মাটি ও দোয়াঁস মাটি। যে জমির মৃত্তিকায় বেশী ভাগ বালি থাকে, তাহাকে বালি মাটি কহে। যাহাতে বালির ভাগ অত্যন্ত অল্প অথবা প্রায়ই থাকে না, তাহাকে এঁটেল মাটি বলে। যাহাতে বালি ও এঁটেল মাটি প্রায় সমান ভাগে থাকে, তাহাকে দোয়াঁস মাটি কহে। যে দোয়াঁস মৃত্তিকায় বালি মাটি বেশী থাকে, তাহাকে "হাল্কা দোয়াঁস মাটি" কহে। যাহাতে এঁটেল মাটির ভাগ অধিক থাকে, তাহাকে "কঠিন দোয়াঁস মৃত্তিকা" বলে। সকল প্রকার দোয়াঁস মাটিই কপি প্রভৃতি সব্জী চাষের উপযোগী। পূর্ব্বোক্ত বালি ও এঁটেল মাটি কপি প্রভৃতি সব্জী চাষের উপযোগী নহে। উহাতে বিলাতী সব্জী চাষ করা চলে না। কপি প্রভৃতি সব্জীর মূল অতিশয় কোমল। উহা এঁটেল মাটিতে প্রবেশ করিতে পারে না, এবং বালি মাটিতে সহজে প্রবেশ করিতে পারিলেও, বালি মাটি রৌদ্রে বিশেষ উত্তপ্ত হয় বলিয়া মূল শুষ্ক হইয়া যায়। এই উভয় কারণ বশতঃ (এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কারণে) উক্ত মৃত্তিকাদ্বয় কপি প্রভৃতি সব্জী চাষ করিবার আবশ্যক হইলে কর্ষণে ও সার-প্রয়োগে তদুপযোগী করিয়া লইতে হয়। এঁটেল মাটি ঐ সমস্ত সব্জী চাষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জমী এবং উহাকে দোয়াঁস অবস্থায় পরিণত করাও বহু ব্যয়সাধ্য। কিন্তু বালি মাটিকে অল্প আয়াসে ও অল্প ব্যয়ে সার সংযোগে উক্ত প্রকার সব্জী চাষের উপযুক্ত করিয়া লইতে পারা যায়। যে মাটিতে অপেক্ষাকৃত কর্দ্দমের ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক এমন দোয়াঁস মাটিতে কপির চাষ ভালরূপ হয়, কিন্তু গাজর, সালগম, মূলা, মটর, সীম প্রভৃতির জন্য হাল্কা দোয়াঁস মাটির আবশ্যক।

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। বাঙ্গালা দেশ সুজলা-সুফলা বলিয়া চির-বিখ্যাত। এখানে নূতন নূতন বিবিধ প্রকার সব্জী ও ফল মূলের আবাদ করা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কি অসভ্য, কি সভ্য অবস্থায় কৃষিই মানবজাতির একমাত্র সহায় ও অবলম্বন। কৃষি-কার্য্যের প্রতি ঘৃণা ও অবহেলা জাতীয় পতনের অন্যতম কারণ। এখনও এদেশে শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় কৃষিকর্ম্মে উদাসীন। যখন তাঁহাদের উৎসাহে ও চাষীগণের যত্নে ভারতের শস্যক্ষেত্র সমূহ নূতন নূতন খাদ্যোপযুক্ত ফসলে পূর্ণ হইবে, তখন ভারতে বাস্তবিক সুদিন আসিবে।

বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ছোট নাগপুর, উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি অঞ্চলে সচরাচর যে প্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ স্থলই দোয়াঁস এবং কপি প্রভৃতি সবজী-চাষের উপযোগী। কপি জাতীয় সবজীর চাষ ক্রমশঃ সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিতেছে। ইহার অধিকতর বিস্তৃতি সর্ব্বত্র প্রার্থনীয়।

বোর্‌কোল, কেল্ বা ডালকপি

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ।

মৃত্তিকা। বিশেষ উর্ব্বরাশক্তিবিশিষ্ট জমী না হইলেও চলে। অন্যান্য সব্জী অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত হীনতেজ মাটিতে বেশ জন্মে। সবজী ক্ষেতের মধ্যে যে স্থল তত উর্ব্বরা নয় বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থলে ইহার গাছ রোপণ করা যাইতে পারে।

সার। বিশেষ সারের আবশ্যক হয় না। সামান্য পরিমাণে পুরাতন গোবর-সার দিলেই চলিবে।

বপনাদি প্রণালী ও জলসিঞ্চন। হাপরে বীজ ছড়াইয়া চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। যে নিয়মে বাঁধাকপি কিম্বা ফুলকপির চারা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, সেইরূপে ইহারও চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। হাপরে চারা প্রস্তুতকালে কোন কারণে কোন সময়ে বিশেষ জলাভাব না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নচেৎ চারা সকল দুর্ব্বল হইবে ও সবজী ভাল হইবে না। হাপরে চারাগুলি তিন বা চার ইঞ্চি উচ্চ হইলে—চারাগুলি হাপর হইতে উঠাইয়া চাষের জমীতে—প্রত্যেক চারা দেড়ফুট অন্তর বসাইতে হয়। বড় জাতীয় বোর্‌কোলের চারা তিন বা চারিফুট পৃথক্ পর্য্যন্ত—বসান হইয়া থাকে। চারা বড় হইলে বাঁধাকপির ন্যায় ইহার মূলদেশে পার্শ্বস্থিত মাটি কিছু বেশী পরিমাণে টানিয়া দিতে হইবে। অন্যান্য বিষয়—বাঁধাকপি চাষের ন্যায়।

বিশেষ কথা—কেল নানা রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার কেল আছে, তাহার পাতাগুলি বেশ কোঁকড়ান—গাছ দেখিতে সুন্দর। অন্যান্য খাদ্যের

ডিস্ সুসজ্জিত করিতে হইলে ইহার পাতা দিয়া সাজান হয়। খুব গ্রীষ্মপ্রধানদেশে কেল ভাল রকম জন্মায় না। ফুলকপি, ওলকপি জন্মাইতে পারিলে আর কেলের চাষ কেহ করে না। কিন্তু অত্যন্ত শীতপ্রধান উত্তরাঞ্চলে যখন তুষার ও বরফ পড়িয়া ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি সমুদয় খাদ্যোপযোগী সব্জী নষ্টপ্রায় হয়, তখন কেলই একমাত্র ভরসা। কেল অত্যন্ত শীত ও তুষারপাত সহ্য করিতে পারে। কেল গবাদির খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বীজের পরিমাণ—এক একর চাষের জন্য ৪ আউন্স বীজের আবশ্যক।

ব্রসেল্স্ স্প্রাউট্স্ বা গাঁইটকপি

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ।

মৃত্তিকা। যে কোন প্রকার হাল্কা অথবা শক্ত দোয়াঁস মাটিতে ব্রসেল্স্ স্প্রাউট্স্ ভালরূপ জন্মিয়া থাকে।

সার। "ভেড়া"র সার—সর্ষপ খৈল বা গোবর-সার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মিশ্র-সার অর্থাৎ আবর্জ্জনাদির সারও দেওয়া যাইতে পারে। সার যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্যক।

বপনাদি প্রণালী ও জলসিঞ্চন। হাপরে চারা প্রস্তুত করিয়া পরে চাষের জমীতে বসাইতে হয়। হাপর ছায়াযুক্ত স্থানে হইলে চলিবে না। যেস্থানে সকাল হইতে সন্ধ্যা না হওয়া পর্য্যন্ত বরাবর রৌদ্র পতিত হয়, সেই স্থানই হাপরের উপযুক্ত। হাপরে বীজ ছড়াইয়া মাটি চাপা দিতে হয়। হাপরের মাটি শুষ্ক থাকিলে, বীজ বপন করিয়াই জলসিঞ্চন করিতে হয়। তিন বা চারি দিবসে বীজ অঙ্কুরিত হয়। সাত আট দিবসের মধ্যে সমস্ত চারা নির্গত হয়। ক্রমশঃ চারা বড় হইয়া তিন বা চারি ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে হাপর হইতে উঠাইয়া চাষের জমীতে বসাইতে হয়। হাপর হইতে চারা তুলিবার কালে কোন রকমে চারার শিকড় নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। এতদর্থে চারার শিকড়ের সহিত অধিক পরিমাণে হাপরের মাটি গোলাকার ভাবে রাখিয়া চারা তুলিলে ভাল হয়। হাপর হইতে উঠাইয়া চারা এরূপ ভাবে চাষের জমিতে লাগাইতে হইবে যে, যেন চারা স্থানান্তরিত হইয়াও কোন রকমে নির্জীব না হইয়া পড়ে। বীজ বপনের পর হইতে গাছের শেষ দশা পর্য্যন্ত—যাহাতে কোন প্রকারে গাছের বর্দ্ধিত হইবার শক্তি বাধা প্রাপ্ত না হয়—সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

চাউল

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত

চাউলের রাসায়নিক খাদ্যগুণ

১। দাহ্ গুণ—

শ্বেতসার ও শর্করা শতকরা		৬৫—৭৯ ভাগ।
তৈল	,,	১— ২ ভাগ।
সূত্র	,,	½ ভাগ।

২। মেদকারিতা গুণ—

প্রোটিড্	,,	৬— ৭ ভাগ।
ভস্ম	,,	১ ভাগ।

চাউল বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। চাউল ব্যতীত বাঙ্গালী জাতির একদিনও চলে না। চাউল খুব লঘু পথ্য এই জন্যই বাঙ্গলা দেশে ইহার এত আদর। ভাত এক ঘণ্টা মাত্র সময়ের মধ্যে পাকস্থলীতে জীর্ণ হয়। কিন্তু ময়দার রুটী জীর্ণ হইতে প্রায় ৪ ঘণ্টার প্রয়োজন। নানাপ্রকারের ধান্য আছে যথা, বোরো, আউশ এবং আমন। ইহাদের মধ্যে আবার সরু মোটা এবং শাদা, লাল প্রভৃতি * নানা বিভাগ। কোন কোন ধান্যে শুঁয়া থাকে। কয়েক প্রকার সুগন্ধি ধান্যও আছে। ইহাদের মধ্যে সরু আমন ধান্যের শাদা চাউল উচ্চশ্রেণীর লোকের নিকট অতিশয় আদরণীয়। এই চাউল সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পথ্য বলিয়া বিখ্যাত। বোরো চাউল এবং অধিকাংশ আউশ অত্যন্ত মোটা। এই জন্য উচ্চশ্রেণীর লোক এই সব চাউল গ্রহণ করে না। মোটা চাউল অপেক্ষা সরু চাউলের মূল্য মণকরা অন্ততঃ এক টাকা অধিক। আবার নূতন অপেক্ষা পুরাতন চাউলের মূল্য আরও অধিক। পুরাতন চাউল অতিশয় লঘু এই জন্য ইহা এত মূল্যবান। ধনী লোক কখনও এক বৎসরের চাউল আহার করেন না। যাহাদের অবস্থায় কুলায় না, তাহারা আষাঢ় মাস হইতে নূতন চাউল গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধারণ লোক বোরো, আউশ, মোটা সকল রকম চাউলই গ্রহণ করিয়া থাকে। সিদ্ধ করা ধান হইতে যে চাউল প্রস্তুত হয়,

* আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লাল শালি ধান্যের চাউল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট শালিধান্যের চাউল নিকৃষ্ট। পরন্তু কৃষ্ণবর্ণ আউশধান্য আউসের মধ্যে উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

তাহাকে সিদ্ধ চাউল বা উষ্ণ চাউল বলে। বঙ্গদেশে এই চাউলেরই অধিক প্রচলন। ভাত প্রস্তত করিতে মাড়ের সহিত এই চাউল হইতে অধিক কিছু মূল্যবান পদার্থ চলিয়া যায় না।

সিদ্ধ না করিয়া যে চাউল প্রস্তত হয়, তাহাকে আতপ বলে। আতপ চাউলের মাড়ের সহিত অনেক পদার্থ চলিয়া যায়। সুগন্ধি ধান্যদ্বারা সাধারণতঃ আতপ চাউল প্রস্তত হয়। সিদ্ধ চাউল করিতে হইলে ইহার সুগন্ধ নষ্ট হয়। অধিক সিদ্ধ চাউলের ভাত শক্ত হয়। অধিক সিদ্ধ করিলে অর্থাৎ সিদ্ধ করাতে যখন ধান ফাটিয়া যায়—চাউলের ওজন বৃদ্ধি হয় ও ইহা কুটিবার সময়ে ভাঙ্গে না। এইজন্য ব্যবসায়ী লোক অধিক সিদ্ধ করিয়া চাউল প্রস্তত করে। সিদ্ধ করিবার সময়ে যখন পাত্রের উপরে ভাপনার বাষ্প উঠে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সিদ্ধ ঠিক হইয়াছে। বঙ্গদেশে বিধবাদিগের খাদ্যের জন্য এবং ঠাকুর পূজার জন্যই প্রধানতঃ আতপ চাউলের ব্যবহার। আতপ চাউল কীটের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা কঠিন।

চাউল ছাঁটার মাত্রা অনুসারেও মূল্যের তারতম্য হয়। অধিক ছাঁটা চাউলের মূল্য অধিক। কিন্তু অধিক ছাঁটায় চাউলের অধিকাংশ তৈলাক্ত পুষ্টিকারক পদার্থ কুঁড়ার সহিত চলিয়া যায়। ইহাতে চাউলের মূল্য হ্রাস হওয়া যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অধিক ছাঁটায় চাউল এবং তাহার ভাত অতি উজ্জ্বল হয়, এই জন্যই এই চাউল অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। ছাঁটা চাউল সতরঞ্চি কিম্বা থলিয়ার উপর রাখিয়া ঘসিয়া পালিস করিয়া লইলে ইহার ভাত ফাটে না। ইহাকে মাজা চাউল বলে।

পুষ্টিকারিতায় চাউল অন্যান্য প্রধান খাদ্য অপেক্ষা হীন। এইজন্য ভাতের সহিত প্রচুর মৎস্য মাংস গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

চাউল দুই তিন ঘণ্টা ভিজাইয়া যাঁতায় পিষিয়া বা ঢেঁকিতে কুটিয়া আটা প্রস্তত করা যায়। চাউলের আটায় উত্তম চাপাটি ও পিষ্টকাদি প্রস্তত হয়। ধান্য হইতে সুখাদ্য চিঁড়া, মুড়ি ও খৈ প্রস্তত হয়। কিন্তু ইহাদের সহিত তুঁষ থাকিলে এই সব খাদ্য অপকারী হয়।

কলিকাতার চাউল সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হয়, যথা—

(১) বালাম। (২) দেশী। (৩) রাঢ়ী। (৪) উত্তরা। (৫) কাজ্‌লা। (৬) রেঙ্গুন।

বাখরগঞ্জের চাউলকে বালাম বলে। বালামের দানা শাদা, লম্বা, উজ্জ্বল, পরিষ্কার ও হাল্কা। ইহার ভাত ফাটে না; দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাতে বালি কিম্বা কাঁকর থাকে না। বাখরগঞ্জের মোটা শাদা চাউলকে পেগু বলে এবং তথাকার শাদা আউশের নাম ষোলই। ষোলই মোটা ও ছোট, পেটে উজ্জ্বল দাগ আছে। ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, মেদিনীপুর, হাবড়া ও হুগলী জেলার

শাদা চাউল সাধারণতঃ দেশী নামে অভিহিত। এই চাউল লম্বা, শাদা, উজ্জ্বল, পরিষ্কার ও ভারী। ২৪ পরগণার মাজা বাঁকতুলসী ও পাটনাই চাউল বিখ্যাত। এই চাউলে উৎকৃষ্ট ভাত পোলাও প্রস্তুত হয়। পাটনা ধান্যের আতপ চাউলকে হুরা চাউল বলে, ইহারই নাম টেবল্ রাইস। বাঁকতুলসী ধান্যের নামাজা চাউল কোঁড়া বাঁকতুলসী নামে কথিত হয়। দেশীর মধ্যে সিলেট চাউলও বিখ্যাত, ইহা মোটা চেপটা ও খর্ব্বাকৃতি।

বৰ্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়ার চাউলকে রাঢ়ী চাউল বলে। বিহারের চাউল এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। তথাকার কাটারীভোগ, মানভোগ, সমুদ্রবালী, বাঁশমতি বিখ্যাত। এই চাউলে অনেক কাঁকর থাকে। এই অঞ্চলের বাদসাভোগ, দাদখানি, রাঁধুনীপাগল চাউল বিখ্যাত।

রাজসাহী ডিভিসনের চাউলকে উত্তরা চাউল বলে। দিনাজপুরের চন্দনচুড়, কাটারীভোগ ও দাদখানি চাউল বিখ্যাত। এই অঞ্চলের মোটা চাউলকে মুগী বলে।

বঙ্গদেশের লাল চাউলকে কাজলা বলে। কাজলা চাউলের ভাত দেখিতে সুদৃশ্য নয়। এই জন্য অবস্থাপন্ন লোকেরা ইহা গ্রহণ করেন না। ন্যাতপাশা, খৈয়ামুগরী, দলকচুয়া প্রভৃতি কোন কোন কাজ্‌লা চাউল হাল্‌কা ও ইহাদের ভাত সুখাদ্য।

বর্ম্মার চাউল রেঙ্গুন নামে পরিচিত। ইহা আতপ চাউল। ইহার দানা বেটে ও ক্ষুদ্র। কলে ছাঁটা হয় বলিয়াই ইহাতে অনেক খুদ থাকে।

তৈলে পক্ক জালায় বা কুঁড়ার সহিত চাউল রাখিলে ইহাতে পোকা লাগে না।

রন্ধন প্রণালী

প্রায় ১৫ মিনিট চাউল ধুইয়া রাখিবে। জল ফুটিলে উহাতে চাউল ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে কিঞ্চিৎ লবণ দিলে ভাল হয়। ১০।১২ মিনিটের মধ্যে আতপ চাউলের অন্ন প্রস্তুত হয়। সিদ্ধ নূতন চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিতে ১৫।১৬ মিনিট প্রয়োজন হয়। পুরাতন চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিতে অৰ্দ্ধঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হইতে পারে। কয়লার জ্বালে জল ফুটিতে ১০।১২ মিনিট লাগে। সুসিদ্ধ ভাত টিপিলে ইহা মিলিয়া যায়। ভাত অধিক সিদ্ধ হইলে ভাত গায়ে গায়ে লাগে ও তাহা সুস্বাদু হয় না। অন্ন ঘৃতে পক্ক অর্থাৎ এক সের চাউলে অৰ্দ্ধ পোয়া ঘৃতযুক্ত অন্ন অধিক গুরু পথ্য নয়। কিন্তু অধিক ঘৃতযুক্ত পোলাও গুরুপথ্য।

চাউলে ও দাইলে রন্ধন করিলে খিচুড়ি প্রস্তুত হয়। খিচুড়ি অতিশয় গুরু পথ্য। অৰ্দ্ধ চাউল ও অৰ্দ্ধ দাইলের খিচুড়ি খুব সুস্বাদু হয়, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এইরূপ গুরু পথ্য খাদ্য ব্যবস্থা করা যায় না। সুস্থ ব্যক্তিরা কোন কোন সময়ে এক সের চাউলে এক পোয়া দাইলের খিচুড়ি গ্রহণ করিতে পারে। আতপ চাউলের খুদ শর্করা সংযোগে দুগ্ধে পাক করিলে অতি সুস্বাদু পায়স প্রস্তুত হয়।

ভাত তিন ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে ইহাকে ভাতের মণ্ড বলে। ভাতের মণ্ড রোগীর পথ্য। ফুটন্ত জলে খৈ ভিজাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ছাঁকিলে খৈয়ের মণ্ড প্রস্তুত হয়। ভাতের মণ্ড ও খৈয়ের মণ্ড বার্লির মত রোগীর পথ্য স্বরূপ কবিরাজগণ ব্যবহার করিতেন।

খরিদ

চাউল খরিদ করিবার সময় দেখা আবশ্যক যে—

(১) চাউল নূতন কি পুরাতন।

(২) কাঁকর বালি মিশ্রিত কিনা, (রাঢ়ী চাউলে সাধারণতঃ কাঁকর ও বালি থাকে। চালনিদ্বারা চালিয়া কাঁকর ও বালি ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।)

(৩) দানা ভাঙ্গা কি না।

(৪) ছাঁটা কিরূপ, (ধান আছে কি না।)

(৫) পোকা ধরা কি না।

(৬) দানা শাদা কিম্বা লাল।

(৭) দানা সরু কিম্বা মোটা, অথবা লম্বা কিম্বা বেঁটে।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

নাইট্রোজেন সারের পরীক্ষা—

এতাবৎকাল সালফেট অব এমোনিয়া এবং সোডা নাইট্রেট এই দুইটি কৃত্রিম সার, জমিতে নাইট্রোজেনের আবশ্যক হইলে ব্যবহার করা হইত। সম্প্রতি আরও দুইটি নাইট্রোজেন সার ব্যবহৃত হইতেছে—একটি সাইনামাইড ক্যালসিয়াম (Calcium Cyanamide), দ্বিতীয় নাইট্রেট চুণ।

উল্লিখিত চারিটি সারের গুণাগুণ বিচার করিবার জন্য আয়ারল্যাণ্ডের কৃষি-বিভাগে বহুবিধ পরীক্ষা হইয়াছে।

এই গুলিতে নিম্নলিখিতানুরূপ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়—

সালফেট অব এমোনিয়া	...	১৯·৭৫
নাইট্রেট অব সোডা	...	১৫·৫
ক্যালসিয়াম সাইনামাইড	...	২০·০
নাইট্রেট অব লাইম	...	১৩·০

জৈয়ের ক্ষেতে উক্ত প্রকার সার প্রয়োগের ফল—

সারের পরিমাণ।			উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ।	
			শস্য	খড়
সালফেট এমোনিয়া	...	১ হন্দর	... ২৬॥ হন্দর	৪৭ হন্দর
সোডা নাইট্রেট	...	১⅓ ,,	... ২৫৮ ,,	৫০ ,,
ক্যালসিয়াম সাইনামাইড		১ ,,	... ২৭ ,,	৪৪ ,,
লাইম নাইট্রেট	...	১॥ ,,	... ২৭ ,,	৪৮ ,,
নাইট্রোজেন সার বিনা			... ২৪¼ ,,	৪১ ,,

এই নাইট্রোজেন সার ব্যতীতও প্রত্যেক ক্ষেত্রে হাড়ের গুঁড়া ও কাইনাইট ছড়ান হইয়াছিল।

উপরের লিখিত তালিকা দেখিলে বুঝা যায় যে, ক্যালসিয়ম সাইনামাইড ও লাইম নাইট্রেট সার ব্যবহারে ফসল সমান দাঁড়াইয়াছে। সালফেট এমোনিয়াতে শস্য কম হইয়াছে, নাইট্রেট অব সোডাতে শস্যের মাত্রা আরও কম, কিন্তু খড় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হইয়াছে।

আলুর ক্ষেতে এই চারি প্রকার নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের ফলাফল—

দশটি ক্ষেতে পরীক্ষা হইয়াছিল, প্রত্যেক ক্ষেত্রের পরিসর এক একর। ক্ষেত্র গুলি সমুদয় আয়ারল্যাণ্ডে স্থাপিত।

সারের পরিমাণ।			ফসলের পরিমাণ।	
			টন—হন্দর	টন—হন্দর
		হন্দর	বিক্রয় উপযুক্ত	মোট
সালফেট অব এমোনিয়া	...	১	১১—১২	১২— ৬
সোডা নাইট্রেট	...	১⅓	১০— ৮	১২— ২
ক্যালসিয়াম সাইনামাইড	...	১	১০—১৬	১২—১৫
নাইট্রেট লাইম	...	১½	১০—১৫	১২—১০
বিনা নাইট্রোজেন সার	...		৯—১২	১১—১০

চারিটি সালগম ক্ষেতে এই সারের পরীক্ষা—

			ফসল
		হন্দর	টন—হন্দর
সালফেট এমোনিয়া	...	১	২৫— ৩
সোডা নাইট্রেট	...	১⅓	২৬— ৬
ক্যালসিয়াম সাইনামাইড	...	১	২৬— ৩
লাইম নাইট্রেট	...	১½	২৪—১৭
নাইট্রোজেন সার বিনা	...		২৩—১১

সালগম ক্ষেতে চারিটি সারের উপকারিতা প্রায় একই প্রকার—

মাঙ্গেল বীট ক্ষেতে পরীক্ষা—

৮টি ক্ষেতে সার প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

	হন্দর	উৎপন্ন ফসল টন—হন্দর
সালফেট এমোনিয়া ...	২	৩২—১০
সোডা নাইট্রেট ...	২$\frac{১}{৬}$	৩১—১৪
ক্যালসিয়াম সাইনামাইড ...	২	৩০— ৩
লাইম নাইট্রেট ...	৩	৩২—১৭
বিনা সারে ...		২৫— ৯

উক্ত চারি প্রকার সারের নাইট্রোজেনের তারতম্য হেতু প্রযোজ্য সারের পরিমাণের তারতম্য করা হইয়াছে। সকল পরীক্ষাতে এক একর পরিমাণ এক একটি ক্ষেত্র রচনা করা হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল বিচার করিয়া বুঝা যায় যে, ক্যালসিয়াম সাইনামাইড ও লাইম নাইট্রেট অপর দুইটি নাইট্রোজেন সারের তুল্য কার্য্যকারী। এক একর জমি বাঙলা দেশের প্রায় তিন বিঘার কিছু অধিক। এক হন্দরের ওজন বাঙলায় ১ মণ ১৪ সের এবং বিশ হন্দরে ১ টন হয়।

পাট—

কি প্রকারে পাটের ফলন বাড়ে কিম্বা আঁশের উন্নতি হয় এইজন্য পূর্ব্ববঙ্গে অনেক প্রকার পরীক্ষা করা হইতেছে। এই হেতু ব্যবহারিক কৃষি-তত্ত্ববিদ বারকিল সাহেবের তত্ত্বাবধানে $\frac{১}{১০}$ বিঘা পরিমাণ এক একটি ক্ষেত্র রচনা করিয়া তাহাতে নানা জাতীয় পাট বীজ বপন করা হইয়াছিল। ১০০ শতের অধিক জাতীয় পাটের আবাদ করিয়া তন্ন তন্ন বিচারে জানিতে পারা গিয়াছে -

বঙ্গদেশে দুইটি ভিন্ন জাতীয় পাটের আবাদ হয়—

(ক) লম্বা শুঁটি পাট (Corchorus olitorius)—ঢাকার বাঙ্গি, সেরাজগঞ্জের তোসা, ফরিদপুরের সাতনলা, ত্রিপুরা ও ঢাকার দেওপাট, হুগলীর দেশী, আসাম ও উড়িষ্যার মিঠা ইত্যাদি এই জাতির অন্তর্গত।

(খ) গোল শুঁটি পাট—(Corchorus Capsularis)—পাবনার দেশওয়াল, কাকিয়া বোম্বাই; মৈমনসিংহের বরাণ, বড়পাত, ছোটপাত, আউসে; ঢাকার ধলেশ্বরী, বেলগাচী, রঙ্গপুর এবং জলপাইগুড়ির ভাদিয়া, হেউতি, বিত্রি; ফরিদপুরের আমোনিয়া, ত্রিপুরার দেওধলি; আসাম ও উড়িষ্যার তিত পাট প্রভৃতি গোলশুঁটি পাট জাতিভুক্ত।

কলিকাতার আশপাশে এবং হুগলিতে লম্বাশুঁটি পাটেরই চাষ সাধারণতঃ হইয়া থাকে। রাজসাহি, পাবনার স্থানে স্থানে এবং ফরিদপুরেও অল্লাধিক স্থানে এই

পাটের আবাদ হয়। এই পাটের আঁশ একটু মোটা হইলেও খুব শক্ত ও টানসহ; কলিকাতা বাজারে এই পাট দেশী পাট বলিয়া চলিয়া থাকে। এই জাতীয় পাটের ফলন অধিক হয়। ইহার মূল্য গোলশুঁটি অপেক্ষা কিছু কম। অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে ইহার চাষ হয়, কারণ ইহার ক্ষেতে অধিক জল দাঁড়াইলে এই পাট বাড়ে না। লম্বা শুঁটি পাটের বীজ ইহা অপেক্ষা কিছু ছোট এবং ইহার রঙ ঈষৎ সবুজ কৃষ্ণ।

গোল শুঁটিধারী পাটের আবাদও অধিক এবং বহুতর স্থানে ইহার চাষ হয়। সমগ্র জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর মৈমনসিংহ, এবং পূর্ণিয়া জেলায় এবং ঢাকা ও ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থানে এই জাতীয় পাটেরই আবাদ হয়। ইহার আঁশ, লম্বা-শুঁটি পাটের আঁশ অপেক্ষা সুক্ষ্ম। ক্ষেতে অধিক জল জমিলেও এই পাটের কোন ক্ষতি হয় না। গাছ বড় হইয়া ৫ ফিট হইলেই জমিতে জল যতই বৃদ্ধি হউক এই পাটও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকিবে।

দুই জাতীয় পাটের পার্থক্য—

(ক) গোল শুঁটি পাটের বীজ অপেক্ষাকৃত বড়, ইহার রঙ, লাল;

(খ) উভয় জাতীয় পাটের ফুল হরিদ্রা রঙের: গোল শুঁটি পাটের ফুল আকৃতিতে লম্বাশুঁটির দ্বিগুণ হইবে।

(গ) গোলশুঁটি পাটের পাতা খাইতে মিষ্ট, লম্বা শুঁটি পাটের পাতা তিত; এই কারণে প্রথমোক্তটিকে মিঠাপাট এবং দ্বিতীয়টিকে তিতো পাট বলে।

এই দুই জাতীয় পাটের মধ্যে প্রত্যেকটির নানাপ্রকারের পাট দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল পাটের যে গুলির ছোট ফুল, গোলফল এবং পাটকিলে রঙের বীজ হয় সেইগুলিকেই গোলাশুঁটি বা (Corchorus Capsularis) শ্রেণীতে ফেলা হয়।

এই শ্রেণীর পাটের কোন কোন প্রকার ১০ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়, কোনটি বা ৭ কিম্বা ৮ ফিটের অধিক বাড়ে না। গাছের কাণ্ডের রঙের অনেক তফাৎ আছে—

(১) কাণ্ড ঘোর লাল, (২) কাণ্ড ঈষৎ লাল, (৩) কাণ্ড পাটকিলা রঙের, (৪) কাণ্ড সবুজ কাণ্ড, পাতার মূল লাল, (৫) কাণ্ড নির্ভাঁজ সবুজ।

ইহাতে বুঝা যায় যে লাল ও সবুজ ইহার দুইটি পৃথক থাক আছে এবং এই লাল সবুজ পাটের জলদি ও নাবী দুইটি প্রকার আছে—

জলদি সবুজ পাট—

পূর্ণিয়া, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, মৈমনসিংহ ও দিনাজপুরে অধিক জন্মায়। পূর্ণিয়ায় এই জাতীয় পাটের নাম দেশী পাট, জলপাইগুড়িতে ধলা ভাদৗয়া, রঙ্গপুরে ধলা বিত্রি, মৈমনসিংহে আউসা।

জলদি লাল পাট—

জলপাইগুড়িতে লাল ভাদুই, রঙ্গপুরে লাল বিত্রি, মৈমনসিংহে সরিষাবাড়িতে ছোট পাতা লাল পাট জন্মায়।

জলদি জাতীয় পাটের আবাদ প্রধানতঃ উত্তরাঞ্চলেই হইয়া থাকে। পাবনা, ঢাকা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে এমন কি সমুদয় দক্ষিণাঞ্চলে নাবী পাটেরই আবাদ হইয়া থাকে।

গোল শুঁটি পাটের ন্যায় লম্বাশুঁটি পাটেরও অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে। প্রায় শতাধিক প্রকারের গোলশুঁটি পাট বিভিন্ন জেলা হইতে সংগ্রহ করিয়া দেখা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও অনেকগুলিই এক শ্রেণীর অন্তর্গত। সূক্ষ্ম বিচারে জাপান ও ফরমোসার দুইটি পাট লইয়া ২০ টির অধিক সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর পাট মিলে না। একটি সুখের কথা এই যে, পাটের বীজ স্বপুষ্পের পরাগরেণু দ্বারা সঞ্জীবিত হয়, পুষ্পান্তর হইতে পুষ্পরেণুর নিষেক ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না। এই কারণে প্রত্যেক প্রকার পাট বীজ হইতে মাতৃ বৃক্ষের ন্যায় ফসল উৎপন্ন হওয়া অধিকতর সম্ভব। কিন্তু এক স্থানে বিভিন্ন প্রকার পাট বীজের চাষ হয় বলিয়া পাটের সঙ্কর প্রতিনিয়তই হইতেছে। বাজারের মিশ্রিত পাট বীজ লইয়া চাষ না করিয়া বীজ নির্বাচন পূর্ব্বক লাল জলদি, লাল নাবী, সবুজ জলদি, সবুজ নাবী এই চারি শ্রেণীর পাট পৃথক জন্মানই সুবিধাজনক। এই প্রকার চাষ দ্বারাই পাটের জাতীয় উন্নতি হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

২০ প্রকার পাটের মধ্যে প্রত্যেক পাটের আঁশের তফাৎ আছে। সমান জল হাওয়া ও মৃত্তিকায় ইহাদের চাষ হইলে তুল্যরূপ ফসলই উৎপন্ন হইবে। বিভিন্ন জল হাওয়ায় ইহাদের আঁশের কিরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে তাহা অদ্যাপিও স্থির হয় নাই। এক্ষণে পাটের বিশেষজ্ঞ ফিন্‌লো সাহেব, পাটের এই পরীক্ষার দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে গমের আবাদ—১৯১০-১১—

গম বপনের সময় জমি বেশ সরস থাকায় প্রথমাবস্থায় গমের চাষের বেশ সুবিধাই হইয়াছিল এবং অন্য বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৩ ভাগ অধিক জমিতে গমের আবাদ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে গমের আবাদী জমির পরিমাণ ৭৪,৭০০ একর। মালদহ, রাজসাহী, পাবনা প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ গমক্ষেতগুলিই গঙ্গার ধারে। অধিক জমিতে গমের আবাদ হইলেও ফলন আশানুরূপ দাঁড়ায় নাই। মোট ২০,১০০ টন মাত্র গম জন্মিয়াছে বলিয়া অনুমান হইয়াছে। বিগত বৎসর অপেক্ষা তিন আনা রকম কম গম উৎপন্ন হইয়াছে।

বিগত বৈশাখ মাসে এ অঞ্চলে গমের দর ৪।৵০ আনা মণ।



ভাদ্র, ১৩১৮ সাল।

নূতন নাইট্রোজেন প্রধান সার

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক পণ্ডিত সার উইলিয়াম ক্রুকস্ ব্রিটিস্ অ্যাসোসিয়েসনের অধিবেশনে যখন মন্তব্য প্রকাশ করেন যে জগতে যুক্ত সোরাজানের মাত্রা কমিয়া যাইতেছে তখন বিলাতী কৃষক সমাজে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সোরাজান না পাইলে অনেক অত্যাবশ্যকীয় ফসল উৎপাদিত হইবে না। ফসল উৎপাদিত না হইলে অনেক জীবজন্তু বিনষ্ট হইবে এবং এমন কি পরোক্ষভাবে বিশুদ্ধ মাংসভোজী প্রাণীরও প্রাণ ধারণ করা দুরূহ হইয়া উঠিবে।

কিন্তু বিংশতি শতাব্দীতে প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না বলিয়া যে কার্য্যতঃ তাহার অভাব হইবে, তাহা কখনই সম্ভবপর নয়। প্রাকৃতিক অবস্থায় যুক্ত সোরাজান কমিয়া যাইতেছে—আচ্ছা, তাহা যাইতে দেওয়া হউক। এখন অনুসন্ধানীয় বিষয় এই যে, কি উপায়ে ফলিত রসায়নের সাহায্যে বায়ুমণ্ডল-স্থিত অম্লজান ও সোরাজানকে সংযুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক মনঃসংযোগ করিলেন ও তাহার ফলে যুক্ত সোরাজান প্রস্তুত করার দুইটি প্রথা উদ্ভাবিত হইল। উভয়েরই মূল ক্রিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি ও তজ্জনিত তাপের উপর নির্ভর করে।

অনেক স্থলের জলপ্রপাতকে শৃঙ্খলীভূত করিয়া তাহা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি আহরিত হইল এবং তাহার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের সোরাজানকে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত করা হইল। আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা নাইট্রিক অ্যাসিড্‌কে চূণের সহিত সংযুক্ত করিয়া উহার দ্রাবণ হইতে নাইট্রেট অব্ লাইম বাহির করিয়া লওয়া হইল।

ইহা অভিনব প্রথা। ইহার পূর্ব্বেও নাইট্রোলিম্ অথবা ক্যালসিয়ম সায়নামাইড্ নামক একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম পরীক্ষাদির পর এই দ্রব্য সারের পক্ষে এত উপযুক্ত ও সুলভ বলিয়া প্রতীয়মান হইল যে আজকাল পৃথিবীর নানাস্থানে নাইট্রোলিম্ প্রস্তুত হইতেছে। তন্মধ্যে নরওয়ে দেশের ওড্ডা নামক স্থানে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ সায়নামাইড্ কোম্পানি নামক কোম্পানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এতদিন পর্য্যন্ত নাইট্রেট অব্ সোডা ও সলফেট্ অব এমোনিয়াই দুইটি মহৎ প্রাপ্য নাইট্রোজেন-প্রধান-সার ছিল। কিন্তু সলফেট্ অব এমোনিয়া প্রত্যক্ষভাবে প্রস্তুত হয় না। ইহা গ্যাস, আলকাতরা প্রভৃতি কারখানার একটি গৌণ দ্রব্য। নাইট্রেট অব্ সোডাও একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকায় অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়; সেখানেও নাইট্রেট্ অব্ সোডার খনি আর অধিক দিন থাকিবে না বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় যে নূতন দুইটি নাইট্রোজেন-প্রধান-সার উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য সুখের বিষয়। কিন্তু এই দুইটি নূতন সার, পুরাতন দুইটি সারের সমকক্ষ কি না, অথবা উৎকৃষ্ট কিম্বা অপকৃষ্ট তৎসমুদয় বিষয় জানিবার জন্য অনেকের আগ্রহ হইতে পারে। সম্প্রতি বিলাতে এই সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা হইয়াছিল। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত পরীক্ষা সমূহের ফলাফল আলোচনা করিয়া কয়েকটি সারের আপেক্ষিক উপকারিতা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বিগত তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষাগুলি নির্ব্বাহিত হয়। পরীক্ষার জন্য শালগম উপযুক্ত ফসল বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত তালিকায় বিভিন্ন বৎসর বিভিন্ন সার দ্বারা উৎপাদিত ফসলের ওজন প্রদত্ত হইল।

	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০
	পাঃ	পাঃ	পাঃ
সার হীন	১২৯	৩৯½	১৫৯½
ক্যালসিয়ম সায়নামাইড্	১৭৩	৪৬	১৮৭
ঐ (হাইড্রেটেড্)	—	—	—
এমোনিয়াম সলফেট্	—	৩৯½	১৬৯½
নাইট্রেট অব্ লাইম	—	৫৫½	—
নাইট্রেট অব্ সোডা	১৫৩	৫৬	২১৪½

যদিও তালিকায় প্রদর্শিত হয় নাই তথাপি অপরাপর পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, হাইড্রেটেড্ ক্যালসিয়ম সায়নামাইড্ ভিন্ন অপর সকল সারের উৎপাদক শক্তি অনেক কম। তবে প্রত্যেক বৎসর জমি অবশ্য ঠিক ছিল না এবং জল হাওয়াও সমান থাকে নাই, তজ্জন্যই ফলের কিছু অধিক

তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি তিন বৎসরের গড় পড়তা করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে জলহাওয়ার জন্য তারতম্য অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। এতদ্ সম্বন্ধে অপরাপর পরীক্ষা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে, ক্যালসিয়ম সায়নামাইড সত্বরে ফলদায়ক হয়। পক্ষান্তরে ইহার কার্য্য অধিক দিন স্থায়ী হয় না। হাইড্রেটেড্ ক্যালসিয়ম সায়নামাইডের আপাততঃ কার্য্য কম হইলেও উহা অপেক্ষাকৃত অধিক দিবস স্থায়ী। ক্যালসিয়ম সায়নামাইডও নাইট্রেট অব লাইম অথবা নাইট্রেট অব সোডা অপেক্ষা মৃদু সার। যদি কোন ফসলে সঙ্গে সঙ্গে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উক্ত দুই সারই প্রকৃষ্ট। তাহার নিম্নে এমোনিয়াম সলফেট্ এবং ক্যালসিয়ম্ সায়নামাইড্। এই দুইটি সারও নাইট্রোজেনের পরিমাণ হিসাবে একরূপ। হাইড্রেটেড ক্যালসিয়ম, সায়নামাইড সর্ব্বাপেক্ষা মৃদু সার।

নাইট্রেট অব লাইম যেরূপ অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে অনেকটা ফিকে ধূসরবর্ণ। ইহার কোন প্রকার গন্ধ নাই এবং প্রথমতঃ অত্যন্ত চূর্ণের মত থাকে। এই মিশ্র পদার্থে শতকরা ৭৫—৭৭ ভাগ ক্যালসিয়াম নাইট্রেট থাকে, অবশিষ্টাংশ জল। পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ অত্যন্ত জলশোষক। নাইট্রেট অব সোডা ও ক্যালসিয়ম সায়নামাইডও তদ্রূপ। ক্যালসিয়ম সায়নামাইড, নাইট্রেট অব সোডা এবং নাইট্রেট অব লাইমের প্রত্যেকের ১০০ গ্রেণ ৫ দিন উন্মুক্ত অবস্থায় রাখিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা বায়ুমণ্ডলস্থিত জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া যথাক্রমে ১৫৮·৭, ২২৬·৯ ও ২৪৭·২ গ্রেণ হইয়াছে। ইহা একটা অসুবিধার বিষয়, কারণ জল টানিলেই হয় সার জমাট হইয়া যায়, না হয় তরল হইয়া যায়, সুতরাং এই সমুদয় সার পিপে খোলার অনতিকাল পরেই ব্যবহার করা উচিত। নাইট্রেট অব লাইমে নাইট্রোজেনের মাত্রা শতকরা ১৩ ভাগ; অর্থাৎ নাইট্রেট অব সোডার সহিত তুলনায় ২·৭ ভাগ কম। মূল্যের তুলনায়ও সেই জন্য নাইট্রেট অব লাইমের কম মূল্য হওয়া উচিত। যদি সুপারফস্ফেটের সহিত নাইট্রেট অব লাইম মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে উক্তমিশ্রিত সার অনতিবিলম্বে প্রয়োগ করা উচিত। নতুবা অনিষ্টকর রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইতে পারে।

ক্যালসিয়াম সায়নামাইড দেখিতে সূক্ষ্ম, শুষ্ক কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণের ন্যায়। ইহাতে শতকরা ৫৭ ভাগ বিশুদ্ধ ক্যালসিয়ম সায়নামাইড, ১৪ ভাগ অঙ্গার এবং ২১ ভাগ কষ্টিক্ চূণ আছে। এতদ্ভিন্ন সামান্য সামান্য মাত্রায় গন্ধক, ফসফরাস, সিলিকন ইত্যাদিও আছে। মৃত্তিকায় জলের সহিত সংযুক্ত হইলে ইহা ক্যালসিয়ম্ কার্ব্বনেট ও অ্যামোনিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মৃত্তিকাস্থিত জীবাণু নাইট্রোজেনকে বৃক্ষের আহারোপযোগী অবস্থায় আনিতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহা বীজ বুনিবার অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। নাইট্রোলিম্ এত সূক্ষ্ম যে ইহা সমানভাবে প্রয়োগ করা সুকঠিন। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র অঙ্গারকণার ন্যায় বায়ুমণ্ডলে ঝুলিতে থাকে। এই সমুদয় অসুবিধা দূর করিবার জন্যই হাইড্রেটেড্ ক্যালসিয়ম সায়নামাইডের সৃষ্টি, এ সমুদয় অসুবিধা হাইড্রেটেড অবস্থায় থাকে না, কিন্তু হাইড্রেটেডের ক্রিয়া অনেক বিলম্বে প্রকাশ পায়। সায়নামাইডের আর একটি সুবিধা আছে। অধিক দিবস সলফেট্ অব্ অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করিলে মৃত্তিকা অম্ল হইয়া উহার উর্ব্বরতা কমিয়া যায়; কিন্তু সায়নামাইডে কষ্টিক চূণ থাকার জন্য তাহা হইতে পারে না। নাইট্রেট্ অব্ সোডার ক্রমাগত ব্যবহারেও জমি খারাপ হইয়া যায়। তাহার প্রতিকার সুপার ফস্ফেট অব লাইম কিম্বা উক্তরূপ কোন সার প্রয়োগ।

আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত রাসায়নিক সারের প্রচলন হয় নাই এবং বিশুদ্ধভাবে রাসায়নিক সার প্রয়োগেরও আমরা পক্ষপাতী নহি। কারণ জীবজ অথবা উদ্ভিজ্জ সারের, জমির প্রাকৃতিক গঠনের উন্নতি করার যেরূপ শক্তি আছে রাসায়নিক সারের সেরূপ কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু মিশ্রভাবে উদ্ভিজ্জ ও জীবজ সারের সহিত রাসায়নিক সার ব্যবহারে লাভ আছে। বস্তুতঃ সমস্ত সারের ব্যবহার, সারের মূল্যের উপর নির্ভর করে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে দুইটি সারের উল্লেখ করিলাম, সে দুইটির দাম এখনও পর্য্যন্ত এত কমে নাই যে, আমাদের দেশে চলিতে পারে। কিন্তু সকল কৃত্রিম প্রণালীতে প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য কমা অবশ্যম্ভাবী এবং তখন ইহাদের প্রচলনও সম্ভব।

পত্রাদি

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, চেতলা, কলিকাতা।

আপনারা "কৃষক পত্রিকায়" ইতিপূর্ব্বে তৈলে, ঘৃতে, এমন কি মাখনে, দুগ্ধে ভেজালের কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। আজকাল ডেলিনিউস প্রমুখ পত্রিকায় ভেজাল সম্বন্ধে খুব আন্দোলন চলিতেছে। আপনারা প্রত্যেক গৃহস্থের বাটিতে ছোট ছোট সরিষা তৈলের কল স্থাপন, বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃতের জন্য গোপালন প্রভৃতি সদুপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আপনাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে সামান্য গৃহস্থের পক্ষে আপনাদের কথা মত কার্য্য করা সম্ভবপর নহে। ধনবান হইলেও যাঁহারা সহরবাসী তাঁহাদেরও পক্ষে সহরে গোপালন বড়ই কষ্টসাধ্য হয়। তবে যাঁহাদের বাগান বাড়ী আছে বা কলিকাতার নিকটে মফঃস্বলে জায়গাজমি আছে, তাঁহাদের পক্ষে সকলই সম্ভব। সক্ষম লোকে না হয় একটা উপায় করিয়া লইলেন; সক্ষম লোকই বা কয়জন? বোধ হয় ষোল আনার এক আনাও হইবে না, বাকী লোকের উপায় কি? যৌথ কারবার খুলিয়া তৈলাদির কারখানা এবং বড় গোশালা স্থাপন করিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধাদি খাদ্যবস্তু সরবরাহ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ইহাতেও একটি প্রধান অন্তরায় আছে। দেশ যখন ভেজালে ছাইয়া যাইতেছে, তখন খাঁটি জিনিষ বিকাইবে কেন? গরীবে সস্তার লোভ কি প্রকারে সামলাইবে? গরীবইত অধিকাংশ। ভেজাল বেচিলে অন্যদেশে যেমন দণ্ডের বিধি আছে, সেইরূপ কোন বিধি প্রবর্ত্তিত না হইলে ভেজাল চলা বন্ধ হইবে না।

সুধু কি খাদ্যবস্তুতে ভেজাল? বীজ কিম্বা গাছ পালার ব্যবসায়ও ভেজাল চলিতেছে। নূতন বীজের সহিত পুরাতন বীজ মিশাইয়া, ভাল বীজের সহিত খারাপ মিশাইয়া, সস্তায় পড়তা করা হইয়া থাকে। নিরীহ ভদ্রলোকদিগকে এই কারণে অনেক অর্থ ও সময় বৃথা নষ্ট করিতে হয়। তাঁহারা যে কাহাকে বিশ্বাস করিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না, যা তা বীজ খরিদ করা এক হিসাবে সামান্য পাপ,—না হয় এক বৎসরে তাহার শাস্তি হইল। নকল গাছ খরিদের বিড়ম্বনা বহুকাল ব্যাপী। লোকে ভাল জোড় দেখিয়া কলম খরিদ করিল, জোড়ের দোষ নাই, গাছ যাহা বলিতেছে তাহাও ঠিক, কিন্তু সেই কলম বসাইয়া গাছ আর ফলে না। অনুসন্ধান করিয়া জানা যাইবে যে, ঐ গাছ আঁটির চারার সহিত আঁটির চারার জোড় লাগান। আঁটির চারার সহিত আঁটির চারার জোড় তাহা সহজে ফলিবে কেন? যে গাছে আদৌ ফল ধরে নাই, সে গাছের জোড় কলম হইলেও ঐ দোষ ঘটে। তার উপর এক গাছ বলিয়া অন্য গাছ দেওয়া, ভাল বলিয়া মন্দ দেওয়া, দোষযুক্ত কলম

দেওয়া ইত্যাদি কত প্রকার প্রতারণা আছে, তাহা ঠিক করিয়া উঠা যায় না। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, এদেশের লোকের দেশের হিতের দিকে লক্ষ্য নাই এবং স্থায়ী ভালর আকাঙ্ক্ষা নাই, আশু একটা লাভ হইলেই হইল। একবার কেহ ভাবেনা যে যাহা সত্য তাহা ছাড়া কোন কিছু স্থায়ী হইতে পারে না।

সাবর কলেজ—ইতিপূর্ব্বে কৃষকে সাবর ও পুষা কলেজের যে খবর দিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। সবিশেষ জানিলাম যে নভেম্বর ১৯১০ হইতে আংশিকরূপে সাবর কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সময় হইতে ছাত্র লওয়া হইতেছে। উদ্ভিদতত্ত্ব, কৃষি-রসায়ন, ভূতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, ব্যবহারিক কৃষি প্রভৃতি কৃষি সম্বন্ধীয় বিষয় গুলি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তিন বৎসরে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবে। প্রথম বৎসরের ছাত্র সংখ্যা ২১ জন। উত্তীর্ণ ছাত্রগণ L.A.G. উপাধি প্রাপ্ত হইবে। কৃঃসঃ

পুষা—এখানে মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ছাত্র লওয়া হইবে। প্রাদেশিক কৃষি-কলেজের ছাত্রগণকে কিম্বা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বিশিষ্ট ছাত্রদিগকে এখানে শিক্ষার্থ প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে দুই জন ছাত্র লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কৃষি-সম্বন্ধীয় যাবতীয় মৌলিক তত্ত্ব শিখান হইবে।

পুষাতে একটি সাধারণ ছাত্রদিগের শিক্ষা বিধানের আয়োজন হইয়াছে। প্রায় বিশ জন ছাত্র এই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে। তাহাদিগকে সামান্যতঃ ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব প্রভৃতি শিখান হইবে। তাহারা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহের বা অন্যত্র কৃষি-কার্য্য তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হইবে। এক কথায় তাহারা ২০৲।২৫৲ টাকা বেতনে ক্ষেত্র পরিদর্শক (Field-man overseer) হইবে।

কৃষি-শিক্ষা বিধানের এ প্রকার আয়োজন হইলেও বিশিষ্ট ছাত্রগণের পুষাতে যাইবার তত আগ্রহ দেখা যায় না। তাঁহারা জানিতে চান যে, শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। দেশের লোক এখনও নিরতিশয় নিশ্চেষ্ট। তাঁহারা ব্যবসায়ার্থ চাষাবাদে মনোনিবেশ করিবেন এরূপ আশু কোন আশা নাই। শিবপুর কলেজের ছাত্রগণকে ডেপুটি বা সব-ডেপুটির কার্য্য দেওয়া হইত। উচ্চ অঙ্গের কৃষিশিক্ষা করিয়া এই সকল ছাত্র ডেপুটি কিম্বা সব-ডেপুটির কার্য্য করিবেন ইহা কথনই বাঞ্ছনীয় নহে। তথাপি ঐ চাকুরির লোভে অনেক ছাত্র শিবপুরে অধ্যয়ন করিতে যাইত। এদেশে ধনবান লোকের ছেলেরা বিশেষ কোন প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিতে চান না। যাঁহারা পুষাতে অধ্যয়ন করিতে যাইবেন, তাঁহারা সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তান সুতরাং তাঁহারা

ভবিষ্যতের ভাবনা ত্যাগ করিতে পারেন না। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য-নির্দ্ধারণ করিয়া দেন এই তাঁহাদের ইচ্ছা। আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে ছাত্রগণকে কৃষিবিদ্যা শিখাইয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে যেমন ২৫০৲ হইতে ৪০০৲ টাকা বেতনের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইতেছে, পুষার ছাত্রগণ সেইরূপ কোন আশা পাইলে আশ্বস্ত হইতে পারে। তবে তাহাদিগকে গভর্ণমেণ্ট ষ্টেটে বা কৃষি-ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের সংস্রবে রাখা হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কারণ তাহা হইলেই শিক্ষার সার্থকতা হইবে। কৃঃ সঃ।

শুষ্ক প্যাকিং—নাজিরার অন্তর্গত ম্যাজেঙ্গা চা-বাগানের জনৈক সাহেব গোলাপের কলম শুষ্ক প্যাক করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন এবং তাহাতে গাছ ভাল অবস্থায় পৌঁছিবে কি না জানিতে চাহিয়াছেন, তদুত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, রেঙ্গুনে একবার গোলাপ গাছ আমরা এই প্রকারে প্যাক করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। ৮টী গাছ পাঠান হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৩টী গাছ বাঁচিয়াছিল। ডাকযোগে এই গাছ পাঠান হইয়াছিল। ইহাতে খরচ খুব কমে হইয়াছিল। ষ্টীমারে এই গাছ পাঠাইতে হইলে, বোধ হয় পাঁচ ছয় গুণ অধিক খরচ পড়িত। বিশেষ সাবধানে শুষ্ক প্যাক করিয়া পাঠাইতে পারিলে বোধ হয় সমুদয় গাছ জীবিত অবস্থায় পৌঁছিতে পারে। কারণ পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মাসাবধি কিম্বা ততোধিক কাল গাছের চারা সছিদ্র বাক্সে আবদ্ধ থাকিলেও জীবিত থাকে। কৃঃ সঃ।

সিয়ারা রবার—মিঃ এম, ডি, ফুকন মিরিবিল ইক্ষুক্ষেত্র, লেটিকুজান, আসাম। আমাদের নিকট রবারের বীজ নাই বা কলিকাতায় অন্য কোথাও মিলিবে না। রবার বীজ হইতে চারা ফুটিতে বিলম্ব হয়। ১০০ শত বীজ হইতে ৬০ কিম্বা ৭০টা চারা জন্মিতে পারে। গাছ লইলে এখানে এক একটি গাছ চারি আনা মূল্যের কমে মিলিবে না। কৃঃ সঃ।

সবুজ বা সজী সার—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দে, মেদিনীপুর,—জানিতে চান যে, মটর, মসুর প্রভৃতি সবুজ সাররূপে ব্যবহার করা যায় কি না এবং সবুজ সার গোবর সারের সমতুল্য কি না?

[যাবতীয় শুঁটীধারী গাছই সবুজ সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সজী-সারের জন্য মটর জাতীয় (শুঁটীধারী) গাছ,—মটর, খেঁসারী, বরবটী, কুলৃতি, ধঞ্চে, শণ, নীল প্রভৃতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই জাতীয় গাছের মূলে

একরূপ উদ্ভিদাণু (ব্যাক্‌টিরিয়া) বায়ুমণ্ডলস্থ নাইট্রোজেন সঞ্চিত করিয়া ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতার বৃদ্ধি করে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে মটর, খেঁসারী জন্মাইয়া তাহা ঐ জমিতেই গরু দ্বারা খাওয়ান হয়। তৎপরে ঐ জমি কর্ষিত হইয়া থাকে। ইহা অতি উত্তম প্রথা। ইহাতে পশুগণ যেমন একদিকে সুখাদ্য গ্রহণ করিয়া বলিষ্ঠ হয়, তেমনি আবার মলমূত্র ত্যাগ করিয়া এই ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। অনেক স্থানে সারের জন্য গোবর মিলে না। সেখানে সবুজ সার একমাত্র উপায়। অনেক স্থলে কৃষকগণ শণের সবুজ সার পাটের জমিতে ব্যবহার করিয়া থাকে।]

গোবর সার ও সবুজ সারের মধ্যে কোন্ ফসলে কোন্‌টি অধিকতর উপকারী তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। বর্দ্ধমানক্ষেত্রে ধান্যে সবুজ সারই অধিকতর কার্য্যকারী বলিয়া স্থির হইয়াছে। সারের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ কৃষি-রসায়ন পুস্তক পাঠে জানা যায়। কৃঃ সঃ।

ঈশ্বর বাবু আলুর কীট

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঈশ্বরবাবু প্রত্যুত্তরে কৃষি সম্পদের ২য় সংখ্যা ৫৮ পৃষ্ঠায় গোলাপোকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "এই সকল কীটের বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ কৃষি সমাচারে ২১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে"। "ফসলের পোকার" ত্রয়োদশ চিত্রপটে ইহার স্বাভাবিক রঙ ও আকার ইত্যাদি দেখান হইয়াছে। ইহা প্রকৃত পক্ষে বীজ আলুর পোকা এবং এই নামেই ইহার সঠিক বিবরণ ফসলের পোকার ৭৫—৭৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।

ঈশ্বরবাবু ইহার আচরণ বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন "আলু নাশক কীট রাত্রিতে বাহির হইয়া গাছের মূল, পত্র ও শিকড় ইত্যাদি খাইয়া ফেলে—দিনের বেলায় গাছের গোড়ায় মাটির নীচে লুকাইয়া থাকে। * " * যে গাছের পাতা বা ডাঁটা শুষ্ক হইতেছে দেখিবে সেই গাছের বা তন্নিকটবর্ত্তী অন্য কোন গাছের গোড়ার মাটি "খুরপী" দ্বারায় আল্গা করিয়া সরাইলেই দেখিবে যে, গাছের কাণ্ডের নিকট বা গোড়ায় তাহারা লুকাইয়া আছে"। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঈশ্বরবাবু "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপাইয়াছেন। তাঁহার কোন পোকারই ঠিক জ্ঞান নাই। চিত্রে অঙ্কিত ও তাঁহার বর্ণিত পোকার আচরণ এরূপ নয়। ইহারা ক্ষেত্রস্থিত আলুর গাছ তত বেশী আক্রমণ করে না। যখন করে তখন পাতার দুই পর্দ্দার ভিতর কিম্বা ডাঁটার ভিতর আসিয়া কুরিয়া কুরিয়া খায় এবং উহাদের ভিতরেই সকল সময়ে থাকে; দিনের বেলা কখনও মাটির ভিতর যাইয়া লুকায় না। এই পোকা গোলাজাত আলুই বেশী আক্রমণ করে।

আলুর চোকের উপর ডিম পাড়ে। ডিম হইতে ফুটিয়া ক্ষুদ্র কীড়ারা আলুর ভিতরে প্রবেশ করে এবং কুরিয়া কুরিয়া খায় এবং উহাদের ভিতরেই সকল সময়ে থাকে; দিনের বেলা কখনও মাটির ভিতর যাইয়া লুকায় না। ইহারা সর্ব্বদা আলুর ভিতরেই থাকে ও বর্দ্ধিত হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ফসলের পোকায় আছে।

ঈশ্বরবাবু শোলা পোকার কোন্ অবস্থায় ডিম হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট ভাবে লেখেন নাই। তিনি প্রকারান্তরে শোলাপোকার প্রজাপতিকেই মারিতে বলিয়াছেন। ইহার দ্বারাও কীট পতঙ্গের আচরণ সম্বন্ধে যে তাঁহার কোনই জ্ঞান নাই, তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। কারণ শোলাপোকা প্রজাপতি হইয়া ধরা দিবার জন্য ক্ষেতে বসিয়া থাকে না। বরং শোলাপোকাকে ধরা যাইতে পারে, তাহার প্রজাপতিকে ধরা অত্যন্ত কঠিন।

জলকে অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত করিয়া পরীক্ষা না করিয়াই পরীক্ষার ফলে কি হয় ঈশ্বর বাবু ধরিয়া লইয়াছেন। পাঠকগণকে এবং ঈশ্বর বাবুকেও অনুরোধ করি, যেন তাঁহারা নিম্নলিখিত রূপে জলকে গরম করিয়া তাহাতে আপনা হইতে মশা হয় কি না দেখেন। জলকে অগ্নিসংযোগে ফুটাইবেন এবং ফুটিতে ফুটিতে হাঁড়ির মুখ এরূপে বন্ধ করিবেন যেন ক্ষুদ্র কীটও প্রবেশ করিতে না পারে। এইরূপে বন্ধ করিয়া যতদিন ইচ্ছা রাখিয়া দিবেন এবং দেখিবেন কখনও মশা জন্মিবে না। গোবর প্রভৃতিতেও প্রথমাবধি যদি কোন কীট পৌঁছিতে না পারে তাহা হইলে তাহাতে পোকা হয় না। আমের পক্ষেও তাহাই। প্রকৃত পক্ষে আমে ক্ষত করিয়াই আমের মাছি আমের ভিতর ডিম পাড়ে। কিন্তু ক্ষত এত ক্ষুদ্র যে ভাল করিয়া না দেখিলে নজরে পড়ে না। কৃমি বা কাটা প্রকৃতপক্ষে কীট জাতীয় (Insect) নয়। ইহাদের জীবন বৃত্তান্ত আমার জানা নাই। তবে গো মহিষাদির পেটে একরকম মাছির কীড়া হয় তাহাদের বিবরণ সংক্ষেপে ফসলের পোকার ১০৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। ইংরাজি অভিজ্ঞ পাঠকগণ লেফ্রয় সাহেবের ইণ্ডিয়ান ইন্‌সেক্ট লাইফ (Indian Insect Life) নামক পুস্তকে ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন। Spontaneous Generation "স্বাভাবিক জন্ম" অর্থাৎ অজৈবিক পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তি প্রথমে অনেকে বিশ্বাস করিতেন। মনে করিতেন মাথার ময়লা হইতে উকুন এবং আবর্জ্জনা হইতে অনেকানেক কীট আপনা আপনিই জন্মে। ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে ইহাদের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ জানা গিয়াছে। অতএব "স্বাভাবিক জন্ম" মত বৈজ্ঞানিকগণের অজ্ঞতার পরিচায়ক। যাহাদের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিতেন তাহারা আপনা আপনিই জন্মিয়াছে এই মত প্রকাশ করিতেন। এখনও অসংখ্য জীবাণু (Protozoa) আছে যাহাদের উৎপত্তির প্রকৃত বিবরণ জানা যায় নাই, কিন্তু

জীবতত্ত্ববিদগণ কেহই এখন আর এই মত অনুমোদন করেন না। হাক্স্লি প্রভৃতি মহাত্মাগণের নামের দোহাই দিয়া না জানিয়াই কোন বৈজ্ঞানিক মত অপ্রকৃতভাবে প্রচার করিতে চেষ্টা করিলে ঐ মহাত্মাগণের অবমাননা করা হয়। ঈশ্বর বাবু আমার কথা সত্য বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিবেন না। অতএব তাঁহাকে অনুরোধ করি যেন তিনি জীবতত্ত্বজ্ঞ কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন কিম্বা পুস্তক পাঠ করিয়া দেখেন। যদি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন তাহা হইলে আরও উত্তম। তবে রীতি বিরুদ্ধ পরীক্ষার কোন মূল্য নাই। যেমন তিনি এক স্থানে বলিতেছেন যে গর্ভবতী কীটকে মারিয়া জঙ্গলে রাখিয়া দেখিয়াছেন ঐ স্থানে বহুসংখ্যক কীটের উৎপত্তি হইয়াছে। মৃত কীট হইতেই নূতন কীটের উৎপত্তি হইয়াছে কিরূপে জানিলেন? অপর কত রকমের কীট সেই খানে আসিয়া ডিম পাড়িতে পারে এবং অন্যান্য স্থান হইতে সেখানে আসিতে পারে। হয়ত মৃত কীট সকলকে রাখিবার পুর্ব্বেই সেখানে অপর কীট সকল ছিল। প্রকৃতরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্থির করিতে পারিতেন যে তাঁহার রক্ষিত মৃত কীটের ডিম হইতে নূতন কীটের জন্ম হয় নাই। কাইন্‌গা ফড়িং, বাগা ফড়িং প্রভৃতির সঙ্গম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা খুব সম্ভব ঠিক নয়। ইহারা বহুক্ষণ, সাধারণতঃ ৫।৬ ঘণ্টা কাল সঙ্গম করে। একটী ফড়িং আর একটীর পৃষ্ঠে বসিলেই যে সঙ্গম করে তাহা নয়। তবে ইহারা অনেক দিন বাঁচে সেই জন্য একবারেরও বেশী সঙ্গম করিতে পারে—রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া বিশেষতঃ অল্প স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিলে অনেক বার সঙ্গম করে। কিন্তু যদি প্রথমবার সঙ্গমের পরেই স্ত্রী পতঙ্গকে পৃথক করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ইহার সমস্ত ডিমই সঞ্জীবিত হয়। প্রজাপতিরা দুই চারি দিনেই মরিয়া যায়। একবারের বেশী সঙ্গমের অবসর হয় না। উপসংহারে বলিতেছি যে কৃষিসম্পদ সম্পাদক মহাশয় যখন স্বয়ং কীটতত্ত্বজ্ঞ নহেন তখন "কীটতত্ত্ববিদের" ভ্রম কি ঈশ্বর বাবুর ভ্রম বিচার করিবার তাঁহার কোনই ক্ষমতা নাই। অতএব "কোন অজ্ঞাত নামা লেখক" "প্রবন্ধের দুই এক স্থলে ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন" বলিয়া নিসংন্দিগ্ধ চিত্তে ঈশ্বর বাবুর মতের সমর্থন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। লেখক "অজ্ঞাত কুলশীল" হইলেও লেখকের যদি আলোচ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকে, তবে যেখানেই হোক ভুল দেখিলে তাহার সংশোধন করা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যানুরোধে ঈশ্বর বাবুর প্রবন্ধের ভ্রম সংশোধন করা হইয়াছে মাত্র। লেখকের সহিত ঈশ্বর বাবুর পরিচয় নাই এবং ঈশ্বর বাবুর উপর তাঁহার ক্রোধ বা প্রতিহিংসা কিছুই নাই। যে কোন ব্যক্তিই হউন এইরূপ না জানিয়া নিজেকেই সর্ব্বজ্ঞজ্ঞানে পরীক্ষিত ও সপ্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভ্রমপূর্ণ জ্ঞান সাধারণ মধ্যে প্রচার করিতে প্রয়াসী হইলে তাঁহার ভ্রম সংশোধন করা উচিত।

এ স্থলে প্রতিবাদ না করিয়া ভ্রম সংশোধন করা হইয়াছে এবং ইহার জন্য কৃষক ধন্যবাদার্হ না হইয়া "কলঙ্ক পৃষ্ঠ" কেন হইবে বুঝিতে পারিলাম না। কীটতত্ত্ববিদ লিখিত প্রবন্ধের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া কৃষিসম্পদ সম্পাদক মহাশয় "ব্যক্তিবিশেষের বিসদৃশ সমালোচনা" করা হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আগা গোড়া পাঠ করিয়া দেখিলে এরূপ সিদ্ধান্ত কোন যুক্তিতে আসে, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে আমাদের দেশে কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনার অভাব এবং তৎসম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবের কথাই বলা হইয়াছে, যুক্তি স্থলে ঈশ্বর বাবুর নাম আসিয়া পড়িয়াছে মাত্র। আর এক কথা, "কৃষক" কিম্বা "কৃষিসম্পদ" প্রভৃতি পত্রিকাতে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা সাধারণতঃ যাঁহাদের ইংরাজিতে জ্ঞান নাই তাঁহাদের জন্যই লিখিত। অন্ততঃ সকল প্রবন্ধই সেই উদ্দেশ্যে লিখিত হওয়া উচিত। "ফসলের পোকা" বাঙ্গালা ভাষায় কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে একমাত্র পুস্তক। অতএব ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ পাঠকের জন্য যদি ফসলের পোকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তবে তাহাতেই বা কি দোষ হইয়াছে? কৃষিসম্পদ ও কৃষক প্রভৃতির ন্যায় পত্রিকা ঐ শ্রেণীর পাঠকগণের জন্যই পরিচালিত হওয়া উচিত। এই কারণে সম্পাদকের দায়ীত্ব অতি কঠিন। বিশেষ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করা উচিত। প্রবন্ধ সারগর্ভ হইলেও সহজ বোধ্য না হইলে তাহার উপকারিতা নাই। দুর্ব্বোধ্য প্রবন্ধের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধন্য ধন্য করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা কৃষির ধার ধারেন না। প্রবন্ধ যদি সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত কৃষকের বা কৃষি ব্যবসায়ীর পক্ষে সুবোধ্য হয় তবে প্রবন্ধ লিখনের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। এই কারণেই ইষ্টারণ বেঙ্গল ও আসাম গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগের বাৎসরিক বিবরণী বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন।

প্রবন্ধ লেখকগণের দায়ীত্ব আরও বেশী। কারণ সম্পাদক কৃষিবিষয়ক সকল শাস্ত্রেই অভিজ্ঞ হইবেন এরূপ আশা করা যায় না। ঈশ্বর বাবু কতদূর এই দায়ীত্ব পূরণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা প্রবন্ধের একস্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। প্রবন্ধের অনেক স্থানেই এইরূপ দৃষ্ট হইবে। পাঠকগণ মনোযোগের সহিত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া দেখিবেন। আলুর কীড়ার কথা, নিবারণের উপায় প্রভৃতি বলিতে বলিতে লিখিয়াছেন যে "অতিরিক্ত সার প্রয়োগে অথবা জন্তুর কাঁচা সারে অনেক সময় কীটের জন্ম হইয়া থাকে, আমি দৃষ্টান্ত দ্বারায় তাহা নিম্নে দেখাইতেছি। সার ও অন্যান্য অনেক পদার্থেই স্বভাবতঃ কীট জন্মিয়া থাকে। নিম্নের দৃষ্টান্ত কয়েকটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা প্রমাণিত হইবে। জন্তুর সারে সহজে ও অত্যল্প সময়ে সূর্য্য ও জীবাণুর (Micro organism or Bacteria) ক্রিয়াদ্বারা ফার্ম্মেণ্টেসন (Fermentation অর্থাৎ উত্তাপে দ্রব পদার্থের ফাঁপিয়া

ফেণাবস্থা প্রাপ্তি) হয়। সূর্য্য ও জীবাণুর ক্রিয়াদ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিরূপে ফার্ম্মেণ্টেসন হয়, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা করিতে গেলে, উদ্দেশ্য বিষয়ের আয়তন বৃদ্ধি হইবে বিবেচনায় আমি এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে বিরত হইলাম। এই নিমিত্ত এই প্রবন্ধ পাঠকগণকে ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, অজৈবিক (inorganic) পদার্থের ফার্ম্মেণ্টেসন (fermentation) ও পচন (decomposition) দ্বারায় এমোনিয়া (ammonia) ও কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাসের (Carbonic acid gas) সৃষ্টি হয়।" প্রথমতঃ বিষয়টী কিরূপ সহজ বোধ্য হইয়াছে পাঠকগণ বিচার করিবেন। দ্বিতীয়তঃ অতিরিক্ত সার দিলে কীট জন্মে ইহা শুনা যায় নাই, ঈশ্বর বাবু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি না জানি না। অবশ্য ইহা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বিরুদ্ধ। তৃতীয়তঃ মশার উৎপত্তি ইত্যাদি যাহা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহার আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ কীট সম্বন্ধে আলোচনা করিতে Bacteria, Fermentation ইত্যাদি কিরূপে আসিয়া পড়িল বুঝা যায় না। তিনি কিন্তু অপরকে "ধান ভানিতে শিবের গীত", "ডাল খিচুড়ি,", অপ্রাসঙ্গিক কথায় প্রবন্ধের কলেবর পূরণ, ইত্যাদি দোষে নিন্দা করেন। পঞ্চমতঃ—পাঠকগণকে যাহা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার করিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছেন তাহার "বিস্‌মোল্লা" তেই ভুল। Inorganic পদার্থ সকলের পচন ইত্যাদি হইতে carbon এবং এমোনিয়ার উপাদান nitrogen প্রভৃতির কিরূপে সৃষ্টি হইবে রসায়ন শাস্ত্রে ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। Organic পদার্থের পচন ইত্যাদি হইতে এই সকল পাওয়া যায়।

এইরূপে প্রবন্ধের যেখানেই বড় বড় ইংরাজি কথা আওড়াইয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেই খানেই গলদ্ করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহাকে একটী উপদেশ দিতেছি। অবশ্য ইহা গ্রহণ করা না করা তাঁহার ইচ্ছাধীন। বাস্তবিকই তিনি অনধিকার চর্চ্চা করিতে চেষ্টা করিয়াই এত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম তিনি চৈতন্য নার্সারির অধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী এবং গাছ উৎপাদন করেন। এই সকলের উৎপাদনের রীতি ইত্যাদি এবং পরীক্ষার ফল যদি যথাযথ বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের তত্ত্বানুসন্ধানে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। কীটতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব ইত্যাদিতে যখন তাঁহার অধিকার নাই, তখন তাহাদের আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইলে ভ্রম করিয়া বসেন এবং করাই সম্ভব। ভ্রম দর্শাইয়া দিলে সত্য কি মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া পরে সমালোচকের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। খুব সম্ভব সমালোচনাতে যাহা বলা হয়, তাহাই ঠিক হইতে পারে, কারণ না জানিয়া কেহই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয় না। সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ না করিয়া

যদি ঈশ্বরবাবু পুনরায় বৃথা বাক্যাড়ম্বরে প্রত্যুত্তর দিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তিনি স্বেচ্ছায় নিজ মত পোষণ করিতে পারেন। প্রত্যুত্তর প্রদানের কোন প্রয়াস করিব না। কারণ বৃথা তর্কবিতর্কে কোন ফল নাই এবং এরূপ তর্কবিতর্কে কোন কৃষিবিষয়ক পত্রিকার কলেবর পূর্ণ হওয়া উচিত নয়।—জনৈক কীটতত্ত্ববিদ্‌।

বঙ্গের জলবয়ু—ভাদ্র মাসের প্রথমে বাঙ্গলাদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে। কুচবিহার, দার্জ্জিলিং সম্বলপুর এবং পূর্ণিয়া, সাহাবাদ ও গয়ার কোন কোন অংশ ব্যতীত বিহারের প্রায় সমুদয় জেলায়ই বৃষ্টি হইয়াছে। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং গয়ার কোন কোন অংশে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ণিয়া. নিম্নবঙ্গের প্রায় সমুদয় জেলা, পূরীর কোন কোন অংশ এবং ছোট নাগপুরে মধ্যম রকম বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু হুগলী, হাওড়া, কটক ও বালেশ্বর জেলার কোন কোন অংশে খুব অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। গত বৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই বেশ উপকার হইয়াছে। সাহাবাদ এবং উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর ও নিম্নবঙ্গের প্রায় সমুদয় জেলাতেই আরও বৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। মোটের উপর শস্যের অবস্থা কতকটা আশাপ্রদ। হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, পাটনা, দার্জ্জিলিং, বালেশ্বর, আঙ্গুল, সম্বলপুর ও হাজারিবাগে সাধারণ চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং হুগলী, মানভূম ও সিংহভূম অঞ্চলে চাউলের মূল্য হ্রাস হইয়াছে। মেদিনীপুর, চম্পারণ, দারভাঙ্গা, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, কটক, আঙ্গুল, পুরী, সম্বলপুর, হাজারীবাগ, আন্দামান ও মানভূমে পশুরোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গুজরাটে অন্নকষ্ট—গুজরাট কাটিবাড়ে একবারেই অনাবৃষ্টি; ফলে ইতি-মধ্যেই তথায় বহু লোকের অন্ন মিলিতেছে না, বহু গবাদির খড় মিলিতেছে না। গুজরাট-কাটিবাড়ের অনেক লোকেই আশা করিয়াছিল, জন্মাষ্টমীর দিন বৃষ্টিপাত হইবেই; কিন্তু এক বিন্দুও পড়িল না; কাজেই লোকের চাঞ্চল্য বাড়িয়াছে। অপিচ বেণিয়া মহাজনেরা বলিতেছেন,—এবার আমরা আর সর্দ্দার তালুকদার প্রভৃতিকে টাকা ধার দিতে পারিব না;—কেননা, ইতিপূর্ব্বে এমনি অন্নকষ্টকালে আমরা ইহাঁদের অনেককেই বিস্তর টাকা ধার দিয়াছিলাম, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহা শোধ পাই নাই। মহাজনদের এইরূপ কথায় ভয়ের কারণ আরও বাড়িয়াছে। টাকা ধার না পাইলে কি তালুকদারেরা অনেকেই অন্নাভাবক্লিষ্ট প্রজার প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন? এরূপ অবস্থায় এক গভর্ণমেণ্টই ভরসা। কাটিবাড়ের ব্রিটিশ এজেণ্ট সাহেব সম্প্রতি বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সহিত এ সম্বন্ধে যুক্তি পরামর্শ করিতেছেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে শস্যের অবস্থা—গত ২১শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে এই প্রদেশে সাধারণভাবে বৃষ্টিপাত সন্তোষজনক হইয়াছে। কিন্তু রাজসাহী বিভাগের কোন কোন অংশে বৃষ্টি কম হইয়াছে। পাট ও আশু ধান্য সংগ্রহ চলিতেছে, উভয় ফসলই ভালরূপ পাওয়া যাইতেছে। হৈমন্তিক ধান্যের অবস্থা মোটের উপর মন্দ নয়, তবে ধানে পোকা লাগিয়া অনিষ্ট করিতেছে। গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁও, শিবসাগর, কাছাড় এবং খাসিয়া, নাগাপাহাড়ে পশু

রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই প্রদেশের অধিকাংশ জেলায়ই জলবায়ুর অবস্থা সময়োচিতরূপ; কাছার, রাজসাহী, মালদহে গরম কিছু বেশী এবং চট্টগ্রাম, বগুড়া ও গারো পাহাড়ে কিছু অধিক বারিপাত হইয়াছে। প্রায় সকল স্থানেই শস্যের অবস্থা আশাপ্রদ; পাট কাটা ও ধান রোপণ কার্য্য চলিতেছে।

জাপান প্রত্যাগত কৃষি-ছাত্র—ভারতীয় ছাত্রগণের শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা-দান সমিতি চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পি, কে, বিশ্বাসকে কৃষিতত্ত্ব-শিক্ষার্থ জাপানে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি তথায় ৫ বৎসর কাল রাজকীয় তপকু বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কৃষি-কলেজে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি তথাকার সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি পি, এচ, ডি, (নাগাকুসী) লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বোচ্চ কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইনিই প্রথমে জাপান হইতে ফিরিলেন। ইনি সাধারণ কৃষি-বিদ্যায় বুৎপত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সম্বন্ধীয় কৃষি-রসায়নে বিশেষ জ্ঞান লাভ, করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্বদেশের কৃষির উন্নতি বিধান করিয়া তাঁহার নিজের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে পারেন, ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

বৃষ্টিপাত—ভাদ্রের প্রথমে অনেক স্থানেই বৃষ্টিপাত হইয়াছে। কোথাও কিছু কম, কোথাও কিছু বেশী,—যুক্তপ্রদেশে অনেক স্থানেই কিছু কিছু। গুজরাটে ইতিমধ্যেই অন্নকষ্টের লক্ষণ দেখা গিয়াছে; প্রচুর বৃষ্টি আবশ্যক। রাজপুতানা এবং পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও বৃষ্টি আবশ্যক। বঙ্গে ত বৃষ্টি অভাবে অনেক স্থানেই ধান্য-বীজ শুকাইয়া গিয়াছে। আবাদের আশা ফুরাইয়াছে। ছেঁচাজলে যে সব স্থানে আবাদ হইয়াছে, এখন বৃষ্টিপাত হইলে সে সব স্থানে উপকার হইতে পারে।

সীমান্তপ্রদেশে শস্য হানি—এলাহাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সীমান্তপ্রদেশে শস্যের বিষম ক্ষতির সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হইতেছে।

সার-সংগ্রহ।

গাছপালার বৃদ্ধি *—কিন্তু যা হয় তা রয় না—কোথায় ঠিক মনে নাই, কিন্তু আমি কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম যে, এদেশে ফণী মনসার গাছ ছিল না। চারি শতবৎসর পূর্ব্বে পোর্ত্তুগীজগণ আমেরিকার কোন স্থান হইতে ইহাকে আনয়ন করেন। ইহার দুই চারিটী শাখা আনিয়া তাঁহারা ভারতের দক্ষিণে গোয়া অঞ্চলে রোপণ করেন। শীতলা ভক্তগণ দেবীর যে মূর্ত্তি লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী গান করিয়া বেড়ায় তাহার ন্যায় শুভ্র কণ্টকময় হরিৎ বর্ণের চাবড়া রূপ অপূর্ব্ব উদ্ভিদ দেখিয়া প্রতিবেশীদিগের লোভ হইল। রাত্রিকালে গোপনে দুই একটী ফণী মনসার গাছ চুরি করিয়া তাহারা বাগানে অতিযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিল। কিন্তু এখন? এখন ফণী মনসার গাছের জ্বালায় দক্ষিণ দেশে অনেক স্থানে লোকের চাষ বাস বন্ধ

হইবার উপক্রম হইয়াছে। লোকের বাগান হইতে বাহির হইয়া প্রথম ইহারা ঊষরভূমি অধিকার করিল, তাহার পর আরও অগ্রসর হইয়া এখন লোকের ক্ষেতখোলা অধিকার করিয়া লইতেছে। কাহার সাধ্য ইহাদিগকে নির্ম্মূল করে। চারুপাঠে সেকালে পুরুভুজের গল্প পাঠ করিয়াছিলাম। পুরুভুজকে কাটিয়া তুমি যত খণ্ড করিবে, তাহা এক একটী খণ্ড এক একটী নূতন পুরুভুজ হইবে। ফণী মনসাকে উদ্ভিদরাজ্যের পুরুভুজ বলিলেও চলে। ঘোর অনাবৃষ্টি হইলে ফণী মনসার আনন্দের আর সীমা থাকে না। হাত পা ছড়াইয়া নধরভাবে ইনি বাড়িতে থাকেন। কেবল যে হাত পা ছড়াইয়া লোকের ভূমি ইনি অধিকার করেন, তাহা নহে। পক্ষীদিগকে ভুলাইবার নিমিত্ত ইনি উজ্জ্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত ফল প্রসব করেন। লোভে পড়িয়া পক্ষীগণ সেই ফল ভক্ষণ করে, কিন্তু তাহারা বীজ পরিপাক করিতে পারে না। বরং উদরের বহ্নিতে উত্তপ্ত হইয়া ইহার আবরণ শিথিল হয়, এবং বিষ্ঠার সহিত বাহির হইয়া শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়, এবং সার রূপ সেই বিষ্ঠা দ্বারা পরিপালিত হইয়া ইহা সতেজে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ফণী মনসা এইরূপে চারিদিকে নিজের অধিকার বিস্তার করিতেছে। সেই সকল স্থানে হতাশ হইয়া কৃষকগণ মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে। কিন্তু ফণী মনসার যতগুলি বীজ জন্মে তাহার এক সহস্রের ভিতর একটীও গাছ হয় কি না সন্দেহ। ইহা যদি অধিক হইত তাহা হইলে সমুদয় ভারতভূমি ফণী মনসাতেই পূর্ণ হইয়া যাইত। ফণী মনসার সংখ্যা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ইহাকে এখন মানুষের কাজে লাগাইবার নিমিত্ত আয়োজন হইতেছে। কাঁটা ফেলিয়া অগ্নিতে ঈষৎ দগ্ধ করিয়া ফণী মনসার গাছ গরুর আহাররূপে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত এক্ষণে চেষ্টা হইতেছে। আমেরিকায় এক ব্যক্তি নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া ইহা হইতে মনুষ্যের আহারের উপযোগী সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের নিমিত্ত পরীক্ষা করিতেছেন।

কীটপতঙ্গের বৃদ্ধি *—নিম্ন শ্রেণীস্থ কীট পতঙ্গদিগের বৃদ্ধিও এইরূপ। এই কলিকাতায় কার্ত্তিক মাসে এক প্রকার সবুজ বর্ণের ক্ষুদ্র পতঙ্গ হয়। সন্ধ্যার পর গ্যাসের লণ্ঠনগুলি তাহারা ছাইয়া থাকে। প্রতি রাত্রিতে কত কোটি যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার সংখ্যা নাই। অমাবস্যার দীপাবলীতেও কোটি কোটি পতঙ্গ মরিয়া যায়। কোটি কোটি অন্য জীবের দ্বারা ভক্ষিত হয়। তাহাদের নিজের জনতাতেও কোটি কোটি সংহার প্রাপ্ত হয়। তাই রক্ষা, তা না হইলে এই সবুজ পোকায় পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যাইত। পৃথিবী? এ তো সামান্য কথা। রোটিফার নামক এক ক্ষুদ্র জীব আছে। ইহারা সর্ব্বদা আপনা আপনি ঘূর্ণিত হয়, সেইজন্য ইহাদের এইরূপ নাম হইয়াছে। এই জীবাণু এত ক্ষুদ্র যে খালি চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। পনেট সাহেব একবার কয়েকটীকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এক বৎসরে তাহাদের সাতষট্টী পুরুষ জন্মিয়াছিল। প্রতি জীব ত্রিশটী করিয়া অণ্ড প্রসব করিয়াছিল। তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, এই এক বৎসরের ভিতর যতগুলি জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহারা সকলেই যদি বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে সৌর জগৎ পার হইয়া ধ্রুব নক্ষত্র পার হইয়া দুরবীক্ষণের সহায়তায় যতদুর দৃষ্টি চলে সমুদয় বিশ্ব সংসার ঐ জীবে পূর্ণ হইয়া যাইত—এতঘন ভাবেপূর্ণ হইয়া যাইত যে, তাহার

* শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

ভিতর তুমি একটী সূচ প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারিতে না। উপরে বর্ণিত সবুজ পোকা অপেক্ষা এফিস নামক আর একার ক্ষুদ্র জীব আছে। মনে কর তাহাদের এক একটী পোকা প্রতিদিন পঁচিশটী করিয়া সন্তান উৎপাদন করে। দ্বিতীয় দিনে তাহাদের সংখ্যা হইবে ২৫×২৫; তৃতীয় দিনে ২৫×২৫×২৫; চতুর্থ দিনে ২৫×২৫×২৫×২৫ ইত্যাদি। মোটামুটি হিসাবে দশ দিনে দশ পুরুষে তাহাদের সংখ্যা হইবে ৬০ ••••••••• ••••••••••••••। বিশ হাজার এই পোকা ওজন করিলে এক রতি হয়, কেবল দশদিনে যত পোকা উৎপন্ন হয় তাহার ওজন কত সহস্র মণ হয়, সে হিসাবে আর আবশ্যক নাই। ভাগ্যে পিপীলিকা প্রভৃতি নানা জীব এই পোকা সাদরে ভক্ষণ করে, তা না হইলে এক বৎসরের ভিতরেই এই পোকা দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইত।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

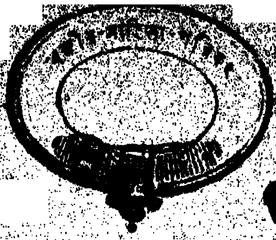
আশ্বিন মাস।

সব্জীবাগান।—এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই জলদি জাতীয় কপি, টমাটো, বিলাতি লঙ্কা প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈয়ারি হইয়াছে। এই সময় নাবী জাতীয় বীজ বপন করিতে হয়। মুগজ সব্জীর চাষ এই সময় হইতে আরম্ভ। মূলা, সালগম, বীটের এই সময় চাষ আরম্ভ করিবে। বেগুন চারা ইতিপূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সীম, মটর বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। জলদি কপিচারা যাহা ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাতেও এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকা পাতা গুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলুও এই সময় বসাইবে, পিঁয়াজ চাষেরও এই সময়।

ফুলের বাগান।—এই সময় এষ্টার, প্যান্সি, ভার্ব্বিনা, ডালিয়া, ক্লিয়াস্থাস, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুল বীজ বপন করিতে আরম্ভ করিবে।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় বেগোনিয়া, জেরিনিয়ম প্রভৃতি কোমল গাছগুলির বিশেষ পাট করিতে হয়। এই সকলের কাটিং বসাইতে পারা যায়, কিন্তু পাহাড়ে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয়—সুতরাং সাসি দ্বারা আবৃত স্থানে সে সকল কাটিং পোতা উচিত। গোলাপের কলম (Budding) এখন করা যাইতে পারে—বিশেষতঃ হাইব্রীড পারপেচুয়াল জাতীয় গোলাপের বডিং হইবে। চীনা, টি, বুরবন জাতীয় গোলাপের কাটিংও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এখন করা যাইতে পারে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে সব্জী তৈয়ারি করা হইয়া উঠে না। তবে আচ্ছাদনের ভিতর যত্ন করিয়া করিলে কিছু কিছু হইতে পারে। পর্ব্বতে দ্রাক্ষালতার এই সময় বড় বাড় হয়। সেগুলি কাটিয়া, ছাঁটিয়া, গোড়া খুঁড়িয়া, একটু বাড় কমাইতে হইবে।

পশ্চিম ভারতে যেখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদৌ নাই, তথায় গোলাপ হাপর হইতে নাড়িয়া বসাইতে পারা যায়। এই সময় উক্ত প্রদেশে ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান হইতেছে। আশ্বিন মাসের শেষে কার্ত্তিকের প্রথমেই তথায় ফুলকপি তৈয়ারি হইয়া উঠিবে।



REGISTERED No. C 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

আশ্বিন, ১৩১৮।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

দ্বাদশ খণ্ড,—৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।



আশ্বিন, ১৩১৮।

কলিকাতা: ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচীপত্র।

আশ্বিন, ১৩১৮ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ খণ্ড। | আশ্বিন, ১৩১৮ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সব্জী চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্রসেলস্ স্প্রাউটস্

"বাঁধাকপি" চাষের নিমিত্ত যেরূপ ভাবে জমি প্রস্তুত করিতে হয়, সেইরূপ ভাবে জমি প্রস্তুত করিতে হইবে। বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে বা তৎপূর্ব্বে চাষের জমি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সার মিশ্রিত করিয়া মাটি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। জমিতে চারা সর্ব্বদিকে এক হাত অন্তর বসাইয়া অল্প অল্প জল সিঞ্চন করিতে হয়। সাধারণতঃ ব্রসেল্‌স্ স্প্রাউট্‌সের চাষ—বর্ষা এক প্রকার শেষ হইয়া যাইলে আরম্ভ করা হয়। ইহাতে তত বিঘ্নযুক্ত বা বিফলমনোরথ হইবার কারণ নাই।

চারা, চাষের জমিতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, সামান্য পরিমাণে মাটি মূলদেশে টানিয়া দিতে হয়। পূর্ব্ব হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে রীতিমত জলসিঞ্চন করিতে হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। ব্রসেল্‌স্ স্প্রাউট্‌স্ চাষ সম্বন্ধে ইহা জানা উচিত যে, ইহা আদৌ জলাভাব সহ্য করিতে পারে না। চাষের জমির "যো" যেন কোন সময়ে অন্তর্হিত না হয়।

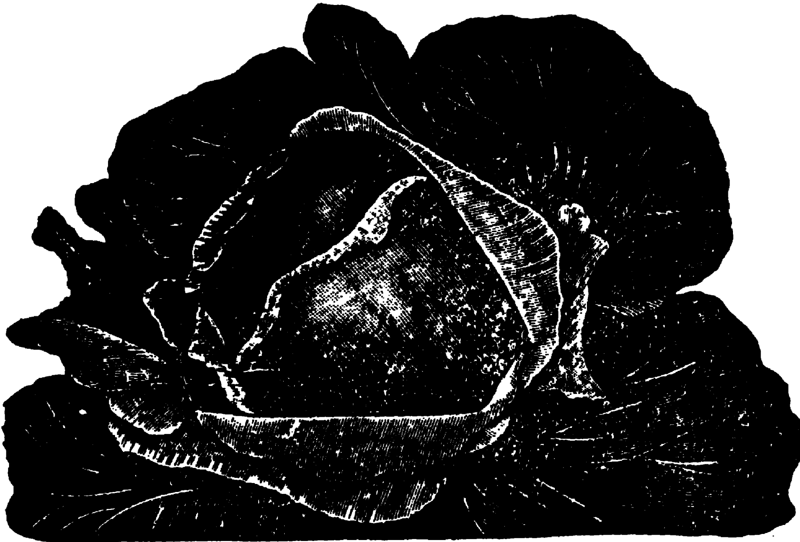
বিশেষ কথা ও অবশিষ্ট কার্য্য—"ব্রসেল্‌স্ স্প্রাউটস্" বা গাঁটকপির মর্ম্ম অনেকে জানেন না বলিয়া, ইহার তত আদর নাই। ইহা অতি উপাদেয় সব্জী। ইহার গাছ উচ্চে কিছু দীঘ হয় এবং ইহার মূল-ডাঁটায় বা কাণ্ডে ঠিক ছেলেদের খেলিবার "মার্ব্বেলে"র মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গোলাকার কপি ধরে। এই জন্য ইহার "গাঁটকপি" নাম করণ হইয়াছে। ইহা খাইতে ঠিক ফুলকপির ন্যায়। ক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন করা ও গাছের গোড়া খুসিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছু বিশেষ পাইট করিতে হয় না। ব্রসেল্‌স্ স্প্রাউটস্ শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে ভাল রকম জন্মিতে দেখা যায়। গ্রীষ্মপ্রধানদেশে বাঁধাকপিবৎ কুঁড়িগুলি সহজে আল্‌গা ভাব ধারণ করিবার সম্ভাবনা। বড় মার্ব্বেলের মত কুঁড়িগুলি নিরেট না হইলে

খাইতে সুস্বাদু হয় না। নিস্তেজ জমিতে ইহার চাষ করা বিধেয় নহে, খুব সারযুক্ত তেজস্কর জমি না হইলে ইহার চাষ করা চলে না। কারণ তেজস্কর জমিতে চাষ না করিলে গাছের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কুঁড়িগুলি খুব ঠাস হইয়া বাহির হয় না এবং কুঁড়ি শক্ত হয় না। অন্যান্য কপি ক্ষেতের ন্যায় ইহার ক্ষেতে জল সিঞ্চনের ও জল নির্গমের জন্য পয়োনালা থাকা আবশ্যক। জলবসা জমিতে এই সকল সব্জীর চাষ হয় না।

বিশেষ কার্য্য।—গাছ উচ্চে যত দীর্ঘ হইতে থাকে—গাছের গোড়ার দিকের মরণাপন্ন পুরাতন পাতা গাছ হইতে কাটিয়া দিতে হয়। কেননা ঐ পাতার সংযোগ স্থলে কাণ্ডের উপরেই কপি ধরিয়া থাকে।

বীজের পরিমাণ।—প্রতি একরে ২ আউন্স বীজের আবশ্যক। কিন্তু তেজস্কর চারাগুলিই কেবল ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়, সেইজন্য অনেক চারা বাদ পড়ে; এই কারণে এক একরে চাষের জন্য ২ আউন্স স্থলে ৩ আউন্স বীজ বপন করাই প্রশস্ত।

বাঁধাকপি



ড্রম-হেড
বাঁধাকপি

বপনের সময়—ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ

মৃত্তিকা—ছায়াবিহীন দোয়াঁস শক্ত অথবা হাল্‌কা মাটিতে অথবা নূতন (যাহা অনেককাল বা আদৌ কর্ষণ করা হয় নাই) মৃত্তিকায় ভালরূপ জন্মায়। নূতন মাটি হইলে প্রথম কয়েক বৎসর বেশী পরিমাণে সারের আবশ্যক হয় না। চারা প্রস্তুত করিবার সঙ্গে সঙ্গে বা তৎপূর্ব্বে লাঙ্গলাদি সাহায্যে সার প্রয়োগ করিয়া চাষের জমী প্রস্তুত করিতে হয়। "হাপর" কিম্বা চাষের জমী ছায়াযুক্ত স্থানে

হইলে চলিবে না। যে স্থানে প্রাতঃসূর্য্যকিরণ হইতে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যরশ্মি পর্য্যন্ত বরাবর সূর্য্যালোক পতিত হয়—সেই স্থান নির্ব্বাচন করা উচিত। তবে পশ্চিমদিকে কিছু আড়াল থাকিলে চলিতে পারে, বৈকালের রৌদ্রের গতিরুদ্ধ হইলে কপি চাষের তত ক্ষতি হয় না বটে, কিন্তু পূর্ব্ব-রবিরশ্মি যে স্থানে আদৌ পতিত হয় না—সে স্থান কপি চাষের নিমিত্ত নির্ব্বাচন করা বাঞ্ছনীয় নহে।

সার—ভেড়ার সার বাঁধাকপির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তদভাবে চূর্ণ সর্ষপ খৈল সাররূপে প্রয়োগ করা হয়। ভেড়ার সার সংগ্রহ করিতে পারিলে, সর্ষপ খৈলের আবশ্যক হয় না। নচেৎ গোবর বা আবর্জ্জনাদির সার ও খৈল ব্যবহৃত হয়।

চারা বসাইবার পর প্রত্যেক গাছে অন্ততঃ আধপোয়া সরিষার খৈল দেওয়া কর্ত্তব্য। আধপোয়া খৈল এককালে প্রয়োগ না করিয়া তিনবারে প্রয়োগ করাই বিধি। প্রত্যেকবার খৈল দিবার পর জল সিঞ্চন আবশ্যক এবং তাহার পূর্ব্বে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি আল্গা করিয়া দিতে হয়। গোময়াদি সার অধিক পরিমাণে দেওয়া থাকিলে খৈল কম লাগে। বিঘাপ্রতি কপি ক্ষেতে তিন কিম্বা চারি মণ সরিষার খৈল সাররূপে প্রদান করিতে হয়। খৈল পচাইয়া কিম্বা মাটির সহিত মিশাইয়া তিন চারি দিন রাখিয়া তবে গাছের গোড়ায় দিতে হয়।

বপনাদি প্রণালী ও জলসিঞ্চন—বর্ষা শেষ হইবার অনতিপূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ষা থাকিতে বীজ বপন করিলে—চারা প্রস্তুত করিতে বিশেষ যত্ন, ক্লেশ স্বীকার ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়। বর্ষাগতে অর্থাৎ বৃষ্টি ধরিয়া যাইলে বীজ বপন করিয়া—চারা প্রস্তুত করিতে—ততোধিক যত্নাদি আবশ্যক হয় না।

বীজ বপনের নিমিত্ত "হাপর" প্রস্তুত করণে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। "হাপর"টী পার্শ্বস্থিত জমী অপেক্ষা চারি কিম্বা পাঁচ ইঞ্চি উচ্চ হইবে—বর্ষা ধরিয়া যাইলে "হাপর" উচ্চ করিবার তত আবশ্যক হয় না। বীজ বপনকালে মাটি অত্যন্ত ভিজা থাকিলে চলিবে না। "যো"-যুক্ত (অর্থাৎ নাতি শুষ্ক নাতি ভিজা) হওয়া চাই। বর্ষাকাল প্রযুক্ত যদি ভিজা থাকে—বর্ষার মধ্যে মধ্যে যে সময় বৃষ্টি ধরিয়া যায় ও প্রখর সূর্য্য উদয় হয়—সেই সময় ঐ "হাপরে"র মাটি কোপাইয়া রৌদ্রতাপে অল্পাধিক শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। বৃষ্টি আসিলে চাপা দিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে ঐ মাটি "যো"-যুক্ত করিয়া—(শীতকালে মাটি অত্যন্ত শুষ্ক থাকিলে—জল প্রয়োগে "যো"-যুক্ত করিতে হয়)—উত্তমরূপে সার (পুরাতন গোবর আবর্জ্জনাদি সার প্রভৃতি) প্রয়োগানন্তর কোপাইয়া ধূলির ন্যায় করিতে হইবে। এ কার্য্য—বিশেষতঃ বর্ষাকালে—একদিনের নহে। ক্রমশঃ ঐরূপ করিতে হইবে।

মাটি রীতিমত প্রস্তুত হইলে—হাপর দীর্ঘে ও প্রস্থে আবশ্যকানুযায়ী করিয়া লইতে হয়। পরে বীজ ছড়াইয়া চূর্ণ মাটি চাপা দিয়া—হস্ত-তালু বা সমতল কাষ্ঠ

খণ্ডের সাহায্যে সামান্য চাপিয়া দিতে হয়। তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিবসে বীজ অঙ্কুরিত হইবে। সমস্ত চারা নির্গত হইতে সাত দিবস পর্যান্ত সময় লাগিতে পারে। চারা "ঘন" হইয়া বাহির হইলে—সেই অবস্থাতেই তুলিয়া "হাপরে" বা "হাপরে"র ন্যায় প্রস্তুত অন্য জমীতে তিন কিম্বা চারি ইঞ্চি পৃথক করিয়া বসাইলে চারা সকল সতেজ হয়। কিন্তু অনেকে আলস্য বশতঃ এই সামান্য কার্য্যটী করেন না। বীজ বেশী "পাতলা" করিয়া ফেলিলে—ঐ কার্য্যের তত আবশ্যক হয় না বটে—কিন্তু যে যে স্থলে চারা "ঘন" হইয়া বাহির হয়—তথা হইতে পৃথক করিয়া বসান উচিত। সমুদয় চারাগুলি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণের পূর্ব্বে দুঃ কিম্বা একবার নাড়িয়া বসাইয়া একটু টেক্‌সহি করিয়া লইলে ভাল ফল পাওয়া যায়। চারা দ্বিতীয়বার নাড়িবার সময় মূল শিকড়টি সামান্য মাত্রায় ছাঁটিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

বীজ বপন করিয়া—প্রখর সূর্য্যের তাপ ও বৃষ্টি হইতে বীজ ও পরে চারা রক্ষা করা আবশ্যক। বীজ বপনের সময় হইতে চারাগুলি রৌদ্রতাপ-সহ্য-শক্তি-সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত "হাপর" আবৃত রাখার বন্দোবস্ত করিতে হয়। এ নিমিত্ত "হাপরে"র উপর "হোগ্‌লা"র বা ঐরূপ অন্য কোন বস্তুর "ঢাকুনি" বা "ছাউনি" আবশ্যক করে। "হাপরে"র লম্বালম্বী পরিসরের দুই পার্শ্বের প্রত্যেক পার্শ্বে তিনটী করিয়া বাঁশ বা খুঁটি প্রোথিত করিতে হয়। প্রত্যেক দিকের মধ্যস্থিত খুঁটি সর্ব্বোচ্চ, এবং পার্শ্বের দুইটী সর্ব্বনিম্ন করিতে হইবে। যেমন "একচালা" প্রস্তুত করে—সেইরূপ ভাবে করিতে হইবে। দুই দিকের দুই উচ্চ খুঁটিতে লম্বালম্বী ভাবে একটী বাঁশ বাঁধিয়া দিতে হয়। ঐরূপ দুইধারের দুইটী করিয়া চারিটী সর্ব্বনিম্ন খুঁটিতে আর দুইখানি বাঁশ বাঁধিয়া দিতে হয়। এইরূপে যে বাঁশ বা খুঁটির "কাটাম" প্রস্তুত হইল—ইহার উপরে গোলপাতা, বিচালী, হোগ্‌লা—বা ঐরূপ অন্য কোন বস্তুর "ছাউনি" বা "ঢাকা" প্রস্তুত করিয়া—আবশ্যকানুযায়ী আবৃত রাখিতে হয়। ঐ "ছাউনি" বা "ঢাকা" এরূপ হওয়া আবশ্যক যে,—ইচ্ছা করিলেই তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং আবশ্যকানুসারে পুনরায় চাপা দিতে পারা যায়। বীজ বপন করিয়া দিবসে "ছাউনি" বা "ঢাকা" দ্বারা "হাপর" আবৃত রাখিতে হয়, এবং রাত্রিকালে উহা খুলিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু রাত্রিকালে বৃষ্টি হইলে "হাপর" তৎক্ষণাৎ ঢাকা দিতে হয়। অনেক স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া চারা বা বীজ নষ্ট হইয়া যায়। যদি এ নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতে একান্ত অসাধ্য বোধ হয়—তাহা হইলে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে "হাপরে" ঢাকা দিলে চলিতে পারে। প্রাতঃকালেই আকাশ পরিষ্কার থাকিলে "ঢাকা" খুলিয়া দিতে হইবে, এবং প্রাতঃসূর্য্য-কিরণ লাগাইয়া পুনরায় ঢাকা দিতে হইবে। পুনরায় অপরাহ্ণে রৌদ্রতাপ হ্রাস হইলে ঢাকা খুলিয়া দিতে হয়, এবং

যতক্ষণ পর্য্যন্ত পারা যায়—রাত্রিকালে অনাবৃত রাখিলেই ভাল। কিন্তু বীজ বা চারা বৃষ্টিতে নষ্ট না হইয়া যায়—ইহাই বাঞ্ছনীয়। চারা বড় হইতে থাকিলে—প্রাতঃকালে দিন দিন অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ অনাবৃত রাখিয়া—এবং অপরাহ্নে ক্রমশঃ শীঘ্র শীঘ্র অনাবৃত করিয়া—অল্পে অল্পে—চারাগুলিকে রৌদ্রতাপ সহ্য করাইতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ "হাপর" আবৃত রাখিবার আর আবশ্যক হয় না। তবে বৃষ্টি হইলে "হাপর" ঢাকা দিতে হয়। অবিবেচনা পূর্ব্বক অধিককাল আবৃত রাখিলে চারা সকল "টানিয়া" যায়—অর্থাৎ অতিরিক্ত দীর্ঘ ও শ্বেতবর্ণ-যুক্ত হইয়া ধরাশায়ী হয় ও পঞ্চত্ব পায়। আবার রৌদ্রতাপে নষ্ট হইবারও সম্ভাবনা আছে। বর্ষা থাকিতে থাকিতে কপির চারা প্রস্তুত করা বহু আয়াসসাধ্য ও অনেক কৌশলের উপর নির্ভর করে। হয়ত—প্রথম উদ্যমেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়; নচেৎ উদ্যম বিফল হইলে বার বার বীজ বপন করিয়া তবে কৃতকার্য্য হইতে হয়।

বীজ বপনের ও চারা অঙ্কুরিত হইবার কালে, সাত আট দিবস আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকিলে—কৃতকার্য্য হইবার অনেকটা সম্ভব। আকাশের ভাবগতিক বুঝিয়া বীজ বপন করা উচিত।

"হাপরে" আবশ্যকমত জলসিঞ্চন করিতে হইবে। জলসিঞ্চনের কথা পূর্ব্বে বিশেষরূপ বলা হইয়াছে। বোমার মুখে সরু ঝাঁজর লাগাইয়া তদ্দারা বা বিচালি গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজ তলায় বা "হাপরে" জলসিঞ্চন করা ভাল।

"ভেড়া"র সার সংগৃহীত হইলে জমীর সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। তদভাবে—প্রথমতঃ গোবর বা আবর্জ্জনাদির সার মিশ্রণে জমী ঢেলাবিহীন (যতদূর পারা যায়) করিয়া—প্রত্যেক দিকে এক হাত হইতে দুই হাত পর্য্যন্ত (কপির আকারের তারতম্য অনুসারে) অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক গর্ত্ত হইতে সামান্য মাটি উঠাইয়া—অবশিষ্ট মাটি—এক এক মুঠা চূর্ণ সর্ষপ খৈলের সহিত—বিশেষরূপ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল কার্য্য সমাধানের দুই কিম্বা তিন দিবস পরে গর্ত্তে চারা রোপণ করিতে হয়। বীজ বপনের সময়ে বা তৎপূর্ব্বেই কপি চাষের জমী প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। "ভেড়া"র সার সংগৃহিত হইলেও যদি পরিমাণে অত্যল্প হয়—তবে উহা সমগ্র ক্ষেত্রে না ছড়াইয়া সরিষার খৈলের মত প্রতি গর্ত্তে—এক মুঠা করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

চারাগুলি চারি বা পাঁচটী পত্রযুক্ত হইলে "হাপর" হইতে তুলিয়া—বৈকালে, সন্ধ্যাবেলা অথবা রাত্রিকাল পর্য্যন্ত—পূর্ব্ব প্রস্তুত জমীতে প্রত্যেক গর্ত্তে, আবশ্যক মত এক হইতে দুই হাত অন্তর এক একটী বসাইয়া—তৎক্ষণাৎ অল্প অল্প জল দিতে হইবে। পরদিবস প্রাতঃকালেই চারাগুলির প্রত্যেকটী—কলাপাতা, ছোট টব, সেগুন

(বড়) পাতা বা এইরূপ কোন আবরণ দ্বারা আবৃত করা আবশ্যক। যেরূপ হাপরে চারা রক্ষা করা হইয়াছে—সেইরূপ এখানেও চারা যাহাতে রৌদ্রে কিম্বা বৃষ্টি-জলে নষ্ট না হইয়া যায়—সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একবার চারাগুলি "লাগিয়া" যাইলে তখন অনেকটা রৌদ্রাদি সহ্য করিতে পারে। এই অবস্থায় প্রত্যহ অল্প অল্প জলসিঞ্চন আবশ্যক। প্রয়োজন হইলে দুইবেলা জল দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপে তিন চারি দিবসে চারাগুলি সতেজ হইয়া উঠিলে—রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আর আবৃত করিতে হয় না। কিন্তু যদি হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা হয়—যদিও এ সময়ে বৃষ্টি বিরল—তাহা হইতে আবৃত করিতে হয়। ইহা জানা উচিত যে, যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ এ সময়ে বেশী বৃষ্টি হয়—সমস্ত চারা রক্ষা করিতে পারা যায় না।

পরে যখন চারাগুলি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে—উহাদের পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকা কোদালী দ্বারা উহাদের মূলদেশে টানিয়া দিতে হয়। এইরূপে বারকতক মাটি টানিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হয়। আবশ্যকানুযায়ী জলসিঞ্চন করিতে হয়। প্রত্যেকবার জলসিঞ্চনের পর 'যো' হইলে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া আল্গা করিয়া দিতে হয়। জলাভাব হইলে বাঁধাকপি ভাল জন্মে না। ক্রমশঃ বাঁধাকপি আপনি বাঁধিতে থাকে—বাঁধিয়া দিতে হয় না।

অবশিষ্ট কার্য্য।—"নিড়ানি" যন্ত্রের দ্বারা ক্ষেত হইতে আগাছা উত্তোলন করা—ও মধ্যে মধ্যে মাটির রস ("যো") থাকিতে থাকিতে গাছের গোড়া "খুসিয়া" দেওয়া উচিত।

বিশেষ কার্য্য।—যখন বাঁধাকপি প্রায় অর্দ্ধেক বাঁধিয়া উঠে—সেই সময় প্রত্যেক গাছের গোড়া অল্পাধিক খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া শিকড় বাহির করিয়া দিতে হয়। গাছ না পড়িয়া যায়, এরূপ ভাবে গর্ত্ত করিতে হইবে। কোদালি দ্বারা এই কার্য্য সুচারু-রূপে হয় না, ইহার জন্য ছোট হাত আঁচড়া বা ফর্ক ব্যবহার করাই সুযুক্তি। তিন বা চারিদিবস এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া গাছের শিকড়ে বাতাস লাগাইয়া—চতুর্থ অথবা পঞ্চমদিবসে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় এক বা দুই মুঠা "ভেড়ার" সার বা চূর্ণ সর্ষপ খৈল দিয়া—পূর্ব্ববৎ মাটি চাপা দিতে হয়, এবং ক্ষেত জলসিঞ্চনের দ্বারা ডুবাইয়া দিতে হয়। এরূপ করিলে বাঁধাকপির আকার যাহা হইত—তাহা অপেক্ষা আশাতীত বৃহৎ হয়।

বীজের পরিমাণ। এক একারে ৪ আউন্স বীজের আবশ্যক। ২৫ বর্গ ফিট হাপরে এক আউন্স কপি বীজ বপন করা উচিত। ক্ষেতে প্রত্যেক কপির চারা যদি ৩ ফিট অন্তর বসান যায় এবং প্রত্যেক লাইনের মধ্যে ৩ ফিট ফাঁক থাকে তবে এক একরে প্রায় ৫০০০ চারা বসিবে। এই পরিমাণ চারা উৎপন্ন করিতে গেলে

৪ আউন্স বীজের কমে হয় না। সখের জন্য চাষ করিলে আরও ফাঁক ফাঁক বসান চলে। ইহাতে কপি বড় হয়। ফাঁক ফাঁক বসাইলে বোধ হয় ৩ আউন্স বীজে কাজ চলিতে পারে।

বড় বাঁধাকপি উৎপন্ন করিতে হইলে ১ বিঘায় ১৩০০ চারার অধিক বসান চলে না। ক্ষেতের ভিতর বায়ু চলাচলের পথ থাকা চাই, ক্ষেতের ভিতর চলা ফেরার জন্য রাস্তা থাকাও আবশ্যক। এক বিঘায় ১৩০০ হিসাবে এক একরে ৪০০০ চারার অধিক বসিবে না। ডেনিস বল বা সুগার লোফ জাতীয় ছোট বাঁধাকপি হইলে একরে ১২০০০ চারা জন্মাইতে পারা যায়।

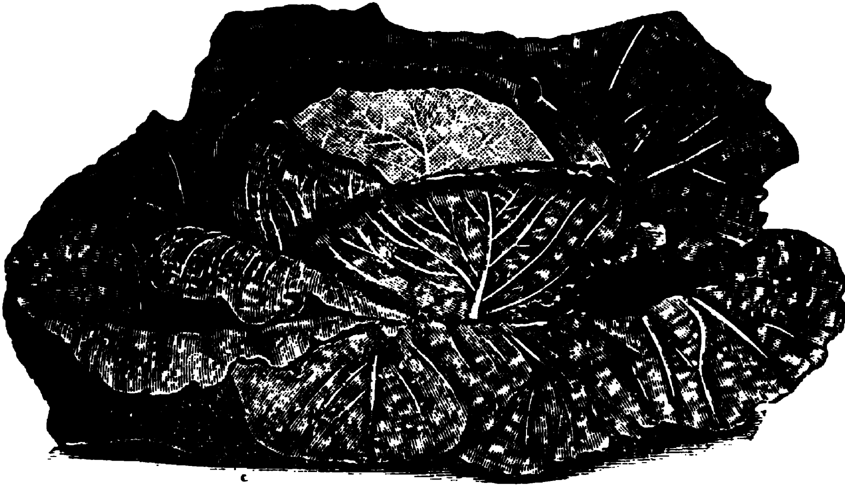
বাঁধাকপি অনেক রকমের আছে—এক রকম চীনা বাঁধাকপি আছে—ইহাই বাঁধাকপির আদি পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। ইহার পাতা আদৌ বাঁধে না এবং মধ্যস্থল আদৌ শক্ত হয় না। মানুষে ইহা শাক হিসাবে ব্যবহার করে। ইহা গবাদির প্রিয়খাদ্য।

স্যাভয়•কপির নাম ইহার পরই উল্লেখ করিতে হয়। ইহার পাতাগুলি কোঁকড়ান—এই কারণে ইহাকে কেহ কেহ কাফ্রি কপি বলে। লম্বা কোণাকার এবং চেপ্টা গোলাকার, দুই প্রকার স্যাভয় কপিই দেখা যায়। ইহার স্বাদ ও আঘ্রাণ অনেকাংশে ফুলকপির তুল্য। এমেরিকান কোঁকড়া পাতা সবুজ রঙের স্যাভয় কপি প্রসিদ্ধ। আমাদের চাষীরা ইহার গুণের সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই সেই জন্য ইহার চাষে তত রত নহে।

বাঁধাকপি যত নিরেট, শক্ত ও ভারি হইবে ততই ভাল। জয়ঢাকের মত চেপ্টা, সম্পূর্ণ গোল এবং কোণাকার এই রকমের বাঁধাকপিই প্রসিদ্ধ। চেপ্টা কপির প্রতিকৃতি প্রবন্ধের আরম্ভেই দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে ইংরাজিতে ড্রমহেড কপি বলে। সম্পূর্ণ গোল কপিকে বলহেড কপি এবং লম্বা কপিকে কোণাকার কপি বলে।

গোল কিম্বা চেপ্টা স্যাভয় কপির বর্ণ গাঢ় সবুজ, কোণাকার স্যাভয় কপির রঙ হরিদ্রাভ সবুজ। অন্য সমুদয় কপির রঙ ফিঁকে সবুজ। ইহা ব্যতীত লাল রঙের বাঁধাকপি আছে। ইহাদের মধ্যে রেড ডাচ এবং লেট পার্পল কপিই উল্লেখযোগ্য। লাল রঙের কপিগুলি প্রায়ই চাটনির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাঁধাকপিকে জলদী ও নাবী হিসাবে দুইটি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। জলদী চেপ্টা জাতীয় বাঁধাকপির মধ্যে এমেরিকার রিডল্যাণ্ড ও ব্রান্স্‌ইক এবং সটনের ইম্পিরিয়াল বাঁধাকপি উৎকৃষ্ট। এমেরিকার কোণাকার জলদী জেরসী ওয়েকফিল্ড কপি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নাবী হিসাবে লার্জ লেট ড্রমহেড, লেট ফ্লাটডাচ প্রভৃতি বাঁধাকপির নাম করিতে হয়।



স্যাভয় বা কাফি কপি



কোণাকার কপি

বাঁধাকপির মধ্যে সুগার লোফ্ কিম্বা সটনের লিটল্ জেম এক হিসাবে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই দুইটি কপিই ছোট আকারের, কিন্তু ছোট হইলে কি হয়,—ইহা খুব নিরেট হয়, খাইতে সুমিষ্ট ও বেশ সুঘ্রাণ আছে। বেশী পাতা ফেলিয়া দিতে হয় না। অনেকেই এই কারণে ইহাদের বড় আদর করেন। এক বিঘাতে অধিক কপি জন্মাইতে পারে বলিয়া চাষারাও ইহার চাষে অধিকতর লাভবান হয়।

ভারতীয় কৃষি-সমিতি তাঁহাদের গোবিন্দপুর ক্ষেত্রজাত রিডল্যাণ্ড বাঁধাকপি প্রদর্শন করিয়া কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর ম্যাডক্স সাহেবের নিকট প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন। কাশীপুর নিবাসী সুদক্ষ চাষী প্রেমচাঁদ রিডল্যাণ্ড বাঁধাকপি প্রদর্শন করিয়া কলিকাতার বিভিন্ন প্রদর্শনীতে উত্তম পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চূণ-সার

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় এফ, আর, এচ, এস, লিখিত

জমিতে চূণ প্রয়োগ করিতে হইলে আমাদিগকে দুই, তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে এবং জানিতে হইবে যে,—

(১) খুব আটাযুক্ত এঁটেল মাটিতে চূণ বিশেষ ফলপ্রদ ;

(২) নরম বেলে মাটিকে চাষের উপযুক্ত করিতে হইলে চূণই একমাত্র উপায় ;

(৩) অম্লরস বিশিষ্ট বোদমাটির (humus) সংস্কার চূণ দ্বারাই হইয়া থাকে।

নিতান্ত আঠাল এঁটেল মাটি চাষের উপযুক্ত নহে। সেই মাটি সহজে গুঁড়া হয় না বা তাহার ভিতর সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না। চূণ কিম্বা চূর্ণাত্মক ক্ষার ব্যবহারে ঐরূপ জমির আঠা ভাব বিনষ্ট হয় এবং উহা তখন কর্ষণ দ্বারা গুঁড়া করিয়া চাষের উপযুক্ত করা যাইতে পারে ; তখন উহাতে জল প্রবেশের সুবিধা হয়।

অত্যন্ত কঠিন মৃত্তিকায় যেমন চাষাবাদ চলে না, তেমনি নিরতিশয় নরম বেলে মাটিও চাষের নিতান্ত অনুপযুক্ত। এই মাটির জলধারণ ক্ষমতা আদৌ নাই। এইরূপ মৃত্তিকা চূণ ব্যবহার দ্বারা চাষোপযোগী করা যাইতে পারে।

উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থ বিশিষ্ট বোদ মাটিতে উদ্ভিদের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে, কিন্তু যতক্ষণ না সেগুলি পচিয়া উদ্ভিদের খাদ্যের উপযুক্ত হয়, ততক্ষণ কার্য্যতঃ তাহাদের দ্বারা কোন উপকার হয় না। অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, এই বোদ মাটিতে অম্লরসের প্রাচুর্য্য থাকায় জান্তব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচনকারী জীবাণুগণ তথায় তিষ্ঠিতে পারে না বা তথায় অবস্থান করিতে পারিলেও কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। চূণ জমির এই অম্লরস বিনষ্ট করিয়া উদ্ভিদ শরীর পোষণে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে।

চূণ দ্বারা উদ্ভিদ শরীর পোষণের প্রত্যক্ষ কোন কার্য্য না হইলেও ইহা যে কৃষি-কর্ম্মের একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় সার তাহা আমাদের চাষীরা বা সাধারণ লোকে কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না। সুখের বিষয় এই যে, এ দেশের মাটিতে চূণের অভাব বড় অনুভূত হয় না. সেই জন্য কোন চাষী সাক্ষাত সম্বন্ধে জমিতে চূণ না দিলেও বড় কিছু ক্ষতি হইতে দেখা যায় না। কিন্তু চাষী মাত্রেরই জানা উচিত যে, জমির প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে চূণই একমাত্র অবলম্বন। ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ বটে কিন্তু কৃষি-বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিবার লোক এখানে নিতান্ত বিরল। সমস্ত কৃষি-কার্য্যের ভার এখনও এদেশে দরিদ্র কৃষকদিগের উপর চাপান

আছে, সুতরাং এদেশে কৃষির উন্নতি অতি সামান্যই হইয়াছে অথবা কোন উন্নতিই নাই বলিলেও বলা যায়।

আমাদের দেশে জমির অভাব ছিল না, এখনও তত অভাব হয় নাই—তাই অকেজো জমিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা তাদৃশ নাই কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই জমির অভাব হইবে এবং নানা কারণে লোকের দিন দিন এত অনাটন হইয়া পড়িতেছে যে, আর তাহাদিগকে অধিককাল নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিবে না এদেশের অধিকাংশ লোকের জমিই একমাত্র ভরসা সুতরাং তাহাদিগকে জমির সদ্ব্যবহার, সারের সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিতেই হইবে। সুতরাং চাষীগণকে আটাল এঁটেল মাটি, নরম অকেজো বালিমাটিকে চূণ দ্বারা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। জলা অকেজো জমিতে চূণ ছিটাইয়া জলজ উদ্ভিদসমূহ পচাইয়া উহা ধান চাষের উপযুক্ত করিতে হইবে। কোন কোন ধান ক্ষেতে এক প্রকার ঝাঁজি কিম্বা শেওলা জমিয়া উহাকে কাজের বাহির করিয়া ফেলিতেছে—চাষীরা কি করিবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না তাহারা যদি চূণের সদ্ব্যবহার জানিত তাহা হইলে শুষ্ক অবস্থায় সেই জমিতে চূণ ছিটাইয়া, বারবার চষিয়া মাটি ভাঙ্গিয়া ঝাঁজি বা শেওলা মূল সমেত পচাইয়া ফেলিত—সেই জমিটি তখন সারবান হইত এবং তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক ধান জন্মাইতে পারিত। চাষীরা যদি জানিতে পারে যে শুঁটিধারী শস্যের পক্ষে চূণও উত্তম সার, তাহাদের যদি জ্ঞান জন্মায় যে ফস্ফরাস ও পটাসের ন্যায় চূণও বৃক্ষের ফুল ও ফল প্রসবের সহায়তা করে, যদি তাহাদের কেহ বুঝাইয়া দেয় যে, চূণ একটা সামান্য জিনিষ নহে—ইহার ব্যবহারে শস্য শীঘ্র পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক হয় তবে তাহারা নিশ্চয় চূণ ব্যবহার করিতে অনুমাত্র সংশয় করিবে না। কিন্তু এ সকল তথ্যের কেইবা খোঁজ রাখে এবং কেবা তাহাদের বুঝায়? ব্যবসা বাণিজ্য চাষাবাদ যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাউক না—রসায়নতত্ত্বে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে তাহার বিশিষ্ট উন্নতি সম্ভবপর নহে, কিন্তু আমাদের দেশে কৃষি-রসায়নের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া তত্ত্বগুলি বুঝিয়া চাষীগণকে বুঝাইবার লোক বিরল।

যাহা হউক আমরা এ পর্য্যন্ত চূণ ব্যবহারের কেবল গুণই বর্ণনা করিয়াছি। চূণের সদ্ব্যবহার বুঝিতে হইলে চূণ অনিয়মিত ব্যবহারে কি দোষ, তাহা বুঝিয়া রাখা ভাল। বৃক্ষাদিতে সদ্যজাত চূণ কদাপি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। বৃক্ষগণ সদ্য-জাত চূণের তেজ সহ্য করিতে পারে না। সেই জন্য চূণা পাথর পোড়াইয়া ব্যবহার না করিয়া অদগ্ধ অবস্থায় ব্যবহারে অনেক সময় উপকার দর্শে। চূণ ব্যবহার না করিয়া চূণ-প্রধান সার,—জিপসম, খড়িমাটি, বা মার্ব্বল প্রস্তর চূর্ণ ব্যবহার করিলে বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমুদয়ে চূণের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে আছে,

কিন্তু এইগুলিতে চূণের ন্যায় এত অধিক তেজ নাই। নূতন চূণ অপেক্ষা পুরাতণ চূণ ব্যবহার করিলে বৃক্ষের কোন ক্ষতি হয় না। চূণের তেজ সহজে যায় না সেই জন্য পুরাতণ চূণ ব্যবহারে ফসলের যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু অত্যন্ত এঁটেল মাটিকে নরম করিতে কিম্বা অম্লরসাত্মক বোদ মাটির সংস্কার করিতে কিম্বা জলা জমির পুনরুদ্ধার করিতে সদ্যোজাত তেজস্কর চূণ চাই। চূণ প্রয়োগে ভূমিতে সঞ্চিত উদ্ভিদ-খাদ্য সমূহ উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী অবস্থায় আসে, তখন উদ্ভিদগণ ঐ সকল খাদ্যবস্তু সহজে গ্রহণ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় ভূমিতে ঘণ ঘণ চূণ প্রদান করিলে ভূমির উর্ব্বরতা একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে তিন, চারি বৎসর অন্তর চূণ ব্যবহার করা বিধেয়। রসায়ন তত্ত্বে বলে যে, ভূমিতে চূণ প্রয়োগ করিলে ভূমির এমোনিয়া ও পটাস বিমুক্ত হইয়া পড়ে, এই সময় বৃক্ষগণ এই দুইটি সার পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে। এই দুই সার পদার্থ কিন্তু অধিকমাত্রায় বিমুক্ত হইলে এমোনিয়া উবিয়া যায় এবং পটাস জলে ধৌত হইয়া নষ্ট হয়। এই কারণে জমিতে চূণ দিতে হইলে খুব সতর্ক হইতে হয়।

জমিতে চূণ ছড়াইবার একটা পরিমাণ ঠিক করা বড় সহজ নহে। কোন্ জমিতে কত চূণ আবশ্যক তাহা ঠিক করিতে হইলে সেই জমির মাটিতে কি পরিমাণ চূণ আছে তাহা বিশ্লেষণ দ্বারা অগ্রে স্থির করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সাধারণ চাষীর পক্ষে মৃত্তিকা বিশ্লেষণ একটা বৃহৎ ব্যাপার। খুঁজিয়া দেখিলে একটা সহজ উপায়ও করিয়া লওয়া যায়। জমি হইতে কিয়ৎ পরিমাণ মাটি আনিয়া, একটা পাত্রে জলের সহিত গুলিতে হয় এবং ক্ষণকাল একটা কাটিদ্বারা তাহাকে নাড়িয়া মাটি জলে বেশ গুলিয়া গেলে এই জল আধঘণ্টা থিতাইতে দিলেই সমুদয় মৃত্তিকার স্থূলঅংশ জলের তলায় পড়িয়া যাইবে। এইবারে জলমধ্যস্থিত মৃত্তিকা একখানা ছুরির ডগা দিয়া উঠাইয়া একখণ্ড সবুজ "লিটমস্" কাগজ দ্বারা চারি পাঁচ মিনিটকাল চাপিয়া রাখিবে। যদি সে মাটিতে চূণের ভাগ থাকে তবে সবুজ "লিটমস্" কাগজ লালবর্ণ ধারণ করিবে। এইরূপে অম্লাক্ত বা লবণাক্ত জমিও চিনিয়া লওয়া বিশেষ কঠিন কথা নহে। অম্লের বা লবণের অস্তিত্ব পরীক্ষা করিতে হইলে সেই কাদা, লাল "লিটমস্" কাগজে চাপিতে হইবে। ইহাতে লাল কাগজ সবুজবর্ণ ধারণ করিবে। মোটামুটি এইরূপে বুঝা যায় যে, মাটিতে অম্লের বা লবণের ভাগ বেশী আছে। লিটমস্ (Litmus paper) বাজারে দুষ্প্রাপ্য নহে। যে জমিতে চূণ নাই, তাহাতে চূণ দিতে হয়। কিন্তু কি পরিমাণ চূণ দিতে হইবে, তাহা স্থির করা মাটি বিশ্লেষণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। মৃত্তিকা বিশেষে প্রতি বিঘায় দুই হইতে ছয় মণ চূণ ছিটাইতে হয়। চূণ মাটির উপর সমভাবে ছিটাইয়া জমিতে চাষ দিতে হইবে। সমভাবে না ছিটাইলে কোন স্থানে অল্প কোথাও বা অধিক চূণ পড়িয়া অনিষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চূণ বহু পুরাতন হইলেও উহার তেজ সহজে যায় না। বহুকালের পুরাতন ছাদের ভগ্নাবশিষ্ট রাবিস মধ্যে যে চূণ থাকে তাহাতেও জমির উপকার হয়। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে এইরূপ ছাদের রাবিস মহা উপকারী। সদ্যজাত চূণ ব্যবহার করিলে এই সকল উদ্ভিদ-সমূলে মরিয়া যায়। আর্দ্র চূণ প্রধান পর্ব্বতগাত্রে ফার্ণ, মস, সিলাজেনিলা প্রভৃতি উদ্ভিদের জন্ম হয়। বাঙ্গলায় পুরাতন ভাঙ্গা প্রাচীর গাত্রে এই সকল উদ্ভিদও জন্মিতে দেখা যায়। গোলাপ গাছেও চূণাক্ত রাবিস্ শুকনা কাদা মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে গোলাপের ফুল বড় ও ফুল অধিক হয়। মাটির সহিত চূণাক্ত রাবিস মিশাইয়া দোপাটি ফুলের গাছ লাগাইলে, দোপাটি ফুলে গাছ ভরিয়া যায় এবং ফুলের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়। চূণের গুণ অনেক, দোষ অতি অল্প, তাই আমরা চূণের দোষ দেখাইতে যাইয়া তাহার গুণের কথাই বলিতেছি। তবে কিনা জানা উচিত যে, এই জিনিষটা খুব তেজস্কর, যাহাতে দেওয়া যাইবে তাহারই তেজ বাড়াইবে। সেই জন্য জিনিষটাকে সময় বুঝিয়া, অবস্থা বুঝিয়া একটু সাবধানে ব্যবহার করিলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নতুবা ব্যবহার দোষে অভাবনীয় বিপত্তি ঘটে।

যদি দেখ যে নাইট্রোজেন প্রধান গোময়াদি সার পাইয়া বৃক্ষগণ একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছে, উন্মত্তবৎ চতুর্দ্দিকে ডালপালা ছাড়িতেছে, ফুল ফল প্রসবের নামটি নাই, একটু চূণ বা সাধারণ লবণ প্রয়োগ করিলে বৃক্ষের অতি সত্বর তাহার প্রধান কার্য্যের কথা মনে পড়িবে, সে তখন হইতেই ক্রমশঃ সংযতভাব ধারণ করিয়া অচীরে ফুল ফল প্রসব কার্য্যের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। চূণ যে প্রত্যক্ষভাবে সকল ফসলে দিতেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। ফস্ফরস প্রধান সারেও চূণের ন্যায় ফল মূল ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। হাড় চূর্ণ, বোন সুপার, জান্তব কয়লা ও এপেটাইট নামক খনিজ পদার্থতে চূণের পরিমাণ শতকরা ৩০।৪০ গুণ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যে শস্যে এই সকল সার দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আর নূতন করিয়া চূণ দিতে হইবে না।

চূণ সার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার নাই। একটা কথা এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, চাষীগণকে ত চূণ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইল, কিন্তু তাহারা চূণের খরচ যোগাইতে পারিবে ত! যত কিছু তত্ত্বকথা পালন করা না করা তাহাদের অবস্থার উপর নির্ভর করে। পোড়া চূণের (Burnt lime) দাম অধিক সুতরাং তাহা সকলে ব্যবহার করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। তৈয়ারি সিলেট চূণের মূল্য সময় সময় ৮০৲ টাকায় এক শত মণের কম নহে। কাট্‌নী চূণও ৪০৲ কিম্বা ৫০৲ টাকার কমে এক শত মণ পাওয়া যায় না। ইহা কলিকাতার বাজার দর। সুদুর পল্লিগ্রামের দর আরও অধিক এবং তথায় বহিয়া লইয়া

যাইবার খরচও অনেক অধিক। এই সমুদয় চুণ অপেক্ষা ঘুটিং চুণ (Unburnt lime stone) বা চুনা পাথর ব্যবহার করিলে অনেক অল্প খরচে হয়। ২০৲ কিম্বা ২৫৲ টাকায় ১০০ শত মণের অধিক পাথর মেলা সম্ভব। পোড়া চুণ অপেক্ষা চুণা পাথরের মূল্য কম, ইহার তেজও কম, ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং মাটিতে ধীরে ধীরে কার্য্য করে। এই প্রকারে চুণ ব্যবহারে মাটি শীঘ্র নিস্তেজ হইয়াও পড়ে না। ঘুটিং পাথর যে ভাবে বাজারে খরিদ করিতে পাওয়া যায় সে ভাবে কিন্তু জমিতে দিলে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। পাথর গুঁড়া করিয়া ছাঁকিয়া ব্যবহার করাই প্রশস্ততর। যেখানে আশু কোন কার্য্য সারিতে হইবে বা পতিত জমি উদ্ধার করিতে হইবে সেখানে পোড়া চুণ ব্যবহার করাই আবশ্যক। অনেক সময় বঙ্গদেশে জমি দীর্ঘকালের জন্য বিলি হয় না বা জমিতে আবাদকারী প্রজার কোন স্থায়ী সত্ব নাই, সেখানে পোড়া চুণ ব্যবহার করিয়া দুই তিন বৎসরের মধ্যে ফসল দ্বারা জমির সমস্ত উপসত্ব ভোগ করিয়া লওয়া মন্দ যুক্তি নহে।

আমরা নিতান্ত নিঃস্ব কৃষককুলের জন্য অন্য ব্যবস্থাও করিতে পারি। পল্লি-গ্রামে যে সব গো-ভাগাড় থাকে, তাহা হইতে হাড় সংগ্রহ করিয়া আনিয়া নিজ ক্ষেত্রে জ্বালাইয়া এ সমস্ত গো-হাড় চুর্ণ করিয়া, সেই হাড়চুর্ণ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিই। ইহাতে একটি প্রধান ফস্ফরাস বিশিষ্ট সার ব্যবহার করা হইল, অথচ সঙ্গে সঙ্গে চুণের অনেক কার্য্য হইতে লাগিল। শামুক চুর্ণেও চুণের কার্য্য বেশ হয়। আমাদের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ হাড়চুর্ণ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, যদি আমাদের দেশের কৃষকেরা এই কেবল মাত্র হাড়ের সদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাদিগের জমির সারের জন্য অনেক উদ্বেগ কমিয়া যাইবে এবং চুণ কোথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হইবে না।

চুণের আরও দুই একটি গুণ আছে—জমি হইতে শামুক, গেঁড়ি, গুগলি তাড়াইতে হইলে চুণের মত এমন জিনিষ আর নাই। চুণে পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত জল সুপরিষ্কৃত হয়। জলে চুণ দিলে ইহাতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু থাকিলে, তাহা মরিয়া যায়। জলার পচা জলই ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি। এই সকল জলা চুণদ্বারা উদ্ধার সাধন করিয়া চাষে লাগাইতে পারিলে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বঙ্গভূমে একটা মহদুপকার সাধন করা হয়।

কৃষকের বারমাসী কাজ

(মালদহের প্রথানুযায়ী শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত)

বৈশাখ

বর্ষার ফসলের চাষ কিয়ৎ পরিমাণে স্থানে স্থানে ফাল্গুন, চৈত্র মাসেই আরম্ভ হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, এই মাসে আর বিলম্ব না করিয়া শেষ করা উচিত। বৃষ্টির অবস্থা বুঝিয়া জমিতে লাঙ্গল দিয়া আশু ধান্য, পাট, ভুট্টা, অরহর, ডেঙ্গোডাঁটা, নটে শাক, আদা, হলুদ, মেটে আলু, শাঁক আলু ইত্যাদির আবাদ করিবে। উহাদের চারা জন্মিলে ক্ষেত্র পরিষ্কার রাখা, গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া দেওয়া এবং যে সকল স্থানে জল সেচনের আবশ্যক বিবেচিত হয়, তথায় জল সেচন করিবে।

বেগুনের চারা প্রস্তুত জন্য বীজ পাতো* দিবে। যাঁহারা আমাদির কলম করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা টবে চারা গাছ তুলিয়া রাখিয়া দিবেন। এই মাসে কোন কোন স্থানের আম্র পাকিতে আরম্ভ হয়।

জ্যৈষ্ঠ

বৃষ্টির সুবিধা বুঝিয়া বৈশাখ মাসে যে সকল বর্ষাতী ফসলের আবাদ করা হইয়াছে, এই মাসে সেই সকলের তদ্বির ও পাইট করাই কৃষকের প্রধান কাজ। যদি অনাবৃষ্টি কিম্বা কোন অসুবিধা বশতঃ বৈশাখ মাসে সেই সকলের আবাদ আরম্ভ না হইয়া থাকে, তবে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহা করিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে যে সকল ফলবৃক্ষের ফল পরিপক্ক হয়, তাহাদের চারা জন্মাইতে হইলে, এই মাসে টাটকা বীজ রোপণ করিবে। বেগুনের চারা প্রস্তুত হইয়া থাকিলে রোপণ করিবে। গুল কলম করিতে হইলে বৃষ্টির অবস্থা দেখিয়া কলম করিবে এবং জোড় কলমও† বাঁধিবে। এই মাসে গুটীর আম্র বেশ পাকিয়া উঠে, কলমের মধ্যে গোপালভোগ পাকিতে আরম্ভ করে। পুরাতন কলা বাগানের গোড়া পরিষ্কার, মাটী ধরাইয়া দেওয়া এবং ছোট ছোট তেউড় তুলিয়া নূতন কলা বাগান করিবার প্রশস্ত সময়। হৈমন্তিক ধান্য রোপণ জন্য বীজক্ষেত্রে বীজ ছড়াইবে।

আষাঢ়

এই মাসেও পুরাতন কলার ঝাড় হইতে তেউড় তুলিয়া নূতন জমিতে বসাইতে পারা যায়। চারা জন্মাইবার জন্য আম্র, কাঁটালাদির সুপুষ্ট বীজ এই মাসেও রোপণ করিতে পারা যায়। আনারসের চারা পুতিবে, মরিচের চারা জন্মাইবে,

---

* পাতো দিবে=বপন করিবে। † ২৪ পরগণায় ভাদ্র মাসে জোড় কলম বাঁধা হয়।

নারিকেলের চারা হাপর হইতে তুলিয়া স্থায়ীরূপে জমিতে বসাইবে। বড় বড় বৃক্ষের চারা যে সকল কার্ত্তিক মাসে "খাসিয়া" করা (মূল শিকড় কর্ত্তন) আছে, তাহা নাড়িয়া পুতিতে হইলে এই সময়ে পুতিবে। বড় বড় ফল বৃক্ষের গোড়ায় আইল বাঁধিয়া, এই মাসে বর্ষার জল খাওয়াইবে। নূতন কোঁড় হইলে বাঁশ বাগান যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, যেন গবাদি জন্তুতে ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিতে না পারে, নূতন বাঁশ বাগান করিতে হইলে এই মাসে শিকড় সহ তুলিয়া বাঁশের গোড়া পুতিবে। ফজলী ইত্যাদি সকল প্রকার কলম আম্রই এই সময় পাকিয়া উঠে। জ্যৈষ্ঠ মাসে জোড় কলম বা গুল কলম করিবার সুবিধা না হইলে এই মাসে শেষ করা কর্ত্তব্য। হৈমন্তিক ধান্যের চারা রোপণ করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট সময়।

শ্রাবণ

এই মাসে বর্ষা প্রবল থাকে বলিয়া কোন প্রকার নূতন ফসলের আবাদ হয় না, তবে হৈমন্তিক ধান্যের চারা রোপণ করিতে পারা যায়। পাট পচাইবে ও কাচিবে। রোপণের সুবিধা থাকিলে পাটের জমিতে হৈমন্তিক ধান্যের চারা রোপণও করিবে। নিম্ন জমির আশু ধান্য এই মাসে পাকে। আদা, হলুদ, বেগুন প্রভৃতির গাছের গোড়ায় কোদাল দিয়া মাটী ধরাইয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিবে। ইক্ষু গাছের নত পত্র গুলি দ্বারা তিন চারিটী গাছ একত্র করিয়া বাঁধিবে। লঙ্কামরিচের চারা এই মাসে রোপণ করা যায়। কোন গাছের গোড়ায় জল না বসে, তাহার উপায় করিবে। কতিপয় পুষ্প বৃক্ষের ও ফল গাছের ডাল ছাঁটিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ভাদ্র

এই মাসেও বর্ষার শেষ হয় না। এজন্য হৈমন্তিক ধান্যের চারা এই মাসেও রোপণ করে। টবে কিম্বা গামলায় ফুলকপি ও বাঁধাকপির চারা প্রস্তুত করিবে। লাউয়ের বীজ রোপণ করিবে। চারা জন্মাইবার জন্য হাপরে উত্তম ঝুনা নারিকেল বসাইবে। এই মাসে আশুধান্য কাটা ও ঝাড়া শেষ হয়। উচ্চ জমির আশুধান্যই এই মাসে পাকে। আশ্বিন মাসে যে সকল ফসলের আবাদ আরম্ভ হইবে, তাহাদের জমি প্রস্তুত ও তাহাতে সার দিবে। বৃষ্টি বন্ধ হইলে আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধেই তামাক বীজ পাতো দিবে এবং আলু বীজ বপন করিবে। মাসকলাই, ঠিকুরী কলাইও ঐ সময় বপন করে।

আশ্বিন

বর্ষার শেষ হইলেই যাবতীয় রবিশস্যের আবাদ আরম্ভ হয়, ভাদ্র মাসে বর্ষার অবসান হইলে আশ্বিন মাসে অনায়াসে চাষ আবাদ চলিতে পারে। কিন্তু যে বৎসর আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বর্ষা থাকিবে, সে বৎসর কার্ত্তিক মাসে রবিশস্যের আবাদে প্রবৃত্ত হইবে। আবাদ অগ্রিম আরম্ভ হইলে ফসলও অগ্রিম পাওয়া যায় এবং

অগ্রিম ফসলে লাভও অধিক হয়, কিন্তু বর্ষা থাকিলে সে চেষ্টা কখনই সফল হইতে পারে না। এই সময়ে সর্ব্বপ্রকার কপি, রাঙ্গা আলু, গোল আলু, উচ্ছে, পটল, পলাণ্ডু, মুলা, শালগম, গাজর, কড়াইশুঁটী, পালম, সীম, মানকচু, ভূঁয়ে শসা, যব, গম, সরিষা, ছোলা, মটর, মুগ, মসুরি, খেঁসারি, ধনে, মেথী, মৌরী, তামাক প্রভৃতির বীজ বপন করিবে। যে সকল গাছে জোড় বা গুল কলম করা হইয়াছে, সেই সকল কলমের জোড়ের বা শিকড় গজাইবার অবস্থা বিবেচনা করিয়া কাট দিবে।

কার্ত্তিক

বর্ষা শেষ হেতু যদি সুবিধা মত আশ্বিন মাসে উপরোক্ত রবিশস্য গুলির আবাদ না হইয়া থাকে, তবে কার্ত্তিক মাসে করিতে হইবে। আর হইয়া থাকিলে তাহাদের ক্ষেত্র খুঁড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়া, আবশ্যক মত জল সিঞ্চন করা প্রভৃতি যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবস্থা তাহা করিবে। বর্ষার জল খাওয়াইবার জন্য যে সকল ফল-বৃক্ষের গোড়ায় আইল বান্ধিয়া রাখা হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহা ভাঙ্গিয়া সার মিশ্রিত নূতন মৃত্তিকা দ্বারা গোড়া ঢাকিয়া দিবে, ফল ও ফুলের উদ্যানস্থ যাবতীয় বৃক্ষের গোড়ার মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিবে। যে সকল জোড় ও গুল কলমে কাটান দেওয়া আছে, তাহাদের অবস্থা বুঝিয়া নামাইয়া লইবে। এই মাসে কদলী বাগানের আর একবার সংস্কার আবশ্যক এবং ইচ্ছা করিলে এখনও ছোট ছোট তেউড় তুলিয়া লইয়া নূতন কলা বাগান করা যাইতে পারে। আম্রাদি বড় বড় গাছ ও কলমের চারা এই মাসে ক্ষেত্রে স্থায়ীরূপে রোপণ করিতে হয় এবং কতকগুলি আগামী আষাঢ়ে রোপণ জন্য "খাসিয়া" করিয়া রাখিবে।

অগ্রহায়ণ

কার্ত্তিক মাসেই অধিকাংশ রবিশস্যের চাষ ও দেশীয় এবং বিদেশীয় শাক সব্জী প্রভৃতির বীজ বপন কার্য্য শেষ করা উচিত, বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ঘটিলে এই মাসেও কতক চাষ চলিতে পারে, কিন্তু নাবি ফসলে তেমন সুবিধা ও লাভ হয় না। কপি ও আলু গাছের দাঁড়া বান্ধিবে। যে নূতন জমিতে চৈত্র বৈশাখ মাসে হলুদ রোপণের মনস্থ আছে, তাহা একবার কোপাইয়া রাখিবে। উচ্চ জমির হৈমন্তিক ধান্য এই মাসে পাকে, কৃষকেরা তাহা কাটিবে ও ঝাড়িবে।

পৌষ

এদেশীয় কৃষকদিগকে পৌষ মাসে প্রায় কোনও নূতন কৃষিতে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। কারণ এই মাসে কোন প্রকার শস্য বা শাক সব্জী রোপণের উপযুক্ত সময় নহে। নিম্ন জলাভূমির ধান্য এই মাসে পাকে উহা কাটা ও ঝাড়াই কৃষকের প্রধান কার্য্য। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল ফসলের চাষ হইয়াছে,

আবশ্যক মত তাহাদের পাইট করিতে হইবে। তামাকের ডগা, ফেঁকৃড়ি ও ছোট পাতা ভাঙ্গিয়া দিবে। আলুর গোড়া খুঁড়িয়া কতক আলু তুলিয়া লইবে।

মাঘ

এই মাসে বৃষ্টি হইলে সুবিধা বিবেচনা করিয়া লাঙ্গল ও কোদাল দ্বারা ভূমি খনন করিবে, জমিতে সার দিবে। উত্তম বীজ প্রস্তুত জন্য মূলা ও বীট পালমের অগ্রভাগ কাটিয়া রোপণ করিবে। সর্ষপ, মৌরী, ধনে প্রভৃতির গাছ তুলিয়া শস্য সংগ্রহ করিবে। ইক্ষু কাটিয়া মাড়িতে আরম্ভ করিবে। ফুল ফুরাইয়া গেলে ফুল গাছের ডাল কাটিয়া ফেলিবে। আদা, হলুদ প্রভৃতি তুলিবে, ধান কাটা হইয়া গেলে নাড়া সংগ্রহ করিবে, কতক আগুন লাগাইয়া জমি পোড়াইয়া উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবে। তরমুজ, খরমুজ, খেড়ো, ফুটী, উচ্ছে, ভুঁয়ে শসা প্রভৃতি এই মাসে বপন করা যাইতে পারে।

ফাল্গুন

মাঘ মাসে জমি খোঁড়া ও সার দেওয়া না লইয়া থাকিলে, এই মাসে করিবে। ইক্ষুর ডগা কাটিয়া বীজের জন্য হাপরে বসাইবে। যব, গম, তামাক প্রভৃতি রবি-শস্য গুলি পাকিলেই কাটিয়া সংগ্রহ করিবে। এই মাসে আম্রাদি বৃক্ষ সকল মুকুলে সুশোভিত হইবে। যে সকল কার্ত্তিক মাসের রোপিত নূতন কলমে মুকুল বাহির হইবে, তাহাতে জল ঢালিয়া মুকুল নষ্ট করিয়া ফেলিবে, নচেৎ গাছ নিস্তেজ হইয়া যাইবে।

চৈত্র

ফাল্গুন মাসেই অধিকাংশ রবিশস্য উঠিয়া যায়। যাহা অবশিষ্ট থাকে এই মাসে সংগ্রহ করিবে। সুবিধা বোধ হইলে কতিপয় বর্ষাতী ফসলের আবাদ এই মাসেই আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ নিম্ন জমীর পাট এই মাসেই বপন করিবে। বাঁশের ঝাড় আগুনে পোড়াইবে। বৃষ্টির সুবিধা বুঝিয়া অন্যান্য চাষ আবাদ কার্য্য করিবে। নচেৎ চৈত্র মাস ক্ষেত্রের একরূপ বিশ্রাম অবস্থা বলিতে হইবেক।

দুর্ভিক্ষে খাদ্য *

চারিদিকে এবার অনাবৃষ্টির কথা শুনিতেছি। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমাঞ্চলে ইহা অপেক্ষা ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, সে বৎসর আমি সাহারাণপুর হইতে দিল্লী অভিমুখে গমন করিতেছিলাম। কখন যমুনার এ পার দিয়া, কখন যমুনার ও পার

* শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম। কুরুক্ষেত্রের নিকট পানিপথ হইতে যমুনা পার হইয়া মজঃফরনগর জেলায় উপস্থিত হইলাম। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অন্নাভাবে সে বৎসর হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু এ স্থানে দুর্ভিক্ষের বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখিলাম না। বৃষ্টির অভাবে সে বৎসর বর্ষাকালে খরিফ (জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদি) শস্যের বীজ লোকে বপন করিতে পারে নাই। কিন্তু এখানে দেখিলাম যে, প্রতি কূপের চারি পার্শ্বে ঘোর হরিৎবর্ণের এক প্রকার ফসল হইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, এ ফসলের নাম গাজর। দুর্ভিক্ষের সময় গাজরের মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিবে সে জন্য যে স্থানে জল সেচনের সুযোগ আছে, সেই স্থানে লোকে অতি যত্নে ইহার চাষ করিয়াছে। এ স্থানের কৃষকের অধিকাংশ জাঠ। অতি পরিশ্রমী জাতি বলিয়া ইহারা প্রসিদ্ধ। দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত জাঠেরা এই উপায় বাহির করিয়াছে। তাহাদের দৃষ্টান্তে গুজর প্রভৃতি অন্যান্য জাতিও গাজরের চাষ করিয়াছে।

যে সমুদয় উদ্ভিদের মূল (বা মূলের ন্যায় পদার্থ) লোকে ভক্ষণ করে, চাষ করিলে ধান্য গোধুম অপেক্ষা তাহাতে অধিক ফসল উৎপন্ন হয়। যে এক বিঘা ভূমিতে দশ মণের অধিক গম হয় না, যত্ন করিলে তাহাতে পঞ্চাশ হইতে একশত মণ পর্য্যন্ত গোল আলু উৎপাদিত করিতে পারা যায়। আলু ঠিক মূল নহে ; যাহা হউক এ স্থানে মূল বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। মূলা, আলুয়া, সুতনি, শকরকন্দ বা রাঙা আলু ও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আয়রলণ্ড দেশে গোল আলু মানুষের প্রধান খাদ্য। বেহার অঞ্চলে সুতনি ও আলুয়া খাইয়া লোক কিছুদিন প্রাণ ধারণ করে। গাজর কিন্তু সেরূপ সুখাদ্য নহে, ইহার পরিপোষণ শক্তিও অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু ইহার চাষ কষ্টসাধ্য নহে। কোন রূপে দুই তিন মাস প্রাণ বাঁচাইবার জন্য লোকে ইহার চাষ করিয়াছিল।

এক বিঘাতে কত গাজরের মূল উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি একখানি ক্ষেত খুঁড়িয়া ফেলিলাম। ওজন করিয়া দেখিলাম যে এ স্থানের এক বিঘাতে (আমাদের তিন বিঘাতে) ৩৬০ তিন শত ষাটি মণ গাজরের মূল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ব্যতীত গাজরের গাছও অনেক জন্মিয়াছিল। গরু বাছুর আহ্লাদের সহিত ইহা ভক্ষণ করে। জাঠ কৃষকদিগের মুখে শুনিলাম যে, আরও অধিক পরিমাণে লোকে এ দ্রব্যের চাষ করিত, কিন্তু বীজের অভাবে তাহা করিতে পারে নাই। সচরাচর অতি অল্প পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে, সে জন্য অধিক পরিমাণে কেহ ইহার বীজ রাখিয়া দেয় না।

আরও পূর্ব্বদিকে আমি আসিয়া দেখিলাম যে, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ দেহ বালক বালিকা সকলের হাতেই দুই একটি গাজর। আলিগড় জেলায় সিকন্দ্রারাও

নামক স্থানের নিকট বৃহৎ একখানি গ্রাম আমি লোক জনের সহিত রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঘিরিয়া ফেলিলাম। পূর্ব্বদিন সে গ্রামের প্রতিজন কি খাইয়া দিন-পাত করিয়াছিল, আমার লোকেরা তাহার বিবরণ লিখিয়া লইতে লাগিল। গণনা শেষ হইলে আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম যে, সে দিন এ গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক লোক কেবল মাত্র গাজর খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। এক চতুর্থভাগ গাজর ও তাহার সঙ্গে জোয়ার প্রভৃতি কোনরূপ শস্যের রুটি খাইয়াছিল। বাকী অবস্থাপন্ন লোকেরা রুটি খাইয়াছিল।

আমি যাহা দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম কৃষি-বিভাগের কর্ত্তা বক্ সাহেবকে তাহা জানাইলাম। সমুদয় তত্ত্ব সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইল। কয়েক বৎসর পরে অনাবৃষ্টি বশতঃ রায়বেরেলি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইল। রোহিলখণ্ড হইতে গাজরের বীজ আনিয়া কৃষকগণকে বিতরণ করিতে আমি সহায়তা করিয়াছিলাম। প্রথম সে স্থানে কূপের অভাব হইল, তাহার পর কূপ হইতে জল তুলিবার নিমিত্ত চর্ম্মনির্ম্মিত পুরের অভাব হইল। যাহা হউক যথাসাধ্য গাজরের চাষ করিয়া সে বৎসর দুর্ভিক্ষে অনেকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। পশ্চিম অঞ্চল হইতে আমি চলিয়া আসিলে আর এক বৎসর দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছিল। পশ্চিম প্রদেশে বীজের অভাব হেতু বটে, গভর্ণমেণ্ট এবার বিলাত হইতে গাজরের বীজ আনিতে চেষ্টা করিলেন। গাজর, মূলা, গোল আলু প্রভৃতির বীজ কার্ত্তিক মাসে রোপণ করিতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বীজ বিলাত হইতে মাঘ মাসে এ দেশে পৌঁছিল, সে জন্য চেষ্টা বিফল হইল।

বঙ্গ দেশের লোক প্রাণ গেলেও গাজর খাইবে না, সুতরাং এ প্রদেশে ইহার চাষের পরামর্শ দেওয়া বৃথা, কিন্তু এ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে আলুর চাষ হওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষের বৎসরে উচ্চ দোয়াঁস ভূমিতে, যে স্থানে জল সেচনের উপায় আছে, সেই স্থানেই আলুর বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। ভালরূপে সার দিয়া বিশেষরূপে যত্ন করিয়া যাহাতে অধিক পরিমাণে আলু উৎপন্ন হয়, সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আলু খাইয়া মানুষ অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারে। আমি যখন শিল্প সমিতির সম্পাদক ছিলাম, তখন নানা স্থানে আলুর চাষ প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। অনেক স্থানে বীজও প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমার যত্ন বিফল হয় নাই। পূর্ব্বে যে সকল স্থানে আলুর চাষ ছিল না, এখন সেই সকল স্থানে ইহার চাষ হইতেছে। কিন্তু ইহার চাষ আরও বিস্তৃতভাবে হওয়া আবশ্যক।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

ফাল্‌ক্স বা বিলাতি তিসির শণ—

ইহা আমাদের তিসি ও মসিনার আঁসের তুল্য। বিলাতি তিসির আঁস ৩ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহার গাছে বেশী শাখা প্রশাখা হয় না, আঁস নরম হয় এবং গাছে অধিক বীজ হয় না। দেশী তিসির আঁস মোটা, ভঙ্গপ্রবণ।

পাটের ন্যায় তিসির আঁসও পচাইয়া বাহির করিতে হয়। প্রতি একরে ৩½ হইতে ৫ মণের অধিক আঁস পাওয়া যায় না। আঁসের তারতম্যের জন্য দামের খুব তফাৎ হয়। ১৫৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা মণ তিসির শণ বাজারে বিক্রয় হয়। কিন্তু ভারতীয় তিসির শণের মূল্য প্রতি মণ ৩০৲ টাকার অধিক কখন হয় নাই।

তিসির আঁস ভাল এবং লম্বায় বড় করিতে হইলে ভাল জমিতে তিসি বোনা ও জমি যাহাতে সরস থাকে তাহার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।

তিসির আঁস ব্যতীত অন্যান্য আঁস লইয়াও পরীক্ষা চলিতেছে; তন্মধ্যে বেড়েলা, জবা জাতীয় বিমৃলি ও মেস্তা পাট উল্লেখযোগ্য। এই সকল পাটের কিন্তু পরীক্ষা খুব আশাপ্রদ বলিতে পারা যায় না।

বঙ্গে তুলার আবাদ—

ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত ৬০,২৩৮ একর জমিতে জলদি তুলার আবাদ হইয়াছে। বিগত বর্ষে এমন দিনে ৩৪,৬১৪ একর পরিমাণ মাত্র জমিতে জলদি তুলার চাষ হইয়াছিল। এই সময় নাবী তুলার জমির পরিমাণ ২৮,৪৩২ একর মাত্র। তৎপূর্ব্বে বৎসর ইহা অপেক্ষা অধিক জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল এই সময়ের মধ্যে ৩৩, ৩৮৮ একর পরিমাণ জমিতে নাবী তুলার আবাদ হইয়াছিল।

বঙ্গের ইক্ষুর চাষ—১৯১১

বিহারে প্রচুর ইক্ষু জন্মে। বিহারের পরই বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হাজারিবাগ এবং মানভূমে ইক্ষু চাষের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। আখ বসাইবার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত আখ চাষের অবস্থা ভাল। বর্ত্তমান বর্ষে আখ চাষের আবাদী জমির পরিমাণ ৩৪০,৩০০ একর, বিগত বৎসর অপেক্ষা ৬,০০০ একর অধিক।

ফসলের পরিমাণ পনেরো আনা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্ত্তমান বর্ষে খেজুর গুড় ১,৩৩২,১০০ হন্দর এবং তালের গুড় ১৩,২০০ হন্দর উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে তিলের চাষ—১৯১১

এখানে তিল দুইবার জন্মে এক গ্রীষ্মের সময় চৈত্র হইতে ভাদ্রের মধ্যে, দ্বিতীয় বার হৈমন্তিক ধানের সহিত শীতকালে। মৈমনসিংহ এবং পাবনা জেলায় তিলের চাষ অধিক। সাধারণতঃ একরে ৪ হন্দর তিল উৎপন্ন হয় ধরিয়া লইলে সমগ্র প্রদেশে ২৫,১০০ টন তিল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। এক হন্দরের ওজন বাঙলায় ১ মণ ১৪ সের।

টেক্সাসে উচ্চ জমিতে ধানের চাষ—

প্রতি বৎসরে এমেরিকার যুক্তপ্রদেশে যে ধান্য জন্মে তাহার অর্দ্ধেক ঐ টেক্সাস্ প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতের লোকে জানে, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর লোকের এই বিশ্বাস যে, জলা জমি না হইলে ধানের আবাদ হয় না। টেক্সাসের অধ্যবসায়ী কৃষককুল সে বিশ্বাস ঘুচাইয়া দিয়াছে। তাহারা টেক্সাসের উচ্চ ভূমিতে ধানের আবাদ বসাইয়া লুসিয়ানা ও উত্তর ক্যারোলিনার চাষীগণেরও চমক ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে টেক্সাসে একটিও ধান্যক্ষেত্র ছিল না। এখন তথাকার ধান্য ক্ষেত্রের পরিমাণ ২৫০,০০০ একর। তাহারা তথায় ধান ও গম চাষ সমতুল্য করিয়া ফেলিয়াছে। যে জমি এতকাল কেবল গম চাষে আবদ্ধ ছিল, এখন তাহাতে যদিচ্ছাক্রমে ধান চাষও হইতেছে। যে যন্ত্রাদি লইয়া তাহারা গম চাষ করিত এখন সেই সকল যন্ত্র লইয়াই ধান চাষে নিযুক্ত হইয়াছে। সেখানে হাতে কোন কাজ হয় না, সব কার্য্যই কলের সাহায্যে সাধিত হয়। সেখানকার চাষে কত অধ্যবসায়ের আবশ্যক তাহা এক সেচন জলের ব্যবস্থায়ই বুঝা যায়। তথায় চাষের জন্য প্রতি একরে ৬ গ্যালন বা ৩০ সের জল এক মিনিটে আবশ্যক হয়। যে চাষীর ১০,০০০ একর জমি আছে তাহার প্রতি মিনিটে ৬০,০০০ গ্যালন জল দরকার। এক দিনে তাহার ৮৬,৪০০,০০০ গ্যালন জলের আবশ্যক। একটা মাঝারি রকম নগরে এক দিনে যে জলের খরচ, একটা ১০,০০০ একর জমির জন্য সেই জলের খরচ। অধিকাংশ স্থলে নদী হইতে পম্প সাহায্যে এই জল তোলা হয়, কোথাও কূপের সাহায্যে লওয়া হয়। ৮০ হইতে ১০০ ফিট চওড়া খালে জল চালাইয়া তাহা হইতে সরু নালায় লইয়া যাইয়া ক্ষেতে দেওয়া হয় এবং মাঝে মাঝে ১৮ হইতে ২৪ ইঞ্চ বাঁধ দিয়া ইচ্ছামত জলে ক্ষেত ডুবাইয়া দেওয়া হয় এবং জল বাহির করিয়াও দেওয়া হয়। এই প্রকার জল সেচনের সুবিধা থাকায় ধানের অঙ্কুর একটু বড় হইবার পর হইতে ধানক্ষেতে ২ কিম্বা ৩ ইঞ্চ জল সর্ব্বদা রক্ষা করা

যাইতে পারে। জল আগম ও নিগম দুইয়েরই পথ ঠিক থাকা চাই। জল বাহির করিয়া দিতে না পারিলে জমি শীঘ্র লাঙ্গল দিবার উপযুক্ত করা যায় না। জল নিগমের সুবিধা না থাকিলে সময় মত ধান রোপণ বা ধান কাটা হয় না, কিম্বা সেই ক্ষেতে অন্য ফসল লাগাইতে হইলে তাহার সময় পাওয়া যায় না। এইরূপ প্রথায় চাষ করিলে খরচ যে অত্যন্ত অধিক পড়ে তাহা নহে, খুব অধিক হইলেও এক একরে ৫০৲ কিম্বা ৫২৲ টাকার অধিক পড়ে না। বাঙলা দেশের ধান চাষে ব্যয় অপেক্ষা এখানে ব্যয় কিছু অধিক কিন্তু আয় তুলনায় তিন চারি গুণ। এখানে তাহারা ধানের ক্ষেতে দুইটী খন্দ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। এই শেষ খন্দ হইতে সমুদয় খরচ উঠিয়া যায়, প্রধান খন্দটা লাভে থাকে। টেক্সাস্ ব্যতীত এমেরিকার অন্যত্র এক ক্ষেত্রে ধানের দুইটী খন্দ উৎপন্ন করা সম্ভব নহে। যদি সেই ক্ষেতে ধান দ্বিতীয় বার জন্মান না যায়, অন্য হৈমন্তিক শস্য গম, রাই, যব উৎপাদন করা যাইতে পারে এবং এই সকল শস্য আহরণ করার পর পুনরায় ধান চাষের যথেষ্ট সময় থাকে। এমেরিকার যে সকল স্থানে ধান জন্মায় তথায় লেবু, কমলা, আঙ্গুর, খর্জ্জুর, ডুম্বুর, তুলা, ভুট্টা উৎপন্ন করা কোন মতে কষ্টসাধ্য নহে।

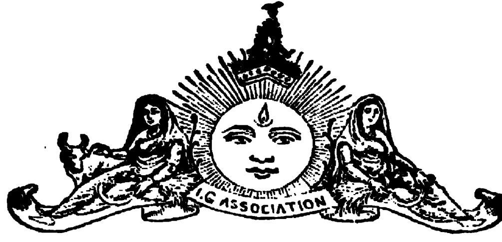
বাঁশে ঘুণ—

গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বাঁশ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়। অন্যান্য অনেক কার্য্যেও বাঁশের আবশ্যক। বাঁশের কিন্তু একটা প্রধান শত্রু—ঘুণ; ঘুণ একবার বাঁশে ধরিলে অচিরে বাঁশ জীর্ণ হইয়া নষ্ট হয়। এই বাঙলা ঘুণের ইংরাজী নাম Shot borer। ঘুণ জাতীয় কীটগুলি এত ক্ষুদ্র যে, তাহাদের চোখে দেখা যায় না। ইহাদের পতঙ্গগুলি বাঁশের কিম্বা কাঠের গায়ে ডিম পাড়ে, ডিম হইতে কীট জন্মিয়া ছিদ্র করিয়া বাঁশের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কুরিয়া কুরিয়া বাঁশের মধ্যে কাটিতে থাকে। ক্রমশঃ ইহা খাইয়া বড় হয়, তখন ইহারা বাঁশের মধ্যে পুত্তলি হয়, পরে পতঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ছিদ্র করিয়া বাহিরে আসে এবং স্বতন্ত্র বাঁশে ডিম পাড়িবার চেষ্টা করে।

এই সকল কীটের বংশ বৃদ্ধির কথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। মনে কর বৈশাখ মাস নাগাইত একটা কীট ১০ স্ত্রী এবং ১০ পুং পোকার ডিম পাড়িল। আবার ঐ স্ত্রী পতঙ্গগুলি প্রত্যেকে ২০ টি ডিম পাড়িল। এই দ্বিতীয় বারে ১০০ স্ত্রী পতঙ্গের উৎপত্তি হইল। এইরূপে ৫ম বারে ২,০০০,০০০ কীটের উৎপত্তি হইল। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে কত শীঘ্র ইহাদের সংখ্যা বাড়ে।

এই ক্ষুদ্র শত্রুর হাত হইতে রক্ষার একটা উপায় চিন্তা করা তবে নিতান্ত আবশ্যক। কয়েক বৎসর যাবৎ কীটতত্ত্ববিদ ষ্টেবিং সাহেব কলিকাতা টেলিগ্রাফ বিভাগের কতিপয় কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যে বাঁশ রক্ষার নানা উপায় পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহার পরীক্ষার ফল সাধারণের জানা উচিত। আমাদের দেশে বাঁশ কাটিয়া কয়েক দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। পাঁচ সাত দিন বাঁশগুলি জলে ফেলিয়া রাখা হয়। ষ্টেবিং সাহেব বাঁশ ৫ দিন জলে পচাইতে বলেন। তদনন্তর বাঁশগুলি তুলিয়া ঘরে কিম্বা কোন আবৃত স্থানে ফেলিয়া শুকাইতে হইবে। রৌদ্রে ফেলিয়া শুকান কর্ত্তব্য নহে। এইরূপে বাঁশগুলিকে পুনরায় ৪৮ ঘণ্টা ক্রুড কেরোসিন তৈলে (অসংস্কৃত খনিজ পাথুরে কয়লার তৈল) ভিজাইয়া রাখিতে হয়। এই তৈল ঘণ—যেন পাতলা গুড় কিম্বা পাতলা আলকাতরার মত। অন্যান্য উপায় অপেক্ষা ইহাই তিনি সহজ সাধ্য বলিয়া মনে করেন। যেখানে অনেক বাঁশ এইরূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে সেখানে খুব কম খরচে হয়, বোধ হয় এক পাই ফুট হিসাবে খরচ পড়ে। ১২ ফিট এক খণ্ড বাঁশ এইরূপে প্রস্তুত করিতে এক আনা খরচ যথেষ্ট। সাধারণতঃ যে কেরোসিন তৈলে আলো জ্বলে তদপেক্ষা এই তৈলের দাম খুব কম। ৪ মণ ৫ মণ এক একটা পিপে ভর্ত্তি হইয়া কলিকাতায় আসিতে পারে। কলিকাতায় পৌঁছিতে জাহাজ রেল ভাড়া দিয়া মণ ৪৲ টাকা হিসাবে পড়তা হওয়া সম্ভব।

বাঁশ এই রকমে তৈয়ারি করিয়া লইয়া দেড় দুই বৎসর রাখাতেও তাহাতে ঘুণ ধরে নাই এবং খুব সম্ভব তাহাতে ঘুণ ধরিবে না।



আশ্বিন, ১৩১৮ সাল।

ক্যালসিয়াম সায়নামাইড সার

আমরা বিগত সংখ্যায় ক্যালসিয়াম সায়নামাইডের স্বরূপ ও ব্যবহার প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। তৎসঙ্গে কতিপয় পরীক্ষারও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ২।৪ টি পরীক্ষা হইতে এই নূতন সারের প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। তজ্জন্য সভ্য জগতের নানা স্থানে ক্যালসিয়াম সায়নামাইড সারের প্রয়োগে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনের মাত্রা যেরূপ হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

সুপ্রসিদ্ধ রথামষ্টেড্ ক্ষেত্রে ১৯০৯ সালে ক্যালসিয়াম সায়নামাইড যবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। ক্ষেত্রের জমি কাদা দোয়াঁস ও অনেক কাল কোন প্রকার জীবাণু সার পায় নাই। পরীক্ষার বৎসর উহাতে একর প্রতি ৩ হন্দর সুপার ফস্ফেট দেওয়া হয়। সোরাজান প্রধান সার সমূহের মাত্রা একর প্রতি ৫০ পাঃ হিসাবে সোরাজান। ইহাতে নিম্নলিখিত প্রকার ফল পাওয়া যায়।

	শস্য		খড়	
নাইট্রেট অব্ সোডা	২৫০৮	পাঃ	৩,৪২৯	পাঃ
ঐ	৩১৪৬	”	৪,৩৩৪	”
নাইট্রেট অব্ লাইম	২৭৮১	”	৪,৮০৬	”
ঐ	২৯১৬	”	৪,০৯১	”
সলফেট অব্ অ্যামোনিয়া	২৯৬৩	”	২,৯৪৩	”
ঐ	২৯৪৩৫	”	৪,০৯১	”
ক্যালসিয়াম সায়নামাইড্	২৫৭০	”	৪,৪৬৯	”
ঐ	২৮৪৫	”	৩,৪৮২	”

উপরোক্ত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সলফেট্ অব্ অ্যামোনিয়ায় শস্যের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অপরাপর ফলাফলকে পরীক্ষার তারতম্য

বলিয়া গণনা করিতে পারা যায়। খড়ের মাত্রা প্রায় সকল সারেই একরূপ। সলফেট্ অব্ অ্যামোনিয়া ও ক্যালসিয়াম সায়নামাইডে শস্যে তুষের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে সায়নামাইডের অনেকটা আগাছা বিনষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে। সুইজারলণ্ডে আরেনেনবর্গ প্রদেশে এসম্বন্ধে পরীক্ষা হয়। যব ও যব এবং মটর ক্ষেত্রে সায়নামাইড প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ হইয়াছে যে উপরোক্ত উক্তি অনেক পরিমাণে সত্য।

ইতালী দেশে ভুট্টা ক্ষেত্রে সায়নামাইড্ প্রয়োগ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে উৎপাদনের ক্ষমতায় ইহা সলফেট্ অব অ্যামোনিয়া অথবা নাইট্রেট্ অব্ সোডা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। পক্ষান্তরে কোন কোন পরীক্ষায় উক্ত দুই সার অপেক্ষা সায়নামাইড ব্যবহারে সমধিক ফলন হইতে দেখা গিয়াছে।

ইতালী দেশে ধান্য ক্ষেত্রেও এই সার পরিক্ষীত হইয়াছিল। লোদির অধ্যাপক অ্যালিসের পরীক্ষায় দেখা যায় যে সায়নামাইড সলফেট্ অব অ্যামোনিয়া অপেক্ষা অধিক শস্য উৎপাদন করে। প্রথমে একর প্রতি ৩·৫৮ হন্দর সুপারফস্‌ফেট প্রয়োগ করিয়া তাহার পর বপনের পূর্ব্বে একর প্রতি ৭৮½ পাঃ হিসাবে সায়নামাইড দেওয়া হয়। সলফেট্ অব অ্যামোনিয়ার মাত্রাও উক্তরূপ।

পরীক্ষার ফল --			শস্য	
সলফেট্ অব অ্যামোনিয়া	...	...	৪৭·৫৪	হন্দর
ক্যালসিয়ম্ সায়নামাইড	...	...	৫০·৪৩	,,
সোরাজান বিহীন সার	...	...	৭১·৬১	,,

লোদী ব্যতীত মিলান প্রদেশেও এতৎ সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষা হয়। তৎসমুদয়েও উক্ত প্রকার ফল পাওয়া গিয়াছে।

বিগত সংখ্যায় আয়রলণ্ডে গোল আলুর চাষে সায়নামাইড প্রয়োগের উপকারিতা সম্বন্ধে একটি পরীক্ষার ফলাফল উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্কটলণ্ডের গ্লাস্‌গো এবং পশ্চিম স্কটলণ্ডের কৃষি কলেজের পরীক্ষাক্ষেত্রে কতিপয় পরীক্ষা হয়। উক্ত পরীক্ষা সমূহে সুপারফস্‌ফেট ও সলফেট অব পটাশ এবং বেসিক স্ল্যাগ ও সলফেট অব পটাসের সহিত সায়নামাইড ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে বেসিক স্ল্যাগের সহিত ব্যবহারে সায়নামাইড সলফেট অব্ অ্যামোনিয়ার সমকক্ষ হয়, কিন্তু সুপারফস্‌ফেটের সহিত প্রয়োগে সেরূপ হয় না। এস্থলে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে যদি সায়নামাইড আলুক্ষেত্রে ছড়ান হয় তাহা হইলে যাহাতে উহা আলুর পাতার উপর না পড়ে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত, নতুবা পাতার অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

২৪

১৯০৯ সালে পোর্টোরিকোর স্যাণ্টারিকা প্রদেশে ইক্ষুক্ষেত্রে সায়নামাইড্ দেওয়া হয়। মাত্রা একর প্রতি ১৪৪ পাঃ সোরাজানের সমতুল্য এবং ইহা দুই মাস ব্যবধানে দুইবার প্রয়োগ করা হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল নিম্নরূপ—

		একর প্রতি ইক্ষুর ওজন, টন হিঃ		৯৬% শর্করার মাত্রা
সলফেট অব অ্যামোনিয়া	...	৪৫.২২	...	৪.৮৬
নাইটেট অব সোডা	...	৪৭.৩৪	...	৫.৩৭
পাঁক ...	...	৪৯.২৩	...	৫.৩১
ক্যালসিয়ম সায়নামাইড	...	৫৮.৩৫	...	৭.৩২
সোরাজানবিহীন সার	...	৭৮.১৯	...	৫.৮০

ইহাতে উপলব্ধি হইবে যে সায়নামাইডে ফসলের মাত্রাও যেরূপ অধিক হইয়াছে, উৎপাদিত ইক্ষুতে শর্করার মাত্রাও সেইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সন, তিসি, কার্পাস প্রভৃতি তন্তু উৎপাদক ফসলেও সায়নামাইড সার পরিক্ষীত হইয়াছে। ইতালী দেশে সনে সলফেট অব অ্যামোনিয়া, নাইট্রেট অব সোডা, সায়না-মাইড ও সোরাজান বিহীন সার প্রয়োগ করিয়া যথা ক্রমে ৭৫৬ পাঃ, ৮০৩ পাঃ, ৮২৫ পাঃ, ও ৬২৫ পাঃ টাটকা তন্তু পাওয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে একবারে সার বিহীন জমিতে কেবল ৫১৩ পাঃ তন্তু পাওয়া গিয়াছিল। তিসির ফসলে সায়নামাইড দিয়া বুঝিতে পারা যায় যে উহাতে তন্তু ও বীজ উভয়েরই উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং তন্তুও অধিক পুষ্ট হইয়া থাকে। আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের কতিপয় স্থানে তুলা চাষে সায়নামাইড ব্যবহার করিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে গাছ প্রতি ৭ টি হইতে ৯ টি অধিক ফল ফলিয়া থাকে।

আরেজো প্রদেশের ভেনী কৃষি বিদ্যালয়ে তামাক চাষে সায়নামাইড দিয়া নিম্ন লিখিত রূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল। ১০টি পাতার ওজন

নাইট্রেট অব সোডা	...	...	...	৭·৬৪৮ আউন্স
ক্যালসিয়াম্ সায়নামাইড্	...	...	...	৭·৫৮৪ „
সলফেট অব অ্যামোনিয়া	...	...	...	৬·৭৬৮ „
ক্যালসিয়ম সায়নামাইড্	...	...	...	৭·৬৪৮ „
নাইট্রেট অব সোডা	...	...	...	৫·৮২৫ „

প্রত্যেক সারই একর প্রতি ১·৬ হন্দর হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সায়নামাইড সার দ্বারা উৎপাদিত পাতাগুলি বেশ পাতলা ও স্থিতিস্থাপক হইয়াছিল। উক্ত পাতা সমুদয় যে অন্যান্য সার উৎপাদিত পাতা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বেভেরিয়া দেশে পেঁয়াজ চাষে সায়নামাইড ব্যবহার করিয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে উহা নাইট্রেট অব সোডার সমকক্ষ এবং সলফেট্ অব অ্যামোনিয়া হইতে উৎকৃষ্টতর। যে ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা নির্ব্বাহিত হয় তাহাতে প্রথমে

সুপার ফস্‌ফেট্ ও পটাশ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। পরে একর প্রতি ৪৫ পাঃ সোরাজানের হিসাবে সায়নামাইড দেওয়া হয়।

নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় গোধূম চাষে সায়নামাইডের ফলাফল দৃষ্ট হইবে। (ক) পরীক্ষা জর্ম্মণির জেনাপ্রদেশে নির্ব্বাহিত হয়; (খ) পরীক্ষা ফরাসি দেশের ফ্রিটয় নামক স্থানে এবং (গ) পরীক্ষা ইংলণ্ডের রয়েল এগ্রিকলচারাল্ সোসাইটির উবার্ণ নামক পরীক্ষা ক্ষেত্রে। প্রত্যেক তালিকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সায়নামাইডে ফসলের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। (গ) পরীক্ষায় ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে সায়নামাইড দ্বারা উৎপাদিত ফসল উৎকৃষ্টতর এবং তজ্জন্য অধিক মূল্যেও বিক্রয় হইয়াছিল।

গোধূম

(ক)

সারের নাম	সারের পরিমাণ একর প্রতি সোরাজান পাঃ হিঃ	উৎপাদনের মাত্রা একর প্রতি	
		শস্য হন্দর	খড় হন্দর
নাইট্রেট অব্ সোডা ...	২০·৮	২০·৮২	৩৫·৭০
ক্যালসিয়ম সায়নামাইড ...	ঐ	২২·১৬	৩৮·২১
নাইট্রেট অব্ সোডা ...	৪১·৭	২২·৮১	৩৯·৯৭
ক্যালসিয়ম্ সায়নামাইড ...	ঐ	২৪·০৭	৪১·৮৭
সোরাজানবিহীন সার ...	...	১৮·৯০	৩২·৪০

(খ)

সারের নাম	সারের পরিমাণ একর প্রতি সোরাজান পাঃ হিঃ	উৎপাদন	
		মাত্রা বুসেল হিঃ	আধিক্য বুসেল হিঃ
সলফেট অব্ অ্যামোনিয়া ...	মাত্রা ৪২ পাঃ	৪৬·৫৪	২·৭৬
শুষ্ক রক্ত ...	ঐ	৫২·৫৮	৮·৮০
পাঁক ...	ঐ	৪৫·০৫	১·২৭
ক্যালসিয়ম সায়নামাইড ...	ঐ	৫৭·১০	১৩·৩২
বপনের সময়, ক্যালসিয়ম সায়নামাইড ...	ঐ	৫৭·৪০	১৩·৬২
বপনের পূর্ব্বে, সোরাজান বিহীন সার ...	ঐ	৪৩·৭৮	

(গ)

সারের নাম	সারের পরিমাণ একর প্রতি সোরাজান পাঃ হিঃ	উৎপাদন	
		মাত্রা পাঃ হিঃ	কোয়াটার হিঃ মূল্য
সলফেট অব্ অ্যামোনিয়া ...	মাত্রা ২৪ পাঃ	৯৬৬	৩২সিঃ ৯পেঃ
নাইট্রেট অব্ লাইম ...	ঐ	৯৪০৫	ঐ
ক্যালসিয়ম সায়নামাইড ...	ঐ	৯৯৭	৩৩সিঃ ৬পেঃ

পূর্ব্ব প্রযুক্ত সার—সুপার ফস্ফেট ৩ হন্দর; সলফেট অব্ পটাস ১ হন্দর।

পুষাক্ষেত্রেও গোধূমে সায়নামাইড প্রয়োগ করা হইয়াছিল। যদিও নানা কারণে উহার ফলাফল সঠিক হয় নাই, তথাপি ইহা বুঝিতে পারা যায় যে ইহা সোরা, নাইট্রেট অব সোডা, সলফেট অব অ্যামোনিয়া অথবা নিম্ন জীবজ সারের সমতুল্য, কিন্তু শরিষার খৈল অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

পত্রাদি

ফুল বিক্রয়—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়, কাঁচড়াপাড়া,—জানিতে চান গন্ধরাজ, জবা, মল্লিকা, বেল, জুঁই ফুল কোথায় কতদরে বিক্রয় হইতে পারে? কোন্ কোন্ গোলাপ বিক্রয়ের জন্য চাষ করা উচিত?

[জবা গন্ধরাজ, মল্লিকা, গাঁদা, স্থলপদ্ম. পদ্ম, চাঁপা প্রভৃতি ফুল কালীঘাট বা ঐ রকম দেবালয়ের নিকট খুব বিক্রয় হয়। দরের কোন ঠিক নাই, ফুল বিক্রয়ে যথেষ্ঠ লাভই হইয়া থাকে। কখন বা অতি চড়া দরে বিক্রয় হয়।

বেল, জুঁই বিক্রয়ের প্রধান আড্ডা মেছুয়াবাজার। মালি ও পাইকারেরা মালিকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বাগান হইতেই তুলিয়া আনিয়া রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করিয়া সৌখিন লোকদিগের নিকটও বিক্রয় করে। জল্দি ফুল ফুটাইতে পারিলে এমন কি ফাল্গুনের প্রথমে বেলফুল ছয় টাকা কিম্বা আট টাকা সের বিক্রয় হয়। জুঁই ফুল একটু দেরীতে ফোটে, কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। গোলাপ, রজনীগন্ধ, শ্বেতচাঁপা, ম্যাগ্নোলিয়া জাতীয় ফুল ও বিলাতি মরসুমী ফুলের প্রধান বিক্রয়ের স্থান হগ সাহেবের বাজার।

বিক্রয়ের জন্য পলনিরো, মন্টিক্রষ্টো, ব্লাকপ্রিন্স, প্যাস্তিলিয়ন ডি প্রেগ্নি, মারশাল নে, লেবিনিয়া, ডচার, পিয়ার নটিং, সার ওয়ালটার স্কট প্রভৃতি কয়েকটি

গোলাপ খুব পসন্দ সহি। বাছাই ফুল না হইলে হগ সাহেবের বাজারে বিক্রয় হয় না। সাধারণ গোলাপ বিবাহাদি মাঙ্গলিক উৎসবে তোড়া বাঁধিবার জন্য অন্যান্য বাজারেও গোলাপের আমদানী দেখা যায়।] কৃঃ সঃ।

ধানক্ষেতে সার—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়, কাঁচড়াপাড়া।

[ধানক্ষেতে প্রতি একরে ৩ মণ হাড়ের গুঁড়া ও ৩০ সের সোরা প্রয়োগ করিলে বিনা সারে ধান চাষ অপেক্ষা তিন গুণ অধিক ধান জন্মে। ধানক্ষেতে শণ বা ধঞ্চে জন্মাইয়া শণ বা ধঞ্চে গাছ কিছু বড় হইলে চষিয়া জমিতে সব্জী সার প্রদান করিলে অতি কম খরচে জমিতে সার দেওয়া হইল, অথচ ফলন স্থানে স্থানে অন্য যে কোন সার প্রয়োগ অপেক্ষা বিশেষ কিছু কম হয় না। নিঃস্ব চাষীর পক্ষে ধানক্ষেতে সার দিবার ইহাই একমাত্র পন্থা।

সার-সংগ্রহ।

শিমূল আলু

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত।

পরলোকগত বন্ধু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশে আর একটী বস্তুর চাষ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন নূতন বস্তুর প্রতি মানুষের মন আকর্ষণ করা সহজ কথা নহে। এই দেখ গোল আলু। গোল আলু প্রদান করিয়া আমেরিকা যে পৃথিবীর কত উপকার করিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু গোল আলুর চাষ সহজে মানুষে করে নাই, সহজে কেহ ইহা আহার করে নাই। প্রথম তো অপবিত্র অখাদ্য বলিয়া লোকে ইহাকে ঘৃণা করিত। "ইহা খাইলে পেট গরম হইবে" এই বলিয়া এখনও বঙ্গদেশের কোন স্থানে লোক ইহার পানে ফিরিয়াও চায় না। পাটশাকের ঝোল আর ভাত, তাহাদের পক্ষে তাহাই পরম উপাদেয় ও উপকারী। সহর অঞ্চলে কপির চাষ হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক পল্লীগ্রামের লোক কপি কি রূপ বস্তু তাহা বোধ হয়, এখনও দেখে নাই। ফল নানা কারণে নিত্যগোপাল বাবুর চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

যে দ্রব্যের চাষ বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে নিত্যগোপাল বাবু চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার নাম "শিমূল আলু।" ইহা এদেশের দ্রব্য নহে, সেইজন্য এদেশে ইহার নাম নাই। ইহার পাতা দেখিতে সামান্যভাবে শিমুল গাছের পাতার ন্যায়। সে জন্য আসামে ইহা হিমুল অর্থাৎ শিমুল আলু নামে অভিহিত হইয়াছে। ইংরাজিতে ইহাকে ক্যাসেভা (Cassava) বলে। ইহা হইতে আরারুট ও ময়দার ন্যায় যে সমুদয় বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহাকে ট্যাপিওকা, মানিহট, মনিয়ক, ব্রেজিলের আররুট ও বলে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে ইহার নাম ম্যানিহট ইউটিলিসিমা (Manihot untilissima) এই জাতির মূলে এক প্রকার বিষ আছে, সে জন্য কাঁচা খাইতে ইহার আস্বাদ তিক্ত। শিমূল আলুর আর এক জাতি আছে, তাহার মূল খাইতে মিষ্ট। উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে এ জাতিকে ম্যানিহট আইপি (Manihot Aipi) বলে।

শিমূল আলুর আদি বাস দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশ, কিন্তু এখন নানা দেশে ইহার চাষ হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন যে, পোর্টুগাল দেশের লোক ইহাকে প্রথম ভারতবর্ষে ও পূর্ব্বাঞ্চলের অন্যান্য দেশে আনয়ন করিয়াছিল। পিনাঙ্গ, শিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক চীনের লোক বসতি করিয়াছে। পোর্টুগিজদিগের নিকট হইতে বীজ পাইয়া বহুদিন হইতে তাহারা এই দ্রব্যের চাষ করিতেছে। জঙ্গলের গাছ কাটিয়া ভূমি পরিষ্কার করিয়া, তাহারা এই দ্রব্যের চাষ করে। কয়েক বৎসর পরে, ভূমি যখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আর এক স্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করিা নূতন ভূমি প্রস্তুত করে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশে লোকে এই প্রণালীতে নানা দ্রব্যের চাষ করে। এরূপ কৃষিকার্য্যকে "ঝুম" বলে।

পিনাঙ্গ ও শিঙ্গাপুর হইতে এই দ্রব্য ব্রহ্মদেশে আনীত হয়। সে জন্য ব্রহ্মবাসীরা ইহাকে "পিনাঙ্গ ইয়াম" বলে। ব্রহ্মদেশের কোন কোন স্থানে ইহা এখন বন্য হইয়া গিয়াছে। বারেণ জাতির লোক সাদরে এ দ্রব্য ভক্ষণ করে। ব্রহ্মদেশ হইতে শিমূল আলু আসামে আসিয়াছে। আসামেই ইহা হিমূল আলু বা শিমূল আলু নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আসামের লোক বেড়ার ধারে ইহার চাষ করে। রন্ধন না করিয়া কাঁচা অবস্থাতেই তাহারা শিমূল আলুর মূল ভক্ষণ করে। কোন কোন স্থানে ইহাকে গাছ-আলু এবং কোন কোন স্থানে ইহাকে রুটি-আলু বলে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণেই কিন্তু ইহার চাষ অধিক। চাউল মহার্ঘ হইয়াছে. সে জন্য ত্রিবাঙ্কুরের অনেক স্থানে ভাতের পরিবর্ত্তে লোকে ইহা ভক্ষণ করে। এ স্থানে লোকে তিক্ত শিমূল আলুর অধিক চাষ করে। তিক্ত জাতির গুণ এই যে, ইহার গাছকে অধিক যত্ন করিতে হয় না, ইহা গরু বাছুরে খায় না, আর ইহার ফলন অধিক। ইহার দোষ এই যে ইহাতে এক প্রকার ভয়ানক উগ্র বিষ আছে। এই বিষের ইংরেজী নাম —Hydrscyanic acid; এ বিষ খইালে মানুষ তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। কিন্তু অগ্নির তাপে এবিষ উবিয়া যায়। তখন তিক্ত শিমূল আলু খাইলে কোন ক্ষতি হয় না। মিষ্ট জাতীয় শিমূল আলুতে বিষ নাই। কাঁচা অবস্থায় অথবা রন্ধন করিয়া অথবা ইহার ময়দার রুটি করিয়া অথবা আরারুট করিয়া মানুষ ইহা সচ্ছন্দে আহার করিতে পারে। গোল আলুর ন্যায় তরকারি স্বরূপ মাছের সহিত রন্ধন করিয়া অনেকে ইহা আহার করে। তামিল ভাষায় শিমূল আলুকে মারা ভুল্লি ও তেলগু ভাষায় ইহাকে মনুপে গুলম বলে।

বঙ্গদেশের সকল স্থানেই এ দ্রব্যের চাষ হইতে পারে। ইহার শাখা আধ হাত পরিমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রোপণ করিতে হয়। তাহার পর আর কোনরূপ যত্ন করিতে হয় না। গাছ আপনা-আপনি বাড়িতে থাকে ও ভূমিতে নিম্নে সেই সঙ্গে মূলও পরিবর্দ্ধি হইতে থাকে। এক বৎসরের পর মূল তুলিবার উপযোগী হয়। কিন্তু বৎসরের শেষে মূল না তুলিলে কোন ক্ষতি নাই, বরং ভূমির নিম্নে ক্রমে ইহা আরও পরিবর্দ্ধিত হয়। অবশেষে দুর্বৎসরে ইহা তুলিয়া ব্যবহার করিলে চলে। বাগানের বেড়ার ধারে, অথবা এইরূপ কোন স্থানে এই গাছ রোপণ করিয়া রাখিলে দুঃখী লোকদিগের উপকার হইতে পারে। এ গাছের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা বৃষ্টির কোন ধার ধারে না। অনাবৃষ্টি হইলে বরং ইহার আমোদ হয়। কারণ সে বৎসর ইহার গাছ দুর্ব্বল না হইয়া সতেজে বাড়িতে থাকে।

এ গাছ সম্বন্ধে গানিং সাহেব লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের প্রধান আহার চাউল। বৃষ্টি না হইলে উহা উৎপন্ন হয় না। আমার ইচ্ছা যে ভাতরবর্ষে কাসাভা গাছের

চাষ হউক। এ গাছের মূল চাউলের ন্যায় পুষ্টিকর এবং আলুর ন্যায় সুস্বাদু। অনেক বৎসর ধরিয়া ভূমির নিম্নে ইহা টাটকা অবস্থায় থাকে।

জগৎ বিখ্যাত দেশ পর্য্যটক লিভিং ষ্টোন লিখিয়াছেন. আফ্রিকায় এঙ্গেলা প্রদেশের লোক মানিয়ক খাইয়া জীবণ ধারণ করে। কাঁচা অবস্থায় অথবা দগ্ধ বা সিদ্ধ করিয়া তাহারা ইহা আহার করে। অনাবৃষ্টিতে এ গাছের কোন হানি হয় না। ইহাতে পোকা লাগে না। এঙ্গেলার বাজারে এক আনায় পাঁচ সের এই দ্রব্য বিক্রীত হয়।

রোপণ করিবার নিমিত্ত এ গাছের শাখা কোথায় মিলিতে পারে তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। ইণ্ডিয়ান গার্ডিনিং এসোশিয়েসন, বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, এই ঠিকানায় লিখিলে বোধ হয় তাঁহারা যোগাড় করিয়া দিতে পারিবেন। ইংরেজিতে ঠিকানা এইরূপ,—Indian Gardening Association, Bowbazar Street, Calcutta. আমি আপাততঃতিক্ত জাতির চাষ করিতে পরামর্শ দিই না। যিনি কাসাভার চাষ করিতে ইচ্ছা করিবেন, মিষ্ট জাতির শাখার জন্য লিখিবেন। সিঙ্গাপুরের চীনেরা বলে যে মিষ্ট জাতির শাখা যদি উল্টা করিয়া রোপণ করা যায়; তাহা হইলে সে গাছ হইতে তিক্ত আলু উৎপন্ন হয়। এ কথা সত্য উহক আর মিথ্যা হউক সাবধান হইলে কোন দোষ নাই। (বঙ্গবাসী)

আমদানী রপ্তানী—গত বৎসরের জুলাই মাস অপেক্ষা গত জুলাই মাসে কলিকাতা সহরে বিদেশ হইতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার দ্রব্য কম আমদানী হইয়াছে; কাপড়-চোপড় কম আসিয়াছে আড়াই লক্ষ টাকার; খনিজ তৈল কম আসিয়াছে চারি লক্ষ টাকার; তবে চিনি আসিয়াছে বেশী প্রায় চারি লক্ষ টাকার; এ মাসে তামাক—সিগারেটও বেশী আসিয়াছে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ লক্ষ টাকার। এ মাসে সাড়ে পনর লক্ষ টাকার গম এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে; তুলাও সাড়ে সাত লক্ষ টাকার বেশী গিয়াছে; পাট গিয়াছে মোট পোণে পনর লক্ষ টাকার; গত বৎসর জুলাই মাসে কিন্তু পাট রপ্তানী হইয়াছিল সওয়া বার লক্ষ টাকার; পাথুরিয়া কয়লা গিয়াছে ছয় লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকার; গত বৎসরের জুলাই মাস অপেক্ষা অনেক বেশী। এ হিসাবে দেখা যাইতেছে, গত জুলাই মাসে এদেশ হইতে গম, তুলা আর পাট প্রভৃতি অধিক পরিমাই রপ্তানী হইয়াছে। এবার ভারতের অনেক স্থানেই অনাবৃষ্টির ফলে শস্যোৎপত্তির বিশেষ বিঘ্ন সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট কি এই গম প্রভৃতির রপ্তানির দিকে দৃষ্টি রাখিলে ভবিষ্যতে ভাল হইবে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

কার্ত্তিক মাস।

আশ্বিন মাস গত হইলে, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম,

সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপন কার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্থের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুরী, মুগ, তিল, খেঁসারি প্রভৃতি রবিশস্থের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবি ফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে।

সুল্পাদি—সুল্প, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনি ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়।

কার্পাস—গাছ কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে দিয়া রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে।

তরমুজাদি—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়।

উচ্ছে—৪।৪ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪টার অধিক পুঁতিবে না।

পটোল—পটোলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুঁতিবে। পুনঃ পুনঃ খুসিয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট।

পলাণ্ডু—কল সমেত এক একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুঁতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো" হইলে খুঁড়িয়া দিবে।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেত্রের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এত দিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বীজ বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ২।৪ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে।

REGISTERED No. C 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

কার্ত্তিক, ১৩১৮।

REGISTERED No. C

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

দ্বাদশ খণ্ড,—৭ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

কার্ত্তিক, ১৩১৮।

কলকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচীপত্র।

কার্ত্তিক, ১৩১৮ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

কৃষকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

কুচবিহার মহারাজা

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার কুচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর উনপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি বিলাতে অবস্থানকালে পীড়িত হইয়া পড়েন। বিলাতের বেক্সহিল-অন্-সী নামক স্থানে তাঁহার দেহাবসান হয়। ১৮৬২ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৭৮ অব্দে স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্রের দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

মহারাজ ও মহারাণী দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। মহারাজ অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন : ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে পোলোখেলায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসবের সময় তিনি তাঁহার এডিকং হইয়াছিলেন, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উৎসবেও এডিকং নিযুক্ত হন। সম্রাট সেসনে তিনি অনারারী কর্ণেল ছিলেন। তিনি দেশের কৃষির উন্নতি বিধানে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে এবং সুযোগ্য কর্ম্মচারীগণের চেষ্টায় কুচবিহার রাজ্যে কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধন হইয়াছে। ভারতীয় কৃষি-সমিতির (Indian Gardening Association) সহিত তাঁহার অত্যধিক সংস্রব ছিল। ভারতীয় কৃষি-সমিতির কার্য্যে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ১৯০০ অব্দে প্রকাশ্যভাবে উক্ত সমিতির পৃষ্ঠপোষক (Patron) হন, এবং সমিতিকে বহুমূল্য পুস্তকাদি দানে অনেক সময় অনুগৃহীত করিয়াছেন।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ খণ্ড। | কার্ত্তিক, ১৩১৮ সাল। | ৭ম সংখ্যা।

সব্জী চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্রকোলি



বপনের সময়—ভাদ্রের মধ্যকাল হইতে অগ্রহায়ণ

বিশেষ কথা :—"ব্রকোলি" ফুলকপি জাতীয় বিলাতী সব্জী। ফুলকপি অপেক্ষা আকার কিছু ছোট হয়। আস্বাদন ফুলকপির ন্যায়। ইহার চাষের বিস্তৃতি প্রার্থনীয়।

বাঁধাকপি, ব্রকোলি ও ফুলকপি একই জাতীয় উদ্ভিদের কেবল অবস্থান্তর মাত্র। বাঁধাকপির ঘনসম্বদ্ধ পাতাগুলি আহার্য্য। ব্রকোলি বা ফুলকপি বাঁধাকপিরই ফুল। ফুলগুলি যত ঘন, ঠাস্ ও মাংসাকৃতি হইবে, ততই খাইতে

ভাল হয় এবং এই অবস্থায় লোকে ইহা খাইয়া থাকে, ফুলকপি বা ব্রকোলি ফুটিয়া গেলে খাইতে বিস্বাদ হইয়া যায়।

ইহার চাষের জন্য সারবান মৃত্তিকার আবশ্যক। বাঁধাকপির মত হাল্‌কা দোয়াঁস মাটি অপেক্ষা ইহা কর্দ্দমাক্ত দোয়াঁস মাটিতেই ভাল রকম জন্মায়। জমিটি সমতল করিয়া চষিয়া মই দিয়া পরে দেড় বা দুই ফিট গভীর নালা করিয়া তাহাতে প্রচুর গোয়ালের সার দিয়া সেই নালাতে ব্রকোলির চারা বসাইতে হয়। কার্য্যতঃ দেখা যায় ব্রকোলির ক্ষেত সদ্য চষিয়া খুঁড়িয়া চাষ করা অপেক্ষা চাষ দিয়া ফেলিয়া রাখিবার পর মাটি বসিয়া গেলে তারপর নালা কাটিয়া চারা বসাইলে গাছ শীঘ্র তেজ করে। প্রত্যেক নালার ব্যবধান ২ হইতে ৩ ফিট এবং একটি চারা হইতে একটি চারা ২ হইতে ৩ ফিট ফাঁক করিয়া বসাইতে হইবে। ছোট জাতীয় ব্রকোলি হইলে কিছু ঘন ঘন বসান চলে।

কোন কোন চাষী আলু ও কপির একসঙ্গে চাষ করিয়া থাকে। বাঁধাকপির সহিত আলুর চাষ চলে না, কারণ বাঁধাকপির গাছ ব্রকোলি বা ফুলকপি অপেক্ষা বড় এবং তাহার পাতার ছায়ায় আলুর গাছ তেজ করিয়া উঠিতে পারে না। আলু কিম্বা ব্রকোলির চাষ এক সঙ্গে করিতে হইলে একটি নালা অন্তর অন্তর ব্রকোলির চারা বসাইতে হইবে, মধ্যে মধ্যে আলু বসিবে এরূপ স্থলে জলদি জাতীয় ফুলকপি বা ব্রকোলির চাষই বিধি, কারণ কপি উঠিয়া যাইবার পরও আলু কিছু দিন তাহার ডালপালা বিস্তার করিয়া হাওয়া খাইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বংশ বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারে।

আউশ ধান বা পাট কাটিয়া লইয়া সেই ক্ষেতে কপি চাষ করা যাইতে পারে, কিন্তু জলদি কপি জাতীয় কোন শস্যের আবাদ করিয়া লইয়া, তাহাতে আবার ঐ জাতীয় ফসলের আবাদ করা নিতান্ত অসম্ভব ও মূর্খতার পরিচায়ক বলিতে হইবে।

ব্রকোলি যেমন জলদি ও নাবী দুই প্রকারের আছে, তেমনি পার্পল বানাল ও শাদা এই দুই রকমেরও দেখা যায়। সটনের তুষারের ন্যায় শাদা ব্রকোলি প্রসিদ্ধ।

চাষের প্রণালী—বিলাতী ফুলকপির ন্যায়।

বীজের পরিমাণ—বাঁধাকপির অনুরূপ।

পাটনাই ফুলকপি

বপনের সময়—আষাঢ় হইতে আশ্বিন

হিমপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে তুষারপাতের সময় ও খুব বর্ষার সময় বাদ দিয়া সকল সময় কপির চাষ করা যাইতে পারে। ঐ সকল স্থানে ফাল্গুন মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত কপির চাষ হয়।



মার্কিন বা বিলাতী ফুলকপি

মৃত্তিকা। ফুলকপির, বাঁধাকপির ন্যায় দোয়াঁস হাল্কা অথবা আটাল দোয়াঁস মাটির আবশ্যক। চাষের জমি ছায়াযুক্ত স্থানে হওয়া কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

সার। "ঘোড়া"র অথবা "ভেড়া"র সার অভাবে সর্ষপ খৈল সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্ষপ খৈল চূর্ণ করিয়া মাটির সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। ফুলকপিতে কিছু বেশী সারের প্রয়োজন হয়। সার সকল পুরাতন হওয়া আবশ্যক।

বিশেষ কথা। পাটনাই ফুলকপির বীজ বর্ষারম্ভেই বপন করিতে হইলে—অল্পাধিক যত্নাদি আবশ্যক হয়। পাটনাই ফুলকপির বীজ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে কেহ ইহার বীজ উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করে না। বিলাতী ফুলকপির গাছ হইতে এই দেশী ফুলকপির বীজের সৃষ্টি হইয়াছে। পাটনাই ফুলকপির বীজ দেশোৎপন্ন বলিয়া, বিলাতী ফুলকপি অপেক্ষা ইহার চারা ও গাছ এদেশের জলবায়ু অনেকটা সহ্য করিতে পারে। বিলাতী বীজ বর্ষা থাকিতে থাকিতে বপন করিলে যতটা ক্লেশ স্বীকার করিয়া কৃতকার্য্য হইতে হয়—পাটনাই ফুলকপির বীজ ঐ সময়ে বা তৎপূর্ব্বে বপন করিয়া অল্লায়াসে সফল-কাম হওয়া যায়।

বাঙলায় অধিক বর্ষা হয় এবং বর্ষা অধিক সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, সেইজন্য বাঙলায় জলদি কপির চাষ করা অতিশয় কঠিন। শীত অতি অল্পকালই স্থায়ী হয়, সেইজন্য

এতদঞ্চলে কপির বীজ উৎপাদন করাও সুকঠিন। ফুলকপি ফুটিয়া তাহা হইতে শীষ বাহির হইবার ও বীজ উৎপন্ন হইবার সময় থাকে না। শীত থাকিতে থাকিতে বীজ না পাকিলে, গরমের হাওয়া চলিতে আরম্ভ হইলেই গাছ সমেত শুকাইয়া যায়। ভারতীয় কৃষি-সমিতি কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া সাতিশয় যত্ন সহকারে ও বিশেষ সাবধানতার সহিত জলদি ফুল ফুটাইয়া ফুলকপি বীজ উৎপন্ন করিতে পারিয়াছেন। এই বীজ হইতে পাটনার বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বীজ অপেক্ষা উত্তম ফসল হইতেছে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বাঁধাকপি কিম্বা ওলকপির বীজ উৎপাদন করিতে তাঁহারা সমর্থ হন নাই। শীত প্রধান দেশেও কপি বীজ উৎপাদন করারও বিঘ্ন আছে. বিঘ্ন—প্রচণ্ড শীত, তুষারপাতে গাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। প্রবল বায়ুতেও ফসল নষ্ট করে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে পর্ব্বতগাত্রের উত্তর কিম্বা পশ্চিম দিকে ভাল রকম আড়াল না থাকিলে তথায় কপি প্রভৃতির ক্ষেত করা চলে না।

বীজ বপনাদি প্রণালী ও জলসিঞ্চন।—বর্ষার পূর্ব্বে বীজ ফেলিলে—হাপর, চতুর্দ্দিকস্থ জমি অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধহস্ত উচ্চ করিয়া লইতে হয়। সম্মুখে বর্ষা—বর্ষাকালে অজস্র বৃষ্টিপাতে সমস্ত জমি জল-পরিপূর্ণ বা অত্যন্ত ভিজা থাকে। সেরূপ জমিতে চারা অধিককাল বাঁচিতে পারে না। হাপর খুব উচ্চ করিলে—এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। হাপরের মাটি—ধূলির ন্যায় চূর্ণ ও পুরাতন সারযুক্ত হওয়া চাই। হাপরের মাটি যো-যুক্ত অর্থাৎ নাতি ভিজা বা নাতি শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। তৎপরে বীজ পাত্‌লা করিয়া বপন করিতে হয়। সামান্য পরিমাণে চূর্ণ মাটি চাপা দিয়া—হস্ততালু দ্বারা অল্পাধিক চাপিয়া দিলে ভাল হয়। হাপরের মাটি শুষ্ক থাকিলে বীজ বপন করিয়াই জল সিঞ্চন করিতে হয়। মাটি ভিজা থাকিলে জল দেওয়া আবশ্যক করে না। বীজ বপন করিয়াই—বাঁধাকপি প্রবন্ধে যেরূপ "ঢাকা" বা "ছাউনির" কথা বলা হইয়াছে—সেইরূপ "ছাউনি" প্রস্তুত করিয়া হাপরের উপরে ঢাকা দিতে হইবে। যেরূপ ভাবে বাঁধাকপির চারা প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে—সেইরূপ ভাবে ইহারও চারা প্রস্তুত করিতে হয়। পাটনাই ফুলকপি সম্বন্ধে এইমাত্র বিশেষ বক্তব্য যে—ইহা দেশীয় জলবায়ু সহ্য করিতে পারে বলিয়া—চারা অনাবৃত থাকিলে—মুষলধারে বৃষ্টি না হইলে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না। অতএব মুষলধারা বৃষ্টি হইতে এবং প্রখর রৌদ্র হইতে চারা রক্ষা করিবার সময় ভিন্ন ঢাকা দেওয়ার আবশ্যক হয় না। চারা, চারি বা পাঁচটী পত্রযুক্ত হইলে—"হাপরে"র ন্যায় প্রস্তুত, অন্য একখণ্ড জমিতে তিন বা চারি ইঞ্চি পৃথক বসাইতে হয়। সেই স্থলে চারা আরও কিছু বড় হইলে পুনরায় সারযুক্ত অন্য জমিতে ছয় বা সাত

ইঞ্চি অন্তর বসাইতে হয়। এখানে চারা অপেক্ষাকৃত আরও বড় হইলে চাষের জমিতে পুতিয়া দিতে হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ নাড়ানাড়ির অভিপ্রায় এই যে, এরূপ করিলে ফুলকপির পাতা খুব বড় হইতে পায় না, গাছে শীঘ্র ফুল দেখা দেয়, এবং ফুলের আকার বৃহৎ হয়।

বাঁধাকপির চাষের জমির ন্যায়—ফুলকপির চাষের জমি প্রস্তুত করিতে হয়। এতদ্বিষয় বাঁধাকপির অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ফুলকপির চাষে সার ও জলসিঞ্চন অধিক পরিমাণে আবশ্যক হয়। কোন সময়ে জলাভাব না হয়—সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। চাষের জমিতে চারা বসাইয়া—আবশ্যক হইলে (বাঁধাকপির ন্যায়) যে ঢাকা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। চাষের জমিতে চারা সকল এক হাত হইতে দুই হাত পর্য্যন্ত বসাইতে হয়। প্রত্যেক চারা এক হাত অন্তর বসাইলে—প্রত্যেক লাইন বা সারি দেড় হাত অন্তর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অবশিষ্ট কার্য্য।—গাছের গোড়ায় পার্শ্ব হইতে অল্পাধিক মাটি দেওয়া—মধ্যে মধ্যে মাটির যো-যুক্ত অবস্থায় গাছের গোড়া খুসিয়া দেওয়া এবং আগাছা জন্মাইলে তুলিয়া ফেলা ভিন্ন আর কিছুই করিতে হয় না। গাছের গোড়ার মাটি খুসিয়া দেওয়া—অতি আবশ্যকীয় কার্য্য। ইহা আলস্য বশতঃ না করিলে গাছ সতেজ হইতে পায় না ও কাজেই কপির আকার ক্ষুদ্র হয়। আবশ্যক হইলে ফুলকপির ক্ষেতে দুই বা ততোধিক বার জল সিঞ্চন করিতে হয়, প্রত্যেকবার জল সিঞ্চনের পর গোড়া খুসিয়া দিয়া শিকড়ে হাওয়া লাগিবার ব্যবস্থা না করিলে কপি আদৌ বাড়ে না বা নিরেট হয় না।

বিশেষ কথা।—পাটনাই ফুলকপি দুই প্রকারের আছে, জলদি ও নাবী। জলদী পাটনাই কপির বীজ শ্রাবণ ভাদ্রে বপন করিতে হয়। নাবী পাটনাই ফুলকপির বীজ আশ্বিনের শেষে বা কার্ত্তিক মাসে—যে সময়ে বিলাতী ফুলকপির বীজ ফেলিতে হয়, সেই সময় বপন করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। কিন্তু অধিক বিলম্বে বপন করিলে কেবল গাছই জন্মে—ফুল ধরে না। ফুল ধরিলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অপকৃষ্ট হয়।

বীজের পরিমাণ—বাঁধাকপির অনুরূপ বা কিঞ্চিৎ অধিক।

বিলাতী ফুলকপি

বপনের সময়—ভাদ্রের মধ্যকাল হইতে অগ্রহায়ণ

মৃত্তিকা ঃ—ছায়াবিহীন শক্ত অথবা হাল্কা দোয়াঁস মাটি।

সার ঃ—সম্পূর্ণরূপে সারে পরিণত "ঘোড়া"র সার বা "ভেড়া"র সার—অভাবে চূর্ণ সর্ষপ খৈল বা মিশ্রসার। কোন বিশেষ সারের অভাব হইলে—আবশ্যক

মত মিশ্র-সার প্রয়োগে সকল প্রকার বিলাতী বা দেশী সব্জী চাষে পূর্ণ-মনোরথ হওয়া যায়। সার জমির সহিত যে বিশেষরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে—সে কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

বপনাদি প্রণালী:—বর্ষা শেষে বিলাতী ফুলকপির বীজ বপন করিতে হয়। বর্ষা শেষের অনতিপূর্ব্বেও বপন করা চলে। বর্ষা ধরিয়া যাইলে—বীজ বপন করিয়া চারা প্রস্তুত করিতে অতিরিক্ত যত্নের দরকার হয় না। চারা হাপরে প্রস্তুত করিয়া, পাটনাই ফুলকপির ন্যায়—বার দুই "হাপরে"র ন্যায় প্রস্তুত অন্য জমিতে পুনঃ পুনঃ নাড়ানাড়ি করিয়া বসাইয়া—পরে চাষের জমিতে এক হাত হইতে দুই হাত অন্তর পুতিয়া জলসিঞ্চন করিতে হয়। বাঁধাকপির জমি যেরূপে প্রস্তুত করিতে বলা হইয়াছে, বিলাতী ফুলকপির জমি তদনুরূপ প্রস্তুত করিতে হয়। চারা হাপরে বসাইয়া প্রথম দুই তিন দিবস প্রখর রৌদ্রতাপ হইতে এবং হঠাৎ বৃষ্টি হইলে বৃষ্টিপাত হইতে ঢাকা দিয়া রক্ষা করিতে হয়। কিরূপ ভাবে হাপর আবৃত করিতে হইবে—তাহা "বাঁধাকপি" প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে।

অবশিষ্ট কার্য্য—পাটনাই ফুলকপির ন্যায়।

বীজের পরিমাণ—বাঁধাকপির অনুরূপ।

ফুলকপির অনেক নাম আছে। অনেক স্থলে সেগুলি একই প্রকার ফুলকপির নামান্তর মাত্র। তাহার মধ্যে এমেরিকান নাবী আলজিয়ার্স, জলদি স্নোবল, ভীচের অটামজয়েণ্ট, ফ্রেঞ্চ ওয়ালচার্ন, আর্লি লণ্ডন প্রভৃতি কতকগুলি স্বনাম খ্যাত এবং নিজ নিজ বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছে।

কপি চাষ সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, ইহা গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালের চাষ নহে। ইহা হৈমন্তিক কালের খন্দ। শিশিরেই ইহা পরিপুষ্ট হয়। হিম শিশিরের আবশ্যক বটে, কিন্তু অত্যন্ত ঠাণ্ডা জায়গায় যেখানে তুষার পড়ে এমন জায়গায় হয় না। এই জন্য ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে বা হিমালয়ের খুব উঁচুতে সকল জায়গায় ইহার চাষ করা সম্ভব নহে। অল্লাধিক শীতপ্রধান স্থানে কোথাও কোথাও কপিক্ষেতের মাঝে মাঝে আলো জ্বালিয়া ক্ষেত একটু গরম করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয়।

কপি চাষ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য—

বাঁধা, ফুল কিম্বা ওলকপি, যে কপির চাষ করা হউক না, উপযুক্ত মৃত্তিকা নির্ণয় ও যথাযোগ্য সার প্রয়োগের উপর কপি চাষের ফলাফল নির্ভর করে। এক একর, বাঙলায় কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা জমিতে ১০০ শত পাউণ্ডের উপর পটাস সার, ১০০ পাউণ্ড গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক অম্ল এবং কমবেশী ৫০ পাউণ্ড

নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করিতে হয়। বাঙলা দেশের কর্দ্দমাক্ত মাটিতে পটাস যথেষ্ট আছে। সেই জন্য পটাস সার দিবার জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হয় না। কিন্তু যে মাটিতে পটাস পর্য্যাপ্ত মাত্রায় নাই, সেখানে খনিজ পটাস বা ভস্ম ব্যবহার করা হয়। নাইট্রোজেনের জন্য খনিজ সার সোরা কিম্বা গোময় ও খৈল এবং ফস্ফরিক অম্লের জন্য বাঙলায় হাড়চূর্ণ বা হাড়ভস্ম ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। জাপানী চাষীরা কপিক্ষেতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মনুষ্য মল ব্যবহার করিয়া থাকে। সারের বিশেষ ব্যবহার জানিবার জন্য কৃষি-রসায়ন দ্রষ্টব্য।

ওলকপি



বপনের সময়—ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ

মৃত্তিকা ঃ—হাল্কা দোয়াঁস মাটি। অল্লাধিক ছায়াযুক্ত স্থানে ওলকপি হইতে দৃষ্ট হয়।

সার ঃ—"ভেড়া" প্রভৃতির সার অথবা গোবর বা মিশ্র-সার। খৈলও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বপনাদি প্রণালী ঃ—ওলকপির চাষে বিশেষ যত্ন করিতে হয় না। ইহার চাষে অন্যপ্রকার কপি চাষ অপেক্ষা বিঘ্ন অনেক কম। ইহা সহজে জন্মে।

হাপরে চারা প্রস্তত করিয়া, পরে চারা তিন চারি ইঞ্চি বড় অথবা পাঁচ বা ছয়টী পত্রযুক্ত হইলে—চাষের জমিতে বসাইতে হয়। "বাঁধাকপি" প্রবন্ধে হাপরে চারা প্রস্তত কার্য্য যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—সেইরূপ করা বাঞ্ছনীয়। চাষের জমিতে একেবারেও বীজ বপন করা যাইতে পারে।

সারাদি প্রয়োগে, চাষের জমি রীতিমত প্রস্তত করিয়া ঢেলাবিহীন করিতে হইবে। চাষের জমিতে একেবারে বীজ বপন করিলে—লাইনবন্দী করিয়া বীজ ফেলিতে হইবে। প্রত্যেক লাইন এক ফুট অন্তর হইবে। ঐ লাইনে খুব পাত্‌লা পৃথক পৃথক বীজ বপন করিয়া যাইতে হইবে। আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে জলসিঞ্চন করিয়া চারা নির্গত হইলে—প্রত্যেক চারা নয় বা দশ ইঞ্চি তফাৎ রাখিয়া অবশিষ্টগুলি তুলিয়া ঐরূপ তফাতে অন্য স্থানে বসাইলে চলিবে। হাপর হইতে চারা তুলিয়া ঐরূপ তফাতে লাইনবন্দী করিয়া চাষের জমিতে বসাইতে হয়। চাষের জমিতে একবারে বীজ বসাইতে হইলে, বাঙলাদেশে বর্ষা শেষ ভিন্ন বীজ বপন করা চলে না। মুষলধারে বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা থাকিলে—পরিশ্রম ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা।

অবশিষ্ট কার্য্য ঃ—গাছের মূলদেশের মাটি, খুসিয়া দেওয়া, আগাছা উত্তোলন করা ভিন্ন আর কিছু করিতে হয় না।

বিশেষ কথা ঃ—ওলকপি "ক্রিকেট বলে"র ন্যায় আকার-বিশিষ্ট অবস্থায় খাইতে অতি উপাদেয় লাগে। বড় হইয়া যাইলে শক্ত হয় ও ছাল বাদ দিয়া খাইতে হয়, কিন্তু তত সুমিষ্ট লাগে না। ওলকপি শালগমের অপেক্ষা তেজস্কর খাদ্য।

বীজের পরিমাণ—বাঁধাকপির অনুরূপ।

ওলকপি, বাঁধাকপি অপেক্ষা আরও কম ব্যবধানে বসান যাইতে পারে। একরে ১৫০০০ গাছ বসাইলে বীজের পরিমাণ কিছু বাড়ান উচিত। একরে ৪ আঃ বীজের অধিক কখনই আবশ্যক হয় না। কেবলমাত্র তেজস্কর বাছাই করিয়া চাষ করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক পরিমাণ বীজ বপন করাই বাঞ্ছনীয়।

ওলকপি দুই রকমের আছে—সাদা ও লাল। দুই প্রকার ওলকপির আস্বাদন একই—কেবল রঙের তফাৎ মাত্র।

গম

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

১। দাহ্যগুণ—

শ্বেতসার ও শর্করা শতকরা	...	৬৭—৭৬ ভাগ
তৈল ...	...	১½— ২ ,,
সূত্র ...	...	১½— ৩ ,,

২। মেদকারিতাগুণ—

প্রোটিড্ শতকরা	...	৮—১২ ভাগ
ভস্ম ...	...	২— ৩ ,,

গম আমাদের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য। ভারতবর্ষের বহুস্থলে এবং অন্যান্য বহুদেশে, বাঙলাদেশে চাউলের ন্যায় গম সর্ব্বপ্রধান খাদ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। আমাদের শরীর ধারণ করিতে যে পরিমাণে পুষ্টিকর পদার্থের প্রয়োজন, তাহা গমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঁওরুটী লঘু পথ্য। কিন্তু চাপাটী পরিপাক করা সুকঠিন। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থলে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তথায় চাপাটী সহজে পরিপাক হয় না।

গম প্রধানতঃ চারি প্রকার—যথা—

(১) নরম শাদা গম, যথা—দুধিয়া

(২) শক্ত শাদা গম, যথা—দুধিয়া ও বড় গহমা

(৩) নরম লাল গম, যথা—লালকা

(৪) শক্ত লাল গম, যথা—দেশী বাখেরী

নরম গমে উৎকৃষ্ট লুচী প্রস্তুত হয়।

কিন্তু শক্ত গম দ্বারা উৎকৃষ্ট পাঁওরুটী, চাপাটী ও সুজী প্রস্তুত হয়। নরম গমে সুজী হয় না। ইউরোপে এক্ষণে শক্ত গমের খুব আদর হইতেছে এবং তথায় এক্ষণে শক্ত গমের মূল্যও অধিক। শক্ত লাল গমের আটা, শাদা গমের মত শাদা হয় না।

গম পিষিয়া কাপড়ে অথবা খুব সরু চালনীতে ছাঁকিলে যে মিহি গম চূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে ময়দা বলে। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহার চোকর বাদ দিলে

আটা থাকে। মোটা আটাই সুজী। গম পিষিয়া ময়দা বা চোকর বাদ না দিলে তাহাকেও আটা বলে। যে আটার চোকর বাদ না দেওয়া যায় তাহা আহার করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে চোকর বাদ দেওয়াই উচিত। চোকর বাদ দিলে যে আটা প্রস্তুত হয়, তাহা দ্বারা উত্তম পাঁওরুটী প্রস্তুত হয়।

গম ধৌত ও শুষ্ক করিয়া কাঁকর প্রভৃতি আবর্জ্জনা ফেলিয়া পেষণ করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট আটা বা ময়দা প্রস্তুত হয়।

এইরূপ উৎকৃষ্ট আটা কিম্বা ময়দা বাজারে দুর্ঘট, এই জন্য ঘরে আটা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। বাজারের ময়দা, কিম্বা সুজীতে প্রায় কাঁকর চূর্ণ কিম্বা বালি প্রভৃতি আবর্জ্জনা মিশ্রিত থাকে।

গম তিন মাসের পুরাতন হইলেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। ময়দা কি আটা ১৫ বা ১৬ দিনের অধিক ভাল থাকে না। পোকা লাগা গমের আটা নিকৃষ্ট। ক্রয়কালীন ক্রেতা দেখিবেন যে,—গম

(১) শাদা কি লাল গম

(২) নরম কি শক্ত গম। (দাঁতে কাটিয়া পরীক্ষা করা যায়।)

(৩) পোকায় ধরা কি না (পোকা ধরা গমের আটা বা ময়দা তিক্ত।)

(৪) আবর্জ্জনা আছে কি না। আবর্জ্জনা থাকিলে তাহার পরিমাণ।

(কাঁকর কিম্বা বালি থাকিলে চালনি দ্বারা চালিয়া লইতে হয়।)

আটা, ময়দা ও সুজী—

১। কাঁকর চূর্ণ কিম্বা বালি মিশ্রিত কি না? দাঁতে কাটিয়া পরীক্ষা করা যায়।

২। পোকায় ধরা কি না?

৩। নূতন কি পুরাতন। বহুদিনের পেষা আটা কিম্বা পোকা লাগা গমের আটা তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট হয়। (জিহ্বায় দিয়া পরীক্ষা করা যায়।)

৪। চোকর মিশ্রিত কি না।

পাঁওরুটী

পাঁওরুটী খরিদকালে দেখিতে হইবে যে, ইহা টিপিয়া ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্ববৎ আকৃতি প্রাপ্ত হয় কি না। যদি তাহা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে রুটী ভালরূপ প্রস্তুত হয় নাই।

প্রস্তুত প্রণালী—

চাপাটী—এক সের আটায় এক তোলা লবণ দিয়া উত্তমরূপে মাখিতে হয়। ঢেলা করিয়া এইরূপ আটা বা সুজী অর্দ্ধ ঘণ্টা ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া পুনরায় ঐ ঢেলা ভাঙ্গিয়া রুটী প্রস্তুত করিলে ইহা দ্বারা লঘুপাচ্য চাপাটী প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ ঢেলা করিয়া সিদ্ধ করার প্রথা নাই। আটা জলে মাখিয়া বেলনীতে

বেলিয়া চাপাটী প্রস্তত করা হয়। চাপাটী প্রথমতঃ চাটুতে অগ্নির তাপে উত্তপ্ত করিয়া চিমটে দ্বারা ধরিয়া অগ্নির মধ্যে দিতে হয়, যখন ঐ রুটী ফুলিয়া উঠে, তখন ইহা প্রস্তত হয়। অলন্ত অগ্নির মধ্যে না দিয়া কাঠ কয়লার অগ্নির উপর এপিঠ ও ওপিঠ রাখিয়া রুটী ফুলিতে দিলে রুটী ভালরূপ সিদ্ধ হয়। অলন্ত অগ্নির মধ্যে রুটী অতি ত্বরায় প্রস্তত হয় বলিয়া ইহা সুসিদ্ধ হয় না।

লুচী।—এক সের ময়দায় সাধারণতঃ এক ছটাক ঘৃত ও এক তোলা লবণ দিয়া ভালরূপ মাখিতে হয়। তৎপরে বেলনীতে বেলিয়া উত্তপ্ত ঘৃতে ভাজিতে হয়। সেরকরা আধ সেরের কিছু অধিক ঘৃতের প্রয়োজন হয়।

পাঁওরুটী।—সাত সের ময়দায় এক ছটাক লবণ মিশ্রিত করিতে হয়। এক সের ঈষদোষ্ণ জলে এক ছটাক ঈষ্ট (ডাক্তার খানায় প্রাপ্তব্য) যোগ করিয়া মিশ্রণ প্রস্তত করিতে হয়। এই মিশ্রণ ঐ ময়দার ভিতরে ঢালিয়া উত্তমরূপে মাখিতে হয়। মাখা শেষ হইলে কাপড় দিয়া এক ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে ঐ ময়দা ফুলিয়া উঠে। তৎপর পুনরায় ইহাকে উত্তমরূপে মাখিতে হইবে। মাখা হইলে অর্দ্ধ সের বা এক পোয়া পরিমাণের ছোট ছোট তাল করিয়া ১০ কিম্বা ১৫ মিনিট অগ্নির তাপে রাখিতে হইবে। এই জন্য বিশেষ প্রকার চুলী প্রস্তত করিতে হয়।

এতদ্দেশীয় বেকারগণ * ঈষ্টের পরিবর্ত্তে তাড়ি মিশ্রিত করে। তাড়িতেও ঈষ্ট থাকে কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ নহে। ঈষ্টের সহিত জলের বদলে দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। ঈষ্ট ব্যতীতও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাঁওরুটী প্রস্তত হইতে পারে। এক সের ময়দায় ৩ তোলা চিনি ও ছয় আনা পরিমাণ সোডা দিয়াও পাঁওরুটী প্রস্তত করা যায়। ময়দার যতপ্রকার খাদ্য প্রস্তত হয় তন্মধ্যে পাঁওরুটী সর্ব্বাপেক্ষা লঘু খাদ্য।

যব

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

১। দাহগুণ—

শ্বেত সার ও শর্করা শতকরা		...	৭২ ভাগ
তৈল	...	...	২ „
সূত্র	...	...	৩ „

২। মেদকারিতা গুণ—

প্রোটিড্ শতকরা	...	...	৬½ ভাগ
ভস্ম	...	...	১½ „

* পাঁউরুটি প্রস্তত-কারকগণকে ইংরাজী ভাষায় Bakers (বেকার) বলে।

গম অপেক্ষা যব নিকৃষ্ট খাদ্য

উত্তমরূপে চোকর ফেলিয়া চূর্ণ করিলে যব অতিশয় লঘু পথ্য হয়। কিন্তু ইহার চোকর অতিশয় অপকারী। যবের আটায় রুটী প্রস্তুত হয় না। কিন্তু গরীব লোক ইহাদ্বারা চাপাটী ও ছাতু প্রস্তুত করিয়া গ্রহণ করে। বিলাতে কল দ্বারা চোকর কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, তৎপরে যব চূর্ণ করে। এই যব চূর্ণ রোগীর পথ্য। চোকর ছাড়ান যবের দানা সিদ্ধ জলে স্নিগ্ধকারী ও রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

যব জলে ভিজাইয়া ঢেঁকিদ্বারা চোকর ছাটিয়া ফেলিতে পারা যায়। তাহার পর যব ভাজিয়া ছাতু প্রস্তুত করা যায়। যবের ছাতু এতদ্দেশে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ক্রেতার জ্ঞাতব্য বিষয়

১। ইহাতে কাঁকর আবর্জ্জনা আছে কি না। থাকিলে তাহার পরিমাণ।

২। বীজ হাল্কা কিম্বা ভারী। এক মুষ্টি বীজ লইয়া মুষ্টির মধ্যে অনুভব করা যায় যে বীজ হাল্কা কিম্বা ভারী। ভারী বীজই উত্তম।

৩। বীজের বর্ণ টাট্কা হওয়া উচিত।

৪। পোকা ধরা কি না।

মকাই

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

১।	শ্বেত সার ও শর্করা শতকরা		...	৭১½ ভাগ
	তৈল	...	...	৫ „
	সূত্র	...	...	১½ „
২।	মেদকারিতা গুণ			
	প্রোটিড্ শতকরা		...	৯½ ভাগ
	ভস্ম	...	...	১¼ „

কোন কোন স্থলে মকাই প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। গরিব লোকেরা মকাইর ভাত, ভাঙ্গা, ও ছাতু করিয়া গ্রহণ করে। মকাই চূর্ণের সহিত গমের আটা মিশ্রিত করিয়া চাপাটী প্রস্তুত হয়। মকাই গমের মত পুষ্টিকারক এবং ইহা বিলক্ষণ তৈলাক্ত, এইজন্য মকাই লঘুপথ্য নহে। মকাই উত্তম রূপে পেষণ করিলে সুপথ্য হয়।

ক্রেতার জ্ঞাতব্য বিষয়

১। ইহাতে আবর্জ্জনা আছে কি না।

২। বীজ হাল্কা কি ভারী।

৩। বীজ পোকায় ধরা কি না।

৪। বীজের বর্ণ টাটকা কি না।

দেওধান বা যুয়ার বা গহমা

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

১। দাহ্যগুণ

শ্বেতসার ও শর্করা শতকরা		...	৭০—৭৩ ভাগ
তৈল	...	...	৩½—৪½ „
ভস্ম	...	...	— ১ „

২। মেদকারিতা গুণ

প্রোটিড্ শতকরা		...	৮—১২ ভাগ
ভস্ম	...	...	২ „

নাগপুর, মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের অধিকাংশ স্থলে দেওধান প্রধান খাদ্য। দেওধান গমের মত পুষ্টিকারক এবং ইহা মকাইর মত তৈলাক্ত। এইজন্য লঘু পথ্য নহে। দেওধানের আটার চাপাটী প্রস্তুত হয়। বিহারের গরিব লোকেরা দেওধানের ভাত ও আহার করে। ইহাতে খৈ ও হয়। মকাইর দেওধানের খৈ ধানের খৈর মত মোলায়েম হয় না। এতদ্দেশে দেওধানের কাঁচা গাছ গরুর প্রধান খাদ্য।

ক্রেতার জ্ঞাতব্য বিষয়

১। ইহাতে আবর্জ্জনা আছে কি না।

২। বীজ হাল্কা কি ভারী।

৩। বীজ পোকা ধরা কি না।

দাড়িম্ব

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত

দাড়িম্ব অতি উৎকৃষ্ট ফল, এবং গাছ ও দেখিতে বড় সুন্দর, গাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা আছে, ইহার মূল, ত্বক, পত্র, ফল সমস্তই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এজন্য উদ্যানে রোপণ করা ব্যতীত প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেও এই গাছ জন্মান কর্ত্তব্য। পাটনা অঞ্চলের দাড়িম্ব অপেক্ষাকৃত বড় ও উৎকৃষ্ট। আরব ও আফগানিস্থানের দাড়িম্ব বিশেষ বিখ্যাত, বাজারে বেদানা নামে যে দালিম বিক্রয় হয় তাহা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও আফগানিস্থান হইতে আমদানী, এতাদৃশ ডালিম ভারতের অন্যত্র কোথাও জন্মে না।

যে দোয়াঁস মৃত্তিকায় আঁটাল মাটীর ভাগ বেশী, তাহাতেই দাড়িম্বের গাছ ভাল জন্মে। গাছের গোড়ায় বেশী রস সঞ্চিত থাকিলেই ফল মন্দ হয়, এজন্য পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অপেক্ষা একটু উচ্চস্থানে চারা রোপণ করা কর্ত্তব্য। বীজ রোপণ করিয়া অথবা গুল কলম করিয়া ইহার চারা প্রস্তুত হয়। বীজের চারা উৎপাদন জন্য বড় ও নিখুত সুপক্ক ডালিমের বীজ মনোনীত করিবে, বীজের চারা ও কলমের চারা উভয়ই রোপিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে কলম করিলে শীঘ্র শিকড় গজাইয়া নূতন চারা প্রস্তুত হয়, অথচ বেশী পরিশ্রমের আবশ্যক হয় না। বীজ রোপণ করিয়া চারা জন্মাইতে হইলে মৃত্তিকাপূর্ণ পাত্রে পক্ক ডালিমের বীজ টাটকা অবস্থায় রোপণ করিবে। মৃত্তিকা নীরস বোধ হইলে মধ্যে মধ্যে জল দিবে তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই অঙ্কুর উদ্গত হইয়া চারা জন্মিবে। চারা কিছু বড় হইয়া উঠিলে উপযুক্ত স্থানে স্থায়ী রূপে রোপণ করিবে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে গাছের গোড়া খুড়িয়া শিকড়ে রৌদ্র বাতাস লাগাইবে। ১২।১৪ দিন পরে কিছু সার মিশ্রিত নূতন মৃত্তিকা দ্বারা পুনরায় গোড়া ঢাকিয়া দিবে, ইহাতে গাছের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে।

প্রায়ই ২।৩ বৎসরের গাছ হইলেই ফল ধরিতে আরম্ভ করে ; ডালিমের পুরাতন ও শুষ্কপ্রায় ডালগুলি কাটিয়া দিলে নূতন ফেকড়ি গজাইয়া বৃক্ষকে সুশোভিত করে, এবং তাহাতে ফলও বেশী হয়। ফলের প্রধান শত্রু কীট, অনেকে বলেন ফলের মস্তকে যে ফুল থাকে তাহাতেই কীটের সঞ্চার হয়, তাহা ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে পোকা কম ধরে। এই কথা নিতান্ত অলৌকিক বলিয়া বোধ হয় না। ঐরূপ বান্ধিয়া রাখায় আর একটী গুণ এই, উহাতে ফল বড় হয়, বান্ধিবার সময় ফল বৃদ্ধির সুবিধা থাকার জন্য উপযুক্ত রূপে ঢিলা রাখিতে হইবে, আরও শুনিতে পাওয়া যায়, বৃক্ষের মূল অধিক নিম্নে প্রবেশ করিলে ফলে কীট জন্মে, এ নিমিত্ত মৃত্তিকার কিছু নিম্নে টালি পাতিয়া তদুপরি চারা রোপণ করিতে কেহ কেহ পরামর্শ দেন। কিন্তু ফলে পোকা ধরার এই কারণ কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা আমরা বলিতে পারি না। ডালিম গাছের ভাসা শিকড়ই হইয়া থাকে, টালি না দিলেও ইহার শিকড় অধিক মৃত্তিকার নিম্নে যায় না।

যে জমিতে দালিম গাছ রোপণ করা হইবে তাহার নিম্নস্তর বালুকাময় হইলে জমির অতিরিক্ত জল এই বালিতে শোষিত হয়। বালুকাস্তরে চারিদিক হইতে জল শোষিত হয় বলিয়া বালুকাস্তরটি স্বভাবতই আর্দ্র থাকে। এই কারণে বালুকাস্তরের উপর মৃত্তিকার স্তরগুলি নাতি আর্দ্র, নাতি শুষ্ক অবস্থায় পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আর্দ্রতাবিহীন স্থান ভিন্ন দালিমের বাগান করা চলে না। কিন্তু নিম্নবঙ্গে এরূপ স্থান অতীব বিরল ও অধিকাংশ জায়গাই বৎসরের অধিকাংশ সময় অত্যন্ত আর্দ্র থাকে। এই কারণে বাঙলার দালিম বাগান লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা কম। পাটনা, উত্তর পশ্চিম ও হিমালয়ের পার্ব্বত্য ভূমি হইতে কলিকাতা ও বাঙলার অন্যান্য সহর বাজারে দালিম প্রতিনিয়ত আমদানী হইয়া অত্রত্য অধিবাসীগণকে দালিম বেদানার রসাস্বাদনে তৃপ্ত করিতেছে।

আমাদের বাগানে আম, কাঁটাল, জাম, জামরুল, গোলাপজাম থাকিলেও আমরা দালিম গাছের জন্য বড় দুঃখিত কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, বেদানার মত বলকারক ফল খুবই বিরল। টাইফয়েডাদি জ্বর রোগে দালিম বেদানা আহার ও ঔষধ, রক্তামাশয় রোগ নিবারণে ডালিমের রস ও দালিম পাতার রস আশু ফলপ্রদ। অধিকন্তু তেল চকচকে সরু সরু পাতার মাঝখান হইতে যখন দালিমের লাল ফুলগুলি ফুটিয়া উঠে তখন বাগানের শোভা শতগুণ বৃদ্ধি হয়। হিন্দু চিকিৎসাশ্রমে দালিমের নানাগুণ বর্ণিত আছে, হিন্দুর পূজা ও ব্রতাদিতেও দালিমের আবশ্যক, দালিম কবিগণেরও চোখ এড়াইতে পারে নাই এই সকল নানা কারণে বাগানের একোনে, ওকোনে এক একটা দালিম গাছ থাকা ভাল।



কার্ত্তিক, ১৩১৮ সাল।

ক্ষেত্রজাত বীজ

উদ্ভিদ শাস্ত্রে শস্যের সারভাগই বীজ নামে অভিহিত। বীজের অভ্যন্তরে ভবিষ্যত তরুলতার অঙ্কুর নিহিত থাকে এবং সেই অঙ্কুরটি বৃক্ষোৎপাদন উপযোগী উপাদানে আবৃত থাকে। ইহার উদাহরণ ধান, যব, কলাই প্রভৃতি বীজ শস্য, এবং আম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের অভ্যন্তরের বীজ বা আঁটি। কৃষিতত্ত্বে কিন্তু বীজের আখ্যান সতন্ত্র। যাহাদ্বারা নূতন তরু লতার উৎপত্তি হয় তাহাই বীজ যেমন কন্দ মূলও বীজ, কাণ্ড বা শাখাও বীজ; রাঙা আলু, গোল আলু ও হলুদের মূলও বীজ, আখের টুক্‌রাও বীজ, শিমুল আলুর শাখা খণ্ডও বীজ। উদ্ভিদ জীবনের বংশ বৃদ্ধি করিবার জন্য উদ্ভিদের যে কোন অংশ ব্যবহৃত হয় তাহাই কৃষকের নিকট বীজ বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

বীজের একটি সাধারণ ধর্ম্ম আছে। তাহারা নিজ মাতার অনুরূপ শাখা, পল্লব ও ফল প্রসবে প্রয়াসী হয়। আখের অগ্রভাগ দ্বারা ইক্ষু উৎপাদন বা আলু হইতে আলুর বৃদ্ধি করিতে কৃষককে কোন প্রকার বাধা পাইতে হয় না। কেন না সেই বীজগুলি ভাল হইলে স্বভাবতঃই ভাল শস্য উৎপন্ন হইবে। কিন্তু ধান যব প্রভৃতি শস্যের বীজ লইয়া একটু গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই সমুদয় বীজ স্ত্রী ও পুং পুষ্পের সংসর্গে উৎপন্ন হয় সুতরাং ইহাদের পিতা এবং মাতা ভাল হইলে তবে ভাল বীজ হয়। উভয়ের মধ্যে কোনটি খারাপ হইলে বীজও খারাপ হয়। এই হেতু দেখা যায় যে, ক্রমান্বয়ে নির্ব্বাচন এবং ভাল রূপ সংসর্গের (Crossing) ব্যবস্থা করিতে পারিলে তবে ভাল বীজ এবং নানাপ্রকার, নূতন ও উন্নত জাতীয় বীজ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়।

লম্বা কুমড়ার ফুলের সহিত গোল কুমড়ার ফুলের সংসর্গ ঘটাইতে পারিলে চেপ্টা অর্দ্ধ গোলাকার নিরেট কুমড়া উৎপন্ন করা বিচিত্র নহে। লেঙড়া ও বোম্বাই আমের স্ত্রী ও পুং পুষ্পের সঙ্গম ঘটাইলে লেঙড়া ও বোম্বাই আমের গুণ বিশিষ্ট এক জাতীয় আম সহজেই উৎপাদন করা যাইতে পারে।

সুবীজের বিশেষ গুণ নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হয় যে, তাহা সহজে অঙ্কুরিত হইবে এবং তাহা হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ সতেজ হইবে। সকল বীজই অঙ্কুরিত হয় না। বীজ নূতন না হইলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না। এবং বীজ সুপুষ্ট ও সুপক্ক না হইলে তাহাতেও গাছ জন্মায় না। যদিও কখন কখন পুরাতন বীজ হইতে গাছ জন্মিতে দেখা যায় কিন্তু. সে গাছ খুব নিস্তেজ হয়। অপরিপুষ্ট বীজ খুব কম কিম্বা আদৌ অঙ্কুরিত হয় না। শস্য আহরণ করিবার পর হইতে কিছু কাল পর্য্যন্ত অঙ্কুরের জীবনীশক্তি বাড়িতে থাকে এবং অক্ষুণ্ণ থাকে কিন্তু তাহার পর হইতে ঐ শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায় সুতরাং বীজ সময়ে উপ্ত না হইলে তাহাতে গাছ হইবে না। প্রায় সকল বীজই এক বৎসরের পুরাতন হইলেই তাহার জীবনী শক্তি চলিয়া যায়।

বীজে কোন প্রকার পোকা না লাগে এইজন্য খুব সতর্ক হইতে হয়। ইহার কারণ আর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবে না। যদি কেহ কোন ছত্রক রোগাক্রান্ত বীজ বপন করে, তবে তাহার ফসলে ছত্রক রোগ দেখা দিবে এবং ফসল পর্য্যাপ্ত মাত্রায় উৎপন্ন হইবে না। যদি বীজ কোন প্রকার কীটাক্রান্ত হয় তবে সে বীজ হয়ত অঙ্কুরিত হইবে না। জীবাঙ্কুর হয়ত কীট খাইয়া ফেলিয়াছে. কিম্বা সকল সময় যদিবা অঙ্কুরটি খাইয়া না ফেলে, কীটদষ্ট বীজ যদি বা অঙ্কুরিত হইল, অঙ্কুরের প্রথমাবস্থায় পরিশোষণকারী সঞ্চিত খাদ্য কীটে খাইয়া রাখিয়াছে, সেইজন্য অঙ্কুরিত গাছ যে হীনবল হইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুড়ঙ্গকারী পোকা ধরা বীজ-ইক্ষু লইয়া ইক্ষু চাষ করিলে ফসলের অনিষ্ট-কারী কি ভয়ানক শত্রুকে আমরা আশ্রয় দিলাম এ কথা একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

ঝাড়া বাছা বীজ ব্যবহার করিতে হয়, বীজের সহিত কোন প্রকার মাটি, কাটি থাকা উচিত নহে। ইহার সহিত আগাছা কুগাছার বীজ বা অপরিপুষ্ট বীজ মিশ্রিত থাকা বিধেয় নহে।

ভাল বীজের দাম দিয়া অপরিপুষ্ট বীজ বা মাটি কাটি মিশান বীজ খরিদ করা সুযুক্তি নহে। বীজ বাছিয়া না কিনিলে বা উপযুক্ত স্থান হইতে বীজ খরিদ না করিলে এইরূপ লোকসানই হয়।

যদি বীজের সহিত আগাছা কুগাছার বীজ মিশান থাকে তবে বিপদ কিছু গুরুতর আকার ধারণ করে। বীজ খরিদ করিয়া ক্ষেতে বীজ বোনা হইলে—ক্ষেতময়

আগাছা জন্মিল, তারপর সারা বৎসর ধরিয়া সেই আগাছা নিড়াইবার পরিশ্রম এবং নিড়াইবার খরচা নিতান্ত কম নহে।

সুবীজ পরীক্ষা করিয়া লইতে হইলে দেখিতে হইবে যে,

(১) বীজগুলি সুপরিষ্কৃত কি না,

(২) সুপুষ্ট কি না,

(৩) রঙ কি রকম,

(৪) বীজের খোসায় চাকচিক্য আছে কি না,

(৫) সুবীজে কোন প্রকার দুর্গন্ধ থাকিবে না,

(৬) সুপুষ্ট ভাল বীজ তোলা প্রতি কত ভারি হয় তাহা নিদ্ধারিত করিয়া লইয়া বীজের ওজন ধরিয়া একটা ভাল মন্দ স্থির করা অসম্ভব নহে। বীজের এই প্রকার পরীক্ষাই খুব ভাল পরীক্ষা, কিন্তু ইহা একটু আয়াস সাপেক্ষ, কারণ সকলপ্রকার বীজ ওজন করিয়া একটি হিসাব ঠিক করিয়া লইতে হয়। সুতরাং এই প্রকার পরীক্ষার দিকে বড় একটা কেহ অগ্রসর হয় না।

সুপুষ্ট ও অপুষ্ট বীজ দেখিলেই অনেক সময় পার্থক্য বেশ বুঝা যায়। সুপুষ্ট বীজ তেজস্কর গাছে ভিন্ন হয় না এবং বীজ সুপক্ক না হইলে সুপুষ্ট হয় না। বীজে যদি গুমো গন্ধ থাকে তবে বুঝিতে হইবে তাহা আর্দ্রস্থানে রাখা হইয়াছিল, সেরূপ বীজ সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য।

বীজের রঙ দেখিয়া, তাহার উজ্জ্বলতা দেখিয়া তাহা সুপক্ক কি না বুঝা যায় এবং নুতন কি পুরাতন চেনা যায়। যে বীজ ভাল পাকে নাই তাহার রঙ মেটে মেটে হয়, বীজ পুরাতন হইলেও বদরঙ হইয়া যায়। পরিষ্কার চক্‌চকে সবুজরঙের মটর বীজ যে কাল রঙের মটর বীজ অপেক্ষা ভালরকম জন্মায় ইহা সকল কৃষকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে।

সুপুষ্ট বীজ ওজনে ভারি সুতরাং খাদ্যের জন্য হউক বা চাষের জন্য হউক ওজনে ভারি বীজই সংগ্রহ করিতে হয়।

ভারতের চাষীরা সর্ব্বত্রই সকলে সুবীজ নির্ব্বাচন বা বীজ রক্ষায় মনোযোগী বলিয়া মনে হয় না। কতিপয় চাষীর এ দিকে লক্ষ্য থাকিলেও অধিকাংশ চাষী এ বিষয়ে বড়ই উদাসীন। তাহারা সুপক্ক অপক্ক বীজ মিশাইয়া রাখে, বীজে মাটি কাটি যথেষ্ট থাকে, এই মাটি কাটি সমেত বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং আগাছা কুগাছার বীজ যে মিশান থাকে না একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তাহারা এই রকমে সঞ্চিত বীজ দরকার হইলেই বপন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না।

বঙ্গদেশে ধান ক্ষেত্রে দেখিবে যে এক ক্ষেতেই দুই তিন রকম ধান জন্মিতেছে। তাহারা বাক তুলসী ধানের আবাদ করিতেছে, কিন্তু তাহার সহিত পাটনাই ও

রামশাল মিশ্রিত রহিয়াছে। অযত্নে বীজ রক্ষার ইহা একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। যাহা বীজ বলিয়া রাখিতে হইবে তাহা প্রথমতঃ কুলাঝাড়া করিয়া লওয়া আবশ্যক, তার পর হাত বাছাই করিয়া এক জাতীয় বীজ বাছাই করিয়া খাঁটি করিয়া লইতে হয়।

অনেক চাষী নিজের আবশ্যকমত বীজ স্বক্ষেত্রে উৎপন্ন করিয়া লইয়া থাকে; সেগুলি তাহার মনের মত হওয়া তাহার সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু এ দিকে তাহার যত্ন ও চেষ্টা থাকা আবশ্যক। ক্রমাগত সুপুষ্ট ও সুপক্ক ভাল বীজ বাছাই করিতে করিতে তবে উৎকৃষ্ট জাতীয় বীজের উৎপত্তি হয়।

অধিকাংশ কৃষককে বাজারের বীজের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাজারের বীজ প্রায়ই অপরিষ্কার—তাহার দশ ভাগের এক ভাগ মাটি কাটি, কখন কখন তাহারও অধিক। কি গবাদির খাদ্যের জন্য, কি মানুষের খাদ্যের কিম্বা চাষের জন্য, অপরিষ্কৃত বীজ খরিদ করা বিধেয় নহে এবং তাহা সস্তা হইলেও দুর্ম্মূল্য। ক্রেতার দোষেই খারাপ বীজ বিকায়। যদি সকলেই ভাল বীজ খরিদ করিতে চায় তবে বাজারে অপরিষ্কৃত বীজ দুর্ল্লভ হইয়া পড়িবে।

সুবীজ উৎপাদনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ক্ষেত্র রচনা করা ভাল। সেই ক্ষেত্রে একটিও আগাছা থাকিবে না এবং তার ধার ভিত সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। সাধারণ শস্য উৎপন্ন করিবার জন্য যেরূপ ভাবে বীজ বপন করা হয় তাহা অপেক্ষা পাতলা করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। গাছ খুব ঘন জন্মিলে উহা সতেজে বাড়িতে পায় না। সতেজ গাছ ভিন্ন কমতেজ গাছে ভাল বীজ জন্মায় না। পাট বীজ ঘন করিয়া না বুনিলে পাটের আঁশ ভাল হয় না, কারণ পাটগুলির মাঝে মাঝে অধিক ফাঁক থাকিলে পাটের গাছের ডাল পালা বাহির হইয়া যায় এবং সেই পাট গাছ হইতে সমান সরল আঁশ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া সেই ঘন বোনা পাটের গাছ হইতে ভাল বীজ পাইবার আশা করা উচিত নহে। পাটের বীজ উত্তম রূপ পাকিবার পরে পাট কাটিলে পাটের আঁশের চাকচিক্য এবং কোমলত্ব কিছু কমিয়া যায়, সেইজন্য বীজ অপরিপক্ক অবস্থায় অনেক সময় পাট কাটিয়া লওয়া হয়। অনেক অবিবেচক চাষী হয়ত সেই পাট গাছ হইতে কোন রূপ কিছু বীজ সংগ্রহ করিয়া লইয়া পরবর্ত্তী চাষের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেয়। বীজের জন্য সতন্ত্র ফসল উৎপাদন করা এদেশের রীতি বিরুদ্ধ বলিয়া অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে এখানে অনেক ফসলের ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটিতেছে। সুবীজ স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে জন্মাইতে হইবে, সুবীজ সুপরিষ্কৃত ক্ষেতে জন্মাইতে হইবে, সুবীজ সারবান ক্ষেতে বপন করিয়া সতেজ পূর্ণ বয়স্ক গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। সাধারণ শস্যক্ষেত্র অপেক্ষা বীজ ক্ষেত্রের অধিকতর যত্ন

লইতে হইবে। বীজ ক্ষেত্রে জলসেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপে বীজ জন্মাইয়া তাহা হইতে ঝাড়িয়া বাছিয়া বড় বড় ফলগুলি হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় চাষ করিতে পারিলে এবং এই প্রথায় বৎসরের পর বৎসর চাষ করিলে তবে বীজের উন্নতি হইবে, তবে ফসলের উন্নতি হইবে।

সুপক্ক বীজ—আলু না হইলে উত্তম ফসল উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আলু যখন নূতন বাজারে উঠে তাহা একটু চড়া দরে বিকায়, সেইজন্য ব্যবসায়ে লাভের খাতিরে আলুগুলি অনেক সময় অর্দ্ধ পক্ক অবস্থায় ক্ষেত হইতে তুলিয়া ফেলা হয়, সেই আলু লইয়া চাষ করা বিধেয় নহে। সুপক্ক, মাঝারি আকারের গাঁট এবং চোক বিশিষ্ট বেঁটে বেঁটে আলুই চাষের পক্ষে উপযুক্ত। বীজ—আলুর জন্য স্বতন্ত্র ক্ষেত্র পৃথক করিয়া না রাখিলে ভাল বীজ-আলু মেলা কঠিন হয়।

আখের ডগা হইতে আখের বীজ রাখা হয়। আখের গাছটি না পাকিলে তাহার ডগায় ভাল বীজ হয় না। আখের গা দেখিয়া আখ পাকিয়াছে কি না বুঝা যায়। আখের রঙ পাকিয়া না উঠিলে বা আখ মিষ্ট না হইলে সে আখের ডগায় বীজ হয় না। অনেক চাষী পূজার মরসুমে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আখ বেচিতে আরম্ভ করে এবং সেই অপরিপক্ক আখের ডগা বীজের জন্য রাখে। এই কার্য্য অত্যন্ত নির্ব্বোধের মত।

আমরা নিম্নে কতিপয় সুপক্ক বীজের ওজনের একটা তালিকা দিলাম। ভবিষ্যতে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানা যাইবে তাহা পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

মোটা ধান	১ পালি	/২/১০ দুই সের দেড় ছটাক।
সরু ধান	১ ,,	/১৸৵০ এক সের চৌদ্দ ছটাক
মটর	১ ,,	/২।৵০ দুই সের দেড় পোয়া।
মসুর	১ ,,	/২৷৷০ আড়াই সের।
মুগ	১ ,,	/২৷৷০ আড়াই সের।
পাট	১ ,,	/১৷৷০ দেড় সের।
ধঞ্চে	১ ,,	/২।০ নয় পোয়া।
শণ	১ ,,	/২ দুই সের।
সরিষা	১ ,,	/২ ,,
ধনে	১ ,,	/১ এক সের বা চৌদ্দ ছটাক।
খেঁসারি	১ ,,	/২ দুই সের।

ধান অপেক্ষা পাটের আবাদ বৃদ্ধি

যাহাতে অধিক অর্থ আসিবে চাষীরা সেই চাষেই অধিক ঝোঁক দিবে। তাহাদের অর্থনীতির কথা বুঝাও আর যাহাই কর, তাহারা তাহাদের আশু লাভের কথা কিছুতেই ভুলিবে না। পাটের দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাটের আবাদ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। আগে ১ টন অর্থাৎ ২৭॥০ মণ পাটের দাম বড় জোর ১৫০৲ টাকা ছিল, এক্ষণে এক টন পাটের দাম ২৭৫৲ কিম্বা ৩০০৲ টাকা। পাট বাজারে যত দরকার তত উৎপন্ন হইতেছে না, সেই জন্য এত দর এবং সেই কারণে চাষীরা পাট চাষে এত আগ্রহান্বিত। এইরূপ বাজার কিছু কাল থাকিলে বাঙলা দেশ কিম্বা ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র পাট চাষের প্রচলন হইবে। ইতিমধ্যেই এমেরিকাতে পাট চাষের বিশেষ রূপ চেষ্টা হইতেছে। ভারতে অনেকগুলি পাটের কল আছে, একটা পাটের কলে এক মাসে ১,০০০ একর জমির পাট খরচ হয়। এক বৎসর একটা কলে পাট যোগাইতে ৫২,০০০ একর জমিতে পাটের আবাদ করার আবশ্যক হয়। ইহাতেই অনুমান হয় পাট চাষ কেবলমাত্র ভারতে আবদ্ধ থাকিবে না, পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িবে।

পাট ও ধান ভারতের একপ্রকার নিজস্ব সম্পত্তির মত। ধান চাষে লাভ না দেখিয়া ভারতের চাষীরা ক্রমে ধান চাষে অবহেলা করিতেছে। বিগত কয়েক বৎসর চাউলের দর একটু বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাদিগকে ধানের আবাদে অপেক্ষাকৃত অধিক মনোযোগী দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু ধানের,—পাটের মত দাম বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে বা বাঞ্ছনীয়ও নহে। ভারতে নিঃস্ব লোকের সংখ্যাই অধিক এবং ভারতবর্ষীয়দিগের চাউলই প্রধান খাদ্য সুতরাং এ দেশে চাউলের দর যত কম থাকে ততই মঙ্গল।

ভারতের প্রায় শতকরা ৬৬ জন কৃষিজীবী আর শতকরা ৮০ জন প্রত্যক্ষ ভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ভারতে যে খাদ্য শস্য জন্মে তাহার কিছু মাত্র পর বৎসরের জন্য সঞ্চিত থাকে না। অর্থাভাব বশতঃ ভারত তাহার একান্ত আবশ্যক শস্যের কিয়দংশও বিদেশে রপ্তানি করিতে বাধ্য হয়; অর্থাভাববশতঃ তাহারা জমিতে ধান না বুনিয়া পাট বুনিয়া থাকে। পাট হইতে যাহা কিছু অতিরিক্ত লাভ করে তাহা জমিদারের খাজনা দিতে, মহাজনের সুদ যোগাইতেই ব্যয় হয় এবং নির্ধনের ধন কিছু বিলাস ব্যসনেও খরচ হইয়া থাকে। সেইজন্য ভারতে এক বৎসর সামান্য অজন্মা হইলে অনশনে লোক মরিতে থাকে। যখন এদেশে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হইবে, অসময়ে আহার

যোগাইবার জন্য দুই তিন বৎসরের খাদ্য জমা থাকিবে এবং তদতিরিক্ত শস্য ইচ্ছামত অধিক মূল্যে বিদেশে রপ্তানি করা যাইবে তবে এবং তখন ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু এ সকল এখন কল্পনার কথা। ইহা কাজে পরিণত করিতে বহু সাধনার প্রয়োজন। এ সব বড় কথা ছাড়িয়া বর্ত্তমান যুগে কি প্রকারে ধান চাষের উন্নতি সাধন করা যায় তাহাই চিন্তার বিষয়। ধানের ফলন বাড়াইবার চেষ্টাই এখন একমাত্র কর্ত্তব্য। বাঙলা দেশে গড়ে এক একর (তিন বিঘা) জমি হইতে ১০ মণের অধিক চাউল পাওয়া যায় না। ১০ মণ চাউলের দাম গড়পড়তা হিসাবে ৪০৲ টাকা মাত্র। চাষের খরচা একর প্রতি ২৫৲ কিম্বা ৩০৲ টাকার অধিক নহে সুতরাং এই হিসাবে একরে ১০৲ টাকা লাভের জন্য কেন চাষীরা ধান চাষ করিতে যাইবে। এমেরিকায় এই ধান চাষের কি উন্নতি হইয়াছে তাহা ভাবিলে আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত। নিউ ইয়র্কের টেক্সাস্ প্রদেশে এক একর জমিতে ধানের আবাদ করিতে ১২ হইতে ১৪ ডলার খরচ পড়ে। বাঙলা টাকার হিসাবে ৩৬৲ টাকা হইতে ৪২৲ টাকা খরচ হয়। খরচ, বাঙলার অপেক্ষা কিছু অধিক এবং হওয়াই সম্ভব, কেন না সেখানে মজুরের মজুরী অনেক বেশী। তবু সেখানে কলের লাঙ্গলে চাষ হয় এবং ধান কলে কাটা ও ঝাড়া ও মাড়া হয়। এমেরিকার প্রতি একরে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ ১২ হইতে ১৮ ব্যাগ। এক ব্যাগের ওজন ১৬২ পাউণ্ড বা ২ মণ। মোটের উপর এক একরে ২,৪৩০ পাউণ্ড বা ৩০ মণ চাউল উৎপন্ন হইবে। কোথায় ৩০ মণ আর বাঙলার ১০ মণ। এখান অপেক্ষা গড়ে কিছু অধিক দরেও ধান বিক্রয় হয়। তথায় ৫৲ টাকা মণ হিসাবে একটা সাধারণ দর ধরিয়া লইলে একরে বাঙলার ৪০৲ টাকার স্থলে ১৫০ টাকা আয় হইল।

এমেরিকার ও বাঙলার ধান চাষ একটু পৃথক। তথায় ধান্যক্ষেত্র মাত্রেই পম্প বা জলোত্তোলন যন্ত্র আছে, তাহার সাহায্যে জমিতে জল প্রবেশ করান বা বাহির করা হয়। সমুদয় বাঙলা দেশে ধানের চাষ বৃষ্টির জলের উপরই নির্ভর। শুধু বাঙলা কেন বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তরপশ্চিম, পঞ্জাবে বৃষ্টি না হইলে ধান জন্মে না। কোথাও কোথাও খালের সেচন জলে কাজ হয়, কিন্তু সে জমির পরিমাণ অতি সামান্য। এমেরিকায় গ্যাসোলিন এঞ্জিন চালিত পম্প বা জলোত্তোলন যন্ত্র সাহায্যে অতি সহজে যথাযথ চাষের কার্য্য চলিতেছে। ঐরূপ পম্প বাঙলায় আনিয়া কাজে লাগান যায় না এমন নহে। কিন্তু আমাদের দেশে সে উদ্যোগ কার আছে!

বাঙলাদেশের বিস্তৃত চাষের একটী বড় অন্তরায় আছে। জমিতে চাষীর অনেক স্থানে কোন কায়েমী সত্ব নাই, জমিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে বিভক্ত।

কল বল লইয়া চাষ করিতে হইলে বিস্তৃত ক্ষেত্র আবশ্যক। কিন্তু যাহা ছোট খাট চাষীর পক্ষে অসম্ভব, জমীদারগণ মনে করিলে তাহা সম্ভব করিয়া লইতে পারেন। অর্থ থাকিলে সুন্দর বনের পতিত জমি কায়েমী বন্দোবস্তে লইয়া সুবিস্তৃত ক্ষেত্র রচনা করা দুঃসাধ্য নহে।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

আলুতে পোকা—

সরকারী কৃষি পত্রিকায় প্রকাশ যে বিগতবর্ষে লক্ষ্ণৌ এবং অন্যান্য স্থানে আলুতে পোকা দেখা দেয়। সেই পোকা ক্রমশঃ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পোকার উৎপত্তি পাটনা হইতে এবং খুব সম্ভব ইউরোপ হইতে এই পোকা আমদানী হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে আলু জন্মায় তথায়ই এই পোকা দেখা যাইতেছে। পোকাক্রান্ত আলুর ক্ষেতে উপস্থিত হইলেই দেখা যায় যে, একপ্রকার ঈষৎ সজে আভাযুক্ত পাটকিলা রঙের পোকা ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। ইহারা আলু গাছের ডগার রস শুষিয়া খায়। কীড়া অবস্থায় ইহারা আলুর ভিতর প্রবেশ করিয়া, আলুর ডাঁটার ভিতর প্রবেশ করিয়া আলুর সমূহ ক্ষতি সাধন করে। বীজ—আলুর ভিতরে থাকিয়া এক ক্ষেত হইতে অন্য ক্ষেতে যাইতেছে। ইহাদের বাড়ও অনেক অধিক। চারি হইতে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে ইহারা ডিম হইতে পতঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। একটা স্ত্রী পতঙ্গ এক শতের অধিক ডিম পাড়ে। পুষাতে নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইয়াছে। আলুর উপরের ডিমগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে, তৎপরে ক্রুড অয়েল ইমলসনে সেই আলুগুলি ৫ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। আলুগুলি পরে বেশ করিয়া শুকাইয়া গুদামে রাখিতে হইবে এবং মাসে একবার সেইগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা উচিত। শুকান মানে কেহ যেন রৌদ্রে ফেলিয়া শুকান বুঝেন না। ছায়ায় জল ঝরাইয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। যদি কোনটা পচে তৎক্ষণাৎ তাহা সরাইয়া ফেলা বিধেয়। এইরূপ বীজ আলু চাষের জন্য নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে।

পঞ্জাবে কৃষি—

পঞ্জাবে চাষের জমি অনেক এবং অধিকাংশ স্থলে সেচন জলের সুবিধা থাকায় পঞ্জাবে কৃষি প্রসার মন্দ নহে। সরকারী তালিকায় দেখা যায়। ১৯১০—১১ সালে বিভিন্ন ফসলের আবাদী জমির পরিমাণ দেওয়া হইল ;—

ধান—

৭১২, ৮৪৩ একর জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছে। এই আবাদী জমির মধ্যে প্রায় ১/৪ ভাগ জমিতে সেচনের সুবিধা আছে।

জোয়ার—

আবাদী জমির পরিমাণ ১,৩৪২.৮৭০ একর। ইহার মধ্যে ১/৬ ভাগ জমি ব্যতীত অন্যত্র জল সেচনের সুবিধা আছে।

বাজরা—

আবাদী জমি ২, ৭১২, ৪৯৭ একর মাত্র। বিগত বর্ষের বাণিজ্য তালিকায় দেখা যায় যে এতদঞ্চলে ৬২০, ৪৬০ টন জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই উৎপন্ন বাজরার মধ্যে ১৯, ৮৩৮ টন বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

ভুট্টা—

ভুট্টার আবাদী জমির পরিমাণ ১, ২০৬, ৬৪৫ একর। এই সমগ্র জমির ১/৬ ভাগ জমিতে সেচন জলের সুবিধা আছে। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৫১২, ৬৫৯ টন।

ইক্ষু—

আখের ক্ষেতের পরিমাণ ৩৯৯, ৬৮৯ একর মাত্র। উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ ২৬৬, ৯২৬ টন। পঞ্জাবে ১৯১০—১১ সালে ১৪০, ৫৫৬ টন চিনি আমদানী হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে বিগতবর্ষে এখানে গুড়ে, চিনিতে ৪০৭, ৪৮২ টন খরচ হইয়াছে। পঞ্জাবের লোক সংখ্যা ১৯, ৯৭৪, ৯৫৬ ; অতএব এখানকার অধিবাসীগণের প্রত্যেকের জন্য প্রতি বৎসর ৪৬ পাউণ্ড গুড় বা চিনির আবশ্যক। পঞ্জাবে ইক্ষু চাষ কত বাড়ান যাইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

তুলা—

জমির পরিমাণ ১, ২৪৯, ৭৭৭ একর ; ১/৪ ভাগ জমিতে জল সেচনের সুবিধা আছে। ১৯১০ সালে ২৬৮, ১৪০ বেল। ১৯১০—১১ সালে আমদানী বাদ নেট ২৮৪, ৬৩১ বেল রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯১০ সালে রপ্তানির পরিমাণ ৪১৮, ৩৭৬ বেল। একটি বেলের ওজন ৪০০ পাউণ্ড = ৫ মণ। উৎপন্ন তুলা অপেক্ষা রপ্তানি অধিক দেখা যাইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলা জমা থাকিলেও উৎপন্ন এত কম হইলেও এত অধিক রপ্তানি হইতে পারে না। ইহাতে মনে হয় যে আবাদী জমির সঠিক পরিমাণ সব সময় মিলে না।

গম—

আবাদী জমির পরিমাণ ৮,৮৮৪,৬৯৭ একর। উৎপন্ন গমের পরিমাণ, ৩,৩০৯,০২২ টন। আবহাওয়া প্রতিকুল না থাকিলে আরও কত হাজার টন বাড়িয়া যাইত।

যব—

জমির পরিমাণ ১,০০৩, ৪২৯ একর। এই জমির ⅘ ভাগে সেচন জলে চাষ হয়।

ছোলা—

৪,৪৯৪,০৪৪ একর। ইহার ½ ভাগ জমিতে সেচনের সুবিধা আছে। উৎপন্ন ছোলার পরিমাণ ১,৩০৯, ১৭০ টন। যদি মার্চ্চ মাসে অতিবৃষ্টি না হইত বা পোকার উপদ্রব না দেখা দিত তাহা হইলে আরও অধিক ছোলা জন্মিত।

রবি তৈলশস্য—

সরিষা প্রভৃতির জমির পরিমাণ ১,০৭৭, ৮৪২ একর। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ১৫৯, ২৫২ টন।

পত্রাদি

কৃষিকর্ম্ম—শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার, দিঘল গ্রাম, বর্দ্ধমান।

[কৃষিবিদ্যা কি এবং ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্য পরিচালনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। আপনি স্থানীয় কৃষি সম্বন্ধীয় তথ্য ও বিশেষ কোন অভাব ও অসুবিধা কিম্বা বিশেষ কোন ফসল সম্বন্ধে পরীক্ষার ফলাফল নিয়মিত লিখিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। ইতি] কৃঃ সঃ

৯৲ টাকায় জলোত্তোলন যন্ত্র—শ্রীযুত তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মহতপুর, পোঃ নদীয়া।

জলোত্তোলন যন্ত্র নামটি দেখিয়া আপনি ভ্রমে পড়িয়াছেন। ইহা একটি দুই মুখ বিশিষ্ট পিচকারী বিশেষ। এই পিচকারী এমনভাবে গঠিত যে ইহার একমুখ একটা বালতি বা টাঁকীতে লাগাইয়া দিয়া হ্যাণ্ডেল ধরিয়া পম্প করিতে থাকিলে অন্য মুখদ্বারা জল দূরে চালান চলে।

ম্যাগ্নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা—শ্রী—রসীদপুর, জামালপুর, মৈমনসিংহ। পত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে ভুলিয়াছেন। তাঁহার ম্যাগ্নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা গাছ বাড়িতেছে না। বসাইবার পর হইতে ৫ মাসের মধ্যে একটিও পাতা বাহির হয় নাই। ম্যাঃ গ্রাণ্ডিফ্লোরা প্রথমাবস্থায় খুব অল্পে অল্পে বাড়ে। অত্যন্ত রোদ পিটে জায়গায় বসাইলে ইহার বাড়ের ব্যাঘাত জন্মে। ম্যাগ্নোলিয়া জাতীয় গাছ পাহাড়িয়া অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গায় বেশ জন্মায়। শুক্না মাছের গুড়া, কিছু রাবিশ মাটি ও কিছু জিপসম মিশ্রিত সার প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। জিপসমের পরিবর্ত্তে এসিটিলিন গ্যাস জ্বালাইবার পর যে চূণবৎ পদার্থ পড়িয়া থাকে তাহাও দেওয়া যাইতে পারে।

গোলাপ গাছে পোকা—তাঁহার গোলাপ গাছের পাতা কাটিয়া খাইয়া ফেলিতেছে অথচ পোকা দেখিতে পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই রাত্রে পোকায় এইরূপ উপদ্রব করিতেছে। রাত্রিকালে আলো জ্বালিয়া পোকা মারিতে পারিলে ভাল হয়। ক্ষেতের মাঝখানে দুই তিন জায়গায় কেরোসিন তেলের জল রাখিয়া তাহার উপর আলো জ্বালিয়া রাখিলে কতক প্রতিকার হইতে পারে। ভারতীয় কৃষি-সমিতি হইতে কীট নিবারক আরক লইয়া ছিটাইয়া দেখিতে পারেন। আরকের গন্ধে পোকা ক্ষেত পরিত্যাগ করিতে পারে। পোকা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা "ফসলের পোকায়" দেখিতে পাইবেন।

চম্‌কা গাছ—শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়, চাঁদপুর, খুলনা। আমরা চম্‌কা গাছ সম্বন্ধে তত্ত্ব লইতেছি; অনুসন্ধান ফল আপনাকে জানান যাইবে।

বেগুনের পোকা—আপনার বেগুন গাছের যে যে অবস্থার কথা লিখিয়াছেন সেই সেই অবস্থার বিশদ আলোচনা "ফসলের পোকায়" আছে ও তাহার প্রতিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আশা করি পুস্তক খানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িবেন।

সার-সংগ্রহ।

কৃষকের উন্নতিকল্পে যৌথ ঋণদান সমিতি

ভারতের অধিকাংশ লোকই কৃষক। অতি প্রাচীনকালে ভারতবাসীর উপজীবিকা যাহাই থাকুক না কেন, ইদানী অধিকাংশ ভারতবাসী কৃষিজীবী হইয়াছে; সুতরাং ভারতীয় কৃষকগণের উন্নতি অবনতির উপরেই দেশের উন্নতি ও অবনতি,

সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি নির্ভর করিতেছে। যদি ভারতের কৃষকগণ নিশ্চিন্তচিত্তে পুত্র কলত্রাদির উদর পূর্ণ করিতে পারে, পীড়ায় পথ্য ও ঔষধ যোগাইতে পারে, বর্ষা ও শীতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের মত শান্তস্বভাব ব্যক্তি পৃথিবীর কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা দুই বেলা দুই মুটা খাইতে পাইলে, সমস্ত দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুত্র কন্যার সহাস্য আনন দেখিতে পাইলেই সন্তুষ্ট হয়।

কিন্তু ভারতীয় কৃষকগণের অদৃষ্টে এই সামান্য সুখও নাই। তাহাদের ক্ষেত্রে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে তাহাদের অধিকার নাই, সেই শস্যের অধিকারী মহাজন। কৃষকের লাঙ্গল, বলদ, এমন কি সামান্য পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত তাহার নিজের নহে, সমস্তই মহাজনের নিকটে ঋণদায়ে বাঁধা।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন ভারত পরিত্যাগ কালে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, এদেশের কৃষকগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দেশের এরূপ অবস্থা রাজ্য শাসনের পক্ষে অনুকূল নহে। গত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখলে মহাশয়ও ভারতীয় কৃষকগণের দুর্দ্দশার প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা সুসভ্য গভর্ণমেণ্ট মাত্রেই ভয়ানক অবস্থা বলিয়া মনে করেন।

এই সকল কথায় প্রজার দুর্দ্দশার প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ে। রাজপুরুষগণ অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, সত্য সত্যই কৃষকগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কৃষকগণ দুরবস্থার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। ঋণের দায়ে তাহাদের মস্তক পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং যেরূপেই হউক কৃষকগণকে রক্ষা করিতে হইবে, তাহাদের দুর্দ্দশা দূর করিতেই হইবে।

মহাজনদিগের কবল হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিতে হইলে প্রচুর অর্থের আবশ্যক। সেই অর্থ পাওয়া যাইবে কোথায়? অবশেষে স্থির হইল যে, যদি মফঃস্বলের প্রতি গ্রামে "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি" বা পরস্পর সাহায্যকারী ধনভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং অতি অল্প সুদে সেই ভাণ্ডার হইতে কৃষকগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা আর মহাজনের কবলে পতিত হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া ভারতের নানাস্থানে ঐরূপ ধনভাণ্ডার স্থাপনের চেষ্টা করা হইল।

এখন অনেক স্থানেই এইরূপ ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের হস্তে ধনভাণ্ডার পরিচালনের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, রাজপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে ঐ সকল ভাণ্ডারের কার্য্য পরিদর্শন করেন, উহার হিসাব পরীক্ষা করেন। এই সকল ধনভাণ্ডার হইতে কৃষিকার্য্যের সহায়তার জন্যই স্থানীয় কৃষকগণকে

সাহায্য প্রদান করা হয়। কোনরূপ সামাজিক কার্য্যের জন্য কৃষকেরা ধনভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য পায় না।

পূর্ব্বে পিতৃ-মাতৃদায় বা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অপরিণামদর্শী কৃষকগণ অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিত। বলা বাহুল্য যে তাহারা অতি উচ্চহারে সুদ দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া মহাজনদিগের নিকট খত লিখিয়া দিত। পল্লীগ্রামে কৃষক সমাজে মহাজনেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা। তাহারাই কৃষকগণকে পরামর্শ দেয়, টাকা ধার দেয়, অসময়ে ধান্য দিয়া ফসলের মুখে তাহার চতুর্গুণ আদায় করিয়া লয়। সুতরাং কৃষকগণকে সদুপদেশ দিয়া অমিতব্যয়িতার দোষ দেখাইবার কেহই নাই বলিলেই হয়। মহাজনেরা জানে যে, কৃষকেরা যদি অধিক পরিমাণে টাকা ধার করে, তাহা হইলে মহাজনদিগেরই লাভ।

যাহাদের অর্থের সংস্থান নাই, তাহাদের মান অপমান জ্ঞান নাই, আত্মাভিমান, হিতাহিত জ্ঞান নাই। মহাজনের ক্রীতদাস কৃষকগণও দুর্দ্দশার শেষ সীমায় উপনীত হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকে নানাপ্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া একেবারে পশুরও অধম হইয়া পড়িয়াছিল।

ধনভাণ্ডার স্থাপনের ফলে এখন অনেক গ্রামের কৃষক ঋণমুক্ত হইয়াছে। সামাজিক ব্যাপারে অবস্থার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় যে অন্যায়, তাহা বুঝিতে পারিয়া মিতব্যয়ী হইয়াছে। অনেকে সুরা, গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ব্যবহারও পরিত্যাগ করিয়া সংসারী হইয়াছে। যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে ধনভাণ্ডার হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া ধ্বংসমুখ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহারাই এখন আবার ভাণ্ডারে অর্থ গচ্ছিত রাখিতেছে। ধনভাণ্ডারে টাকা রাখিলে কিছু কিছু সুদ পাওয়া যায়। সুদের লোভে অনেক অনাথা বিধবাও ধনভাণ্ডারে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। সে দিন মান্দ্রাজের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় মিঃ শঙ্করম নায়ার মহোদয়—"কো অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির" এক অধিবেশনে বলিয়াছেন যে, উত্তর ভারতের কোন কোন গ্রামের স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার নির্ম্মাণ না করাইয়া ধনভাণ্ডারে অর্থ গচ্ছিত রাখিতেছেন। একটা ধনভাণ্ডারে গ্রামের প্রত্যেক স্ত্রীলোকই যথাসাধ্য টাকা জমা রাখিয়াছেন। ধনভাণ্ডারের কল্যাণে কেবল যে কৃষকদিগের আর্থিক উন্নতি হইয়াছে তাহা নহে, অনেক স্থলে তাহাদিগের নৈতিক উন্নতিও হইতেছে। যে সকল গ্রাম পূর্ব্বে সুরাপায়ীদিগের জন্য বিখ্যাত ছিল, সেই গ্রামে এখন সুরাপায়ীর সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। গ্রামে সর্ব্বত্র লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন।

অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, অভাবে স্বভাব নষ্ট করে নিঃস্ব অবস্থায় যে সকল লোক অত্যন্ত বিবাদপ্রিয় থাকে, কিঞ্চিৎ অর্থের সংস্থান হইলেই তাহাদিগের

স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়। তাহারা সচ্ছন্দে শান্তভাবে জীবন নির্ব্বাহ করে। তাহারা জানে যে দেশে শান্তি বিরাজ করিলে তাহাদেরই লাভ। অশান্তির আবির্ভাব হইলে তাহাদিগেরই সর্ব্বনাশ হইবে। তাহারাও দেশের দশজনের একজন, দেশের শুভাশুভই তাহাদের শুভাশুভ। আমাদের দেশের কৃষকগণের যাহাতে দুরবস্থা দূর হয়, যাহাতে তাহারা দেশে দশজনের একজন হইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, স্বদেশ হিতৈষী মাত্রেরই তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাহাতে প্রত্যেক পল্লীগ্রামে ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়, কৃষকগণ মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, প্রত্যেক সমাজহিতৈষীর সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দেশের ধনভাণ্ডারগুলির প্রতিষ্ঠা ও পরিপুষ্টি সাধন বিষয়ে দেশের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য সমাজ উদ্যোগী হইলে কৃষকগণের দুর্দ্দশা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে সুতরাং বিশেষভাবে ধনবানগণেরই এবিষয়ে উদ্‌যোগী হওয়া আবশ্যক।

পাট।—কলিকাতার নিকটে অনেক পাটের কল আছে; এই সকল কলে চট ও থলে প্রস্তুত হয়; শস্যাদি জিনিষ রপ্তানি করিবার জন্য এই সকল চট ও থলের বিশেষ দরকার। পূর্ব্বে একটি থলে একবার মাত্র ব্যবহার করিয়াই ফেলিয়া দেওয়া হইত; সুতরাং বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাটের আদর বাড়িয়াছিল। পূর্ব্বে প্রতি টন (২৭ মণ) পাটের দাম ১৫০৲ টাকা ছিল; ক্রমে এই দাম বৃদ্ধি হইয়াছে; গত বৎসর প্রতি টনের দাম ২১০৲ টাকা ছিল, এক্ষণে দাম আরও বৃদ্ধি হইয়া প্রতি টন ৩৩০৲ টাকা হইতে ৩৯০৲ টাকা হইয়াছে। তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এ বৎসর মোট ১৬০০ লক্ষ গজ থলে কম রপ্তানি হইয়াছে। এক ফ্রান্সেই ৩টা কারখানা হইয়াছে, তাহাতে পুরাতন ব্যাগগুলিকে মেরামত করিয়া আবার ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। সুতরাং চট ও থলের রপ্তানি হ্রাস হইয়াছে। এই জন্য অনেক পাটের কল সাময়িক রূপে বন্ধ করিতে হইয়াছে।

জমিদারী ট্রেনিং কলেজ।—কলিকাতার বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য লোকের সমক্ষে কাশিমবাজারের মহারাজ ১৫ নং সরকার লেনে উক্ত কলেজের উদ্বোধন ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে জমিদারী কার্য্য সুন্দররূপে শিক্ষা দেওয়াই এই কলেজের উদ্দেশ্য। কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সবজজ ও প্রসিদ্ধ উকিল উক্ত কলেজে আইন বিষয়ে উপদেশ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ জমিদারগণ এই কলেজের ছাত্রদিগের আবেদন গ্রাহ্য করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

শিবপুর ব্যবহারিক শিল্প কলেজ।—শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রং করা ও টিংটরিয়েল রসায়ন বিভাগ নভেম্বরে আরম্ভ হইবে; মাত্র ২০ জন

ছাত্র প্রত্যেক বৎসর ভর্ত্তি করা হইবে। জুলাই মাস হইতে দরখাস্ত লওয়া হইতেছে; যাহারা ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্স অথবা আর্টসে রসায়ন পড়িয়াছে অথবা গভর্ণমেণ্ট বয়নবিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহারা দরখাস্ত করিতে পারিবে। যাহারা বি, এ, কিম্বা বি, এস, সি, পরীক্ষায় রসায়ন পড়িয়া পাশ করিয়াছে অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করিয়াছে তাহাদের দাবী অগ্রে গ্রাহ্য হইবে। স্থান থাকিলে অন্য অস্থায়ী ছাত্রও গ্রহণ করা যাইতে পারিবে। নিয়মিত ছাত্রদের জন্য প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ১৭টা বৃত্তি আছে; যাহারা সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে থাকিবে সেই সকল ইউরোপীয়ানদের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা ও ভারতবাসীদের জন্য ১৮৲ টাকার এবং যাহারা সেখানে থাকিবে না, তাহাদিগের জন্য যথাক্রমে ১৮৲ টাকা ও ১০৲ টাকার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্কুলে পড়িতে বেতন লাগিবে না।

দিল্লির দরবারের আয়োজন—

দরবারের জন্য সমস্ত শিবির ও পট মণ্ডপ সুসজ্জিত হইয়া গিয়াছে, রাস্তা ঘাট প্রস্তুত হইয়াছে, রেল বসিয়াছে; রেল লাইনের দৈর্ঘ্য ২০ মাইল, তাহার ধারে ধারে অনেকগুলি ষ্টেসন, জলের ও আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে, চারিদিকে নানাস্থানে উদ্যান রচিত হইয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে সকলেই আশা করিতেছেন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর জাহাজ আসিয়া বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিবে এদিকেও সব সাজ সজ্জা শেষ হইয়া যাইবে। অদ্য নভেম্বর মাসের ২৪শে তারিখ, আর এক পক্ষের মধ্যে দরবারভূমি শোভা ধারণ করিবে।

বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এক্ষণে দিল্লিতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি দিল্লি হইতেই বরাবর সম্রাট ও সম্রাট মহিষীর সংবর্দ্ধনার জন্য বোম্বাই যাত্রা করিবেন। সম্রাট দিল্লিতে সেলিম গড় ষ্টেসনে নামিবেন। পঞ্চাশ হাজার সেনা নানা স্থান হইতে সম্রাটের অভ্যর্থনার জন্য দিল্লিতে সমবেত হইবে। ২৫শে নভেম্বর হইতে দিল্লিতে সাধারণ লোকের ভিড় হইবে।

সম্রাট ও সম্রাট মহিষীর অভিষেকের জন্য যে সামিয়ানা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দৈর্ঘ্যে ৪০ হাত, প্রস্থে ৪০ হাত। সামিয়ানা লাল ভেলভেটের, পাড়ে সোণার কাজ, এবং হরিদ্রাবর্ণের গরদের কাজ করা।

একটি মঞ্চের উপর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। তাহার সম্মুখভাগ মোগল আমলের প্রচলিত প্রথা অনুসারে নির্ম্মিত এবং শ্বেত সজ্জায় সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছে। মঞ্চের সম্মুখে ২০ হাজার সেনা সজ্জিত থাকিবে। খেলার জন্য একটি বিরাট মাঠ প্রস্তুত হইয়াছে। স্থানে স্থানে দর্শকগণের জন্য গ্যালারি তৈয়ারি হইয়াছে; ঐ সকল গ্যালারিতে ২০ হাজার লোকের স্থান হইবে। মাঠগুলি সমতল করিয়া তাহাতে ঘাস বসান হইয়াছে, জল দিবার বন্দোবস্ত ছিল, মাঠ এক্ষণে ঘাসে ঢাকিয়া সুদৃশ্য হইয়াছে।

দরবার ক্ষেত্রে অনেক পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। পথের ধুলা নিবারণের জন্য এবার পথে তৈল মিশ্রিত জল ছিটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

অগ্রহায়ণ মাস।

সব্জীবাগান।—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা, বিলাতি সীম বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীতপ্রধান দেশে কিম্বা যথায় জমিতে রস অধিক দিন থাকে—যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপি চারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী।—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁশ জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়।

ফুলের বাগান।—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসান্থিমম, ফ্লক্স, পিটুনিয়া, অ্যাষ্টারসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

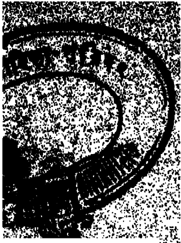
ফলের বাগান।—ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না। পাঁকমাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

কৃষি-ক্ষেত্র।—মুগ, মসুর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক কতক পরিমাণে হইবেই। পশুখাদ্যের মধ্যে মাঙ্গোল্ড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত বৃক্ষের

নিম্নে আইল বান্ধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতি সব্জীর বীজ লাগান এ মাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মুলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শসা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতি সব্জীর ভাঁটিতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যায় আবরণ উঠান; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট।—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটী লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টী-গোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরান ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় গোময় সরিষার খৈল, গোমূত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার, সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার এক ভাগ, পোড়া মাটি এক ভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এ সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভুসা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুসা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি ২০ পাউণ্ড মিশ্র সারে এক পেকেট ভুসা যথেষ্ট, ভুসা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়।

REGISTERED No. C 192.



কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

দ্বাদশ খণ্ড,—৮ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।



অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



সুরমা মর্ত্তের পারিজাত।

পুরাণের আখ্যানেই সাধারণে শুনিয়াছেন, যে স্বর্গে—ইন্দ্রের নন্দনে, দেবভোগ্য পারিজাত আছে। সেই পারিজাত দেবরাজ ইন্দ্রের শচীরাণীর সোহাগের বিলাসভোগ। পারিজাতের রং কেমন, গন্ধ কেমন, আকার কেমন, তাহা কেহ জানেন না। তবে, পারিজাতের গন্ধটা যে খুব মনমাতান তার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পারিজাতের স্বর্গীয় সৌরভ কতকটা ধারণায় আনিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় সুরমা ব্যবহার করুন। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের সুরমা মর্ত্তের পারিজাত। শুধু গন্ধে নহে, সুরমা—সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ অথচ সুলভ সুগন্ধি কেশতৈল।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির ৸৹ আনা। ডাকমাশুলাদি।৶৹ আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। মাশুলাদি ৸৶৹ তের আনা।

শুক্রবল্লভ-রসায়ন।

শুক্রই শরীরের সার জিনিষ। কাজেই শুক্রক্ষয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না। শুক্রক্ষয়ে দেহ অবসন্ন, মন বিষণ্ণ, বর্ণের মলিনতা, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্কের বলহানি, শরীরে দারুণ গ্লানি প্রভৃতি উৎকট উপদ্রব উপস্থিত হইয়া, মানুষকে জীবন্মৃত করিয়া ফেলে। এই রসায়ন ঔষধ শীঘ্র শীঘ্র শুক্রবৃদ্ধি করিয়া, সেই সমস্ত দোষ দূর করিয়া দেয়। এই জন্যই ইহার নাম শুক্রবল্লভ। এই শুক্রবল্লভ সেবনে শুক্রধাতু গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা দূর হইয়া যায়, মনের স্ফূর্ত্তি ও দেহের কান্তি বৃদ্ধি পায়, উত্তেজনা ও ধারণাশক্তি আশানুরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক মাত্রাতেই ইহার উপকার অনুভব করা যায়। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। মাশুলাদি।৶৹ আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর

পুষ্পসার।

বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্‌কা বকুলফুলের মতই অটুট সুন্দর।



পারিজাত।—এ যেন সত্য সত্যই স্বর্গীয় সৌরভ!

বঙ্গমাতা।—বাঙ্গালীর "বঙ্গমাতা" সমস্ত বাঙ্গালার গৌরবস্বরূপ।

মিলন।—"মিলনের" সুবাস মিলনের মতই মনোরম!

রেণুকা।—আমাদের "রেণুকা" বিলাতী কাশ্মীরীবোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে।

কামিনী—যামিনীর জ্যোৎস্না কামিনীর সৌরভে মধুরতর হইয়া উঠে।

চম্পক।—চাঁপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বলমধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ!

বেলা।—অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় "বেলার" গন্ধ যেন স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়।

হোয়াইট রোজ।—নামের অনুবাদ করিলেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই আমাদের "শেউতি গোলাপ"।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸৹ বার আনা। ছোট ॥৹ আট আনা। প্রিয়জনের প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২॥৹ টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ টাকা। ছোট তিন শিশি ১।৹ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸৹ আনা, ডাক-মাশুল।৶৹ আনা। অডিকলোন এক শিশি ॥৹ আনা, মাশুলাদি।৶৹ আনা। আমাদের অটো-ডি-রোজ, অটো অব্‌ নিরোলী, অটো অব্‌ মতিয়া, অটো অব্‌ খস্‌খস্‌, অতি উপাদেয় পদার্থ। এক শিশি ১৲ এক টাকা, ডজন ১০৲ দশ টাকা।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্‌।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কৃষক।

সূচীপত্র।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

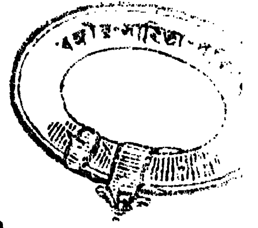
"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।



কুচবিহারের নব ভূপতি।

মহারাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহারাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ ভূপ পিতৃরাজ্য অধিকার করিলেন, তিনিও সৌজন্যে সকলের প্রিয় হইবেন এবং পিতার ন্যায় দয়া দাক্ষিণ্য দেখাইয়া এবং প্রজারঞ্জন করিয়া তাঁহার মহারাজ নাম সার্থক করিবেন, ইহাই আমাদের বাসনা। আমরা আরও আশা করি যে, তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় কৃষির উন্নতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইবেন এবং এই ভারতীয় কৃষি-সমিতির সহিত সংস্রব রাখিবেন ও এই সমিতির প্রতি পোষকতা করিবেন।



কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ খণ্ড। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

সজ্জী চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লেটুস্ বা সালাদকপি

বপনের প্রশস্ত সময়—ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ

লেটুসের আকৃতি ও প্রকৃতি প্রায়ই বাঁধাকপির মত। ইহার চাষও বাঁধাকপিরই অনুরূপ। পূর্ব্বকালে গ্রীক ও রোমীয়গণ এই সজ্জীর চাষ করিতেন। তথা হইতে ইহা এখন নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং বহুদিন হইতে ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। হেরোডোটাসের লেখা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্ট জন্মাইবার ৪০০ বৎসর পূর্ব্বেও পারস্য সম্রাটগণ লেটুসের ব্যবহার করিতেন।

সালাদ হিসাবেই লেটুসের ব্যবহার হইয়া থাকে। সালাদ রূপে যে কি প্রকারে এই সজ্জী আমাদের আহার উপযোগী করা যায়, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। লেটুসের পাতাগুলি কাটিয়া লইয়া তাহা ভিনিগার, লবণ প্রভৃতি দ্বারা জারাইয়া আহার করা হয়। ইহাই সালাদের মত ব্যবহার। এদেশবাসীরা কিন্তু কোন সজ্জীই এই প্রকারে ব্যবহার করিতে রাজী নহেন। তাঁহারা সকল সজ্জীই সিদ্ধ করিয়া তাহাতে লবণ, মসলা ও আবশ্যক মত তৈলাদি দিয়া রন্ধন করিয়া থাকেন। এই প্রকারে প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি কম সুস্বাদু হয় না। তবে দেশ ভেদে আহারের রীতি, নীতি পদ্ধতি বিভিন্ন হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা।—ছায়াবিহীন সারযুক্ত হাল্কা অথবা শক্ত দোয়াঁস মাটি।

সার।—"ভেড়া"র সার, গোবর-সার, অথবা মিশ্র-সার।

বপনাদি প্রণালী।—নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রথম কালেই বীজ বপন করিলে—বীজ ও চারা বৃষ্টিপাত ও রৌদ্রেতাপ হইতে রক্ষা করা আবশ্যক। বাঁধাকপির বীজ ও চারা যেরূপে রক্ষিত হইয়া থাকে—লেটুসেরও চারাদি সেইরূপে যত্ন-পূর্ব্বক উৎপন্ন

করিতে হইবে। এতৎ সম্বন্ধে বাঁধাকপির অধ্যায় দ্রষ্টব্য। বীজ উচ্চ হাপরে বপন করিয়া—চারা সম্পূর্ণরূপে নির্গত হইলে—প্রত্যেক চারা চারি বা পাঁচ ইঞ্চ পৃথক করিয়া দিতে হয়। পরে গাছগুলি অপেক্ষাকৃত বড় হইলে—ক্ষেত্রে রোপণ করা হইয়া থাকে। চাষের জমী, সার প্রয়োগে লাঙ্গলাদি দ্বারা যে যথারীতি প্রস্তুত করিতে হইবে—সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেক চারা চাষের জমীতে বা ক্ষেত্রে প্রত্যেক দিকে বার হইতে পনর ইঞ্চ পৃথক রোপণ করিতে হয়।

বিশেষ কথা।—লেটুস্ দুই প্রকার—(১) বাঁধাকপি জাতীয়; ইহা অনেকটা বাঁধাকপির ন্যায় বাঁধে। (২) "কস্" জাতীয়; ইহা বাঁধে না।

বাঁধাকপি জাতীয় লেটুসের চওড়া, গোল পাতা হয় এবং জমির উপর হইতে পাতা ফেলিয়া বাঁধাকপির ন্যায় বাঁধিয়া উঠে। ইহার ডাঁটা আদৌ দেখা যায় না। কস্ লেটুস ঢেঁঙা হইয়া হইয়া উঠে, বাঁধাকপি না বাঁধিয়া ষাঁড়াইয়া গেলে যেমন দেখিতে হয়, ইহা দেখিতেও অবিকল সেইরূপ। বাঁধাকপি কচি অবস্থায় ঠিক কস্ লেটুসের মত দেখায়। ইহার পাতাগুলি কিছু লম্বা হয়। য়ুরোপবাসীর নিকট লেটুসের আদর অতি বিস্তর। তাঁহাদের মতে ক্যাবেজ লেটুস্ (ক্যাবেজ= বাঁধাকপি) অপেক্ষা কস্ লেটুসই খাইতে সুস্বাদু। লেটুস্ চাষের জন্য যে সময় নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে—তদ্ব্যতীত অন্য সময়েও ইহার চাষ চলিতে পারে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দারুণ গ্রীষ্ম ও অতিরিক্ত বর্ষার সময় বাদ দিয়া এবং শীত প্রধান স্থানে তুষার পাতের সময় বাদ দিয়া লেটুস চাষ করা সম্ভব। লেটুস চাষের জমি খুব সরস থাকা চাই। বঙ্গদেশে ভারি পসলা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সামান্য মাচান করিয়া তাহার উপর নারিকেল পাতা বা নারিকেলের ছোবড়ায় পাতলা ম্যাটিং করিয়া দিলে—লেটুস্ ফসল বাঁচাইয়া রাখা যায়। যেখানে তুষার পড়ে সেখানেও এইপ্রকারের কোন রূপ আচ্ছাদন আবশ্যক। এতটা সাবধান হইলে তবে অপেক্ষাকৃত জলদি লেটুস উৎপন্ন করা যায়। লেটুস্ গাছ ফুলিয়া বীজ হইবার সুচনা হইবার পূর্ব্বেই কাটা উচিত নতুবা লেটুস্ পাতার সুগন্ধ চলিয়া যাইবে। বহুদিন ধরিয়া লেটুস্ সরবরাহ করিবার একমাত্র কৌশল—এক সপ্তাহ অন্তর লেটুস্ বীজ বপন করা।

এখানে শীতপ্রধান দেশে লেটুসের বীজ তৈয়ারী করা সম্ভব। বাঁধাকপি, ফুল কপির মত ভাল সতেজ গাছ বীজের জন্য ছাড়িয়া দিতে হয়। কস ও ক্যাবেজ লেটুসের এক ক্ষেতে চাষ করিতে নাই, কারণ তাহা করিলে বর্ণ-শঙ্কর লেটুস উৎপন্ন হইবে। গাছ হইতে দণ্ড বাহির হইয়া ফুল ধরিলে পাতলা বস্ত্র খণ্ড দিয়া বাঁধিয়া দিলে সুবীজ উৎপত্তির বিষয় কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

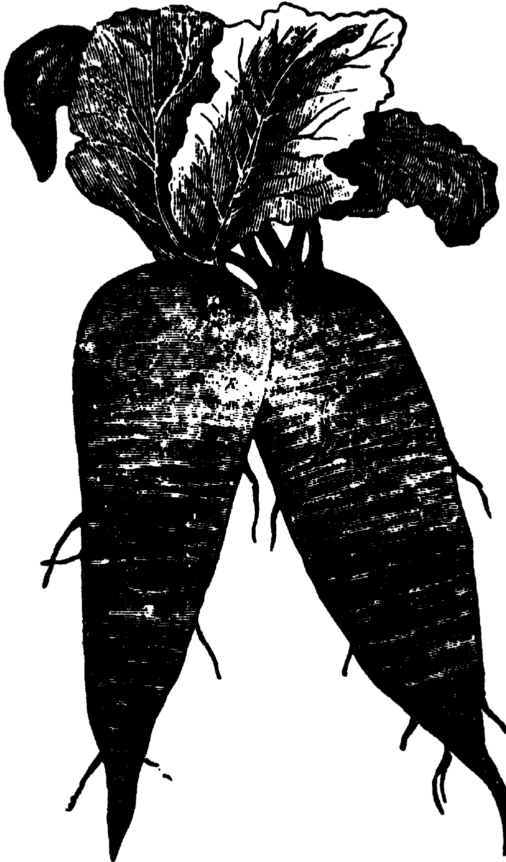
প্রধান প্রধান সহরের নিকট য়ুরোপীয় বাজারে যোগাইবার জন্য সুচাষী, লেটুস্ চাষ করিলে লাভবান হইতে পারেন।

জলসেচনাদি ও অবশিষ্ট কার্য্য।—যথারীতি জল দিবার ব্যবস্থা করিতে এবং আগাছা জন্মাইলে—"নিড়ানি" সাহায্যে তুলিয়া দিতে হইবে।

বীজের পরিমাণ—একরে ৩ আউন্স।

বিলাতী মূলা

বপনের সময়—আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ



দেশী মূলা—লাল।

মৃত্তিকা।—হাল্কা দোয়াঁস মাটি। মাটি ১॥০ কিম্বা ২ ফিট গভীর কর্ষিত হওয়া আবশ্যক।

সার।—পুরাতন গোবর-সার। গোবর প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে সারে পরিণত না হইলে ব্যবহার করা উচিত নয়। অপরিণত বা অর্দ্ধ-পরিণত সার প্রয়োগ করিলে, কীটাদির উপদ্রব উপস্থিত হয়। একর প্রতি মূলার জমিতে ৬/ মণ হিসাবে খৈল দিলে খুব ভাল ফসল হয়।

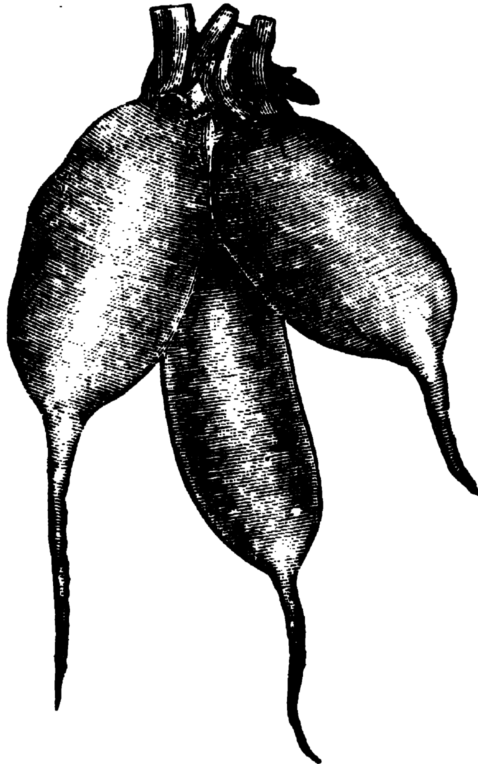
বপনাদি প্রণালী।—হাপরে বীজ না ফেলিয়া, চাষের জমীতে বীজ বপন করিলে ভাল হয়। নাতি প্রশস্ত "চৌকা" বা "পটী" নির্ম্মাণ করিয়া—সেই চৌকা বা পটীতে পাতলা করিয়া বীজ ছড়াইতে হয়। পরে চারা বহির্গত হইয়া—স্থানান্তরিত করিবার উপযুক্ত হইলে—যদি ঘন বোধ করেন, তবে চারি ইঞ্চি পৃথক প্রত্যেক চারাগুলি রাখিয়া বাকিগুলি উঠাইয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হইবে।

অবশিষ্ট কার্য্য।—যথারীতি জলসেচন ও মধ্যে মধ্যে আগাছা উৎপাটন ভিন্ন আর বিশেষ কিছু করিতে হয় না।

বিশেষ কথা।—বিলাতী মূলা, দেশী মূলা অপেক্ষা আকারে অনেক ক্ষুদ্র হয়। জলদী জাতীয়গুলি, বীজ বপনের একমাস বা দেড় মাসের মধ্যেই আহারের উপযোগী হইতে দৃষ্ট হয়। আস্বাদন—কোমল ও সুঘ্রাণ-যুক্ত। দেশী বোম্বাই মূলা ও জাড়ার মূলা খুব বড় হয় এক একটা ১০।১২ সের পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

আমাদের দেশের সাধারণ গরীবলোকের মূলা একটা মন্দ খাদ্য নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে মুটে, মজুর, গরীব চাষী দুই একটা মূলা খাইয়া একবেলা কাটাইয়া দেয়। ইহা তাদৃশ পুষ্টিকর না হইলেও সাধারণতঃ একটী ভাল তরকারি, ইহার ব্যঞ্জন অতি সুস্বাদু।

মূলা জমি তুলা হওয়া আবশ্যক—এই জন্য হাল্কা বেলে দোয়াঁস মাটি চাই। জমিতে না জল বসে—সুতরাং উঁচু জমি চাই। শাক খাইবার জন্য মূলা বারমাস বপন করা যাইতে পারে। অন্য সময় জল সেচন আবশ্যক—বর্ষায় তাহার আবশ্যক হয় না।

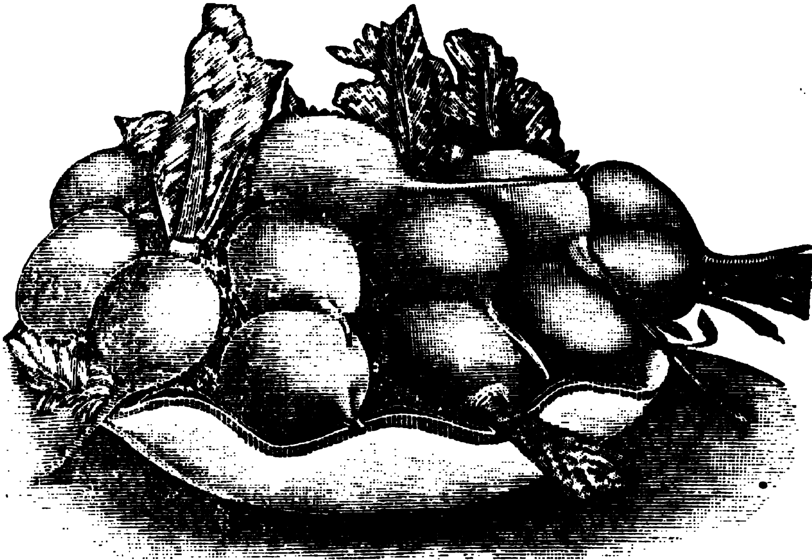


মূলা—ফ্রেঞ্চ ব্রেক ফাষ্ট—ইউরোপীয়গণের বড়ই আদরের

মূলা দুই শ্রেণীর—(১) আশু ; ২য় হৈমন্তিক বা পোষীয়।

আষাঢ় মাসে বর্ষারম্ভে মূলার চাষ হয়, এই মূলায় পাতা অধিক হয়, মূল তত বড় হয় না। পাটনাই মূলা বীজে খুব জলদী ফসল হয়, ইহা কিন্তু দেশী এই শ্রেণীর মূলা অপেক্ষা খাইতে ঝাল। আষাঢ় মাসে বীজ বপন করিলে ভাদ্র মাস নাগাইদ ফসল তৈয়ারি হয়। চাষীরা ভাদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় হিসাবে মূলা উঠাইতে থাকে এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের মধ্যে আশু খন্দ নিঃশেষ হইয়া যায়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিলে পৌষ মাঘ মাসের মধ্যে পৌষীয় খন্দ শেষ হয়। দুই বার বীজ বপন না করিয়া আগু পিছু তিন চারিবার বীজ বপন করা মন্দ নহে। মূলা জমি সরস থাকা চাই, শীতের হাওয়ায় জমি শুকাইতে আরম্ভ হইলেই মূলা ক্ষেতে তিন চারি বার জলসেচনের আবশ্যক।

মূলা ক্ষেতে বিঘায় ৫৲ পাঁচ মণ খৈল ছড়াইলে মূলা আশাতীত বড় হয় এবং ফসলের পরিমাণ শতাধিক মণ হইয়া থাকে।



মূলা—বিলাতী লাল গোল—দেখিতে বড়ই সুন্দর।

আকৃতিগত বিভিন্নতা ধরিয়া আমরা মূলাকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি—লম্বা, গোল, ও চেপ্টা সালগম-আকৃতি। কখন কখন লম্বা ও গোলের মাঝামাঝি একটা আকৃতি দেখা যায়। মূলার রঙেরও অনেক বিভিন্নতা—সাধারণতঃ সাদা, লাল, ঘোর লাল, কাল-রঙের মূলা দেখা যায়।

অনেকের বিশ্বাস শাদা মুলা খাইতে মিষ্ট হয় না—সেটা কিন্তু খুব ঠিক ধারণা বলিয়া বোধ হয় না। আমেরিকান সিলিশ্চিয়াল গোল মূলা অনেকটা ফ্লাট সালগমের মত। খাইতে সুমিষ্ট, বড় ৫'সের পর্য্যন্ত হয়। এই মূলা প্রদর্শনীতে পারিতোষিক লাভ করিতে অদ্বিতীয়।

বীজের পরিমাণ—এক একরে /১॥ সের।

পাটনাই সালগম

বপনের সময়—শ্রাবণের শেষ হইতে কার্ত্তিকের মধ্যকাল



সালগম।

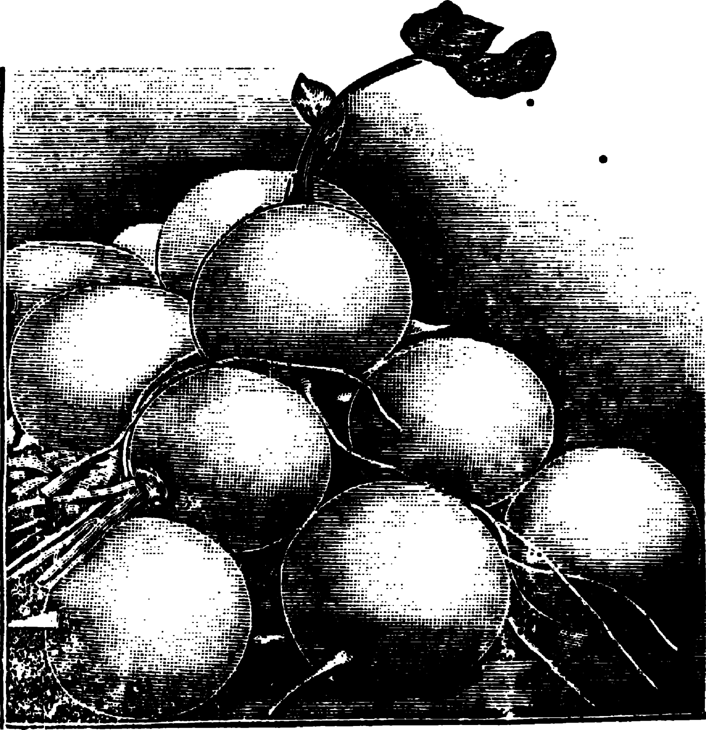
পাটনাই সালগমের বীজ পাটনায় জন্মায় এবং সেই বীজ হইতে চাষ হয় বলিয়া ইহার নাম পাটনাই সালগম হইয়াছে। বাঁধাকপি, ফুলকপির মত ইহাও কিছু দিন পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আসিয়াছে; এক্ষণে ইহা পাটনার জল হাওয়া খুব সহিতে পারিয়াছে এবং পাটনাই ফুলকপির মতপাটনা, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের স্থানীয় সজীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

শ্রাবণ মাসের পূর্ব্বে জমিতে গোবর সার দিয়া চষিয়া রাখিতে হয়। মূলা বা মূল জাতীয় সজী মাত্রেরই চাষের জন্য জমি গভীরভাবে কর্ষিত হওয়া আবশ্যক—মাটি ধুলিবৎ চূর্ণ হইবে। লোকে কথায় বলে—"মূলার জমি তুলা।" ক্ষেতে চারা বসাইবার পূর্ব্বে বিঘাপ্রতি আবশ্যকমত ৩/ মণ কিম্বা ৪/ মণ শরিষার সার ব্যবহার করিতে হয়। চারা বসাইবার পর আবশ্যকমত জল সেচনের আবশ্যক। এক একটি চৌকা করিয়া সালগম বসাইলে জল সেচনের সুবিধা হইতে পারে। সালগম মূলগুলি যত বড় হইতে থাকিবে ততই পাশের মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, কারণ প্রায় দেখা যায় যে, মূলগুলিতে রৌদ্র পাইলে কঠিন হইয়া যায় বা ফাটিয়া যায়। মাটি চাপা দিবার ও জল সেচনের সুবিধার জন্য সালগম শ্রেণীবদ্ধ রূপে রোপণ করা ভাল।

এমেরিকান রুটা বাগা (Ruta Baga) সালগমের খুব খ্যাতি আছে। ইহা পাটনাই সালগম, এমন কি অনেক বিলাতী সালগম অপেক্ষা খাইতে সুস্বাদু। য়ুরোপে সালগমের যথেষ্ট আদর; অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া তথায় গবাদি পশুকে খাওয়ান হইয়া থাকে। অল্পে অল্পে এদেশে সালগমের সমধিক প্রচলন হইতেছে।

বিলাতী সালগম

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ

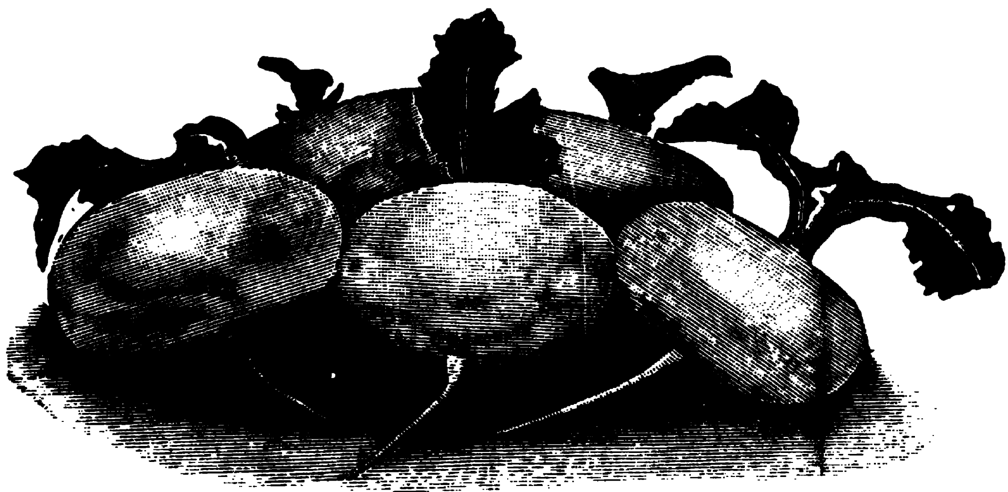


বিলাতী সালগম—স্নোবল।

বিলাতী সালগম এক্ষণে এদেশবাসীর নিত্য ব্যবহার্য্য সব্জী হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপিও হিন্দু বিধবাগণ ভ্রমবশতঃ সালগম খাইতে চাহেন না। পাটনাই সালগম মানুষের খাদ্য অপেক্ষা গবাদির খাদ্যে অধিকতর খরচ হইতেছে। সালগম খাইলে গরু ছাগলাদি হৃষ্ট পুষ্ট হয় ও তাহাদিগের দুধ বাড়ে। কাহার ও মতে সালগম খাইলে অর্শরোগ দমন হয়।

বিঘাপ্রতি পাঁচ, ছয় মণ খৈল খরচ করিলে এক বিঘায় ১০০ মণ পাটনাই সালগম উৎপন্ন হইতে পারে। এমেরিকান রুটা বাগার ফলন এক বিঘায় একশত মণেরও অধিক।

সালগম অনেক প্রকারের আছে—তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটির এ স্থলে প্রতিকৃতি দেওয়া হইল।



বিলাতী সালগম—ফ্লাটডচ।

মৃত্তিকা।—সারপূর্ণ হাল্কা দোয়াঁস মাটি। অল্পবিস্তর এঁটেল মাটিতে জন্মিয়া থাকে। যে মাটিতে চুণের ভাগ কম তাহাতে সালগম ভাল হয় না।

সার।—মিশ্র-সার অথবা অন্য কোন বিশেষ সার।

বপনাদি প্রণালী ও জলসেচন।—বীজ হাপরে বপন না করিলেও চলে। ক্ষেত্রে বপন কবিলে বিশেষ সুবিধা হয়। সালগম চাষে মৃত্তিকা একটু বিশেষরূপে কর্ষিত হওয়া আবশ্যক। ছোট ছোট "পটী" প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বীজ পাতলা করিয়া বপন করিতে হয়। মাটি শুষ্ক থাকিলে বীজ বপন করিয়াই জল সেচন করিতে হয়। পাটনাই সালগম বীজ অল্পাধিক বর্ষা থাকিতে বপন করা হইয়া থাকে। তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কারণ পাটনাই বীজ এতদ্দেশোৎপন্ন বীজ। কাজেই এখানকার জল বায়ু সহ্য করিতে পারে। বীজ বপনের পরে চারা প্রস্তুত হইলে, প্রত্যেকটী ছয় হইতে নয় ইঞ্চি পৃথক বসাইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটীর মধ্যের ব্যবধান ১ ফুট × ৬ ইঞ্চ হওয়া আবশ্যক। চারা উদ্বৃত্ত হইলে অন্যস্থানে রোপণ করা হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে আবশ্যকানুযায়ী জলসেচন করিতে হয়, কোন সময়ে জলাভাব না হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইতে হয়।

অবশিষ্ট কার্য্য। ক্ষেত্রে আগাছা উৎপন্ন হইলে, তাহা নিড়ানি দ্বারা তুলিয়া ফেলিতে হয় এবং গাছের মূলদেশের মাটি সময়ে সময়ে খুসিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বীজের পরিমাণ—প্রতি একরে ৬ আউন্স।

মৎস্য

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কৃষি পরিদর্শক
শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত

মৎস্য বলকারক ও সুস্বাদু খাদ্য। বিশেষ কারণ ব্যতীত বাঙ্গালী প্রত্যহ মৎস্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। মৎস্য ব্যতীত বাঙ্গালীর আহার কিছুতেই তৃপ্তির হয় না। অসংখ্য নদ নদী, খাল, নালা, পুকুর পরিপূর্ণ বঙ্গদেশে ধনী নির্ধন সর্ব্ব বাঙ্গালীর গৃহেই মৎস্য সুলভ। পূর্ব্ববঙ্গে মৎস্য অপর্য্যাপ্ত। মৎস্যাহারী বাঙ্গালী জাতি সাহসী। পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালী পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালী কর্ত্তৃক "বাঙ্গালের গোঁ" উপাধিতে খ্যাত আছেন। পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালী অনায়াসে বৃহৎ নদী সাঁতার দিয়া পার হইতে পারে, অনায়াসে কর্দ্দমাক্ত দীর্ঘ পথ নগ্নপদে চলিয়া যাইতে পারে। তাহারা সারাদিন জলবৃষ্টিতে ভিজিয়া প্রফুল্লচিত্তে কৃষিকার্য্য করে। তাহাদের কিছুতেই দুঃখ ক্লেশ নাই। তাহাদের জমি উর্ব্বরতার আকর—বিনা সারেও প্রচুর শস্য প্রদান করে। তাহাদের ঘরে ভাত আছে; আর খাল নালায় মাছ আছে। মাছ ধরায় অলসতা দুর হয় ও চতুরতা বৃদ্ধি হয়। মৎস্যভোজী বলিয়া বাঙ্গালী চতুরতা ও কার্য্যক্ষমতায় সুবিখ্যাত।

মৎস্যে জিলেটিনের ভাগ অধিক থাকায়—ইহা সাধারণতঃ মাংসের মত সুপাচ্য নহে। তবে শিঙ্গি, মাগুর, বাটা, মৌরলা প্রভৃতি মৎস্য লঘুপাচ্য ও রোগীর পথ্য। কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট মৎস্যের তৈলের অধিকাংশ চর্ম্মের সহিত সংলগ্ন, সুতরাং ছাল বাদ দিয়া গ্রহণ করিলে ইহারা অতি লঘুপাচ্য হয়। সাধারণতঃ শল্কবিহীন মৎস্যের ছালে তৈলের অধিকাংশ অবস্থান করে।

মেদকারিতাগুণে সাধারণতঃ মৎস্য, মাংসের সমকক্ষ না হইলেও বঙ্গদেশীয় কোন কোন মৎস্য, মাংস অপেক্ষা হীন হইবে না। তৈলাক্ত মৎস্য সহজে জীর্ণ করা যায় না। তৈলাক্ত মৎস্যমাত্রেই শ্লেষ্মানাশক কিন্তু গুরুপাচ্য। শল্কবিহীন মৎস্যমাত্রের একটা প্রধান কাঁটা থাকে। ইহাতে তুষকাঁটা থাকে না। ছোট ছোট শল্কবিশিষ্ট মৎস্যে অত্যধিক কাঁটা থাকে।

আমরা নিম্নে সায়েন্স এসোসিয়েসন দ্বারা পরীক্ষিত বঙ্গদেশীয় কতিপয় মৎস্যের রাসায়নিক খাদ্যগুণ, শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রায় বাহাদুরের "খাদ্য" হইতে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

মৎস্যের নাম।		শ্বেতসার শর্করা	তৈল	প্রোটিড্	ভস্ম
মিরগেল (ছাল, কাঁটা বাদে)		... ০	০·৩	১৮·০	১·০
মাগুর	...	... ০	০·৫	১৯·৫	১·৩
টেংরা	...	... ০	০·৩	১৭·২	১·৩
গলদা চিংড়ি (মুড়া বাদে) ...		... ০	০·৫	১৫·৪	০·৯
মেডিকেল কলেজের পরীক্ষিত					
রুই (ছাল ও কাঁটা বাদে)		... ০	৭·৪	১৭·৫	...
আমেরিকার কৃষিবিভাগ দ্বারা পরীক্ষিত					
মৎস্য (গড়)	...	... ০	২·৫	১০·৫	১·০
চিংড়ি মাছ	...	... ০·২	০·৭	৫·৯	০·৮
কাঁকড়া	...	... ০·৬	০·৯	৭·৯	১·৫

আহারের জন্য তাজা মাছই ব্যবস্থা করা যায়। অভাবে লোণা, শুষ্ক ও টিনে রক্ষিত মৎস্য ব্যবহৃত হইতে পারে। লোণা ও শুষ্ক মৎস্য গুরুপাক। অসাবধানতার সহিত রক্ষিত টিনের মৎস্য বিকৃত ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে।

তাজা মৎস্যের ফুলকা লাল ও চক্ষু উজ্জ্বল। টিপিলে ইহা নরম বলিয়া বোধ হইবে না, কিম্বা ইহাতে কোন খারাপ গন্ধ থাকিবে না।

রোহিত মৎস্য

রোহিত মৎস্যের প্রধান। ইহা যেমন বলকারক, তেমনি সুস্বাদু, কিন্তু গুরুপাক। ইহার পোণা লঘুপাচ্য। রোহিত মৎস্যের মস্তক, মস্তিষ্ক রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকারী বলিয়া খ্যাত।

মিরগেল।

বৃহৎ মৎস্যের মধ্যে রোহিতের পরই মিরগেল মৎস্য সুখাদ্য ও প্রিয়।

কাৎলা

কাৎলা মাছ রোহিত ও মিরগেলের ন্যায় সুস্বাদু নহে। কিন্তু ইহার মাথা রোহিত মিরগেলের মাথার ন্যায় ফলকারী।

ইলিস

ইলিস মাছের মত সুস্বাদু আর কোন মাছ নাই। অত্যধিক পরিমাণে তৈল থাকায় ইলিস অত্যন্ত গুরুপাক। ইহা আহারে কোষ্ঠকাঠিন্য করিয়া থাকে।

ভাঙ্গন

সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী লবণাক্ত জলে ভাঙ্গন মাছ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত তৈলাক্ত ও সুস্বাদু।

ভেটকি

ভেটকি মাছ সমুদ্রের নিকট লবণাক্ত জলে জন্মে। ইহাতে অধিক কাঁটা থাকে না। বৃহৎ ভেটকি তৈলাক্ত ও সুস্বাদু।

আড় মাছ

আড় মাছ বড় হইলে তৈলাক্ত ও সুস্বাদু হয়। ইহাতে এক প্রকার গন্ধ অনুভূত হয়। শল্কহীন শুভ্রবর্ণের সমস্ত মৎস্যেই অল্পাধিক গন্ধ অনুভূত হয়।

বোয়াল

বোয়াল মাছ বৃহৎ আকার প্রাপ্ত ও তৈলাক্ত হয়। অনেক লোকের নিকট বোয়াল মাছ প্রিয়। কিন্তু অনেকেই বোয়াল মাছকে কুপথ্য বলেন। তৈলাক্ত বলিয়া বোয়াল গুরুপথ্য সন্দেহ নাই। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে ইহা শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। অধিক তৈলাক্ত বলিয়া ইহা শ্লেষ্মানাশক না হইয়া শ্লেষ্মাবর্দ্ধক কিরূপে হইবে ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। ঘৃত ও তৈল শ্লেষ্মা নাশকর।

শিলং বা টাইন

শিলং মাছ, বোয়াল অপেক্ষাও বৃহৎ হয়। বৃহৎ মাছকে টাইন বলে।

চিতল

চিতল মাছ বিলক্ষণ বড় হয়। ইহাদের এক জাত ছোট, তাহাকে ফলি বা ফলাট বলে। চিতল ও ফলি মাছে বিলক্ষণ তৈল আছে। অত্যধিক কাঁটা থাকা প্রযুক্ত চিতল ও ফলি মাছ আহার করা কষ্টকর। কিন্তু পেটির মাছে ছোট কাঁটা থাকে না।

মাগুর

মাগুর মৎস্য লঘুপথ্য বলিয়া খ্যাত ও রোগীর পথ্য।

শিঙ্গি

শিঙ্গি মৎস্য মাগুরের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট।

কই

শল্ক বিশিষ্ট ক্ষুদ্র মৎস্যের মধ্যে কই শ্রেষ্ঠ। কই মৎস্য বাঙ্গালীর অতি প্রিয় খাদ্য।

চিংড়ি

চিংড়ি মাছ অতি মুখপ্রিয় কিন্তু গুরুপথ্য। ইহার সুগন্ধ প্রীতিদায়ক। গলদা চিংড়ির মাথার ন্যায় সুস্বাদু খাদ্য বিরল।

কাঁকড়া

কাঁকড়া অতিশয় দুষ্পাচ্য কিন্তু সুস্বাদু।

শুষ্ক মৎস্য

শুষ্ক মৎস্যের গন্ধ অতিশয় অপ্রীতিকর। রন্ধন করিলে ইহার গন্ধ থাকে না। শুষ্ক মৎস্য দুষ্পাচ্য।

লোণা মৎস্য

লোণা মৎস্যও শুষ্ক মাছের মত গুরুপাচ্য।

দগ্ধ মৎস্য

দগ্ধ মৎস্য লঘু পথ্য। দগ্ধ করিলে আমিষ গন্ধ বিদূরিত হয়। এই নিমিত্ত অশৌচাদির জন্য দীর্ঘকাল মৎস্যাহার না করিলে প্রথমে দগ্ধ মৎস্য খাইবার বিধি আছে।

সিংহভূমে সাবাই ঘাস

ভারতীয় কৃষিসমিতির উদ্যান তত্ত্বাবধারক

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত

সিংহভূমের জঙ্গলে বিশেষতঃ ময়ুরভঞ্জের সিমানায়, হলুদপুকুর পরগণায় প্রচুর পরিমাণে সাবাই ঘাস পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকে এই ঘাস হইতে দড়ী তৈয়ারি করে। এই দড়ি ঘর বাঁধা, খাটিয়া বোনা, পশুরক্ষণ, কুপ হইতে জল তোলা প্রভৃতি নানাকার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। অধুনা এই ঘাস হইতে কাগজ তৈয়ারি হইতেছে। সেইজন্য ইহার আদর ক্রমশঃই বাড়িতেছে। সিংহভূম হইতে রেলযোগে এই নিমিত্ত নানাস্থানে এই ঘাস প্রেরিত হয়।

সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে, সাহেবগঞ্জের পার্ব্বত্য প্রদেশে এই ঘাসের রীতিমত চাষ হইয়া থাকে। ভাগলপুর বিভাগে যে সকল জমিতে অন্য চাষের সুবিধা হয় না সেই সমস্ত জায়গায় সাবাই ঘাসের চাষ হইতেছে। তথায়ও স্থানীয় লোকে ইহাদ্বারা রজ্জু তৈয়ারি করিয়া থাকে কিন্তু রজ্জুর জন্য অতি অল্প ঘাসের আবশ্যক; কাগজের জন্য ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

চাষপ্রণালী—জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে পাহাড়ের ফাঁকা জায়গায় এই ঘাসের বীজ বপন করা হয়। প্রতি বিঘায় এক সের হিসাবে বীজ ছড়ান হইয়া থাকে। বর্ষাকালে দুই একবার ক্ষেতটি নিড়াইয়া দিতে হয়। দুই তিন বৎসরে

ঘাসগুলি এক ফুট বড় হইয়া উঠে, তখন ইহাদিগকে ধানের গাছের মত নাড়িয়া রোপণ করিতে হয়। ৫ বা ৬টা চারা দুই ফিট অন্তর এক একটি গর্ত্তে রোপিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের গায়ে সমতল ক্ষেতেই ঐ সকল চারা রোপণের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়। অধিক পুরাতন ঘাসের ঝাড় হইতে চারা লইয়া চাষ করিলে ঘাস ভাল জন্মায় না—এই কারণে নূতন ঘাসের চারা লইয়া আবাদ করা কর্ত্তব্য। ক্ষেতটিও পরিষ্কার হওয়া চাই, আগাছা থাকিলে অনিষ্ট হয়। ওজনে এক মণ চারাতে এক বিঘা জমির (১৪৪০০ বর্গফিট) চাষ চলে। এই চাষের জন্য কেহ কোন সার প্রয়োগ করে না। রোপণের পর দুই বৎসরের মধ্যে ঘাস কাটিবার উপযুক্ত হয়। তখন হইতে প্রতি বৎসর একবার ঘাস কাটিয়া লওয়া হয়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ঘাস কাটা হয়, কখন বা মাঘ মাস পর্য্যন্ত বিলম্ব হয়। একটা ক্ষেত হইতে ক্রমাগত ২০ কিম্বা ২৫ বৎসর ঘাস কাটা চলে। ক্ষেতটি প্রতি বৎসর নিড়াইয়া আগাছা শূন্য করিয়া রাখা, কোন ঝাড় মরিয়া গেলে তাহার স্থানে নূতন চারা বসান এবং পুরাতন ঝাড়গুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া একটু পরিষ্কার করিয়া দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই।

ফলন—প্রতি বিঘায় ৩০ হইতে ১০০ বোঝা ঘাস পাওয়া যায়; প্রতি বোঝার ওজন ১০।১২ সের।

চাষে খরচ—সিংহভূমে কোথাও ইহার চাষ কেহ করে না, সুতরাং ইহার চাষে তথায় কত খরচ পড়িবে তাহা অনুমান করা সম্ভব নহে, তবে সাহেবগঞ্জে চাষের খরচ দেখিয়া একটা হিসাব ঠিক করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহার চাষের জন্য ভাল জমির আবশ্যক নাই।

সাহেবগঞ্জের হিসাবে এক বিঘায় খরচ এক মণ চারার মূল্য ...	১৲
চারা রোপণ জন্য চারিজন মজুরের মজুরী ৶০ আনা হিঃ ...	৸০
ক্ষেত নিড়াইতে ৬ জন মজুর	১৶০
ঘাস কাটিতে ৮ জন মজুর	১৷০
„ বাঁধিতে ২ „ „	।৶০
ঘাস জন্মিবার উপযুক্ত জমির খাজনা প্রতি বিঘা	।০
	৫৲

বিঘা প্রতি ৮ হইতে ২৫ মণ ঘাস উৎপন্ন হইতে পারে। এক মণ ঘাসের দাম ১৲ টাকা ধরিয়া লইলে এবং প্রতি বিঘায় গড়ে ১৬ মণ ঘাস উৎপন্ন হইবে বলিয়া একটা হিসাব ঠিক করিয়া লইলে বিঘা প্রতি খরচবাদে ন্যূন কল্পে ৫৲ টাকা মুনফা থাকিবে।

সিংহভূম হইতে ঘাস বাণ্ডিল বাঁধিয়া কলিকাতার সন্নিকট বালি, টিটাগড় প্রভৃতি কাগজের কলে চালান আসিতে আমরা দেখিয়াছি। মিলে পৌঁছিয়া দিলে প্রতি মণে ১।০ বা ১।৶০ আনা দাম মিলিয়া থাকে।

সরকারী বিবরণীতে জানা যায় যে এই ঘাস কলিকাতার মিলগুলিতে পাঠাইবার জন্য ঘাসের গাঁইট বাঁধা ৪টা কল আছে; তিনটা কল সাহেবগঞ্জেই এবং একটা মির্জাচৌকিতে। প্রতি বৎসর তথা হইতে ১॥ লক্ষ গাঁইট কলিকাতায় রপ্তানি হয়। প্রত্যক গাঁইটের ওজন ৩ মণ, গাঁইট বাঁধিতে প্রতি মণে খরচ ৵০ আনা, রেল মাশুল, মুটে, গরুরগাড়ীভাড়া ইত্যাদি খরচ মণ করা ।০ আনা এবং চাষের খরচ গড়পড়তা মণে ।৵০ আনা ধরিয়া লইলে ও ক্ষতি, খেসারৎ বা অন্যান্য খরচ হিসাবে কিছু বাদ দিলেও এবং মিলের দর মণকরা ১।০ হইলে, মণে ।৶০ হইতে ॥০ আনা লাভ হইতে পারে। চাষীরা কিন্তু স্বয়ং মিলে ঘাস পাঠায় না, সুতরাং চাষী ও ব্যবসায়ীর মধ্যে এই লাভটা বিভাগ হইয়া থাকে এবং চাষীরা কেবলমাত্র অর্দ্ধেক লাভ পাইয়া থাকে।

সিংহভূম হইতে কত ঘাস চালান হয় তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই।

গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেত্রে আলুচাষের পরীক্ষা

আলুচাষের এই সময় আসিয়াছে। বিগত বর্ষের গোবিন্দপুর-কৃষিক্ষেত্রের আলু চাষের ফলাফল এখানে সংক্ষেপে বলা হইল;—

দার্জ্জিলিঙ ও নৈনিতাল দুই প্রকার আলুর চাষ করা হইয়াছিল। দার্জ্জিলিঙ আলুর, নৈনিতাল অপেক্ষা ফলন অনেক অধিক। নৈনিতাল ১ বিঘায় ৪৩॥ মণ এবং দার্জ্জিলিঙ ৭১॥০ মণ উৎপন্ন হইয়াছিল। আউশ ধান কাটিয়া আলু বসান হইয়াছিল। আউশ ধানের ক্ষেতটি তিন বিঘা পরিমাণ, তাহাতে ২৫ গাড়ী গোময়াদি গোয়ালের সার প্রদান করা হইয়াছিল। আলু চাষের সময় আর গোময় বা অন্য কোন সার দেওয়া হয় নাই, কেবল বিঘা প্রতি ৫ মণ রেড়ীর খৈল দুই বারে দেওয়া হয়; আলু বসাইবার ঠিক পূর্ব্বে প্রতি গর্ত্তে একবার, তারপর আলুর গাছ বাহির হইয়া একটু বড় হইলে তাহাতে জল সেচন করিয়া গোড়াগুলি খুসিয়া দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিবার সময় দ্বিতীয়বার খৈল দেওয়া হয়। পূর্ব্ব পরীক্ষার সহিত তুলনা করিয়া বুঝা গেল যে রেড়ীর খৈল দিলে জমিতে একটু অধিক জল টান হয়, রেড়ী অপেক্ষা সরিষা খৈল বিঘা প্রতি ৭॥০ মণ হিসাবে দিতে পারিলে বোধ হয় উভয় আলুরই ফলন বাড়িত। বিগত বর্ষে কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী জায়গায় পৌষ মাসের প্রথমে বৃষ্টি হওয়ায় আলুক্ষেতের মাটি বসিয়া গিয়াছিল; সুতরাং আলুর ফলন এতদঞ্চলে ঠিক আশানুরূপ হয় নাই। উভয়বিধ আলুর মধ্যে দার্জ্জিলিঙ আলুতে কম পোকা

লাগিয়াছিল এবং দুই রকম আলু রাখিয়া দিয়া এবার দেখা গেল যে, পচিয়া দার্জ্জিলিঙ আলুর সিকি বাদ গিয়াছে কিন্তু নৈনিতাল আলু ছয় আনা মাত্র ভাল ছিল, বাকী নষ্ট হইয়াছে।

আমাদের ক্ষেতজাত আলু বীজের সহিত নূতন আমদানী পাহাড়ী আলুর বীজের ভালমন্দ পরীক্ষায় স্থির করিতে পারা গেল যে, নূতন আমদানী পাহাড়ী বীজই ভাল। আমাদের ক্ষেতের বীজ হইতে গাছ কিম্বা ফসল ভাল হয় নাই। বলা বাহুল্য বাঁশের মাচান করিয়া তাহাতে বালি দিয়া আলোক বিহীন ঘরে আলু বীজ খুব যত্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল। এবারও পুনরায় আলু রাখিয়া পরীক্ষা করা যাইবে।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

বঙ্গদেশে পাটের আবাদ—১৯১১

ইতিপূর্ব্বে পাটের আবাদের একটা আনুমানিক হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে সরকারী শেষ বিবরণী পাঠে জানা গিয়াছে যে বিগত ৩ বৎসর অপেক্ষা পাটের আবাদের পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে।

১৯০৭	সালে	পাটের	আবাদী	জমির	পরিমাণ	৯৩১,২০০	একর
১৯০৮	”	”	”	”	”	৫৪৮,৭০০	”
১৯০৯	”	”	”	”	”	৫৫৫,৪০০	”
১৯১০	”	”	”	”	”	৫৭৩,৮০০	”
১৯১১	”	”	”	”	”	৬২৫,১০০	”

ইহা ছাড়া কুচবিহার রাজ্যে ২০,০০০ একর পরিমাণ জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে।

বাঙলার মধ্যে পূর্ণিয়া জেলায়ই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। সমস্ত পাটের তিন ভাগের এক ভাগ এখানেই জন্মায়।

একরে ৩ বেল হিসাবে পাট জন্মিয়াছে ধরিয়া লইলে কুচবিহার সমেত সমগ্র বাঙলায় মোটামুটি হিসাবে ১, ৬৯১, ৩০০ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ঠিক করা যাইতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ডিরেক্টর ঠিক করিয়াছেন যে তাঁহার এলাকায় ২, ৪৬১, ৩০০ একর জমিতে মোটামুটি ৬, ৫৪১, ৪০০ বেল পাট জন্মিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে বাঙলা এবং পূর্ব্ববঙ্গ দুই জড়াইয়া পাটের আবাদী জমির পরিমাণ ৩, ১০৬, ৪০০ একর এবং উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৮, ২৩৩,০০০ বেল।

বঙ্গদেশের পাট ব্যতীত বিগতবর্ষে নেপাল হইতে ৪২,৭৫১ বেল, উত্তর ভারত হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলযোগে ৩৫,৮৬০ বেল; মান্দ্রাজ হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলযোগে ৫৬৪ বেল রপ্তানি হইতে দেখা গিয়াছে।

বঙ্গীয় বণিক সমিতি বলিতেছেন যে, বিগত ১লা জুলাই ১৯১০ সাল হইতে ৩০শে জুন ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত ৩,৫৩১,০৬৬ বেল পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে এবং ভারতীয় মিল সমুহে ৩,৯৭৯.৬০৬ বেল খরচ হইয়াছে। ইহার উপর স্থানীয় লোকের ব্যবহার জন্য ৫০০,০০০ বেল খরচ হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে। এই বণিক সমিতির হিসাবে ৮,০১০০,৬৭২ বেল বিগত বর্ষের পাটের পরিমাণ স্থির হইয়াছে। কৃষি বিভাগ বিগত বর্ষের পাটের পরিমাণ ৭,৯৩২,০০০ বেল অনুমান করিয়াছিলেন।

বঙ্গের ভাদুই শস্য—১৯১১

বিগতবর্ষ অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে অধিক পরিমাণ জমিতে ভাদুই শস্যের আবাদ হইয়াছে। বর্ত্তমাণ বর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ অনুমান ১০,৪১৪,০০০ একর; বিগতবর্ষে ৯,১৩০,৯০০ একর জমিতে ভাদুই ফসলের আবাদ হইয়াছিল। ফসল কি পরিমাণ উৎপন্ন হইবে অদ্যাপি ঠিক হয় নাই কিন্তু অনুমান যে চৌদ্দ আনা ফসল জন্মিবে।

বঙ্গদেশে তিল—১৯১১

বাঙলা এবং উড়িষ্যায় তিলের আবাদ নিতান্ত কম হয় না। সাহাবাদ জেলায় সারণ, মজঃফরপুর এবং মানভূমে এবং মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান এবং খুলনায় তিল চাষ হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমান বর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ ৩৫,০০০ একর। একর প্রতি যদি গড়ে ৪½ মণ* তিল জন্মিয়া থাকে তবে এই হিসাবে সমগ্র বঙ্গে ৪,০০০ টন তিল উৎপন্ন হইয়াছে।

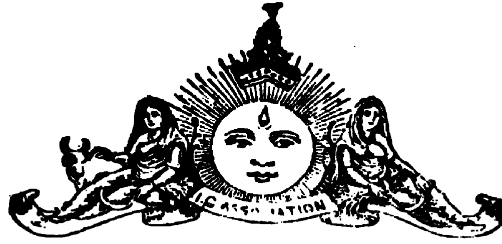
পঞ্জাবে তিল—

বাঙলা অপেক্ষা পঞ্জাবে তিল অধিক উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান বর্ষে আবাদী জমির পরিমাণ ৭২,৫০০ একর।

আসামে সরিষা—১৯১১

আসামের মাটি অধিক দিন পর্য্যন্ত বেশ সরস থাকে এইজন্য তথায় সরিষার চাষটা ভালরূপ হয়। বর্ত্তমান বর্ষে ৩,৩০,০০০ একর পরিমাণ জমিতে সরিষার আবাদ হইয়াছে। অনুমান ৫৪,৮০০ টন সরিষা উৎপন্ন হইবে।

বঙ্গে হৈমন্তিক ধান্য—বিগত বর্ষে ২০,৯৪৭,৪০০ একর পরিমাণ জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে আবাদী জমির পরিমাণ অনুমানে ১৯,১৭৬,৮০০ একরের অধিক হইবে না। ধান রোপণের সময় বৃষ্টির অভাবে অনেক জমিতে এ বৎসর আবাদ হয় নাই।



অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল।

বোম্বাই অঞ্চলে ফলের চাষ

সাধারণ কৃষিকার্য্যের হিসাবে ধরিতে গেলে বোম্বাই প্রদেশের নানাস্থান সর্ব্বাধিক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে। শুধু কৃষি পদ্ধতির উৎকর্ষতার জন্য যে এইরূপ হইয়াছে তাহা নহে। বোম্বাই প্রদেশের সমুদ্রের উপকুলবর্ত্তী অনেক স্থানই সাধারণতঃ বেশ উর্ব্বর। জল বায়ুও নাতি শীতোষ্ণ। সেইজন্য এই সমুদয় অঞ্চলে ফল ও মশলার চাষের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এ স্থলে বোম্বাই প্রদেশের উত্তর কানাড়া বিভাগের ফল ও মশলার চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব। আশা করি আমাদের পাঠকবর্গ ইহা হইতে অনেক আবশ্যকীয় তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

উত্তর কানাড়া বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণতম অংশ। ইহার মধ্য দিয়া সমুদ্রের সহিত সমান্তরাল রেখায় মহ্যাদ্রি উত্তর দক্ষিণে ধাবিত। মহ্যাদ্রির পূর্ব্ব দিকে সমতল ক্ষেত্র এবং পশ্চিমে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা ক্রমশঃ নামিয়া আসিয়াছে। এই সমুদয় পর্ব্বত মালার পাদদেশেই বিস্তৃত সমুদ্র উপকুল। মহ্যাদ্রির গিরি সমূহ নিবিড় জঙ্গলপরিপূর্ণ। ব্যাঘ্র, বন্য বরাহ, সম্বর, হরিণ প্রভৃতি বন্য পশুর অভাব নাই এবং সঙ্কীর্ণ গিরিনদী সমূহের প্রাচুর্য্যও সমধিক। মহ্যাদ্রির পূর্ব্বাংশ অর্থাৎ উত্তর-ঘাট এবং পশ্চিমাংশ অর্থাৎ দক্ষিণ-ঘাট এই দুই অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থার সমধিক তারতম্য রহিয়াছে।

সাধারণতঃ উত্তর কানাড়ায় যে সমুদয় ফল উৎপাদিত হয় তাহার মধ্যে আম, কাঁটাল, হিজলী বাদাম, নারিকেল কদলী, বিভিন্ন প্রকারের লেবু ও কমলা লেবু, বাতাবী, পেয়ারা, দাড়িম ও আতা অন্যতম। উত্তর-ঘাটে ফলের বাগানগুলি গিরিরাজীর উপত্যকায় স্থিত; ইহারা পর্ব্বত শৃঙ্গ ও অরণ্য পাদপ বেষ্টিত হইয়া

অসীম শোভা প্রদর্শন করে। এই স্থানেই কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ শুপারি, গোল মরিচ ও অন্যান্য মসলার বাগান অবস্থিত। নিম্ন-ঘাটেও পর্ব্বতের পাদ দেশেই সাধারণতঃ বাগান রচিত হইয়া থাকে। এখান হইতে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি ফলের রীতিমত বহির্ব্বাণিজ্য আছে। এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় ফল উৎপাদিত হয়। তাহাদের বহির্ব্বাণিজ্য নাই ; দেশেই কাটতি হইয়া যায়। এইরূপ ফলের মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটি বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য :—মোনা, আঞ্জীর. তেঁতুল, পেঁপে, আনারস, গোলাপজাম, জামরুল, কুল, কামরাঙ্গা, বিলিম্বি, আখরোট ও কাট বাদাম। কানাড়ার বাজারে এই সমুদয় ফলের অল্প বিস্তর আমদানি হয়। মফঃস্বলেই কিন্তু কাটতি অধিক।

কানাড়ার আম্রের জাতি ও তদ্‌সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য অনেকের আগ্রহ হইতে পারে। তাঁহাদিগের অবগতার্থ বলিতে পারা যায় যে, এই স্থানের কতিপয় জাতীয় আম্র যথা, কারনান্দিন্, ইসাদ্, (দুই জাতীয়, কাল ও শাদা) করিয়েল্, মম্‌রাদ ও আলফান্সো আমাদিগের দেশীয় আম্র অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর। ফল পাঁচ, ছয় বৎসরেই হয়, কিন্তু ১৫ বৎসর না হইলে গাছ সম্পূর্ণ রূপে পুষ্টি প্রাপ্ত হয় না। উক্ত কতিপয় জাতীয় আম ওজনে প্রায় ১ সের হইতে দেড় সের পর্য্যন্ত ফল হয়। কারনান্দিন্ আমের, গাছ প্রতি প্রায় ১০০০ ফল হয়। কারনান্দিন্ আমের বাগানে বিক্রয়ের দর শতকরা ২৲ হইতে ৩৲ টাকা। কারনান্দিন্ আম ডিম্বাকৃতি ও এই আম গাছ অনেক দিবস থাকে। ইসাদ্ গোলাকার আম, অধিকতর মিষ্ট ও রসযুক্ত। ইহার মূল্য ১৷৹ হইতে ২৲ টাকা। অন্যান্য জাতীয় আমের সাধারণ দাম শতকরা ১৲ টাকা।

এতদঞ্চলে যে সমুদয় অম্ল আম হয় তাহার অধিকাংশই চাটনি প্রস্তুতের জন্য বিলাতে রপ্তানি হইয়া যায়। এই শ্রেণীর আম্রের পাঁচ ছয়টি জাতি আছে। তাহাদের গড়ে ফসল প্রায় গাছ প্রতি ১৫০০, মূল্য শতকরা গড়ে ৷৹। যে সমুদয় স্থানে উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র উৎপাদিত হয় তন্মধ্যে মুলকি ও কুন্তার নাম প্রসিদ্ধ। কাঁটাল এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলিয়া থাকে যে তাহার উদ্বৃত্তাংশ গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাঁটালের মূল্য শতকরা ৩৲ টাকা ও তদপেক্ষা নীচ জাতীয় ফলের দাম শতকরা প্রায় ৷৵৹। কানাড়া বিভাগের অনেক স্থলে নারিকেল ও শুপারির চাষ এক সঙ্গে হইয়া থাকে। সমুদ্রের উপকুলস্থ নারিকেল গাছ সমূহের নারিকেল সুস্বাদযুক্ত ও সুমিষ্ট। পক্ষান্তরে উত্তর-ঘাটের নারিকেলে তৈলের মাত্রা ও জলের পরিমাণ অধিক। নদীর পলি ভিন্ন নারিকেল চাষে অন্য কোনও সার ব্যবহৃত হয় না। নারিকেল চাষে বিঘা প্রতি প্রায় ৬৫৲।৬৬৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

কমলা লেবুর মধ্যে সান্তারা ও লাড্ডু নামক দুইটি জাতির অধিকতর চাষ হয়। সান্তারা প্রায় গোলাকার ও লাড্ডু বর্ত্তুলাকার। সান্তারা ওজনে প্রায় ৩½ ছটাক ও লাড্ডু ১½ ছটাক হইয়া থাকে। ফলের তারতম্য হেতু ইহাদের মূল্য শতকরা ১॥০ হইতে ২৲। এতদ্ভিন্ন পাতি, কাগজী, গোঁড়া লেবু প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

এতদঞ্চলের কলা অত্যন্ত সুমিষ্ট ও সুস্বাদ যুক্ত। প্রসিদ্ধ কলা সমূহের নাম—রাম বেল, নীরবেল, মিঠাবেল, কারিবেল, মহীশূর বেল, চন্দ্রবেল ও অনাবেল। অনাবেল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম, প্রায় ১ ফুট লম্বা। ইহা কখন কখনও শুষ্ক অবস্থাতেই ব্যবহৃত হয়। উৎকৃষ্ট জাতীয় কলা সমূহকে এতদ্দেশীয় চাষীরা গাছে পাকিতে দেয় না। সুপুষ্ট অথচ সবুজ অবস্থায় কাটিয়া অন্ধকারে রাখিয়া পাকাইয়া লয়। তাহাতে কলাও বেশ রসযুক্ত থাকে ও সুপক্ক হয় এবং হনুমান, কাট বিরালী ও পাখী প্রভৃতিতে কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না।

বস্তুতঃ কানাড়া দেশে ফলের বাগান হইতে সাধারণতঃ বিঘাপ্রতি সমস্ত খরচ বাদে ১০০৲ টাকা হিসাবে লাভ হয়। নারিকেল গুপারি প্রভৃতির বিষয় স্বতন্ত্র।

কানাড়া প্রদেশে যে সমুদয় মসলার চাষ হইয়া থাকে তন্মধ্যে গুপারিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমি অধিকার করে। গুপারির চাষ উত্তরঘাটেই হয়। প্রথমে চারাগুলিকে বসাইয়া গুপারিক্ষেতে কলা রোপণ করা হয়। গুপারি গাছগুলি একটু বড় হইলে কলা তুলিয়া ফেলিয়া ছোট এলাচের ঝাড় বসান হয়। প্রায় ১৩ বৎসরে গুপারি গাছে ফল ধরে। গুপারি চাষে লাভের পরিমাণ বিঘা করা প্রায় ১০৫ টাকা। গুপারি বাগানে গোল মরিচেরও চাষ হইয়া থাকে। মরিচ লতাগুলিকে গুপারি-গাছের উপর তুলিয়া দেওয়া হয়। প্রায় ছয় বৎসর পরে মরিচ ধরিতে আরম্ভ হয়। তখন বিঘা প্রতি ১॥০ মণ হইতে ১ মণ ৩০ সের পর্য্যন্ত গোল মরিচ পাওয়া যায়। কুমতার নিকট উৎকৃষ্ট জাতীয় পানও জন্মিয়া থাকে। তিন বৎসর পরে বিঘাপ্রতি প্রায় ১৩৫০০ পান পাওয়া যায়। উহার মূল্য প্রায় ১৩॥০ টাকা।

পূর্ব্বোক্ত মসলার গাছ প্রভৃতি ব্যতীত লবঙ্গ, জায়ফল, আদা, দারুচিনি ও লঙ্কাও কানাড়া প্রদেশে অনেক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এস্থলে ইহা বলা উচিত যে, সাধারণ চাষীরা মশলার বাগান করে না। হবিগ্ নামক ব্রাহ্মণ জাতিই মসলার গাছ প্রভৃতির চাষ করিয়া থাকে। ইহারা যেরূপ বুদ্ধিশালী তেমনই পরিশ্রমী। মসলার বাগানের অনেক পাইট আছে; সেইজন্য লাভের মাত্রা তত অধিক হয় না। বিঘা প্রতি ৬০৲।৫০৲ টাকা হইয়া থাকে। কিন্তু যে বৎসর পাশ্চাত্য বাজারে মসলার টান অধিক পড়ে সে বৎসর বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে।

বোম্বাই, হাবলি ও দারবারে মসলা চালান হইয়া যায় এবং তৎসমুদয় স্থান হইতে নানা দেশে রপ্তানি হয়।

আম সত্ত্ব

গাছ পাকা টাট্‌কা আম বহুদূরে পাঠাইতে বহুবিঘ্ন আছে। অধিক দিন সেই আম টাট্‌কা থাকে না। আজ কাল টাট্‌কা আম দূর দেশে প্রেরণ জন্য বহুবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। আম পাকিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমগুলি গাছ হইতে পাড়িয়া বোঁটাগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। পরে আমগুলি জলে ধৌত করিয়া—বোরিক এসিড জলে ধৌত করিলে ভাল হয়—বোঁটার অগ্রভাগে মোম টিপিয়া দিতে হইবে। অতঃপর আমগুলি যত্নপূর্ব্বক টিস্যু পেপার বা পাতলা ঘুঁড়ির কাগজে মুড়িয়া এবং কাঠের বাক্সে প্যাক করিয়া বরফ ঘরে স্থাপন পূর্ব্বক দূর দেশে পাঠাইতে হয়। ইহাতে যে ব্যয় বাহুল্য আছে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এত যত্ন করিয়াও কিছুকাল রাখিলে তাহাদের স্বাদের ও গন্ধের কিছু না কিছু তফাৎ হয় না, এ কথা কেহ নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন না। সিরাপে বায়ুবদ্ধ টীনে আম সংরক্ষিত হইলে অনেক দিন ঠিক থাকে বটে কিন্তু তাহাতেও টাট্‌কা আমের রসাস্বাদন ইচ্ছা মেটে না। মাটির কলসিতে মধুর ভিতর আম রাখিয়া দিলে বহুকাল ঠিক থাকে এবং স্বাদে গন্ধে বায়ুবদ্ধ টীনে রক্ষিত আম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু আজকাল খাঁটি মধু মেলা ভার এবং যদি বা মেলে তাহার দাম এত অধিক যে এইরূপে আম রাখিয়া অসময়ে আম খাইবার সখ মেটান ধনীগণের পক্ষে ভিন্ন সম্ভব হয় না। মধুতে আস্ত আম রাখা চলে কিন্তু বায়ুশূন্য টীনে আস্ত আম রাখিতে গেলে অনেক অধিক খরচ পড়ে।

কলিকাতার সহরে পাকা, কাঁচা নানা রকমের আম সারা বৎসরই মেলে, কিন্তু বারমাস ল্যাংড়া, ফজলী, বোম্বাই আমের রসাস্বাদন ভাগ্যে ঘটে না। অসময়ে যে আম পাওয়া যায় তাহা তেমন সু-তার হয় না। এই জন্য আম রক্ষায় এত চেষ্টা। এদেশের কথা ছাড়িয়া দিলে যে দেশে আম পাওয়া যায় না সেই দেশেই আমের অধিক আদর। কাঁচা, পাকা বা সংরক্ষিত করিয়া হউক সেই সকল দেশে আম পাঠাইতে পারিলে লাভ আছে।

পাকা আমের সত্ব বাহির করিয়া অসময়ের জন্য রাখিয়া দিবার প্রথা বহুকাল হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। ইহাতে অসময়ে আম খাইবার সখ অনেকাংশে মেটে। খাঁটি আমসত্ব, খাঁটি গরম দুধে ফেলিয়া খাইলে মনে হয় পাকা টাট্‌কা

আম দুধ খাইতেছি। আম রক্ষার এরূপ সহজ ও সুন্দর অন্য কোন উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু খাঁটি আমসত্ত্ব মেলা ভার, এদেশে নিভাজ খাঁটি জিনিষের আদর বড় কেহ বুঝে না। খাঁটি জিনিষ চড়া দরে বিক্রয়েও যে লাভ আছে, বাজারে সে জিনিষের কদর যে অক্ষুণ্ণ, আশুলাভের জন্য এ কথা অদূরদর্শী ব্যবসায়ীগণ একবারও ভাবেন না। কলিকাতায় প্রতি বর্ষে কম টাকার আমসত্ত্ব বিক্রয় হয় না। এখানে দারবঙ্গের আমদানী ভাল আমসত্ত্ব বলিয়া টোকো আমসত্ত্ব বিক্রয় হইয়া থাকে। আবার আমসত্ত্বের বদলে তেঁতুল-সত্ত্ব, আমসত্ত্ব বলিয়া বিক্রয় হইতেছে। পোকা পড়া, পচা আম তেঁতুলের সহিত গুলিয়া এই অপরূপ আমসত্ত্ব প্রস্তুত হয়। দুর্ব্বুদ্ধি ব্যবসায়ীগণ ইহাতেও কেবল সন্তুষ্ট হয় না, চটের উপর আমের সত্ত্ব ঢালিয়া তাহার উপর আবার পাত্‌লা চট বিছাইয়া তাহার উপর আবার সত্ত্ব ঢালিয়া খুব পুরু আমসত্ত্ব প্রস্তুত করে এবং পুরু আমসত্ত্ব বলিয়া বাজারে চড়া দরে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করে। দাঁতদিয়া এইরূপ আমসত্ত্ব ছেঁড়া ভার, আর আমসত্ত্বের দরে লোককে চট কিনিতে হয়। ভাল আমসত্ত্ব হইলে লোকে এক টাকা সের দরে কিনিতেও প্রস্তুত। খাঁটি আমসত্ত্ব বিদেশে রপ্তানি হইলেও তাহার আদর নিশ্চয়ই হইবে। আমসত্ত্ব সযত্নে রাখিতে পারিলে দীর্ঘকাল ঠিক থাকিবে। ইহা বিদেশে পাঠাইতেও কোন অসুবিধা নাই। অতি সামান্য খরচেও ইহা বিদেশে রপ্তানি করা যাইতে পারে।

পত্রাদি

সব্জীক্ষেতে উই—

মিঃ এগার্টন্ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পুরী—লিখিতেছেন যে তাঁহার ক্ষেতটির মাটি বালি আঁশ, তার উপর উইয়ের উৎপাত আছে। তাঁহার মটর ও অন্যান্য সব্জী ভাল হইতেছে না এবং শিকড় উইয়ে খাইতেছে।

উত্তরে তাঁহাকে জানান যাইতেছে যে গোবর সার এবং পাঁকমাটি চূর্ণ ক্ষেতে ছড়াইতে পারিলে তবে জমিটি সব্জী চাষের উপযুক্ত হইবে। কিন্তু গোবর সার ব্যবহারে একটু শঙ্কা আছে, ইহাতে উইয়ের উপদ্রব বাড়িতে পারে। গোবর সার বা পশুশালার সার ব্যবহার না করিয়া পাঁক মাটির সহিত কাইনিট মিশাইয়া ছড়াইলে, জমির কতক পরিমাণে উন্নতি হইবে এবং কাইনিট ব্যবহার হেতু উই নিবারিত হইবে। দশ পাউণ্ড মাটির সহিত ১ পাউণ্ড কাইনিট ব্যবহার করিতে হইবে। কাইনিট খনিজ পটাস প্রধান সার। মটর, সীমের ক্ষেতে পটাস সারই

আবশ্যক। কাইনিট অভাবে কলা পাতা বা তামাক পাতার ছাই ব্যবহার করিলে উই নিবারিত হইবে।

কপিক্ষেতে গুয়ানো সার—

গুয়ানো সার ১ পাউণ্ড বা অর্দ্ধসের ২০।২৫টা মাত্র কপিগাছে দেওয়া যায়। এক পাউণ্ড সারের দাম প্রায় ‖০ আনা। সুতরাং বড় কপি ক্ষেতে গুয়ানো সার দিতে হইলে খরচ অনেক পড়ে। কপিক্ষেতে সরিষার খৈল সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। খৈল পচাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। প্রত্যেক গাছে তিন বারে প্রতি এক ছটাক হিসাবে তিন ছটাক খৈল দিলে খুব বড় কপি হয়।

কাইনিট বা জর্ম্মান পটাস—যুক্ত প্রদেশ, অযোধ্যা, মধ্য প্রদেশ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রদেশে উইয়ের উৎপাতে অনেক ফসল নষ্ট হয়। ফলের বাগান করিতে হইলে উইয়ের কবল হইতে চারা গাছগুলি রক্ষা করা এক বিষম সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে উই হইতে ক্ষতি প্রতি বৎসর দশ কিম্বা বার লক্ষ টাকার কম নহে। কিন্তু উই নিবারণের বিশেষ কোন উপায় এখানে চাষীগণ বা উদ্যান স্বামীগণ করিতে পারে না। সম্প্রতি নিউ সাউথ ওয়েলসের গভর্ণমেণ্ট কীটতত্ত্ববিদ্ বলিতেছেন যে কাইনিট কিম্বা জার্ম্মান পটাস যদি সাররূপে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে উই নিবারিত হইতে পারে। প্রত্যেক গাছ রোপণ করিবার সময় যদি মাটির সহিত এক পাউণ্ড হিসাবে কাইনিট মিশাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাতে আর উই লাগিবে না। কাইনিট এক প্রকার খনিজ পটাস প্রধান সার। শস্য ক্ষেত্রে অন্য সার বা মাটির সহিত বিঘা প্রতি ৫০ হইতে ১০০ পাউণ্ড কাইনিট ব্যবহার করিলেই চলে। বাজারে সর্ব্বদা কাইনিট পাওয়া যায় না। গভর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগ যদি এই কাইনিট প্রাপ্তির সুবিধা করিয়া দেন তাহা হইলে সাধারণ চাষীতে ইহার পরীক্ষা করিতে পারে। কাইনিটের দাম খুব বেশী নহে, পাওয়া যাইলে ।০ আনা পাউণ্ডের অধিক হইবে না। দাম অধিক হইলেও যদি ইহা ব্যবহার করিলে ফসলের হার বাড়ে তবে তাহা সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য।

বিগতবর্ষে আমরা আমাদের গোবিন্দপুর ক্ষেত্রের উই নিবারণের জন্য কলা পাতার ছাই ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহাতে উই নিবারিত হইয়াছিল। তামাক পাতার ছাই ব্যবহারে আরও উপকার হইতে পারে। ২৪ পরগণায় উইয়ের

তাদৃশ উৎপাত নাই, যেখানে উই অত্যন্ত অধিক সেখানে কাইনিট কিম্বা ছাই ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক।

আলুর পরিবর্ত্তে দেষীন—দেখিতে দেখিতে সব্জীর মধ্যে আলু প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী খুঁজিলে আজকাল বোধ হয় এমন স্থান মিলিবে না যেখানে আলুর ব্যবহার নাই বা যেখানকার লোক আলু খাইতে ভালবাসে না। এই আলুর কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে। দেষীন খাইতে আলুর মত সুস্বাদু ও সুঘ্রাণ। ইহা পৃথিবীর পূর্ব্বদিকের দ্বীপপুঞ্জে জন্মায়। ইহা আলুর ন্যায় মাটির নীচে জন্মায়। চাষ খুব সহজ। নীচু জলাজমিতেও জন্মিতে পারে। ইহার স্থানীয় নাম তারো। স্থানীয় লোকে ইহা খায়। এমেরিকায় গিয়া ইহার নাম হইয়াছে দেষীন। সম্ভ্রান্ত সমিতির ভোজে ইহা স্থান পাইয়াছে এবং ইহার স্বাদ ও গন্ধে আলুর অপেক্ষা প্রশংসা হইয়াছে। খুব শাদা আলু হইলেই লোকে খুব পছন্দ করে, দেষীন কিন্তু নানা বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায় এবং বর্ণবৈচিত্র হেতু ইহার অধিক আদর।

গোলাপী, লাল, ফিকে, নীল বা হরিদ্রা রঙের দেষীন সিদ্ধ বা অন্যপ্রকারে রন্ধন করিয়া ভোজন পাত্রে সজ্জিত হইলে অতি মনোহর দেখায়। এমেরিকার খাদ্য-বিচারকগণ বলেন যে, দেষীন আলু অপেক্ষা কিছুতেই কম বলকারক নহে। ইহার প্রচলনে আলুর চাষ একেবারে উঠিয়া না যাইলেও এই নূতন সব্জী নিশ্চয়ই আমাদের মূল্যবান খাদ্যের মধ্যে স্থান পাইবে। বাঙলাদেশে জলা ভূমির অভাব নাই। এই জলা ভূমি হইতে যদি আলুর মত এই রকম একটী সব্জী চাষ করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে বাঙলার চাষীগণের বিশেষ লাভ হইবে। সম্ভবতঃ ইহা মুখী কচু কিম্বা ওলজাতীয় কোন প্রকার সব্জী। আমরা এমেরিকা হইতে এই নূতন সব্জীর বিশেষতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

গমনশীল রেলের গাড়ীর বেগ—১৮২৫ অব্দে ইংলণ্ডে যখন গতিশীল ইঞ্জিনের প্রথম সৃষ্টি হইল তখন ঐ ইঞ্জিনগুলি ৬ মাইল পথ ১ ঘণ্টায় চলিত। তার পর যখন ইঞ্জিনের বেগ বাড়িল তখন ঘণ্টায় ১২ মাইল হিসাবে চালাইবার পরামর্শ স্থির হইল। ইহা শুনিয়া সেই সময়ের একজন রেলওয়ে সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ বলিয়াছিলেন যে ঘণ্টায় ১২ মাইল হিসাবে গাড়ী চালাইলে যে ভয়ানক অনর্থ ঘটিবে তাহা কল্পনা করা যায় না। সেই রেলগাড়ী এখন ঘণ্টায় ৭৫ মাইল হিসাবে চলিতেছে এবং তাহাতে কোন অনর্থ ঘটিতেছে না। আবার এখন বিমান কল হইয়াছে। তাহা এখন খেলা তামাসার মত চালান হইতেছে এবং অল্প বিস্তর

যুদ্ধের কার্য্যে লাগিতেছে। ভবিষ্যতে বোধ হয় বিমান যানে চড়িয়া যুদ্ধ চলিবে এবং এই বিমান যানের সাহার্য্যে খুব সস্তায় দেশ দেশান্তরে যাতায়াত হইবে। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। ক্রমশঃ লোকের জ্ঞান বাড়িতেছে এবং অদ্য যাহা অসম্ভব কাল তাহা সম্ভব হইতেছে।

ধাতুর ক্ষয়—অনেক ধাতুতে যেমন বাহিরের হাওয়া লাগিয়া মরিচা ধরে ও ক্ষয় হয় সীসাতে সেরূপ ধরে না। এই কারণে পদক (Medals), পুষ্পাধার বা দীপাধার কেবল সীসায় তৈয়ারি না হইলেও তাহাতে অল্প বিস্তর সীসার ভাঁজ দেওয়া থাকে। এই সকল পদকাদি, এমন কি বিশুদ্ধ সীসাও কালে ধ্বংশ হইবে। সীসাতে কিন্তু মরিচা ধরে না তবে কেন ক্ষয় হয়। বহু পরীক্ষা ও অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে সীসক যখন মাটির ভিতর ছিল তখন তাহার ভিতর লবণাক্ত ধূলিকণা প্রবেশ করিয়াছিল ; এই পদার্থগুলি পরমাণুবৎ হইলেও ভবিষ্যতে ইহারা সীসকের ধ্বংশের কারণ হয়। উদ্ভিদ ও জীবদেহ যেমন জীবাণু দ্বারা ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়, ইহারাও সীসক ধাতুতে সেইরূপ জীবাণুর মত কার্য্য করে। জগতের কোন বস্তুই ধ্বংশকারী পদার্থের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে না।

পেপসিন্—পাকস্থলীতে খাদ্যের সহিত পিত্ত, অম্ল প্রভৃতি কয়েকটি রস মিশ্রিত হইয়া খাদ্যবস্তুর পরিপাক হয়। পেপসিন্ এই পরিপাচক রসের মধ্যে একটা রস। যাহার হজম শক্তি কম হইয়াছে তাহাকে পেপসিন খাওয়াইলে তাহার হজম শক্তি বাড়ে। পেপসিন্ জন্তুদিগের পাকস্থলী হইতে সংগ্রহ করা হয়। পেপসিনে যে কার্য্য হয়, পেঁপের আটায় সেই কার্য্য হইতে পারে। পেঁপের আঠা সুরাসারে গুলিয়া ঔষধ রূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। আধ পাকা পেঁপে খাইলে এই জন্য অগ্নি বৃদ্ধি হয়। কাঁচাপেঁপের ব্যঞ্জন খাইলে অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয়।

ছুরি কাঁচি চক্‌চকে রাখিবার উপায়—ছুরী, কাঁচি ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখিলে তাহাতে মরিচা ধরে। কিন্তু যদি ছুরী কিম্বা কাঁচি ব্যবহারের পর রাখিয়া দিবার সময় চক্‌চকে করিয়া সাফ্ করিয়া রাখা যায় বা সে গুলি নরম বস্ত্রখণ্ড দিয়া পুঁছিয়া শুষ্ক করা হয় এবং পরে ছাই দিয়া ঘষিয়া, ঝাড়িয়া ব্রাউন কাগজে মুড়িয়া দীর্ঘকাল ব্যবহার না করিয়া রাখিয়া দিলে তাহাতে মরিচা ধরিবে না ও চক্‌চকে থাকিবে।

সুপার ফস্ফেট অব্ লাইম্ বা বোন্ সুপার—হাড়ের গুঁড়া সল্‌ফিউরিক এসিডের সঙ্গে মিশ্রণে উক্ত পদার্থ প্রস্তুত করা হয়। ১০ সের সুপার ফসফেট প্রস্তুত করিতে হইলে ৭ সের হাড়ের গুঁড়া এবং ৩ সের সল্‌ফিউরিক এসিড আবশ্যক। উহাকে জলের সহিত মিশাইতে পারা যায়। এইজন্য ইহা উত্তম সার বলিয়া পরিগণিত। ধান্য, ইক্ষু, আলু প্রভৃতির চাষে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ইহা বিঘা প্রতি ২৷৷০ মণ অথবা ৩ মণ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। সুপার ফস্ফেট অব্ লাইম্ উত্তম সার হইলেও ইহা সাধারণ কৃষকদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। কারণ উহাতে বিস্তর ব্যয় হয় এবং হাড়ের গুঁড়াও সহজে পাওয়া যায় না। সাধারণ হাড়ের সার প্রয়োগে তাদৃশ আশু ফল পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐ পরিমিত অপর সারে (খৈল, গোময় প্রভৃতিতে) উহা অপেক্ষা শিঘ্র অধিক ফল লাভ হয়।

আলু ক্ষেতে জল—আলুর খন্দে প্রচুর জল সেচনের আবশ্যক হয়। আলুর জমি বেশ সরস থাকিলে তবে আলু ভাল জন্মায়। আলু রোপণের সময় হইতে তিন চাঁদে অর্থাৎ দুই মাসের মধ্যে আলুর ফসল তৈয়ারি হইয়া যায়, এই দুই মাসের ভিতর দুইবার আবশ্যক বোধ হইলে তিন বার জল সেচনের আবশ্যক হয়। ক্ষেতের চৌকা বা পটি ডুবাইয়া জল দেওয়া কর্ত্তব্য। জলাভাব হইলে আলুর ফলন কম হয়।

গৌরপুর পরীক্ষাক্ষেত্রে আলুক্ষেতে জল দেওয়ায় উপযোগিতা সমন্ধে পরীক্ষা হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা দেখাইতেছি—

এক একর জমিতে—উৎপন্ন আলু—বিনা সেচনে—১১৯৷০ মণ—দুইবার জল সেচনে—১৯৩৷৷০ মণ—জল দিবার খরচ—৪৫৲ টাকা। জল অনেক নিম্নে ছিল, তাহাতেই এত অধিক খরচ হইয়াছে, দুইবারে তবে জল ক্ষেতে উঠিয়াছে। দোনীদ্বারা সেচনের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল—জল-নালাতে জল চালাইয়া ক্ষেত ভিজান হইয়াছে। খরচ অধিক হইলেও জলসেচনের জন্য ৭৪॰ মণ আলু অধিক জন্মিয়াছে। আলুর মণ ২৷৷০ টাকা হিসাবে ধরিলে অতিরিক্ত খরচবাদে ১৪৪৲ টাকা অধিক লাভ হইয়াছে।

কৃষিক্ষেত্র স্থাপনে দারিদ্র নিবারণ—হলাণ্ডে সক্ষম সবলকায় ব্যক্তি যাহাতে ভিক্ষাবৃত্তি করিতে না পায় সরকার হইতে এরূপ বন্দোবস্ত আছে। তথায় দরিদ্রদের চাষবাসের জন্য অনেক জমি আছে। দরিদ্র বেকার লোক অন্য কোন কাজ কর্ম্ম না পাইলে এই স্থানে প্রেরিত হয় এখানে তাহাকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার পর তাহার নিজের চাষবাসের জন্য কতকটা জমি তাহাকে স্বল্প-হারে ইজারা দেওয়া হয়, এইরূপে সে ক্রমশঃ নিষ্কর্ম্মা ও পরের গলগ্রহ হইতে একজন উপায়ী কৃষক হইয়া উঠে। আমাদের দেশে এইরূপ একটা বন্দোবস্ত হইলে মন্দ হয় না।

ইংলণ্ডের মুক্তি ফৌজ শুধু দরিদ্রের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করিয়া নিরস্ত নহেন, তাঁহারা দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ভরণপোষণের উপায় জন্য স্থানে স্থানে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্র হইতে উপার্জ্জন করিতে শিখিয়া বহুসংখ্যক লোক আলস্য ও পাপের পথ হইতে মুক্তিলাভ করে। এ বিষয়ে মুক্তিফৌজ নামের স্বার্থকতা আছে।

ময়মনসিংহ জিলায় শঠির চাষ—প্রতি বৎসর এখানে ৫।৬ হাজার বিঘা জমিতে স্বতঃই শঠিগাছ জন্মিতেছে আবার যথারীতি বর্দ্ধিত হইয়া, মরিয়া যাইতেছে। নীচের কন্দগুলিও মাটীতে জন্মিয়া, প্রতি বৎসরই মাটী হইয়া যাইতেছে! বিঘা প্রতি দশ মণ করিয়া ধরিলেও, সমুদয় শঠির মূলের পরিমাণ ৬০,০০০ মণ হইবে। এই ৬০,০০০ মণ মূলে, অন্ততঃ, ৫০০০ মণ পালো প্রস্তুত হইতে পারে। কলিকাতার বাজারে শঠির উৎকৃষ্ট পালোর মূল্য ২৫৲-৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। সময় সময় আমদানী না হইলে, ইহা অপেক্ষাও দর বেশী হইয়া থাকে। প্রতি মণ ২০৲ টাকা করিয়া ধরিলেও, উক্ত পাঁচ হাজার মণ শঠির পালোর মূল্য এক লক্ষ টাকা হইবে। এই লক্ষ টাকার জিনিষ প্রতি বৎসরই, মাটীর নীচে থাকিয়া, মাটীতেই পরিণত হইয়া যাইতেছে। ময়মনসিংহ জিলায় শঠির পালো প্রস্তুত শিক্ষা দিতে পারিলে, এই লক্ষ টাকার জিনিষ বৃথা নষ্ট হয় না। উত্তর বঙ্গের নানা স্থানেও শঠিগাছ গুলি বৃথাই নষ্ট হইত; কিন্তু তাহা হইতে পালো প্রস্তুত করতঃ, কলিকাতায় রপ্তানি করিতে শিখিয়া, এস্থানের বহু পরিবারেরই ধনাগমের একটা নূতন উপায় হইয়াছে।

সার-সংগ্রহ।

শুষ্ঠি (শুঁঠ) আদা

শ্রীশশীভূষণ সরকার কর্ত্তৃক সংকলিত।

শুষ্ক আদারই নামান্তর শুণ্ঠী, আয়ুর্ব্বেদে ইহার পর্য্যায়ে বিশ্বভেষজ, মহৌষধ, শৃঙ্গবের প্রভৃতি নাম দেখা যায়; বস্তুত ইহার গুণকারিতা এত অধিক যে অধিকাংশ ঔষধে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে; এলোপ্যাথিক ও হাকিমীতেও ইহার প্রচুর ব্যবহার হয়। ফারসী ও আরবিতে ইহার নাম জিঞ্জিবিল, সম্ভবতঃ ইহা শৃঙ্গবের শব্দেরই অপভ্রংশ। এসিয়া মহাদেশের সর্ব্বত্র ইহা জন্মিয়া থাকে। হিমালয়ের ৪।৫ হাজার ফিট উচ্চ ভূভাগ হইতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয়; বঙ্গদেশের মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, যশোহর প্রভৃতি জিলায় ইহার বিস্তর চাষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজের শার্ণদ (Shernad) জিলাজাত শুঁঠ অতি উৎকৃষ্ট ও অধিকতর মূল্যে বিক্রয় হয়। ইহার আদি জন্মস্থান কোথায় নির্দ্দেশ করা কঠিন, কাহারও মতে চীনদেশ ইহার জন্মস্থান; শুনা যায় যবদ্বীপে (আধুনিক নাম জাভা Java) শৃঙ্গবেরপুর নামে এক পুরাতন নগর আছে সম্ভবতঃ ইহা হইতে শৃঙ্গবের নাম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে এবং জাভাই ইহার জন্মস্থান। কেহ কেহ মালায় উপদ্বীপের রাজধানী শিঙ্গারপুর (Singapure) হইতে শৃঙ্গবের নাম উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করেন। যাহা হউক এ সকল প্রমাণদৃষ্টে ভারতবর্ষ ইহার জন্মস্থান নয় বলিয়াই বোধ হয়। কথিত আছে ফ্রানসিস্কো ডি মেণ্ডোজা "Francisco de Mendoga" নামক জনৈক স্পেনীয় পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আমেরিকা ও জ্যামেকাতে সর্ব্বপ্রথম চাষ প্রবর্ত্তিত করেন। পঞ্জাবে ও উত্তরপশ্চিমের স্থানে স্থানে আট হইতে বার আনা পর্য্যন্ত সের দরে শুষ্ক আদাই বিক্রয় হয়, সুতরাং ইহা মূল্যবান ও ইহার প্রভূত প্রয়োজন বলিয়া ইহার চাষ বিশেষ লাভজনক। পাটের চাষে লাভ আছে সত্য, কিন্তু পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক; শুঁঠ পিপুল প্রভৃতির চাষে পরিশ্রম অল্প অথচ লাভ প্রচুর। বিলাতের বাজারে ১ হন্দর (প্রায় ৫৬ সের) জামেকা শুঠের মূল্য ৫০।৬০ শিলিং। পূর্ব্বে ইহা ১৮০ শিলিং পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইত। জামেকার শুঁট সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য হইলেও পরিমাণে অধিক উৎপন্ন হয় না, এ জন্য বিলাতের বাজারে ভারতবর্ষীয় শুঠের আদর ও আমদানী অধিক।

নিম্ন ভূমি, জলা, কঙ্করময় বা নিতান্ত এটেল মৃত্তিকাতে শুঁঠ আদৌ জন্মে না; তদ্ব্যতীত সকল প্রকার ভূমিতে উৎপন্ন হইলেও, কিছু এটেল মাটিরভাগ অধিক, উচ্চ ও সরস দোয়াঁস মৃত্তিকা ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। জঙ্গল কাটিয়া যে ভূমির নূতন পত্তন হইতেছে তাহাতেও ইহা সুন্দর জন্মে। ইহার চাসে প্রভূত জলের আবশ্যক হয়, এ জন্য ভূমি সরস ও সচ্ছিদ্র (well drained) মনোনীত করিতে হইবে। চৈত্র বৈশাখ মাসে হলদ্বারা ভূমি ৫।৬ বার গভীর কর্ষণ ও চূর্ণ করত তদবস্থায় রাখিয়া বৈশাখের শেষ বরাবর আর একটী বৃষ্টিপাত হইলে, পুনরায় কর্ষণ ও মই দিয়া সমতল করিতে হইবে, ইহার পর আর কর্ষণের আবশ্যক করে না, আদার ভূমি ১ হস্ত তিন পোয়া গভীর কর্ষিত ও সূক্ষ্ম চূর্ণিত হওয়া বিধেয়। অনেকের মনে করেন ইহার চাষে সার দেওয়া উচিত নহে; হলদ্বারা মৃত্তিকা উত্তমরূপ বিপর্য্যস্ত হইলেই হইল, কিন্তু এরূপ করিলে ফলন অল্প হয়, এইজন্য বিঘাপ্রতি ৩০।৪০ মণ শুষ্ক ও পচা গোময় সার দিতে হইবে। ভূমিতে প্রথমবার হলকর্ষণ করত সার ছিটাইয়া পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করিলে সার মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত হইয়া উদ্ভিদের সদ্য পোষণোপযোগী হইয়া থাকে। বর্ষার অতিরিক্ত জল নির্গমনের জন্য ক্ষেত্রটী একদিকে উচ্চ অপরদিকে কিছু নিম্ন এইরূপ ঢালুভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, নতুবা অধিক জল সঞ্চিত হইলে আদা পচিয়া যাইবে। গাছ জলবসা জমিতে বিশেষ জোর করে না।

যে আদা ৫।৬ মাস কাল মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত আছে, বীজের নিমিত্ত তাহাই ব্যবহার করা উচিত; পূর্ব্ব হইতে উত্তোলিত বাজারে বাত শুষ্ক আদার ভাল কলা (bulb) বাহির হয় না। বীজের নিমিত্ত সংগৃহীত বাজারে আদা ২।৩ ইঞ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কাটিয়া রোপণের ১৫ কিম্বা ২০ দিবস পূর্ব্বে আর্দ্র অথচ অন্ধকারময় স্থানে পোয়ালচাপা দিয়া রাখিতে হইবে অথবা স্বল্প গভীর খাদমধ্যে দুই ইঞ্চ আন্দাজ ছাই ছিটাইয়া তদুপরি ৩ ইঞ্চ দলভাবে আদা খণ্ড সকল রাখিয়া পুনরায় ছাই ও পোয়াল চাপা দিয়া, উপর্য্যুপরি যতক্ষণ না খাদ পূর্ণ হয় এইভাবে সাজাইয়া সর্ব্বোপরি পোয়াল চাপা দিয়া কোন আবরণ দিতে হইবে। ১০ অথবা ১৫ দিবসের মধ্যে আদার খণ্ড সমুহ হইতে ১ বা আধ ইঞ্চ পরিমাণ নূতন কলা বাহির হইলেই ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। ক্ষেত্র হইতে সদ্য উত্তোলিত আদায় এ সকল প্রক্রিয়া করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাস বরাবর একটী বৃষ্টি হইলে সমস্ত ক্ষেত্রে কোদাল দ্বারা দীর্ঘ পংক্তিবদ্ধ-ভাবে ১ হস্ত অন্তর ৫।৬ ইঞ্চ গভীর নালা কাটিয়া তন্মধ্যে ২ বিঘত অন্তর আদা খণ্ড বসাইয়া মৃত্তিকা চাপা দিতে হইবে, অনেকে অর্দ্ধ হস্ত তিন পোয়া অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে বায়ু চলাচল রোধবশতঃ ফলন অল্প হয়। গাছ বাহির

হইয়া যেমন তেজ করিতে থাকিবে, তেমনি হরিদ্রার দাঁড়া বাঁধার মত উভয় পংক্তি মধ্যস্থ মৃত্তিকা কোদাল দ্বারা কাটিয়া গাছের গোড়ায় সরাইয়া দিতে হইবে, ইহাতে বর্ষার অতিরিক্ত জল নির্গমেরও সুবিধা হয়। বর্ষায় বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব অল্প হইলে নালার মুখগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ এই মূলজ উদ্ভিদ অতিরিক্ত জলে যেমন পচিয়া যায় আবার অল্প জলেও সেইরূপ আদৌ বৃদ্ধি পায় না। কোথায়ও কোথাও বড় বড় আলি না বাঁধিয়া ভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করতঃ আলি বাঁধিয়া দেয়, ইহাতে ক্ষেত্রের সমস্ত জল খণ্ডে খণ্ডে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় একেবারে বাহির হইবার সুবিধা পায় না, শোষিত হইয়া বহু বিলম্বে অতিরিক্ত জল বহির্গত হয়। হরিদ্রা সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডেই রোপিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু শেষোক্ত প্রণালী মত আদা অতি সুন্দর ও অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে। বর্ষার জলে গাছ সতেজ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এ সময়ে মধ্যে মধ্যে নিড়ানী দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার করা এবং আইল মেরামত ও গাছের গোড়ায় মাটী ধরান ভিন্ন অন্য কোন পাইটের আবশ্যক হয় না।

ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর ও উত্তমরূপ প্রস্তুত হইলে তবে আশ্বিনের মধ্যেই সমস্ত ক্ষেত্রটী ১॥ দেড় কিম্বা ২ হস্ত উচ্চ গাছে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, মৃত্তিকা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সময়ে আর একবার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নিড়াইয়া দিতে পারিলে আদার নূতন ও কোমল কন্দগুলি (Rhizomes) মাটি আল্‌গা পাইয়া ও বায়ুর অভ্যন্তর প্রবেশ হেতু আকারে বৃহত্তর ও সুপুষ্ট হইয়া থাকে। আদা সুপুষ্ট ও পরিমাণে অধিক জন্মিলে অনেক সময় ক্ষেত্রের দাঁড়ার মৃত্তিকা অল্প বিস্তর ফাটিয়া যায়। পৌষ মাঘ বরাবর শীতের প্রকোপে গাছ শুষ্ক হইয়া আইসে, এ সময়ে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ পাতাগুলি ঝরিয়া যাইবার দশ, বার দিবস পরে কোদাল দ্বারা দাড়াগুলি ভাঙ্গিয়া আদা বাহির করিয়া লইতে হইবে।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত শার্ণদ জিলায় ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শুঁঠ উৎপন্ন হয়। এই জিলার ভূমি স্বভাবতঃই আদার চাসের উপযোগী ও এখানকার মপলারা চৈত্র বৈশাখ মাসে ভূমি প্রস্তত করে। তৎপরে ৮×১॥ হাত চৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে ৯ ইঞ্চ অন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত কাটিয়া সার মিশাইয়া দেয়, পরে জ্যৈষ্ঠের প্রথম বর্ষণ হইলে ভূমি হইতে মূল সকল উঠাইয়া দুই ইঞ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া এক একটি গর্ত্তে রোপণ করিয়া মৃত্তিকা চাপা দিয়া তদুপরি কোন গাছের কাঁচা পাতা স্থূলভাবে আবরণ দিয়া থাকে। ইহাতে পাতাগুলি, অল্পদিনের মধ্যে পচিয়া সারের কার্য্য করে। এই বিশেষজাতীয় বৃক্ষপত্র ঐ জিলাতেই পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বৃক্ষপত্র

সারের জন্য ব্যবহার করিলে কীট জন্মিয়া ক্ষেত্রের ফসল নষ্ট করিতে পারে বলিয়া ব্যবহার হয় না। শার্ণদের আদার চাষের এইটুকুই বিশেষত্ব, অবশেষে শুঁট প্রস্তুত পর্য্যন্ত অপরাপর সমস্ত পাইট ও প্রণালী অন্য দেশের মত।

শুঁঠ প্রস্তুত—উত্তোলিত আদা জলে ধৌত করতঃ ছুরিকা দ্বারা শিকড় ও ত্বকভাগ উত্তমরূপ চাঁচিয়া পুনরায় একখানি শণ নির্ম্মিত চটের উপর মাজিয়া ঘসিয়া অবশেষে নির্ম্মল জলে পুনঃপুনঃ ধৌত করিয়া প্রখর রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক করিতে হইবে। শুঁঠের অভ্যন্তর ভাগ শ্বেতবর্ণ চূর্ণ পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে; একটু যত্নপূর্ব্বক সুপুষ্ট আদার উপরকার ত্বকভাগ সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া ফেলিলে উহা দিব্য শ্বেতবর্ণ ধারণ করে ও ত্বক্ কুঞ্চিত হইবার অবকাশ পায় না। বিশেষতঃ জল যত নির্ম্মল হইবে এবং পুনঃপুনঃ যত পরিষ্কাররূপে ধৌত করা যাইবে শুঁঠ ততই শুভ্রবর্ণ হইয়া থাকে। মেঘাবৃত দিবসে বা রাত্রে অনাবৃত অবস্থায় শিশিরে ফেলিয়া রাখিলে শুঁঠ খারাপ হয় ও বর্ণের মালিন্য ঘটে, এজন্য দিবাভাগে প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ রাত্রে উঠাইয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে সপ্তাহকাল মধ্যে শুষ্ক হইবার পর ইহাকে আর একবার উপর মাজিয়া ঘসিয়া ধৌত, পরিষ্কৃত ও শুষ্ক করিয়া লওয়া আবশ্যক। অতঃপর বস্তাবন্দী দুই মাসকাল ঘরে রাখিয়া পরে বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা যাইতে পারে। শুঁঠের মধ্যে যে গুলি অপুষ্ট ও হালকা এবং যাহা অনেক দিবস অযত্নে রক্ষিত হয় তাহা শীঘ্রই কীটাক্রান্ত হইয়া পড়ে, এ জন্য বিশেষ যত্নের সহিত শুঁঠ বস্তাবন্দী করিতে হইবে। শুঁঠ যত ভাল শুষ্ক, মসৃণ ও পরিষ্কার শ্বেতবর্ণ হইবে মূল্যও তদনুযায়ী অধিক হইবে। দেখাও যায় মৃত্তিকা ও চাসের তদ্বিরের অপেক্ষা এই প্রস্তুত প্রণালীর তারতম্যে শুঁঠের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিঘাপ্রতি চারি হইতে ছয় মণ পর্য্যন্ত শুঁঠ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। জামেকাতে বিশেষ যত্নে রোপিত ক্ষেতে একর প্রতি ২০০০ পাউণ্ড ফলন হয় এরূপ শুনা গিয়াছে।

সুপক্ক আদা ভূমি হইতে উঠাইয়া উষ্ণজলে সিদ্ধ করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহা কৃষ্ণবর্ণ হয়; কিন্তু উপরকার ত্বকভাগ চাঁচিয়া জলে ধৌত করতঃ শুষ্ক করিলে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। ইহাই যুক্তিযুক্ত; কারণ অনেক উদ্ভিদবিৎ শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে আদা দুই জাতীয় উল্লেখ করিয়াছেন। এদেশে যে শুঁঠ উৎপন্ন হয় তাহা প্রায়ই মেটে, শাদাটে বর্ণের, কর্কশ ও কুঞ্চিগাত্র অর্থাৎ ত্বকভাব ভালরূপ পরিষ্কৃত না হওয়ায় এবড়ো খেবড়ো। চূর্ণ করিলে অতি তীব্র অথচ মনোহর ঔষধিগন্ধি ঈষৎ পীত শ্বেতবর্ণ চূর্ণ পদার্থ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বাজারে ইহা ১৫ হইতে ২৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। নেপালের অন্তর্গত তৈলিহা, বুটোল, তানসেন এবং গোরখপুরের বাহাদুরগঞ্জ, তুলসীপুর, নৈপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে হিমালয়জাত

এক প্রকার অরুণা রঙের শুঁঠের আমদানী দেখা যায়, ইহা অত্যন্ত মলিন, কুঞ্চিতগাত্র, কর্কশ ও অপেক্ষাকৃত হীনগুণবিশিষ্ট, বাজারে ইহা ৬৲ টাকা অথবা অথবা বড় বেশী হয় তবে ৮৲ টাকা মণ দরে বিক্রয়।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

পৌষ মাস।

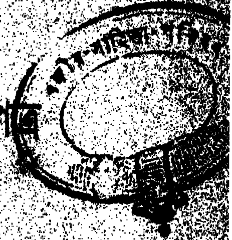
সব্জী বাগান।—বিলাতী শাক্-সব্জী বীজবপনকার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারস্লী (Parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছে। কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতি চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হইবে। গোড়া খুড়িয়া এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্র।—আলুর গাছে মাটি দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। এই সময় কিন্তু ফসল কোদালি দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকি গুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। আলু তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেজে বাড়িতে থাকে। আলু ক্ষেত্রে এমাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর, মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেঁপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

REGISTERED No. C 194.

সুবর্ণ



ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

পৌষ, ১৩১৮ ।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

দ্বাদশ খণ্ড,—৯ম সংখ্যা।

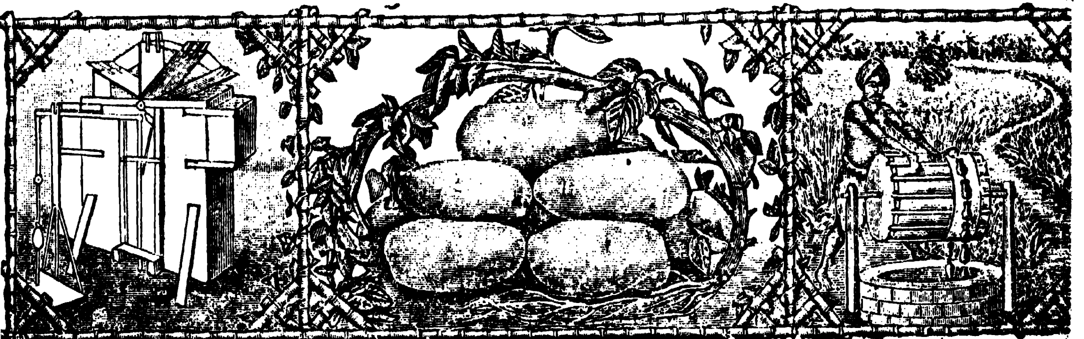
সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

পৌষ, ১৩১৮।



কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচীপত্র।

পৌষ, ১৩১৮ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B. and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL.

Devoted to Gardening and Agriculture. Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulation.

It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3-8. 1 Column Rs. 2.
½ Column Rs 1-8

MANAGER—"KRISHAK,"
162, Bowbazar Street, Calcutta.



কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ খণ্ড। | পৌষ, ১৩১৮ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

সব্জী চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ক্রেশ্ বা হালিম

বপনের সময়—আশ্বিন হইতে মাঘ

উদ্ভিদতত্ত্বের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে সর্ষপ জাতীয় সব্জীর মধ্যে এই শাকটিও স্থান পাইয়াছে।

মৃত্তিকা। সারযুক্ত দোয়াঁস মাটি। খুব মিহিমাটি এমন কি বালিতেও জন্মায়।

সার। গোবর সার বা মিশ্র-সার।

বপনাদি প্রণালী। ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হয়। হাপরের আবশ্যক করে না। বীজ হইতে চারা নির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত—জমী আবৃত রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। এতদর্থে নারিকেল পাতা প্রভৃতি আবরণ-স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। অধিকাংশ সময় আবরণের আবশ্যক হয় না। মাটি সরস রাখিতে পারিলেই হইল।

অবশিষ্ট কার্য্য। সময় মত প্রথম হইতে জলসেচন বিশেষরূপ আবশ্যক ও আগাছা উত্তোলন ভিন্ন—আর কিছু করিতে হয় না।

বিশেষ কথা। ক্রেশ্ বা হালিম একপ্রকার বিলাতী শাক। ইহা ইউরোপীয়গণ সালাদের মত ব্যবহার করে। তিন ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে—আহারের নিমিত্ত কাটিয়া ব্যবহার করিতে হয়। সপ্তাহে সপ্তাহে বীজ বপন করিলে—যখনই ইচ্ছা আহারের নিমিত্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। এক সপ্তাহের মধ্যে শাক তৈয়ারি হয়। যাঁহাদের সখ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় তাঁহারা ক্রেশ্ আস্বাদনে বঞ্চিত হন না। সাহেবরা ফুলের টবে ক্রেশ্ বপন করিয়া টবগুলি টেবিল সাজাইবার জন্য ব্যবহার করেন এবং দরকার হইলে শাক কাটিয়া খাইয়া থাকেন।

বীজের পরিমাণ—এক একরে ২ আউন্স।

ওয়েটার ক্রেশ্-জলহালিম

হিমালয় প্রদেশে এই উদ্ভিদের জন্ম—২০০০ ফিট উচ্চ পাহাড়েও ইহা জন্মায়। ভারতের সর্ব্বত্রই জলের ধারে হালিম জন্মায়। ইহার শাক খাইতে সুস্বাদু। ইউরোপীয়গণের ইহা অত্যন্ত প্রিয়।

তারামণি

ইহাও এক জাতীয় ক্রেশ্, ইহার শাক কাটিয়া খাওয়া হয়। বৃষ্টি শেষে আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিতে হয়। জমিতে ছড়াইয়া বীজ বোনা হয়। পাত্‌লা ভাবে না বুনিলে ভাল ঝাড় হয় না। তিন চারি ইঞ্চ বড় হইলে শাক কাটিয়া লইতে হয়। সরিষার তৈলের মত ইহার তৈল হয়। সেইজন্যও ইহার চাষের আবশ্যকতা দেখা যায়। কবিরাজগণ ইহা উদরাময়রোগে ও চর্ম্মরোগে ও সালসার জন্য ইহার বীজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ৪ হাত লম্বা ৪ হাত চওড়া একটি কেয়ারিতে এক আউন্স বা ২॥ তোলা বীজ বপন করিতে হইবে।

সরিষা ও বিলাতী মাষ্টার্ড

সরিষার কথা উল্লেখ করিয়া আমরা সর্ষপ জাতীয় উদ্ভিদের আলোচনার শেষ করিব। সরিষা ভারতের অনেক জায়গায় হয়। তৈল বীজের জন্য যে সরিষার চাষ হয় তাহার বিস্তৃত ক্ষেত আবশ্যক, যুক্ত প্রদেশে, পঞ্জাবে, পূর্ব্ববঙ্গে সুদীর্ঘ সরিষার ক্ষেতে যখন ফুল ধরে তাহার শোভায় নয়ন মন তৃপ্ত হয়। বিঘাপ্রতি তিন পোয়া, কিম্বা একসের বীজ বপন করিতে হয়। সারবান বেলে দোয়াঁস মাটি হইলে এক বিঘায় দুই কিম্বা ২॥০ মণ সরিষা উৎপন্ন হইতে পারে। সরিষা—লাল দানা সরিষা, শ্বেতী, ও রাই এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাইয়ের বুনানি আশ্বিনের প্রথমে করিতে পারিলে ভাল হয়, লাল ও শ্বেতী কিছু পরে বুনিলে চলে। রাইয়ের ফলন কম।

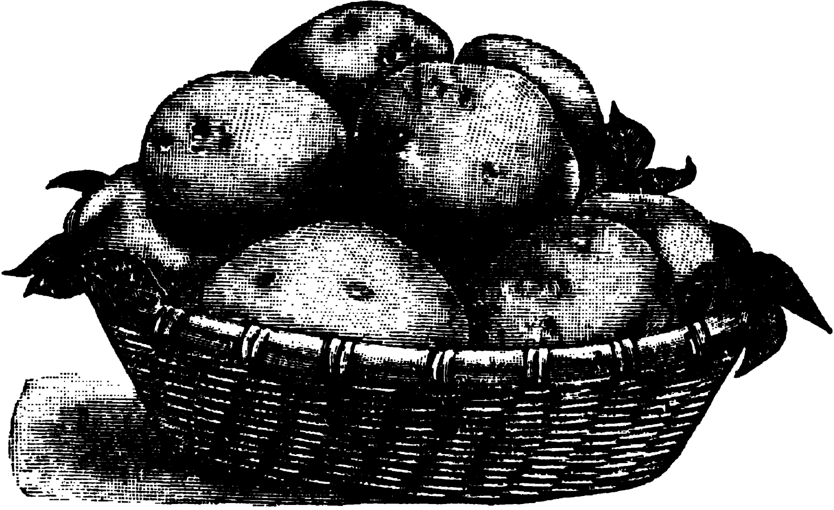
এই সরিষা কিন্তু সব্জী বাগানে বড় আদরের সহিত স্থান পায় না। ইহার যদিও শাক খাওয়া যায় সে শাক তাদৃশ সুস্বাদু নহে। শাক খাইবার জন্য

বিলাতী সরিষা

ভাল, ইহার পাতা চওড়া ও অপেক্ষাকৃত মোটা। ইউরোপীয়গণ ইহাও ক্রেশের মত সালাদ হিসাবে ব্যবহার করেন। সামান্য কৌশল অবলম্বন করিয়া ১০।১৫ দিন অন্তর অন্তর বীজ বপন করিলে এবং একটু আবশ্যক মত জল দিবার ব্যবস্থা করিলে বার মাসই সর্ষপ শাক উৎপন্ন করা যাইতে পারে। গাছ বড় হইতে দিলে শাক সুমিষ্ট থাকে না। দুইটি পাতা বাহির হইবার কিছু দিন পরেই গাছ কাটিয়া লওয়া উচিত। চারিটি পাতা বাহির হইতে দিলে পাতার স্বাদ কমিয়া যায়। শাদা ও পাটকিলা এই দুই রঙের সরিষা চাষ হয়। শাদা সরিষার শাকই অধিকতর সুস্বাদু কিন্তু পাটকিলা সরিষা গাছ অধিক দিন ভাল অবস্থায় ক্ষেতে থাকে।

৪ + ৪ বর্গ হাতের জন্য ২॥ তোলা বীজ বপন করিতে হয়।

গোল আলু

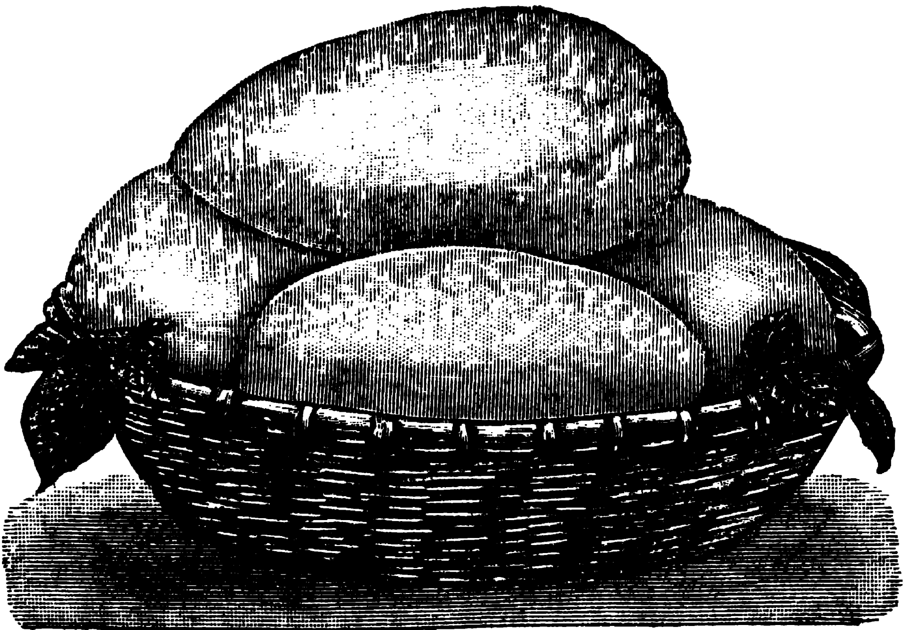


পাটনাই আলু

সোলেনেসী (Solanaceæ) জাতীয় উদ্ভিদের চাষ এই জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে অনেক গুলি ওষধী আছে। ফল পাকিলে যাহাদের গাছ মরিয়া যায় তাহাদিগকে ওষধী বলে। এই শ্রেণীর উদ্ভিদের কোন কোনটির গাছ মূল সমেত মরিয়া যায় কোনটির বা মূল থাকে ডাল পালা শুকাইয়া যায়, পুনরায় বর্ষাগমে নূতন ডাল পালা গজায়। সোলেনেসী জাতীয় উদ্ভিদ গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এই প্রকার উদ্ভিদের কয়েকটির ফল ও পাতা বিষাক্ত, সেগুলি ঔষধার্থে ব্যবহার হয়। ভারতবর্ষে অনেকেই যথাতথা ধুতুরা গাছ জন্মিতে দেখিয়াছেন। ধুতুরার পাতা ও ফল ঔষধে লাগে ইহা সর্ব্বজন বিদিত। ধুতুরা সোলেনেসী জাতীয় উদ্ভিদ। তামাকের পাতায়ও মাদকতাগুণ আছে, ইহাও ঔষধে ব্যবহার হয়। তামাকের চাষ করিয়া তামাক পাতা এক্ষণে ধূমপানার্থে ব্যবহৃত হইতেছে। তামাকও সোলেনেসীর অন্তর্গত। সব্জীর মধ্যে গোল আলু, বেগুণ, লঙ্কা, টেপারি ও টমাটো সোলেনেসী জাতীয় উদ্ভিদের মধ্য স্থান পাইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বেগুণ চাষের বিবরণ দিয়াছি বর্ত্তমান প্রবন্ধে গোল আলু সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

জগতে খাদ্যবস্তুর মধ্যে গোল আলু এক্ষণে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। আলু মূলজ খন্দের মধ্যে স্থান পাইলেও ইহা মূলা, বীট, সালগম, ওল, মানকচু প্রভৃতি মূলজাতীয় সব্জীর মত নহে। মূলাদির যেমন মূলটি বাড়িয়া খাদ্যের উপযুক্ত হয় ইহায় তাহা হয় না। আলু গাছের শিকড়ে ফলের মত আলুগুলি ধরে। ইহাকে সেইজন্য মূল না বলিয়া ফল বলিলে ভাল হয়, তবে ফলের সহিত

পৃথক এই যে, ইহা মূল হইতে জন্মে না—শিকড়ের উপরে কাণ্ডভাগ স্ফীত হইয়া এইরূপ আকার প্রাপ্ত হয় এবং মাটির নীচে ইহার জন্ম। ইংরাজী ভাষায় ইহা টিউবার (Tuber) নাম পাইয়াছে। আমাদের দেশে শকরকন্দ আলু, রাঙা আলু, শাঁক আলু, মউ আলু ইত্যাদি অনেক আলু আছে, এই গোল আলু, কিন্তু ঐ সকল জাতীয় নহে এবং ইহা আকারে অপেক্ষাকৃত গোল বলিয়া এদেশে ইহার গোল আলু আখ্যা হইয়াছে। ইহার ইংরাজী নাম পোটাটো (Potato)। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি এবং পেরুতে বহুপূর্ব্বকাল হইতে অনেক প্রকারের পোটাটো জন্মিয়া থাকে। তথায় ইহা বিভিন্ন মৃত্তিকা ও আবহাওয়ায় জন্মায়। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারজিনিয়া হইতে আয়ারলণ্ডে আলুর আমদানী হয়। প্রায় তিন শতাব্দী ধরিয়া আলুর চাষ হইতেছে, কিন্তু পুরাকালের আলুর সহিত বর্ত্তমান কালের আলুর তুলনা করিলে আকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। সেকালেও একটা আলুর মূলে প্রায় ৫০টা ছোট বড় আলু ধরিত, এখনও তাহাই হয়—সেকালের মত আলুর গাত্র এখনও মসৃণ নহে। এখন অনেক প্রকারের আলু জন্মিলেও তাহার পূর্ব্বাকৃতির আদল ঠিক বজায় আছে। ভারজিনিয়ায় সেকালে যে আলু জন্মিত, তাহার ফুল লাল। সেই আলু গাছের বীজ হইতে অন্যত্র শাদা ও লাল দুই রকম ফুলই হইতেছে।

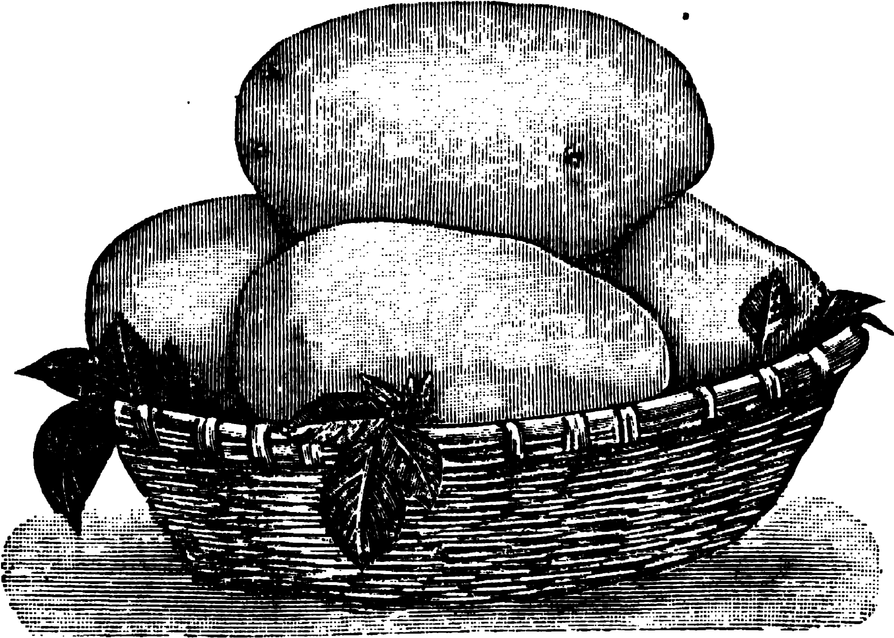


ডিম্বাকৃতি নৈনিতাল আলু

বাঙলা দেশে আলু চাষ অতি অল্প দিনই আরম্ভ হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দুই একটি বাগান ব্যতীত অন্যত্র আলু জন্মিতে দেখা যায়

নাই। বাঙলা কিম্বা ভারতের বনে জঙ্গলে আলুর মত কোন উদ্ভিদ দৃষ্টিগোচর হয় না। এ দেশে সর্ব্বত্র শীতকালেই ইহার চাষ করা হয়, সেই সময়ই ইহার ফুল ফল হয়।

আমরা যে আলুর চাষ করি বা খাই, তাহা সোলেনম টিবরোজম (Solanum Tuberosum)। সোলেনম কমারসোনী, সোলেনম মাগ্নিয়া এবং সোলেনম ইয়াইট নামক আরও তিন জাতীয় আলু আছে—তাহাদের আকৃতি ইহা অপেক্ষা ছোট এবং উদ্ভিদশাস্ত্র মতে তাহাদের প্রকৃতিগত বিভিন্নতাও আছে। আমেরিকা হইতে ইউরোপে ইহার প্রথম প্রচার হইল। ভাল সব্জী বলিয়া তখন ইহার তত প্রচার না হইলেও অন্যান্য ভাল খাদ্যাভাব হেতু আয়রলণ্ডে ইহার চাষ খুব শীঘ্র বাড়িতে থাকিল। ক্রমশঃ ইউরোপে ইহার চাষের বিস্তার হয় এবং ইংরাজ কর্ত্তৃক ইহা ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ও নানাদেশে খাদ্য হিসাবে ইহার আদর বাড়িতেছে।



বঙ্কুর গাত্র—নৈনিতাল আলু

আলু ভারতের সর্ব্বত্র জন্মিতেছে। হিমালয়ের গাত্রে পাঁচ সহস্র ফিট উচ্চে, বিন্ধ্য ও অন্যান্য পর্ব্বতে এবং বাঙলা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সমতল ক্ষেত্রে সর্ব্ব জায়গায় আলু উৎপন্ন হইতেছে। তবে নৈনিতাল পাহাড়, বেহার, বর্দ্ধমান, হুগলী, মজঃফরপুর, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, ২৪ পরগণা, রঙপুরের স্থানে স্থানে, আসামে চেরাপুঞ্জি পাহাড়ের, অধুনা সিলঙে আলু চাষের বিস্তার কিছু অধিক। নানা-প্রকারের আলু আছে। লসনের সব্জী সম্বন্ধীয় তালিকা পুস্তকে (Lawson's Synopsis of Vegetable Products Scottland) ১৭৫ প্রালুর নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে, বোম্বাই, দেশী, পাটনাই, চেরাপুঞ্জি,

নৈনিতাল প্রভৃতি কয়েকপ্রকার আলুর চাষ দেখিতে পাওয়া যায়; পাটনাই ও বোম্বাই আলু, নিম্নবঙ্গে ও হুগলী, বর্দ্ধমানে কিছু রূপান্তরিত হইয়া দেশী আলু এই আখ্যা পাইয়াছে। ২৪ পরগণায় চেরাপুঞ্জি আলুর তত চলন নাই, কিন্তু নৈনিতালের পসার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৩১৫ সাল হইতে নিম্নে সমতলক্ষেত্রে পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে দার্জ্জিলিঙ আলুর চাষ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা বোম্বাই আলুর মত গোলাকৃতি;—রঙ ঈষৎ লাল। গাত্র তত সুগোল নহে। পাটনাই আলু সুগোল, ইহার রঙ ঈষৎ হরিদ্রা আভাযুক্ত শাদা বা লাল। বোম্বাই অপেক্ষা আকারে কিছু ছোট। নৈনিতাল আলু হংসডিম্বাকৃতি, গাত্র সুগোল নহে, রঙ শাদা, ওজনে এক একটা এক পোয়া পর্য্যন্ত হয়। ইহার আর এক জাতি আছে, তাহার গাত্র খুব মসৃণ এবং অবিকল হাঁসের ডিমের মত। ইহা আকারে তত বড় হয় না। এতদ্ব্যতীত আয়রলণ্ড ও ইংলণ্ড হইতে চাষের জন্য ভাল জাতীয় আলু প্রতি বৎসরেই আমদানী হইতেছে। কোনটির আকৃতি প্রকৃতি ভাল বলিয়া, কোনটি বা সহজে রোগাক্রান্ত হয় না, কোনটি বা অনাবৃষ্টিসহ ইত্যাদি নূতন নূতন গুণের হিসাবে এদেশে বিভিন্ন রকম আলু চাষের চেষ্টা হইতেছে। ভারতে এক্ষণে নৈনিতাল সর্ব্বাপেক্ষা আদৃত হইয়া থাকে। ইউরোপীয়গণের নিকট ইহা খুব প্রিয়, কিন্তু এদেশীয়গণ নৈনিতাল অপেক্ষা পাটনাই অধিক মিষ্ট বলিয়া অনেকে পসন্দ করিয়া থাকেন।

বীজ আলুঃ—সাধারণতঃ বীজ-আলু হইতে আলুর চাষ হয়। আলুর গায়ে চোক্ থাকে, আলুগুলি জমিতে বসাইলে এই চোক্ ফুটিয়া গাছ বাহির হয়। ইহাকেই চাষীরা বীজ-আলু বলে। এই বীজ-আলু আস্ত বসান যায়। নৈনিতাল কাটিয়া বসান হইয়া থাকে, কিন্তু পাটনাই গুঁড়ি আলু আস্ত বসানই বিধি। নৈনিতাল বড় হইলে তবে কাটা উচিত; নতুবা হাঁসের ডিমের মত আলুগুলি আস্ত বসাইতে হয়। আলু কাটিবারও একটু কৌশল আছে। এক একটি খণ্ডে অন্ততঃ দুইটি চোক্ থাকিবে। খণ্ডগুলি পাতলা করিয়া কাটিতে নাই। চোকের দিক পুরু থাকিবে এবং অপর প্রান্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া যাইবে। আলু গাছেও ফুল ফল হয় এবং তাহাতে বীজ জন্মে। সুপুষ্ট বীজ হইতে আলু গাছ হয়। প্রথমবর্ষে তাহাতে কুলের আঁটির মত আলু হয়। পরে ঐ ক্ষুদ্র আলুগুলি লইয়া দ্বিতীয়বর্ষে বসাইতে হয়। দুই বৎসর পরে তবে আলুগুলি পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আলুর চাষে ঝঞ্ঝাট অধিক সেই কারণে এই প্রকারে কেহ আলুর চাষ করে না। তবে নূতন প্রকার আলু উৎপন্ন করিতে হইলে ইহাই একমাত্র উপায়। আলুর ডগা বসাইয়াও আলুর চাষ করা যায়, কিন্তু ইহাতে তত ভাল ফসল হয় না।

আলু বসাইবার প্রণালীঃ—ক্ষেতটি অনেকবার চষিয়া মাটি ধূলির মত করিতে হয়। দেড় ফিট গভীর করিয়া চষিতে হইবে। চষা অপেক্ষা কোপান ভাল, কিন্তু

বড় ক্ষেত হইলে কোপাইতে খরচ অনেক হয়, সেই জন্য চষা ব্যতীত উপায় নাই। ক্ষেত মই দ্বারা সমতল করিয়া এক হাত অন্তর নালি কাটিতে হইবে। সেই নালিতে খৈল ও পুরাতন গোবর সার ছিটাইয়া আলু বসাইতে হয়। সরু কোদাল অথবা লাঙ্গলের ফাল হাতে টানিয়া নালি কাটা ভাল। চষা মাটির উপর গরু চালাইলে মাটি বসিয়া যাইবে। আলুক্ষেতে চলা ফেরাও সাবধানে করিতে হয়। নালিতে ৯ ইঞ্চ তফাৎ করিয়া ৪ কিম্বা ৫ ইঞ্চ মাটি চাপা দিয়া আলু বসান হইয়া থাকে নৈনিতাল আর একটু ফাঁক ফাঁক বসাইলে ভাল হয়। আলু কত তফাতে বসান উচিত বা নালিগুলি কত অন্তর হইবে, তাহা চাষিকে দেখিয়া শুনিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়। ইউরোপে এখন অনেক আলু আছে যে, তাহার গাছ ৩ বা ৪ ফিট উচ্চ হয়; সে আলুর ক্ষেতে প্রত্যেক লাইনের মধ্যে ৩ অথবা ৪ ফিট ফাঁক রাখা কর্ত্তব্য।

আলুতে সার ঃ—হুগলী জেলায় আলুক্ষেতে রেড়ীর খৈল ব্যবহার করা হয়। বর্ষার সময় বা আগে গোবর সার, ছাই, পাতা পচা সার দিয়া জমিটি উত্তমরূপে চষিয়া রাখিতে হয়। এই সকল সারে সুধু যে সময়ের কার্য্য হয় তাহা নহে, এই সকল সার দ্বারা মাটি খুব আল্গা হয়। আটালো মাটি হইলে এই সকল সার না দিলে আদৌ চলিবে না। জমিতে গোবরাদি সার দেওয়া থাকিলে বিঘা প্রতি ২॥০ আড়াই মণ খৈল দিতে হয় নতুবা প্রতি বিঘায় ৫ মণ খৈল দিতে হইবে। কেহ কেহ রেড়ীর পরিবর্ত্তে সরিষার খৈল ব্যবহার করেন। তাহারা সরিষার ১০ হইতে ১৫ মণ প্রতি বিঘায় দিয়া থাকেন। সার যত পড়িবে তত আলু ভাল হইবে ও অধিক ফলন হইবে। কিন্তু সময় মত জল দিতে না পারিলে যতই সার দাও কোন উপকার পাওয়া যাইবে না। ক্ষেতে পাট কিম্বা আউস ধানের চাষ করিয়া লইয়া সেই জমিতে আলু জন্মাইতে পারা যায়। ধান বা পাটের ক্ষেতে গোবরাদি সার অধিক পরিমাণে দেওয়া থাকিলে আলু বসাইবার সময় আর ঐ সকল সার দিবার আবশ্যক হয় না।

এক একর (৩ বিঘা আধ কাঠা) আলুর জমিতে নিম্ন লিখিত পরিমাণ সারের আবশ্যক হয়।

নাইট্রোজেন	...	৩০ হইতে	৬০	পাউণ্ড
পটাস	...	৯০ হইতে	১৮০	„
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড		৬০ হইতে	১২০	„

আমরা নাইট্রোজেনের জন্য খৈল, পটাসের জন্য খনিজ পটাস বা ছাই এবং ফস্ফরিক এসিডের জন্য বোন সুপার ব্যবহার করিতে বলি। বোন সুপার ব্যবহার না করিয়া কেল মিল (মিহি হাড়ের গুঁড়া) ব্যবহার করা চলে কিন্তু হাড় পচিয়া উদ্ভিদের খাদ্য রূপে পরিণত হইতে বিলম্ব হয় সেই জন্য কেল সুপার ব্যবহার করাই প্রশস্ত। হাড়ের সহিত সালফিউরিক এসিড সংযোগে ইহা প্রস্তত হয়। বাজারে খরিদ করিতে পাওয়া যায়। এই হিসাবে প্রতি একরে অনুমান

৫ মণ রেড়ীর খৈল. ৩ মণ বোন সুপার, এক মণ আন্দাজ খণিজ পটাস মিশ্রিত করিয়া আলু ক্ষেতে দিলে ঐ ফসলের আবশ্যক মত সব সারই দেওয়া হইল। কাইনিট এক প্রকার খনিজ পটাস। বাজারে তাহা দুই আনা সের কিনিতে পাওয়া যায়। অভাবে প্রতি একরে ১৫ কিম্বা ২০ ঝুড়ি ছাই দিতে হয়। এস্থলে মোটামুটি সারের একটা পরিমাণ দেওয়া হইল মাত্র। সুবিজ্ঞ চাষী কিন্তু জমির অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

আলুতে সবুজ সার ঃ—আলু বসাইবার পূর্ব্বে সেই ক্ষেতে শণ, ধঞ্চে বা অন্য কোন শিম্বিজাতীয় খন্দের আবাদ করিয়া সেগুলি একটু বড় হইলে জমিতে হাল মই দ্বারা চষিয়া ফেলা হইয়া থাকে। ইহাতেও আলুর ফলন মন্দ হয় না। অনেকে কিন্তু পাট, শণের চাষ করিয়া লইয়া সেই ক্ষেতেই আলু বসান অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন।

আলু চাষের বহু পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা যায় না।

(১) বিনা সারে আলু চাষে লাভ হয় না,

(২) উপযুক্ত পরিমাণে সার দিতে পারিলে ফলন তিন কিম্বা চারি গুণ বাড়ে।

বর্দ্ধমানক্ষেতে আলুক্ষেতে সারের পরীক্ষা—

			একর প্রতি সার।	একর প্রতি ফলন।
গোবর (সংরক্ষিত)	...	...	২৪০ মণ	১৮৬॥০ মণ
ঐ (অযত্ন রক্ষিত)	...	...	২৪০ ,,	১৬৫ ,,
রেড়ীর খৈল	...	...	২২ ,,	২১৪ ,,
সরিষার খৈল	...	...	২৪ ,,	১৮০ ,,

বিশেষ সার ঃ—গোবর ২০০ মণ, বোন সুপার ৩ মণ এবং সোরা ২ মণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করাতে ২০৩ মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছে। এই সারের খরচ এমন কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয় না, বোন সুপার ৫৲ টাকা হিসাবে, সোরা ৮৲ টাকা মণ ধরিলে কিছু খরচ বাড়িলেও মোটের উপর লাভ থাকিবে। এই সকল সার অধিক মাত্রায় লইলে আরও কম দামে পাওয়া যাইতে পারে।

কটকে আলুক্ষেতে গোময় ১০০ মণ, বোন সুপার ৩ মণ, এমোনিয়া সালফেট ১॥০ মণ, কাইনিট এক মণ ব্যবহার করিয়া প্রতি একরে ১৪॥০ মণ আলু জন্মিয়াছে। পক্ষান্তরে প্রতি একরে ২৫ মণ রেড়ীর খৈল ব্যবহার করিয়াও ফলন ১৪৭॥০ মণই দাঁড়াইয়াছে।

ডুমরাও ঃ—৫।০ মণ রেড়ীর খৈল এবং ৮।০ মণ সোরা ব্যবহার করিয়া একরে ১৮৬॥০ মণ আলু জন্মিয়াছে।

আসামে ঃ—সবুজ সার ও পরে আলু বসাইবার সময় ১৫০ মণ গোময় সার দিয়া দার্জ্জিলিঙ আলু ১৩৭॥০ মণ ও এক প্রকার স্থানীয় সিল বিলাতী আলু ১০০ মণ উৎপন্ন হইয়াছে।

এড়ি রেশম

পুষা তত্ত্বানুসন্ধানাগারের সহকারী রেশমতত্ত্ববিদ্
শ্রীমন্মথনাথ দে লিখিত

এড়ি রেশম আসাম জাত ; ইহা কীটজ আঁশ বা সূত্র : এই কীট আসামে প্রধানতঃ এড়ি বা ভেরাণ্ডার পাতা খাইয়া রেশম উৎপাদন করে বলিয়া ইহার নাম এড়ি রেশম বলা হইয়া থাকে ; অতি পুরাকাল হইতেই আসামে এই রেশম উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে এবং আসাম প্রদেশ যে ইহার আদি স্থান তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আসামের মিকির, কুকী, গারো প্রভৃতি জাতিরা আজ পর্য্যন্তও এই কীট পালন করিয়া সূত্র উৎপাদন করতঃ বস্ত্র বয়ন করিয়া আপনাদের লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে ; আমাদের দেশে ইহা দুষ্প্রাপ্য ও বহু ব্যয়সাধ্য হইলেও আসামের অতি গরীব লোকেও এড়ি রেশম পরিধান করিয়া থাকে ; সম্প্রতি বোম্বের কলেতে এড়ি রেশমের অতি সূক্ষ্ম ও মিহিন সূত্র প্রস্তুত হওয়ায় ইহাকে আরও বেশী আদরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। এড়ি রেশম হইতে কিরূপ সুন্দর ও মিহিন কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে তাহা খুব কম লোকেরই ধারণা আছে। পুষা কৃষি-কলেজের (Agricultural College, Pusa) তত্ত্বাবধানে ও আনুকূল্যেই আজ ভারতের সর্ব্বত্র এড়ি রেশম কীট পালন ও বস্ত্র বয়ন একটী কুটীর-শিল্পরূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বাঙ্গলা, হিন্দী, উর্দ্দু ও ইংরাজী ভাষায় এণ্ডি সম্বন্ধে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়া উক্ত কলেজ হইতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইতেছে ও এড়ি রেশম সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়া ভারতে এই শিল্পের অনেক উন্নতি ও বিস্তার করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এড়ি রেশম সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ পুস্তক এ পর্য্যন্ত কোনও ভাষায়ই প্রকাশিত হয় নাই। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, পূর্ণিয়া, মৈমনসিংহ, টিপারা, ভাগলপুর, ময়ুরভঞ্জ, চাটগাঁ, কুচবেহার প্রভৃতি জেলায় অনেক কাল হইতেই ইহার আবাদ হইয়া আসিতেছে, বঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও ইহার বিস্তার আবশ্যক বলিয়া মনে হয় ; কারণ ইহা অল্পায়াসসাধ্য অর্থকরী ব্যবসা : ১০৲ টাকার চাকুরীর জন্য লালায়িত না হইয়া ঘরে বসিয়া অন্যান্য ক্ষেতির সহিত ইহার চাষে বেশ দুপয়সা পাওয়া যাইতে পারে ; সুতরাং অতি সহজ বাঙ্গলা ভাষায় এই সম্বন্ধে একখানা তথ্যপূর্ণ পুস্তক অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষকের 'এড়ি রেশম' শীর্ষক প্রবন্ধে, এড়ির চাষ, এড়ি কীট পালন, রোগ নিবারণ উপায়, কীটের শরীর বিজ্ঞান, সূত্র প্রস্তুত করণ ও রঞ্জন এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিক রূপে

থাকিবে। এই বিষয়ে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে তাহার যথাবিহিত উত্তর দিতে চেষ্টা করা যাইবে। কোনও স্থানে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিলে কূট তর্ক না আনিয়া তাহার সংশোধন করিয়া দিলে বাধিত হইব।

এণ্ডির চাষ

এণ্ডি—এণ্ডি উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ইউফর্ব্বিয়েসী (Euphorbiacea) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যাবতীয় বন্য ও ক্ষেত্রজ এণ্ডির কমিউনিস্‌ (Ricinus communis) জাতি হইতে উৎপত্তি; বাঙ্গলায় ইহাকে এরণ্ড, এণ্ডি, ভ্যারাণ্ডা, এড়ি বা রেড়ী বলা হইয়া থাকে। ইহার আদি উৎপত্তি স্থান এপর্য্যন্ত ঠিক হয় নাই; বোধ হয় উত্তর ভারতের হিমালয় প্রদেশে বা উত্তর আফ্রিকার কোন স্থানে ইহার আদি ও স্বাভাবিক বাসস্থান হইবে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে এড়ির মূল ও তৈল আমাদের দেশে ঔষধে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা সুশ্রুতে লিপিবদ্ধ আছে। খৃষ্টের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ভারতে এণ্ডির চাষ বর্ত্তমান আছে; মিসর, গ্রীস, ও রোমের পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রেও এণ্ডির গুণ বর্ণিত হইয়াছে। মিসরের অতি প্রাচীন কবরেও ইহার বীজ পাওয়া গিয়াছে, রোমের অতি পুরাতন গ্রন্থেও ইহার চাষ প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বৃক্ষ ইউরোপে কেবল ঔষধের জন্য রোপণ করা হইত; কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইহা সমগ্র পৃথিবীর বাজারে প্রধান উদ্ভিজ্জ তৈল উৎপাদক বৃক্ষস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতবর্ষে ইহার চাষ বিলক্ষণ হইয়া থাকে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইহার আবাদ প্রায় ১০০০ বিঘায় হইয়াছিল; অনেক স্থানে এই বৃক্ষ স্বাভাবিকই হইয়া থাকে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ, রাজপুতানা, বোম্বে, মান্দ্রাজ, বেহার ও বাঙ্গালা প্রদেশে বীজের জন্য ইহার চাষ হইয়া থাকে। ভারত ব্যতীত আফ্রিকার উষ্ণ প্রদেশে, ইতালি, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, চীন, আসাম, এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও ইহার আবাদ বেশ হইয়া থাকে।

তৈলের ব্যবহার

এণ্ডির তৈল বস্ত্র রঞ্জন, চর্ম্ম পরিষ্কার করণ, বার্ণিসপ্রস্তুত করণ, জ্বালান প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কল কারখানায় প্রয়োগ করিবার জন্য এই তৈল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সাবান, মোমবাতি, পোমেটাম ও অন্যান্য সুগন্ধি তৈলও ইহা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে; সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জ ও ধাতুজ তৈল অপেক্ষা ইহা জ্বালিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট কারণ ইহা, শ্বেত, উজ্জ্বল ও ধূমহীন আলোক দিয়া থাকে; ইহার খৈলও সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং মহীশূর প্রভৃতি দেশে জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্য করে; খৈল হইতে একপ্রকার গ্যাস প্রস্তুত হইয়া রাত্রে আলোক বিতরণ করে; আফ্রিকা ও চাটগাঁয়ের কোনও কোনও বন্য জাতি ইহার তৈল ভক্ষণও করে;

এই খৈল সাধারণতঃ গরুকে খাওয়ান হয় না, ইউরোপে ইহা গরুর পক্ষে অপকারক বলিয়া বিশ্বাস; এণ্ডির তৈল, খৈল ও বীজ, কখন কি দরে বিক্রয় হয় তাহা ইংরাজী Indian Trade Journal ও Capital পত্রিকা পাঠে জানা যায়; অথবা বাণিজ্য-বিভাগের ডিরেক্টরের (Director of Commercial Intelligence Calcutta) নিকট পত্র লিখিলেও জানা যাইতে পারে। কলিকাতার উত্তর বিভাগে ইহার তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য অনেকগুলি কল আছে; কিন্তু দেশীয় ভাল বীজ ইউরোপে রপ্তানি হইয়া কলেতে তৈল প্রস্তুত হইয়া পুনরায় আমাদের দেশে ফিরিয়া আইসে।

জাতি—প্রধানতঃ ইহারা দুই জাতিতে বিভক্ত; বড় বীজ বিশিষ্ট ও ছোট বীজ বিশিষ্ট বৃক্ষ; পূর্ব্বোক্ত বীজ হইতে নিকৃষ্ট ও শেষোক্ত বীজ হইতে বেশ ভাল তৈল পাওয়া যায়। জাতি ভেদে পাতার আকার, কাণ্ডের রঙ, বীজের রঙ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কোনও জাতি কাঁটা শূন্য, কোনও জাতি লম্বা, কোনও জাতি ঝোপ গাছে পরিণত হয়; কোথায়ও ২০ হাত লম্বা স্থায়ী গাছ, কোথায়ও বা বার্ষিক দুই তিন হাত লম্বা গাছ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে প্রায় ১০০ প্রকার এণ্ডি দেখিতে পাওয়া যায়, জগতে প্রায় ৩০০০ রকমের এণ্ডি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুষা কৃষি-কলেজে প্রায় ৭০ রকম বীজ বিভিন্ন দেশ হইতে আনাইয়া পরীক্ষিত হইয়াছে তন্মধ্যে মাহু ও কাণপুর, সুরাতের এক এক জাতি, মান্দ্রাজের চারি জাতি ও মাথা রেড়ীর চাষ পলু প্রতিপালনের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। নিম্নলিখিত যে কয়েকটী জাতি এড়ি পলু পালনের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে তাহাদের ইংরাজী নামও এস্থলে দেওয়া গেল—Mhow Factory, Green tall Lumding, Arand Cawnpore, Surat large variety, Madras Exotic, Madras Red Stemmed, Madras large-leaved, Madras spotted black, Large seeded perennial, এবং Magha Endi। পুষা কৃষি-কলেজের কীটতত্ত্ববিদের নিকট চিঠি লিখিলে বিনামূল্যে এণ্ডি পুষিবার জন্য বীজ পাওয়া যায়।

তৈল প্রস্তুত ঃ—বীজ হইতে তিন উপায়ে তৈল প্রস্তুত করিবার রীতি বর্ত্তমান আছে—(ক) গরম জলে সিদ্ধ করিয়া, (খ) ঘানিতে পিশিয়া (গ) ও পুরা পায়ের সাহায্যে। প্রথমোক্ত উপায়টীই সহজ; অগ্রে বীজগুলি সামান্য ভাজিয়া লইয়া ঢেঁকিতে ভানিয়া লইতে হয়; তৎপরে বীজের ৩।৪ গুণ জলে সিদ্ধ করিলে তৈল উপরে ভাসিয়া উঠিবে; তখন একটী হাতা দিয়া উপরকার তৈল ছাঁকিয়া লওয়া হয়; পুনরায় অল্প জলে গরম করিয়া এই অপরিষ্কার তৈলের উপরকার ময়লা ফেলিয়া দেওয়া হয়। বড় বীজের তৈল জ্বালান ও কল কব্জায় লাগান হয় এবং ছোট বীজের তৈল ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বরাত্রে বীজগুলি জলে ভিজাইয়া দেশী

ঘানিতে পিশিয়া তৈল নির্গত করিবার প্রণালী মান্দ্রাজে প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ বীজের ⅓ অংশ তৈল পাওয়া যায়। বীজগুলি বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাওয়ায় ইহার খৈল হইতে যে সার পাওয়া যায় তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত; ভারত কৃষি প্রধান দেশ; এখানে শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবি; অধিকাংশ লোকেই কৃষির উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে দিন গুজরাণ করিতেছে; সুতরাং যাহাতে আমাদের দেশেই এই তৈল প্রস্তুত হইতে পারে তাহার চেষ্টা আমাদের করা উচিত। ভারত হইতেও কিছু তৈল বিদেশে রপ্তানি হয় কিন্তু উহাতে নানা জিনিষ মিসান থাকে বলিয়া কেহ তত আদর করে না। মান্দ্রাজের কোকনদ হইতে এণ্ডির বীজ বেশী রপ্তানী হইয়া থাকে; প্রতি বৎসরে প্রায় ৫৮৬৪৮৬ হন্দর বীজ বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। কলিকাতার ক্ষেত্রমোহন বসাক একজন তৈল প্রস্তুতকারী; রাজসাহী জেলেও এণ্ডির তৈল প্রস্তুত হইত। ১৮৯০ সালে ভারত হইতে ৩১৮৩১৬৩৲ টাকার তৈল ও ৬০৭৪২৯০৲ টাকার বীজ রপ্তানী হইয়াছিল। কলিকাতায় জোসেপ্ কোম্পানী এড়ি তেলের কল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছিলেন। কিন্তু বাষ্প-চালিত কলে রেড়ীর তৈল প্রস্তুত করা তাদৃশ সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইতেছে না।

এড়ির মাটি—উষ্ণ ও নাতি শীতোষ্ণ দেশে নানা আবহাওয়াতে এড়ি গাছ জন্মিয়া থাকে; ইহা রাস্তার পার্শ্বে ও পতিত জমীতে স্বাভাবিকভাবে হইয়া থাকে; ইহা অনাতাপ স্থানে ও জঙ্গলে জন্মিলেও সূর্য্যোত্তাপেই ইহার বেশ বৃদ্ধি হয়। সারবাণ, সুকর্ষিত জমীতে ইহার চাষ করা শ্রেয়ঃ; পাহাড়ের নীচে লাল কর্দ্দমাক্ত জমীতে ইহারা বেশ জন্মিয়া থাকে; পলিপড়া জমীও ইহাদের বৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী; মান্দ্রাজে বালি ও পাঁক মিশ্রিত জমীতে বীজ বপন করা হয়; মহীশূরে ছেয়ে রঙ্গের জমীতে বালি মিলাইয়া রেড়ীর বীজ বোনা হয়; দিনাজপুরে বালুকামিশ্রিত কাদা মাটিতে, পাটনার দিয়াড়ায় কর্দ্দম বহুল বালুকামিশ্রিত মাটিতে, হাজিপুরে দিয়াড়ার বালুকাবহুল জমীতে, সীতামারী মহকুমায় বালুকামিশ্রিত কাদা মাটিতে এবং নূতন ও জঙ্গল পরিস্কৃত জমীতে, কোলাপুরে লাল এবং কাল পলি পড়া জমীও কাথিওয়ারে কাল জমীতে ও বোম্বাইয়ে জল সেচনের বন্দোবস্ত না থাকিলে সাধারণতঃ বালুকা ও পাঁক মিশ্রিত জমীতে ইহার বীজ বোনা হয়।

সার—এই বৃক্ষ পরিবর্দ্ধন ও পরিপোষণের পক্ষে পটাশ ক্ষার ও প্রস্ফুরক দ্রাবক অতিশয় প্রয়োজনীয়; সুতরাং যে জমীতে এই দুই পদার্থের অপ্রতুল সে জমীতে এই গাছ ভাল হয় না; এণ্ডির খৈল ও এই বৃক্ষের সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এই খৈল বিশ্লেষণ করিলে শতকরা ৫ ভাগ যবক্ষারজান, ২ ভাগ প্রস্ফুরক দ্রাবক এবং ২ ভাগ পটাশ ক্ষার দেখিতে পাওয়া যায়; বীজের খোসা ও গুঁড়িতে শতকরা ২·৫ ভাগ যবক্ষার জান ও ৬·৫ ভাগ পটাশ ক্ষার পাওয়া যায়;

এই খৈল কৃত্রিম সার হইতে বেশী মূল্যবান কারণ ইহার মধ্যস্থিত যবক্ষারজান, বৃক্ষ অল্পে অল্পে অনেক দিন ধরিয়া লইতে পারে, বিঘা প্রতি ৫।৬ গাড়ী গোবর সারও এই ক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে পারে। বিহার অঞ্চলে ছাই সার রূপে দেওয়া হয়। যে সকল পদার্থে পটাশ ক্ষার ও প্রস্ফুরক দ্রাবক বিদ্যমান আছে ঐ সব পদার্থই এড়ি বৃক্ষের সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ক্রমশঃ

সরকারী কৃষি সংবাদ।

কটকে ধানের চাষে সার—

ধান চাষে গোবর সার সর্ব্বজন জানিত। অন্য কি প্রকার রাসায়নিক বা খনিজ সার দিলে কত উপকার হয়, কত পরিমাণে উক্ত সার প্রয়োগ বিধেয়, কোন সময় সার দিতে হইবে তাহার ঠিক নির্ণয় করা হয় নাই। তবে এইটুকু ঠিক হইয়াছে খনিজ সার, বা হাড়ের গুঁড়া ধান চাষের পূর্ব্বে, বর্ষার আরম্ভে না দিলে ভাল ফল হয় না। কিন্তু সোরা সার খুব আগে দিলে বৃষ্টির জলে ধুইয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। সার দিবার সময়, সারের পরিমাণ নির্ণয় করা অভিজ্ঞ চাষির পক্ষেই সম্ভব, নতুবা আশানুরূপ ফল হয় না। এই কারণেই দেখা যায় যে কোন ধানে সোরা দিয়া অপরির্য্যাপ্ত ধান ফলিল এবং অন্য একটি ক্ষেতে সোরা দিয়াও ধানের ফলন বিশেষ কিছুই বাড়িল না। কটকে বহুবিধ সার প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গোবর সার পাইবার সুবিধা থাকিলে ধানে গোবরের মত সস্তা এবং ফলপ্রদ সার আর নাই। বিঘাপ্রতি ৫০/ মণ গোবর প্রদান করিতে পারিলে ৬/ মণ হইতে ৮/ মণ খড় এবং ১৬/ মণ হইতে ১৮/ মণ ধান পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ধঞ্চে বুনিয়া সবুজ সার প্রয়োগে ইহা অপেক্ষা ধান ও খড় ২/ মণ অথবা ৩/ মণ বাড়িতে দেখা যায়। ব্যয়-সক্ষম চাষীর পক্ষে নিম্নলিখিতানুরূপ সারই ধানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সার।

গোবর	...	বিঘা প্রতি	৩৪/ মণ।
সুপার ফস্‌ফেট*	...	,,	১/ মণ।
সোরা	...	,,	১৪ সের।

এই কয়টি সার একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে প্রতি বিঘায় কটকে ৯/ মণ খড় এবং ২১/ মণ ধান ফলিয়াছে।

---

* হাড়ের গুঁড়ার সহিত সালফিউরিক অম্লসংযোগে সুপার ফস্‌ফেট তৈয়ারি হয়।

রঙপুরক্ষেত্রে তামাক চাষ—

তামাক সুমাত্রা এবং দুই জাতীয় এমেরিকান তামাক—কনেকটিকট্ ও ফ্লেমিংগেনের চাষ করিয়া দেখা হইয়াছে। চুরুট প্রস্তুতের জন্য সুমাত্রা তামাকের খুব খ্যাতি আছে। রঙপুরের জল মাটিতে ইহা ভালরূপই জন্মায়। ভাল তামাকের চাষ করিলেই সুধু হয় না, তামাক পাতা ভাল রকম সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। তবে তাহার মূল্য বাড়িবে। এতকাল তামাক পাতা শোধন করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না। এক্ষণে রঙপুরক্ষেত্রে এই জন্য একটি ঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে। বিগতবর্ষের উৎপন্ন ১৪/ মণ ৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের তামাক ত্রিচিনাপল্লীর কোন ইউরোপীয় চুরুট ব্যবসায়ীর নিকট তামাকের গুণের তারতম্যানুসারে ৩৫৲ হইতে ৬০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইয়াছে। খাস রঙপুরের তামাক অপেক্ষা ৩ হইতে ৬ গুণ দর উঠিয়াছে। তামাক পাতা প্রস্তুত করা পর্য্যন্ত মোট খরচ প্রতি মণে ১৪৲ টাকা। এমেরিকান কনেকটিকটের ১৬ মণ ৫ সের এবং ফ্লেমিংগেনের ১২ মণ ১৭৷৷০ সের ফলন হইয়াছিল। তামাকের রঙ ভাল করিবার জন্য পাতায় উত্তাপ ও ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই কার্য্যের উপযোগী চুল্লী নির্ম্মিত করা হইয়াছিল। ঘরের তাপ সমভাবে রাখা ও লোহার পাইপের মধ্য দিয়া আগুণ চালান প্রভৃতি কার্য্য সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই ঘরে, ক্ষেত হইতে কাঁচা তামাকের পাতাগুলি আনিয়া ঝুলান হয় এবং এই প্রকারে তামাক পাতা শোধনে ৪ দিন সময় লাগিয়াছিল। তামাকের পাতাগুলির রঙ দাঁড়াইয়াছিল চক্‌চকে হল্‌দে। এই রকমে প্রস্তুত এমেরিকান তামাকের দাম ৩০৲ টাকা হইতে ৩৫৲ টাকা। তামাকের আবাদ এবং এইরূপে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করিতে প্রায় ২৫৲ টাকা খরচ পড়িয়াছে। ব্যবসায়ীর হাতে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা কম খরচে তামাক পাতা প্রস্তুত হইতে পারে।

বুড়ীরহাট ক্ষেত্রেও এমেরিকান ও সুমাত্রা তামাক মন্দ হয় নাই। তবে সেখানকার পরীক্ষার ফল এখনও আশানুরূপ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। সেখানেও কৃত্রিম উপায়ে ধোঁয়া ও তাপদ্বারা পাতা শোধন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উপায়ে তামাক ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয়। তবে বিগতবর্ষে রঙপুরের সুমাত্রা তামাকে যে দর মিলিয়াছে, তত দর আর ভবিষ্যতে না হইতে

পারে। কারণ এই বৎসর বিদেশাগত তামাকের উপর উচ্চহারে শুল্ক নির্দ্ধারিত করায় এত চড়া দরে এই তামাক বিক্রয় হইয়াছিল।

বঙ্গে গম—১৯১১-১২

বাঙলার মধ্যে বিহারে, নদীয়া, মুর্শীদাবাদ, হাজারিবাগ এবং পাটনায় গম জন্মায়। বর্ত্তমান বর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ অনুমান ১,২৬৩,৭০০ একর।

বঙ্গে ভাদুই শস্য—১৯১১

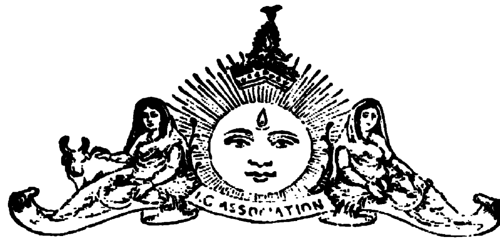
এ বৎসর আবাদী জমির পরিমাণ ১০,৩৯১,৫০০ একর। সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে সুবৃষ্টি না হওয়ায়ও মজঃফরপুর, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণায় অতিবৃষ্টিতে, বর্দ্ধমান, কটক ও পুরীতে জলপ্লাবনে পূর্ণ মাত্রায় ভাদুই ফসলের আবাদ হয় নাই। সমগ্রবঙ্গে গড় পড়তা হিসাবে ১০,৯৬০,৫০০ একর জমিতে ভাদুই ফসলের আবাদ হওয়া উচিত। অনুমানে ঠিক হইয়াছে যে শতকরা ৯০ ভাগ ফসল জন্মিয়াছে এবং এই বৎসর ভাদুই ধান্যের পরিমাণ ৩৪, ৮২০, ১০০ হন্দর। এক হন্দরের ওজন ভারতীয় মাপে কম বেশ ৫৪ সের। বিগত পূর্ব্ব বর্ষে ৩১,০৪৭,১০০ বৃক্ষের ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল।

বঙ্গে তিলের আবাদ—১৯১১

বর্ত্তমান বর্ষে কিছু কম জমিতে তিল চাষ হইয়াছে। বাৎসরিক তিলের আবাদী জমির পরিমাণ গড়ে ২৪৯,৪০০ একর কিন্তু এ বৎসর ২১১,৫০০ একর মাত্র জমিতে তিল চাষ হইয়াছে। একরে ৪½ মণ তিল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে ৩৩,০০০ টন তিল জন্মিয়াছে। ইহা ব্যতীত ৩৫,৭০০ একর পরিমাণ জমিতে ৫,২০০ টন জলদী জাতীয় তিল জন্মিয়াছে। অতএব সর্ব্বসমেত এ বৎসর উৎপন্ন তিলের পরিমাণ ৩৭,৭০০ টন। মোটামুটি হিসাবে ১ টনের ওজন ১ মণ ২৭ সের।

বঙ্গে নীল—১৯১১

বর্ত্তমান বর্ষে নীলের আবাদী জমির পরিমাণ ১১০,৬০০ একর। বিগত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৭,৬০০ একর অধিক। মোটের উপর ২৬,৭৫২ ফ্যাক্টরি মণ নীল উৎপন্ন হইয়াছে। বিগত পূর্ব্ব বৎসরে ২০,৬১৬ ফ্যাঃ মণ উৎপন্ন হইয়াছিল। মেঃ মোরাণ কোম্পানী মতে ২৬,০০০ ফ্যাঃ মণ নীল উৎপন্ন হইয়াছে।



পৌষ, ১৩১৮ সাল।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কার্য্য অল্পে অল্পে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে ইহার দ্বারা কৃষি-প্রাণ ভারতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। আমরা এই বিভাগের আশু উন্নতি দেখিতে ইচ্ছা করি কিন্তু তাহা প্রচুর ব্যয়সাধ্য, কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট মনে করিলে কি না হয় ভারত গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ মুক্তহস্ত, একার্য্যে সেইরূপ মুক্তহস্ত হইলে ভারতের কৃষির অবিলম্বে উন্নতি হইতে পারে এবং কৃষিমাত্র অবলম্বন এরূপ ৩০ কোটী ভারতের প্রজার অন্ন সংস্থানের উপায় হয়। আমাদের আশার কথা এই যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট এককালে উদাসীন নহেন। কৃষির উন্নতি কল্পে বহুব্যয়ে বঙ্গে,—পুষাতে, কৃষি-তত্ত্বানুসন্ধানাগার স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালার তুল্য জলহাওয়া, বাঙ্গালার মত মাটী কোথায়ও নাই। বাঙ্গালায় সেইজন্য ভারতীয় কৃষির কেন্দ্র হওয়া কর্ত্তব্য এবং এই কারণেই বোধ হয় পুষা তত্ত্বানুসন্ধানাগার বাঙলায় স্থাপিত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ কৃষিশিক্ষা বিস্তারের জন্য কি করিতেছেন—বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের উদ্যোগে বিগত ১৯১০ সালের ৩রা নভেম্বর সাবরে একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বৎসরেই উক্ত বিদ্যালয়ে ১২টি ছাত্র কৃষি শিক্ষার্থ গমন করিয়াছে। ছাত্রগণ সকলেই হিন্দু এবং ইহাদের মধ্যে ৬ জন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছে। ছাত্রগণকে অন্যান্য কলেজের উপাধির ন্যায় এখান হইতেও কৃষি বিদ্যাবত্তা-জ্ঞাপক উপাধি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উপাধি লাভ করিতে গেলে এখানে তিন বৎসর পড়িতে হইবে। কলেজে শিক্ষার ও অধ্যাপনার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে, রসায়ন ও বিজ্ঞানের সহকারী

অধ্যাপক যে কয়েক জনের অভাব ছিল তাহাও পূরণ হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে হইতেই কটকে, হাজারিবাগ ও বর্দ্ধমানে বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কৃষি-শিক্ষার্থ এক একটি শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট ছিল· এক্ষণে সেগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গয়া ও ডুমরাঁওতে ঐরূপ শ্রেণী এখনও আছে তাহাও বন্ধ করিয়া দিবার কল্পনা হইতেছে। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, এই সকল শ্রেণীতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া কৃষি বিষয়ে বিশেষ কোন ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না বা ঐ সকল ছাত্র স্বাধীনভাবে বা চাকুরি লইয়া কোনরূপ কৃষিকার্য্য পরিচালনের উপযুক্ত হয় না। এই সকল ছাত্রগণকে সাবর কলেজে প্রবেশেরও কোন বিশেষ সুবিধা বা সুযোগ দেওয়া হয় না; সুতরাং এই সকল কৃষি-শ্রেণীতে পাঠ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে মধ্য-ইংরাজী, উচ্চপ্রাথমিক ও অন্যান্য সমস্ত স্কুল সমূহে সাধারণ কৃষি, গাছ পালা ও জল মাটির সহিত ছাত্রগণের পরিচয় করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছেন। শিক্ষা-বিভাগের উপর এই কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। তবে শিক্ষা-বিভাগ ইচ্ছা করেন যে, কৃষি-বিভাগ হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে ও শিক্ষকগণকে মধ্যে মধ্যে পারিতোষিক দানের ব্যবস্থা করা হইবে।

কৃষি-শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম উপায় কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র নিয়োগ। এক্ষণে অনেক ছাত্র এইরূপে কৃষি-শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। কৃষি-বিভাগের ইচ্ছা যে, প্রাদেশিক কৃষি-সমিতি ঐ সকল পরীক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র পাঠাইয়া তাহাদের কৃষি শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। চাষী ছাত্রগণ সেখানে বিনা খরচে থাকিবার জায়গা পাইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে অধিকন্তু স্থানীয় হারে তাহাদের পরিশ্রমের মজুরী দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা রদ না হয় ইহা আমরা সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করি। পরীক্ষাক্ষেত্রে হাতে হাতিয়ারে অনেক কৃষি-তত্ত্ব ও কৃষি-কৌশল শিখা যাইতে পারে এবং ভবিষ্যতে ঐ সকল লোক নিজ নিজ চাষের উন্নতিবিধান কিম্বা সুচাষী হইয়া চাকুরী স্বীকার করিয়াও তাহার মনিবের চাষের সুশৃঙ্খলা করিয়া দিতে পারে এবং উপরন্তু তাহারা উচ্চহারে বেতন লাভে সমর্থ হয়। আর একটা চিন্তার বিষয় এই যে, যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় সাবরে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই শিক্ষা করিতে পারিবেন এবং যাঁহারা ভাল ছাত্র তাঁহারা তথা হইতে পুষাতে প্রবেশ লাভ করিবেন, এই কারণে আমরা আরও বলি যে, সাধারণ ছাত্রগণের পরীক্ষাক্ষেত্রে কৃষি-শিক্ষার মত কোন একটী বন্দোবস্ত না থাকিলে উপায়ন্তর কি! বিশেষতঃ কৃষি-শিক্ষার্থী ভদ্রবংশীয় ছাত্রগণের শিক্ষার এখনও কোন বিলি ব্যবস্থা হইতে দেখা যাইতেছে না।

কৃষিতত্ত্বানুসন্ধান—এক্ষণে সমস্ত বাঙলায় ছয়টি কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে—১ চুঁচড়া, ২ বর্দ্ধমান, ৩ বাঁকীপুর, ৪ ডুমরাঁও, ৫ সাবর এবং ৬ কটক। ইহা ছাড়া কলিমপঙে এক কৃষি-প্রদর্শন ক্ষেত্র আছে।

বিহারের প্লাণ্টার সমিতি নীল চাষ ছাড়িয়া অধুনা ইক্ষুচাষে মনোযোগী হইয়াছেন। এই জন্য ইক্ষুচাষের বিস্তার ক্রমশঃই বাঙলায় বাড়িতেছে। কৃষি-বিভাগের কৃষি-পরিদর্শক জেনারেল বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের পরীক্ষার জন্য কয়েকটি হস্তচালিত ঘুরণশীল চিনি প্রস্তুত যন্ত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাদ্বারা সহজে কম খরচে চিনি প্রস্তুত হইবে। বর্দ্ধমান ক্ষেত্রে চিনি প্রস্তুত করিয়া যন্ত্রগুলির পরীক্ষা করা হইবে।

বিহার প্লাণ্টার-সমিতি ইক্ষুচাষে মনোনিবেশ করিলেও তাঁহারা নীলের কথা মন হইতে তাড়াইতে পারেন নাই। সস্তায় ভাল নীল উৎপন্ন করিবার নানা প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে, গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে কম উদ্যোগী নহেন। এই কার্য্যে মোট ব্যয় ৪১,৮৩৩৲ টাকার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ৩২,৫০০৲ টাকা দিয়াছেন। নীল চাষের নববিধান,—গামলায় নীলের চাষ। যে ঘরে এই পরীক্ষা চলিতেছিল, সে ঘরটি জলে প্লাবিত হইয়া যাওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হইলেও পরীক্ষায় যৎকিঞ্চিৎ যাহা স্থির হইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে পরীক্ষার আশা নির্ম্মূল হয় নাই। আর একটি আশার কথা এই যে, নীল উৎপাদনকারী অনেকগুলি গাছ গাছড়ার আবিষ্কার হইয়াছে এবং সে গুলি লইয়া অনুসন্ধান চলিতেছে।

এই কৃষি-সমিতি পাট লইয়াও পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিহারে পাট চাষ করিয়া লাভ হইবার সম্ভাবনা খুব কম।

মজঃফরপুরে তিষির পাট উৎপন্ন করা বিগতবর্ষের অন্য একটি পরীক্ষার বিষয় ছিল। বেলজিয়ম হইতে এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আনাইয়া এই কার্য্যে ব্রতী করা হয়, তাহাতে ব্যয় হইয়াছে ৫,৫০০৲ টাকা তাহার ফলাফল এখনও প্রকাশ হয় নাই। এত ব্যয় হইলেও যদি ভারতের কৃষি সম্পদের বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের ভাল বলিতে হইবে।

রাসায়নিক বিভাগে ইক্ষু ও সয়সীম লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। বাঙলায় উৎপন্ন হয়, এইরূপ কয়েকপ্রকার ইক্ষু ও সয়সীম সংগ্রহ হইয়াছে। তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করিয়া ফলাফল শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত কতিপয় সংখ্যক মৃত্তিকার নমুনা, সার ও খাদ্যের পরীক্ষা হইয়াছে; পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা মোটে ১,৬৯১টি মাত্র। সার, খাদ্য, মাটি বিশ্লেষণের ব্যবস্থা আরও যাহাতে বহু পরিমানে হয় ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

উদ্ভিদ-বিদ্যা (Botany) আলোচনার জন্য একটি যন্ত্রাগার সম্পূর্ণরূপে পরিগঠিত হইয়াছে। তত্ত্ববিচার করিয়া ভাতুই কলাই আদির শ্রেণী নির্ণয় হইতেছে। বিভিন্ন প্রকার কুলথী, সিম, মসূর, মুগ, শণ, মটরাদির তত্ত্ব নির্ণিত হইতেছে। উদ্ভিদ-বিদ্যা সাহায্যে ৮৮ প্রকার পরস্পর বিভিন্ন আখ উৎপন্ন

হইয়াছে। ফাগুণ, মরুয়া, বাজরা লইয়া বিচার করা হইতেছে। ছাত্রগণের শিক্ষা বিধানার্থ ২৭৬টি গাছ পালার নমুনা সংগ্রহ হইয়াছে। সাবরের ছাত্রগণের জন্য উদ্ভিদ বিচার পুস্তিকা বাস্তবিকই উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

কৃষি-বিভাগ দ্বারা কীটতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশিষ্ট আলোচনা হইতেছে। অন্যান্য কার্য্য অপেক্ষা কৃষি-বিভাগ এই কার্য্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। এ দেশের বহু শস্য কীটাদির উপদ্রবে নষ্ট হইত, এখনও হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে কীটের দ্বারা ধ্বংশ নিবারণের বিশেষ প্রকার চেষ্টা হইতেছে এবং এই চেষ্টার ফল ভবিষ্যতে আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। পাটের পোকা, আখের পোকা, পানের পোকা, তামাকের পোকা, আমের পোকা ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনায় বাঙলা দেশের চাষীর বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। উপরোক্ত পোকাগুলি ফসল নষ্ট করে। পোকাদ্বারা উপকার হয় এমন পোকাও আছে—যেমন লাক্ষা পোকা, তসর পোকা। ভারতের লোক এই সকল পোকার কথা বহুকাল হইতে জানে; তথাপিও এই সমন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়ায় লাভ আছে এবং তাহাতে সাধারণে ইহার চাষ আবাদ করিয়া লাভবান হইতে পারে। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ সেই শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিতেছেন।

ফসলে কীটের উপদ্রব ব্যতীত ফসলের অন্য রোগও আছে। 'মাইকোলজীতে এই বিষয় আলোচিত আছে। সাধারণতঃ ইহাকে ছত্রকরোগ ও ধ্বসা-ধরা বলা যায়।

মানভূম, মজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ, নদীয়া প্রভৃতি কত স্থানে ধানে ছাত্‌রা লাগিয়া কত আবাদ নষ্ট হইয়াছে। ক্ষেত অধিক জলবসা হইলে, ধান-ক্ষেত বৎসরের মধ্যে একবার অন্ততঃ শুষ্ক হইয়া না গেলে বা তাহাতে লাঙ্গল মৈ দিয়া চষিয়া হাওয়া খাওয়াইতে না পারিলে ধানে প্রায়ই এই রোগ দেখা দেয়। জমি হইতে জল বাহির করিয়া দিয়া জমিতে হাওয়া রৌদ্র খাওয়াইয়া তাহার পর জল ঢুকাইতে হয়। অথবা প্রতি বিঘায় পাঁচ কিম্বা ছয় সের হিসাবে খাড়ি লবন ছড়াইতে হয়। আখে লাল ধ্বসা ধরে। খড়ি আখে অন্য আখের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধ্বসা লাগিয়া থাকে। রোগাক্রান্ত আখ কাটিয়া পুড়ান ছাড়া আর অন্য প্রতিকার অদ্যাপিও স্থির হয় নাই। আলুর গোড়ায় এক প্রকার ধ্বসা ধরে, অলুর পাতায় এক প্রকার দাগ লাগে এবং আলুতে এক প্রকার জীবাণুজ পোকা ধরে। ইহাদের প্রতিকার কি, আজিও সম্পূর্ণরূপে ঠিক হয় নাই; এই সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষের বঙ্গীয়-কৃষি বিভাগের একটি প্রধান কার্য্য রেশম চাষের উৎকর্ষ বিধান। ইহার জন্য একটি রেশম-সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার সভাপতি

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর। অধুনা বাঙলায় তিন জাতীয় রেশম কীটের চাষ হয়,—ছোট পালু, নিস্তারি এবং বড় পালু। এই কীটগুলিকে বিশেষভাবে প্রতিপালন করিলে যদি তাহাদের দ্বারা চীন, জাপান এবং ইটালিয়ান রেশমের মত রেশম উৎপন্ন করিতে তাহার পারা যায় বিধিমত চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু কীটতত্ত্ববিদ লেফ্রয় সাহেব বলেন যে, এই বীজ হইতে দেশী রেশম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রেশম উৎপন্ন হওয়া কঠিন। বিদেশী বীজ আনাইয়া এদেশী বীজের সহিত শঙ্কর উৎপাদন করা ব্যতীত উপায় নাই। এই কারণে তাঁহার পরামর্শ মত বিদেশ হইতে রেশম কীট আনান হইবে এবং শঙ্কর উৎপাদনার্থ ফ্রান্স হইতে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আসিয়াছেন। দুই তিন বৎসরের অনবরত চেষ্টার পর তবে কি ফল দাঁড়ায় জানা যাইবে।

বাঙলার নানা স্থানে সর্ব্বসমেত ১৯টি রেশম কীট পালনাগার (Nurseries) আছে। এই সকল স্থান হইতে অন্যত্র বীজ বিতরণ হয়। বিগত বর্ষে এই সমস্ত নর্শারি হইতে ৭,৮৫৮ টাকার বীজ বিক্রয় হইয়াছে। কৃষি-বিভাগ হইতে সুধু বীজ বিক্রয় হয় নাই, অন্য পোকার উপদ্রব হইতে যাহাতে রেশম চাষের ক্ষেতগুলি রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। পলু প্রতিপালনের গৃহগুলি রক্ষা করিবার জন্য উপায়াভিজ্ঞ ব্যক্তি সকল এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। এখনও কিন্তু এরূপ উপযুক্ত লোকের খুব অভাব। কতিপয় লোক পলু প্রতিপালনের প্রধান কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

চীন দেশ হইতে শাদা এবং নীল গুটী আনাইয়া চাষীগণকে দেওয়া হইয়াছে, ইটালি হইতে তুঁতগাছ আনাইয়া তুঁতের ডাল কাটিয়া চাষীগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া ইটালীয় তুঁত চাষের চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতা লিণ্ডি বরফগুদামে রেশম গুটি রক্ষা করিয়া, উৎকৃষ্ট রেশম কীট উৎপাদন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, ভাল রেশম উৎপাদনের বহুতর চেষ্টা কৃষি-বিভাগের আন্তরিকতার পরিচায়ক।

মৎস্যের চাষ—কৃষি-বিভাগ ইদানী মাছের আবাদেও মনোনিবেশ করিয়াছেন। বাঁধাজলে মাছের ডিম ফুটে কি না!তাহা লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষা সফল হয় নাই। আমরা জানি যে খুব দৌড়দার দীর্ঘিকা না হইলে তথায় রোহিত, কাতলা, মিরগাল প্রভৃতি পোনা মাছের ডিম ফুটে না। এরূপ বড় বড় দীর্ঘিকায় আমরা পোনামাছের ডিম ফুটিতে দেখিয়াছি। মৎস্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় অনুসন্ধান ইলিস্ মাছের জন্মস্থান ও সময় নির্ণয় করা। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইলিস্ মাছ ডিম ছাড়ে এবং বক্সার, মুঙ্গেরাদি গঙ্গার উপরের স্রোতই তাহাদের ডিম প্রসবের স্থান। ভেটকি, ভাঙ্গন, পারসে প্রভৃতি লোণা মাছের চাষ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। বামনঘাটার ভেড়ী

লইয়া এই সকল মৎস্য সম্বন্ধে তত্ত্বসংগ্রহ করা হইতেছে। অদ্যাপিও এই মৎস্য কুলের আচরণ পর্য্যালোচন করিয়া এমন কিছু বিশেষ সিদ্ধান্ত ঠিক করা হয় নাই।

কৃষি-বিভাগের উদ্যোগে বাঙলার অনেক স্থানে প্রাদেশিক কৃষি-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, চম্পারণ, কটক, আঙ্গুল, সম্বলপুরাদি প্রত্যেক জেলায় একটি কৃষিসমিতি গঠিত হইয়াছে। দেশে গণ্যমান্য জমিদারগণ এই সকল সমিতিতে যোগ দিয়াছেন। কৃষি-বিভাগের উদ্যোগে এবং জমিদাগণের চেষ্টায় বঙ্গের কৃষির উন্নতি বিধানার্থ সাধারণে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে। যদিও এই সমিতি গুলির দ্বারা অদ্যাপিও কৃষির উন্নতি বিধায়ক বিশেষ কোন কার্য্য সংসাধিত হয় নাই, তথাপি আমরা হুগলির শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার মিত্র, চকদিঘির রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর, বিরভূমের বাবু রামেশ্বর পরামাণিক ও বাবু কালিকানন্দ বন্দোপাধ্যায়, ২৪ পরগণার বাবু তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কনক রায়, রায় কালীভূষণ ঘোষ বাহাদুর, খুলনার বাবু যতিন্দ্রনাথ বসু, বাঁকিপুরের রায় পূর্ণেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, সাহাবাদের বাবু হরিহরপ্রসাদ সিংহ, মজঃফরপুরের বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, চাম্পারণ রাজপুরে নীলকর ই, এইচ, হডসন সাহেব, ভাগলপুর জেলার মাধিপুরা গ্রামের সারদাপ্রসাদ সরকার, হাজারিবাগের বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বালেশ্বরের রাজা বাহাদুর, এই সকল ব্যক্তিগণকে উৎসাহিত দেখিয়া আমাদের মনে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের নিকট সাধারণ কৃষক মণ্ডলী আর একটি বিষয়ের জন্য ঋণী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কৃষি-বিভাগ কৃষি, শিল্প ও পশু প্রদর্শনীতে কৃষিজাত দ্রব্যাদি, কৃষি যন্ত্রাদি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কৃষি-বিভাগের অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীগণ প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যন্ত্রাদির ব্যবহার দেখাইয়া দেন ও কৃষিজাত দ্রব্য ও পশ্বাদি সম্বন্ধে অনেক বিশেষ তথ্য সাধারণকে সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। মিঃ ই, জে, উডহাউস্ কি প্রকারে দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য বা কিরূপ ভাবে দেখান উচিত, কি রূপে সেগুলি সজ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য এতদ্‌সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল কর্ম্মচারী প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা তাঁহার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কৃষি-বিভাগ হইতে প্রদর্শনীতে অর্থ সাহায্য করা হইয়া থাকে। বিগত বর্ষে ৫,০০০৲ টাকা বিভিন্ন প্রদর্শনীতে সাহায্য করা হইয়াছিল।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ কৃষি সম্পর্কীয় অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং স্থানীয় জমিদারগণের সহিত সমবেত চেষ্টায় এক্ষণে কৃষির উন্নতিকল্পে যেরূপ উদ্যোগী হইয়াছেন, যদি তাঁহারা ফলাফল নির্ণয়ের প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি রাখেন, তবে বঙ্গের কৃষি-বিভাগ অচিরে আদর্শস্থান অধিকার করিবেন।

রাজার আগমনে ভারতবাসীর আশা

রাজা ও রাণী গত ৩০এ ডিসেম্বর, শনিবার কলিকাতা আগমন করিয়াছিলেন, ৮ই জানুয়ারী সোমবার কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

রাজা ও রাণী ২রা ডিসেম্বর ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ১০ই জানুয়ারী ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। সম্রাটের আগমনে বোম্বাই, দীল্লি, কলিকাতা ও নাগপুরে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু রাজা ও রাণীর অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতায় যেরূপ আয়োজন, যেরূপ সাজসজ্জা, যেরূপ জনসম্মিলন হইয়াছিল, কুত্রাপি সেরূপ হয় নাই। এরূপ উৎসাহ, এরূপ জনতা, এরূপ আনন্দ উৎসব আর কখনও দেখা যায় নাই বলিলেও বলা যায়।

রাজা বঙ্গবিভাগ রদ করিয়া বঙ্গ-বিভাগ জন্য বেদনা দুর করিয়াছেন। অধিকন্তু বঙ্গদেশের প্রাণে আনন্দ ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। ধন্য সেই রাজা, আর ধন্য সেই রাজমন্ত্রী ও রাজপ্রতিনিধি, যাঁহারা প্রজার মনের বেদনা জানিয়া তাহা দুর করিতে প্রস্তুত হন।

শিক্ষা বিস্তার—যাহাতে সার্ব্বজনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, প্রজার ইহা একান্ত ইচ্ছা। রাজা দিল্লীতে ঘোষণা করিয়াছেন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইবে এবং বৎসর বৎসর সাহায্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অভিনন্দনের উত্তরে রাজা বলিয়াছেন,—"আমার এই ইচ্ছা যে, দেশের সর্ব্বত্র স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারতবাসীগণ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া শিল্পে, কৃষিতে, অন্যান্য কার্য্যে অন্য দেশের লোকের সমকক্ষ হয়, ভারতের গৃহ জ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত হয়, ভারতবাসীর পরিশ্রম ও জ্ঞান দ্বারা সুশিক্ষা হয়, তাহাদের চিন্তা উন্নত হয়, সুখ ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়। ভারতের শিক্ষা বিস্তারের বিষয় সর্ব্বদাই আমার মনে থাকিবে। শিক্ষাই ভারতবাসীকে আশা দিয়াছে। উন্নততর শিক্ষা দ্বারা ভারতবাসী উন্নততর আশা লাভ করিবে।"

উন্নততর শিক্ষার জন্য ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকট উত্তরোত্তর অধিক ব্যয়ের প্রার্থনাই এক্ষণে ভারতবাসীর প্রাণে সর্ব্বদাই জাগিবে, কারণ রাজ-সাহায্য ব্যতীত সমগ্র প্রজার সুশিক্ষা সম্পন্ন হওয়া কঠিন।

রাজা এদেশে আসিয়া এদেশবাসীর মনে নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়াছেন, নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়াছেন, নূতন আশার উদ্রেক করিয়াছেন।

রাজার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-সৌধ দর্শন—কলিকাতায় অবস্থানকালে এক দিবস প্রাতঃভ্রমণের পর, বেলা সাড়ে দশটার সময় সম্রাট, লর্ড হার্ডিঞ্জ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গ্রিমষ্টোন, কাপ্তেন গডফ্রে ফসেট ও কাপ্তেন বর্ণের সহিত মোটরযোগে ভিক্টোরিয়া 'মেমোরিয়াল' পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি স্মৃতি-সৌধের নক্সাসমূহ পরিদর্শন করেন। স্মৃতি-সৌধের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তিনি সার উইলিম এমারসন্‌কে বহু বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

স্মৃতি-সৌধের একটি সুন্দর মডেল বা আদর্শ প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র নক্সায় ভাবী বিশাল-সৌধের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সম্রাট দুই একটি বিষয় পরিবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যে প্রতিমূর্ত্তি এক্ষণে রেডরোডে বিরাজ করিতেছে, তাহা স্মৃতি-সৌধের পাদমূলে রক্ষা করিবার কল্পনা হইয়াছিল। এ ব্যবস্থা সম্রাট মহোদয়ের মনোমত হয় নাই। সৌধ হইতে কিছুদূরে যে পুষ্পময় ক্ষেত্র থাকিবে, তিনি তাহার মধ্যস্থলে মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। সম্রাটের ইচ্ছা এই যে, প্রতিমূর্ত্তির চতুষ্পার্শ্বে সুন্দর রাস্তা নির্ম্মিত হইবে, সেই প্রশস্ত রাস্তায় লোক গাড়ী করিয়া বেড়াইতে পারিবে।

জয়পুরের মাক্‌রা নামক খনি হইতে স্মৃতি-সৌধের জন্য মার্ব্বেল প্রস্তর আনীত হইতেছে। প্রতি সপ্তাহে গাঁথিবার উপযোগী ৫০ টন মার্ব্বেল মাক্‌রা হইতে কার্য্যস্থলে আনীত হইয়া থাকে। সম্রাট মহোদয় এই সকল মার্ব্বেল খণ্ডও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার পর সম্রাট মহোদয় ভিক্টোরিয়া সৌধের নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিদর্শন করেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলন। কি ভাবে পাষাণখণ্ডগুলি বিন্যস্ত হইতেছে, শুর্কীতে কি পরিমাণ চূণ মিশ্রিত করা হয়, সম্রাট মহোদয় তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহার পর সম্রাট মহোদয় স্মৃতি-সৌধের ভিত্তি-প্রস্তরের নিকট উপস্থিত হন। ভিত্তি-প্রস্তরের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া সম্রাট বলেন, ছয় বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই সময় আমি ভিত্তি-প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। সম্রাট তখন প্রিন্স অফ ওয়েলস বা যুবরাজ ছিলেন।

টালিগঞ্জে অশ্ব প্রদর্শনী—সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী মোটরযোগে টালিগঞ্জের অশ্ব-প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। মিসট্রেস অফ দি রোব্‌স্, ভারত-সচিব, লর্ড ক্র, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সার গ্রীমষ্টোম, কাপ্তেন গডফ্রে ফসেট, লর্ড চার্ল্‌স্ ফিজমরিস প্রভৃতি সম্রাটের অনুগমন করিয়াছিলেন।

চিত্রশালায় সম্রাজ্ঞী—সম্রাজ্ঞী মেরী লেডী হার্ডিঞ্জের সহিত মোটরকার-যোগে কলিকাতার চিত্রশালা বা যাদুঘর দেখিতে গিয়াছিলেন। মিউজিয়মের ট্রষ্টীগণের পক্ষ হইতে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্রাজ্ঞীর সংবর্দ্ধনা

করেন। তাহার পর সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধের জন্য সংগৃহীত দ্রব্য-সম্ভার পরিদর্শন করেন। স্বর্গীয় সপ্তম এডওয়ার্ড যখন ভারত-ভ্রমণে আসেন, তখন তিনি করি-পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া হাতীর মিছিলে জয়পুরের রাজপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জগৎ-প্রসিদ্ধ রুষ-চিত্রকর এই মিছিলের বিশাল চিত্র আঁকিয়াছিলেন। এই চিত্রখানি সর্ব্বাগ্রে সম্রাজ্ঞী মেরীর দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছিল।

তাহার পর সম্রাজ্ঞী রাজমাতা আলেকজান্দ্রার চিত্র দর্শন করেন। স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনের ঘটনাবলী যে সকল আলেখ্যে অঙ্কিত হইয়াছে, সেই চিত্রাবলী আমাদের সম্রাজ্ঞী আগ্রহ সহকারে বহুক্ষণ ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন। ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলদিগের চিত্র, পলাশী ও শ্রীরঙ্গপত্তনের রণক্ষেত্রের এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের মৃন্ময়ী অনুকৃতি দেখিয়া সম্রাজ্ঞী প্রীতিপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সম্রাজ্ঞী এই কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া শিল্পসম্ভার সংগ্রহ দেখিবার জন্য উপরিতলে গমন করেন।

সম্রাজ্ঞী শিল্প-সংগ্রহ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্র দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্রাজ্ঞীকে চিত্রাবলী দেখাইবার সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শুনিতেছি, তিনি সম্রাজ্ঞীর জন্য কতকগুলি ভারতীয় চিত্র সংগ্রহ করিবার ভার পাইয়াছেন। 'আর্ট গ্যালারীতে' সম্রাজ্ঞী প্রায় কুড়ি মিনিট যাপন করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি যাদুঘর হইতে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সম্রাজ্ঞীর প্রত্যাবর্ত্তনের এক ঘণ্টা পরে সম্রাট অনুচরবর্গ সহ যাদুঘর দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

গত দিল্লীর দরবারে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন, সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সম্মতিক্রমে তাহা গত ৪ঠা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন তিনটা পর্য্যন্ত যাদুঘরের চিত্রশালায় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

পাটের কলে রাজা ও রাণী—সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী কয়েক জন অনুচর সহ হাবড়া জেলার অন্তর্গত সাঁকরাইল গ্রামে "বেলবেডীয়ার জুট মিলস্" নামক পাটের কল দেখিতে গিয়াছিলেন।

স্যার ডেভিড ইউল সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে মিলের কার্য্য-প্রাণালী সমুদায় দেখাইয়াছিলেন। কলিকাতার বন্দর হইতে মিলের জেটিতে উপস্থিত হইবার পর, যে ভাবে পাট বাছাই ও পরিষ্কৃত হয় সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সেই সকল অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া "হাইড্রলিক প্রেসে" পাটের গাঁট বাঁধা পর্য্যন্ত সমুদয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কলের সমুদয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কলের অংশ-বিশেষের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া পরিদর্শন করেন।

মাটির উৎপাদিকা শক্তির সংরক্ষণ—

নানাপ্রকার চাষের পদ্ধতি আছে। কি প্রকার চাষে মাটির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, অথবা ক্ষয় হয় না—তাহা জানিয়া রাখা অনেক সময় চাষের মূল সূত্র বলিয়া বোধ হয়। জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি কেন হয়, তাহা জানিতে পারিলে এ বিষয়ের একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। জমির উৎপাদিকা শক্তি জমিস্থিত নাইট্রোজেনের উপর নির্ভর করে। যদিও ফস্‌ফরিক অম্ল, পটাস এবং চূণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের খাদ্য যোগায় কিন্তু জমিস্থিত এই পদার্থগুলি জল হাওয়ার গুণে সহজে পরিবর্ত্তিত বা স্থানান্তরিত হয় না। যখন একমাত্র নাইট্রোজেনের মাত্রার সহজে পরিবর্ত্তন হয়, তখন এ বিষয়ের একটা মিমাংসা কথঞ্চিৎ সহজ হইল বলিতে হইবে। এক্ষণে দেখিতে হইবে কি কি উপায়ে নাইট্রোজেনের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়।

১। সার মাত্রেই যতক্ষণ না রস সংযোগে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, ততক্ষণ উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। মাটি হইতে গ্রহণোপযোগী নাইট্রোজেন উদ্ভিদ নিজ দেহপুষ্টির জন্য সংগ্রহ করে। ইহাতে মাটির নাইট্রোজেনের হ্রাস হয়।

২। কতিপয় জীবাণু জমিতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয় করে। শিম্বি-জাতীয় উদ্ভিদের মূলে যে আবের মত দৃষ্ট হয়, তাহা এই জীবাণুগণের কার্য্য।

৩। অন্য জাতীয় জীবাণুগণ আবার জৈবিক পদার্থের পচন দ্বারা সঞ্চিত নাইট্রোজেন বিযুক্ত করিয়া দেয়। ইহাতে জমির নাইট্রোজেনের হ্রাস হয়।

৪। কতিপয় জীবাণু মাটির নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রেট তৈয়ারি করে। জমির পয়নালা দিয়া জলের সহিত এই নাইট্রেট গলিয়া বাহির হইয়া যায়।

৫। বৃষ্টির জলের সহিত বায়ুমণ্ডলস্থিত নাইট্রোজেন মাটিতে আসিয়া সঞ্চিত হয়। নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে এইরূপে অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। কত পরিমাণ নাইট্রোজেন এই প্রকারে প্রতি বৎসরে সঞ্চিত হইতে পারে তাহার নির্ণয় করিবার জন্য ভারতবর্ষে কোন চেষ্টা করা হয় না। বিলাতে রদামষ্টেট ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে স্থির হইয়াছে যে ৩·৮৪ পাউণ্ড নাইট্রোজেন এক একরে এক বৎসরে সঞ্চিত হইয়াছে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে নানাপ্রকারে মাটির নাইট্রোজেন বাড়িতেছে ও কমিতেছে। নাইট্রোজেনের মাত্রা বাড়াইতে হইলে কৌশলে জমির চাষকার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

দেখা গিয়াছে যে, এক জমিতে ক্রমান্বয়ে ধান, গম, যব, যই আদি শস্যের চাষ করিলে প্রতি ফসলের সহিত জমির নাইট্রোজেন ব্যয়িত হয়। ইহাদ্বারা কেবল যে শস্যের আহারার্থে নাইট্রোজেন খরচ হয় তাহা নহে, বারম্বার চাষ হেতু মাটির নাইট্রোজেন জীবাণুদ্বারা বিযুক্ত হইয়া পড়ে ও নষ্ট হয়। সুতরাং এরূপভাবে চাষ করা কদাচ উচিত নহে। অন্যান্য ফসলের মাঝে মাঝে শুটীধারী শস্যের চাষ করিলে এবং সময়ে সময়ে সেই ক্ষেতে ভেড়ার পাল রাখিবার ব্যবস্থা করিলে জমির নাইট্রোজেন অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। পূর্ব্বে জমিতে কৃত্রিম বা খণিজ সার দিবার প্রথা ছিল না, তখন জমির উর্ব্বরতা রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায় ছিল।

একটি ক্ষেতে এক বৎসর ধান কিম্বা গম জন্মাইয়া তার পর বৎসর মটর, মসুর প্রভৃতি শুটীধারী শস্য জন্মাইতে হইবে, তার পর বৎসর জোয়ার, বাজরা,

মড়ুয়া, কাত্তন প্রভৃতি ঘাস জাতীয় শস্য জন্মাইতে হইবে। এই ঘাস জাতীয় শস্যের মূল হইতে জমির উর্ব্বতা বাড়িবে। এই সকল ক্ষেতে ভেড়া রাখিলে ঐ ঘাষ খড় খাইয়া ভেড়ার মলমূত্র হিসাবে সে গুলি আবার জমির নাইট্রোজেন বৃদ্ধির কারণ হইবে। শুটিধারী শস্যের মূলেও নাইট্রোজেন সঞ্চিত হইয়া জমির উর্ব্বরতা বাড়াইবে। ধান গমের চাষে, বা জীবাণুদ্বারা বিযুক্ত হইয়া বা জলের সহিত যে নাইট্রোজেনের হ্রাস হইবে, ঐ প্রকার পরিবর্ত্ত চাষে তাহার পূরণ হইয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি চিরকালই এক ভাবে থাকিবে। এ স্থলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী অন্যান্য উপাদান যথা ফস্ফরিক অম্ল, পটাস কিম্বা চূণ যথোপযুক্ত মাত্রায় বর্ত্তমান আছে। বাস্তবিক আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতীয় অধিকাংশ মৃত্তিকায় চূণ ও পটাসের অভাব নাই। ফস্ফরিক অম্লের জন্য জমিতে মাঝে মাঝে সুপার ফস্ফেট দিতে পারিলে জমি হইতে সমভাবে ফসল পাইবার আশা কোন কালে ব্যর্থ হয় না। এক বিঘা জমিতে ১মণ হইতে ১৷৷০ মণ সুপার-ফস্ফেট যথেষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ইউরোপে এক একর (৩ বিঘা) জমিতে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে চাষ করিলে ন্যূনকল্পে গড়ে ১ মণ ১৪ সের গম উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা অত্যন্ত কম ফলন বলিয়া ধরিতে হইবে। ফলন বাড়াইতে হইলে চাষীগণকে মাটির নাইট্রোজেন বৃদ্ধির উপায় দেখিতে হইবে। হয় চাষীগণকে কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেন বাড়াইতে হইবে কিম্বা জমিতে ভেড়া রাখিয়া ভেড়া সকলকে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইতে হইবে। ভেড়া ভাল খাইলে ভেড়ার পরিত্যক্ত মলও সারবান হইয়া থাকে। জমির গড় ফলনের উপর ১২ সেরের অধিক বাড়ান ভাল নহে। অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন সার দিয়া ফলন বাড়াইতে চেষ্টা করিলে শস্যের খাদ্য ব্যতীত অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন নষ্ট হয় এবং উত্তরোত্তর দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মাত্রায় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের আবশ্যক হইয়া পড়ে। ফলনের মাত্রা কতদূর হওয়া উচিত, ফসলের দাম হিসাবে তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে চাষীগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবেন। ইউরোপে কোন কোন চাষী একর প্রতি খৈলের জন্য ৪০ সিলিং (ভারতীয় মুদ্রায় যাহার মূল্য ৩০৲) টাকা খরচ করিয়া তাঁহার জমির নাট্রোজেনের মাত্রা বাড়াইতে চেষ্টা করেন। তিনি ভাল আলু, ভাল যব, ইচ্ছা করিলে ভাল ভেড়ার পাল তৈয়ারি করিয়া বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করেন। কিন্তু যে বাজারে উচ্চ মূল্য পাওয়া যায় না কিম্বা অসমর্থ পক্ষে খৈলের জন্য ১০ সিলিং (যাহার দাম ভারতে ৭৷৷ টাকা) মাত্র খরচ করাই উচিত।

বৃটিস কৃষি-ব্যবস্থাপক সভার বিবরণীতে জানা যায় যে, কোন একটি ক্ষেত্রে এক বৎসরে এক একরে কত পরিমাণ নাইট্রোজেনে ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়াছে—

এই জমিতে	১৮৬৫ শালে	নাইট্রোজেনের মাত্রা	২,৭২২ পাঃ
ঐ	১৮৯৩ ”	”	২,৪৩৭ ”
২৮ বৎসরে হ্রাস	”	”	২৮৫ ”
বৃষ্টির জলে বৃদ্ধি	”	”	১০৭ ”
শস্যের খাদ্যরূপে ব্যয়	”	”	৪২৮ ”
অন্য প্রকারে বৃদ্ধি	”	”	৩৬ ”

নাইট্রোজেনের মাত্রায় হ্রাস বৃদ্ধি হিসাব করিয়া সমতা রক্ষা করাই সুচাষীর কর্ত্তব্য।

পত্রাদি

রবার বীজ—মিঃ জে, চৌধুরী—আগরতলা, ত্রিপুরা।

রবার বৃক্ষ অনেক প্রকারের আছে। প্যারা রবার, ইণ্ডিয়া রবার, ইউলটি রবার এই কয়টির মধ্যে পরস্পর সৌসাদৃশ্য আছে। ভারতে ইহাদের সাধারণতঃ বংশীবট বলে। বীজ-তলাতে মাটি প্রস্তুত করিয়া বীজ বপন করিতে হয়, ৮ ইঞ্চ অন্তর, ১ ইঞ্চ মাটি চাপা দিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা ছায়াযুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং জল সিঞ্চন দ্বারা সরস রাখিতে হয়। বীজ ফুটতে ১ হইতে ১॥০ মাস বিলম্ব ঘটিতে পারে। দশ বার মাস বীজতলায় চারা গুলি রাখিয়া ২ ফিট পর্য্যন্ত বাড়িতে দেওয়া হয়। তারপর নির্দ্দিষ্ট ক্ষেতে বসান হয়। তাঁল জাতীয় গাছের ন্যায় রবার গাছের গোড়া হইতেও তেউড় বাহির হয়। সেই তেউড়গুলি ছোট অবস্থায় তুলিয়া লইয়া ২ কিম্বা ৩ বৎসর হাপরে ছায়ায় রাখিতে হয়। এই সকল রবার গাছ বড় হয় কিন্তু সিয়ারা রবারের গাছ অধিক বড় হয় না। ইহা অনেকটা কাসাভার মত গাছ। ইহারও চারা প্রস্তুত প্রণালী অন্য রবার গাছের মত।

চাযের জমি—শ্রীযুক্ত সুণীলচন্দ্র বসু, যুক্তপ্রদেশ, মুশৌরী।

আপনি বলিয়াছেন যে, (১) জমির খাজনা সস্তা, অথচ (২) জমি উর্ব্বরা, (৩) মজুরের অভাব নাই, অথচ তাহাদের মজুরি সস্তা, (৪) জল সেচনের সুবিধা আছে এবং (৫) উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের সুযোগ আছে—সেই খানেই চাষের জন্য জমি লওয়া কর্ত্তব্য। ছোট টুক্‌রা জমি লইয়া বিদেশে যাইয়া চাষ করা সুবিধাজনক নহে। দেরাদুন ও গোয়ালিয়রে জলহাওয়া ভাল এবং তথায় চাষের উপযুক্ত উর্ব্বরা জমি মিলিতে পারে, কিন্তু তথায় যাইয়া চাষ করা আপনার পক্ষে সুবিধা-জনক হইবে কিনা আপনি তাহা ভাল বিবেচনা করিতে পারিবেন। মজুরের মজুরি কত বা মজুরের অভাব আছে কিনা অনুসন্ধানে জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

সুন্দরবনে জঙ্গল লইয়া আবাদ করা খুবই লাভজনক। জঙ্গল কাটিয়া ঐ সকল জমিতে হৈমন্তিক ধান চাষ ভিন্ন অন্য কোন চাষ হইবে না। কিন্তু সুন্দরবনে চাষে ভদ্রলোকের প্রধান অন্তরায় এই যে, সুন্দর বনের জল লোণা এবং কতকটা অসহনীয়। বর্ষাকালেই ধানের চাষ—এই কালে জল, কাদা ও রৌদ্র সহ্য করিয়া চাষ করিতে পারিলে লাভ নিশ্চয় হইবে। মাতলা ডায়মণ্ড হারবার, ও সাগর দ্বীপের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে মজুর মেলে না, অন্যত্র হইতে মজুর লইয়া যাইতে হয়। জমি সস্তায় পাওয়া যাইতে পারে। জমিও খুব উর্ব্বরা, ধান জন্মিলে তাহা বিক্রয় হইবার ভাবনা নাই। অনেক কষ্টসত্বেও এই সকল কারণে সুন্দর বনের আবাদ ভাল।

সার-সংগ্রহ।

যা হয় তা রয় না *

অনেকে বোধ হয় পতঙ্গপাল (পঙ্গপাল) দেখিয়া থাকিবেন, অন্ততঃ ইহাদের কথা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। আফ্রিকা, আরব, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশের বালুকাময় প্রান্তরে পতঙ্গিনী ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্ব ফুটিয়া তাহা হইতে প্রথম ফড়িং বাহির হইয়া লাফাইয়া বেড়ায়। সেই ফড়িং তাহার পর পক্ষযুক্ত পতঙ্গের আকার ধারণ করে। জলবায়ু সুবিধাজনক হইলে সংখ্যাতীত কোটি কোটি পতঙ্গ হইয়া আহার অন্বেষণে দূরদেশে উড়িয়া যায়। পতঙ্গপাল মেঘের ন্যায় সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে, গাছে বসিলে তাহাদের ভারে গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া যায়, সমস্ত দেশে হরিৎবর্ণের তৃণটী পর্য্যন্ত তাহাদের মুখ হইতে পরিত্রাণ পায় না। পক্ষী সকল তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। অনেক স্থানে মানুষেও ইহাকে সুখাদ্য মনে করিয়া আহার করে। দেশের গভর্ণমেণ্টও ইহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত নানা কৌশল অবলম্বন করেন। ১৮৮৩ ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সাইপ্রস দ্বীপে দুই হাজার পাঁচ শত ষাট কোটি পঙ্গপালের পোকা বধ করিয়াছিলেন। তবুও ইহাদের সংখ্যা কিছুতেই হ্রাস হয় নাই। এইরূপ নানা দৃষ্টান্ত দেখিয়া নীতিশাস্ত্রকার পিপীলিকা ও অতিদর্প নামক কৃষ্ণ সর্পের গল্পে বলিয়াছেন,—

বহবো ন বিরোদ্ধব্যং দুর্জ্জয়া হি মহাজনাঃ।
স্ফুরন্তমপি নাগেন্দ্রং ভক্ষয়ন্তি পিপীলিকাঃ॥

কিন্তু পতঙ্গপাল স্বভাবতঃই অধিক দিন জীবিত থাকে না, এবং সকল বৎসর জল বায়ু ইহাদের পক্ষে প্রসন্ন হয় না। তাই রক্ষা, তা না হইলে প্রথমে পঙ্গপাল ব্যতীত অন্য জীব এ পৃথিবীতে থাকিত না। অবশেষে অল্পদিন পরে আহারাভাবে পঙ্গপালও মরিয়া যাইত। পঙ্গপাল ত দূরের কথা, আমাদের ঘরে যে মাছি উড়িয়া বেড়ায়, তাহার বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ। এক বৎসরে একটী মাছি ২,৫০,০০,০০০ দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। যদি সমুদয় গুলি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে পাঁচ বৎসরে ৩২,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০, মাছি উৎপন্ন হয়। কিন্তু এক লক্ষ ডিম্বের মধ্যে একটীও মাছি হয় কিনা সন্দেহ। তবুও পশ্চিমাঞ্চলে যাহা হয়, তাহাতেই ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতে হয়।

* শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় এফ, এল, এস লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

এই গেল কীট পতঙ্গের কথা। মৎস্যদিগেরও ডিম্ব এইরূপ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। সাগরসঙ্গমের নিকট যে সমুদয় ভেটকি মাছ জন্মে, তিন বৎসরে তাহারা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই সময় এক একটীর উদরে প্রায় এক কোটি ডিম্ব হয়। সমুদয় ডিম্ব হইতে যদি মৎস্য হয়, তাহা হইলে একটী মাছ হইতে ৪,০০,০০,০০,০০,০০,০০০০ সন্তান উৎপন্ন হয়। ফল কথা এই এক মৎস্য দ্বারা তাহা হইলে সমুদ্র বুজিয়া যায়। সমুদ্র পথে তাহা হইলে আর জাহাজ গতায়াত করিতে পারে না। জাহাজের অবস্থা তাহা হইলে এইরূপ হয়।

অনেকে বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, আষাঢ় মাসে ঘোলা জল হইলে কলি-কাতার নিকট গঙ্গা কিরূপ শিশু কাঁকড়ায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এক গণ্ডুষ জল হাতে তুলিলে, তাহার সহিত শত শত ছোট ছোট কাঁকড়া উঠিয়া পড়ে। এই সমুদয় কাঁকড়া যদি বড় হইত, তাহা হইলে কি হইত সে কথা আর বলিবার আবশ্যক নাই।

গল্প কথা বটে, কিন্তু কথাটা এইরূপ যে, একবার এক বৃদ্ধা কাঁকড়ানী অয়েষ্টার (Oyster) নামক এক প্রকার ঝিনুকীর সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়াছিল। অয়েষ্টার ঝিনুক অনেক জাতীয় আছে। বঙ্গোপসাগরে যে জাতি আছে, তাহাকে চোঙ্গড়া বলে। তাহার খোলা হইতে লোক চূণ প্রস্তুত করে। মান্দ্রাজ ও সিংহল দ্বীপে যাহা হয়, তাহাতে মুক্তা জন্মে। পৃথিবীর দক্ষিণ দ্বীপ সমূহে যাহা হয়, তাহার খোলা হইতে লোক শুভ্রবর্ণের উজ্জ্বল বোতাম প্রস্তুত করে। বিলাতে এক ছোট জাতীয় অয়েষ্টার হয়, তাহার শাঁস বাহির করিয়া তাহাতে একটু সিরকা, লবণ ও মরিচ-চূর্ণ দিয়া কাঁচা টপটপ গিলিয়া লোকে পরম তৃপ্তি লাভ করে। বিলাতের নিকট সমুদ্রগর্ভে কাঁকড়ানী এইরূপ এক অয়েষ্টার ঝিনুকীর সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়াছিল। একথা সেকথার পর কাঁকড়ানী ঝিনুকীকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। তাহাতে রাগে গর্ গর্ করিয়া ঝিনুকী উত্তর করিল—

"Friends !" shricked the oyster starting up.
"There is not in all the sea
A fish that swims, or sinks,
or crawls, that is a friend to me.
Fish never spared a child of mine ;
I know of only five
Who grew to adult oysterhood—
and men ate those alive.
Give us ten years of fishless peace,
secure from all our foes,
And what do you think would happen then ?"

The crab said, "Goodness knows
In ten years time, if all grew up,
I find that there would be,
Oysters enough to fill the earth, the rivers, lakes and sea.
The shells would lie from Pole to Pole a depth of fathoms three."

চীৎকারস্বরে ঝিনুকী বলিল,—"বন্ধু! এই সমুদ্রে যত মাছ সন্তরণ করিয়া বেড়ায় অথবা জলে মগ্ন হইয়া থাকে, অথবা ভূমিতে বুকে হাঁটিয়া যায়, তাহাদের একজনও আমার বন্ধু নহে। মৎস্য সকল আমার সমুদয় সন্তানকে ভক্ষণ করিয়াছে। কেবল পাঁচটী সন্তান তাহাদের মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। সে পাঁচটী সন্তান বড় হইয়াছিল, কিন্তু মানুষে তাহাদিগকে জীয়ন্ত ভক্ষণ করিয়াছে। মৎস্যদিগের উপদ্রব হইতে নিরাপদ হইয়া কেবল যদি দশ বৎসর আমি শান্তি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে কি হয়, তা জান?" কাঁকড়ানী বলিল,—"ভগবান জানেন!" ঝিনুকী বলিল,—"রও, আমি হিসাব করিয়া বলিতেছি," তাহার পর সে শ্লেট পেন্সিল লইয়া, পেন্সিলের আগাটী মুখে রাখিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া শ্লেটের উপর অনেক অঙ্কপাত করিয়া বলিল,—"যদি দশ বৎসর পর্য্যন্ত আমার সন্তানগণ নিরুপদ্রবে কালযাপন করিতে পারে, তাহা হইলে আমার বংশ এত হইবে যে, সমুদয় পৃথিবীর নদী, হ্রদ ও সমুদ্র পূর্ণ হইয়া যাইবে, আর উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত আমার বংশোদ্ভব ঝিনুকদিগের খোলা বার হাত উচ্চ স্তূপাকার হইয়া থাকিবে।"

কুম্ভীরগণ অধিক ডিম্ব প্রসব করে না। তথাপি কেবল মাত্র একটী কুম্ভীরের বংশ যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর কলিকাতার নিকট গঙ্গা এই ভয়ানক জীবে পূর্ণ হইয়া যায়।

পক্ষীদিগের অধিক শাবক হয় না, তথাপি এক জোড়া পক্ষীর পুত্র পৌত্র প্রভৃতি যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে পনর বৎসরের ভিতর তাহাদের সংখ্যা ২০০,০০,০০,০০ দুই শত কোটি হয়। এক একটী হস্তিনীর সমস্ত জীবনে যদি কেবল-মাত্র ছয়টী সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পাঁচশত বৎসরে তাহার বংশে দেড়কোটি হস্তী জন্মগ্রহণ করে। যদি প্রচুর পরিমাণে খাদ্য থাকে আর যদি মহামারী উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে পাঁচশত বৎসরে মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ হয় এবং কয়েক সহস্র বৎসর পরে এ পৃথিবীতে এত মানুষ হয় যে, দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। এতক্ষণ কেবল আমি এক একটী জীবের কথা বলিতেছিলাম, কিন্তু এক সঙ্গে যদি সমুদয় জীবের সন্তান বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের এই পৃথিবীটি উদ্ভিদাণু, জীবাণু, পশুপক্ষী পতঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা এরূপ ঘনভাবে পূর্ণ হইয়া যায় যে, কাহারও দাঁড়াইবার বা নিশ্বাস ফেলিবার উপায় থাকে না, সকলেই তাহা

হইলে নিমিষের মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, জীবিত জীবের জনতায় পৃথিবী শ্মশানভূমি হইয়া যায়। এক জীব অন্য জীবের আহার, তাই রক্ষা। আবার জীব সকল ভক্ষকের মুখ হইতে আপন আপন প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত কতই না কৌশল অবলম্বন করে।

পক্ষীর মুখ হইতে আপনার প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত কীট বৃক্ষপত্রের আকার ধারণ করে। কিন্তু সে নিজে সজীব বৃক্ষপত্র ভক্ষণ করে; পত্রের ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া নির্ভয়ে পাতা খাইতে পারিবে, সেই জন্য কীট এইরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে।

পূর্ব্বে এরণ্ডরামের কথা হইয়াছিল। এরণ্ডরামের মাতা দুইশত ডিম্ব প্রসব করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একশত পুরুষ ও একশত স্ত্রী। দ্বিতীয় পুরুষে সেই একশত স্ত্রী এক এক জন ২০০ করিয়া ডিম্ব উৎপাদন করিল। তাহার অর্দ্ধেক পুরুষ ও অর্দ্ধেক স্ত্রী অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ ১০,০০০ স্ত্রী এড়ি পোকা হইল। তৃতীয় পুরুষে দশ লক্ষ স্ত্রী হইল। আসামে যত্ন করিলে বৎসরে আট পুরুষ পর্য্যন্ত এড়ি পোকা উৎপাদিত করিতে পারা যায়। যদি সমুদয় ডিম্ব হইতে কীট হয়, আর সমুদয় কীট যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে এই আট পুরুষে ২০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ পোকার উৎপত্তি হয়। কেবল দুইটি কীট হইতে এত কীট জন্মে। সহস্র সহস্র কীট হইতে কত কীট হয়, সে হিসাবে আর প্রয়োজন নাই। ইতি

বাগানের মাসিক কার্য্য।

মাঘ মাস।

সব্জীক্ষেত্র।—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া, সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভূয়ে শসা, করলা, তরমুজ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোবর, ছাই ও মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে, কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহত ভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটিগুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সারমাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র।—সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে, তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া, তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পূরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্না হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান।—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সমস্ত ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিতেছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম্ বাধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যূথিকা ইত্যাদির ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্কস্, ফ্লাক্স, ডেজি, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সব্জী বথা—গাজর, সালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুগাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিয়া জলদি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

REGISTERED No. C 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

মাঘ, ১৩১৮ ।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

দ্বাদশ খণ্ড,—১০ম সংখ্যা।

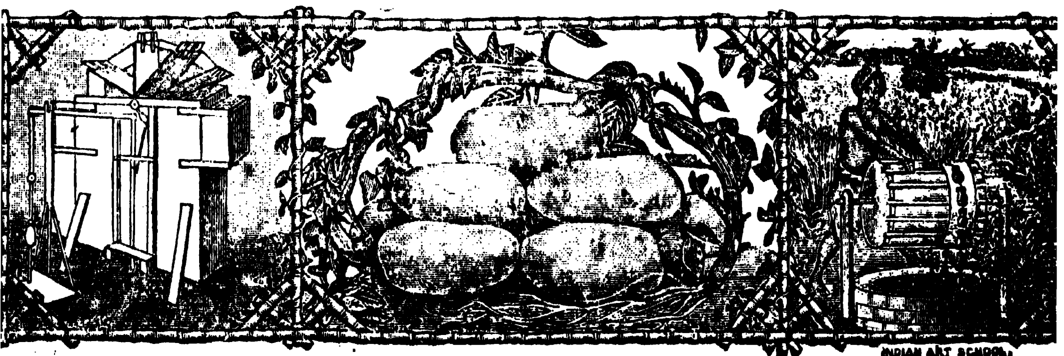
সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস।

মাঘ, ১৩১৮।



কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচীপত্র।

মাঘ, ১৩১৮ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL.

Devoted to Gardening and Agriculture. Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulation. It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3-8. 1 Column Rs. 2.
½ Column Rs 1-8

MANAGER—"KRISHAK,"
162, Bowbazar Street, Calcutta.



কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ খণ্ড। | মাঘ, ১৩১৮ সাল। | ১০ম সংখ্যা।

সব্জী চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আলুর ফলন, আলু সংরক্ষণ ও চাষে লাভ

আলুর ফলন—বর্দ্ধমানক্ষেতে নৈনিতাল একর প্রতি ২২০ মণ, পাটনায় ২০০ মণ ফলিয়াছে, কিন্তু মান্দ্রাজী একর প্রতি ১২০ মণের অধিক হয় নাই। ডুমরাঁও ক্ষেতে পাটনার ফলন অধিক হইয়াছিল, তাহার নিম্নে নৈনিতাল। ২৪ পরগণায় ও হুগলীতে পাটনার ফলনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। এখানে চাষীরা প্রতি একরে পাটনা আলু ২৫০ মণ বা নৈনিতাল ১৮০ মণ ফলাইতে পারে। দার্জ্জিলিঙ আলু ফলনে প্রায় পাটনার সমান।

আলু চাষের সঙ্কেত—(১) জমিতে গোময় সার ১৫০ মণ হিসাবে দেওয়া থাকিলে আলু বসাইবার সময় যত আলু তত খৈলের সার আবশ্যক। (২) সেচের জলের অভাব হইলে আলুর চাষ ভাল হইবে না। (৩) আলুর মাটি হাল্কা, ফাঁপা ও ঢিল শূন্য না হইলে আলু অধিক ফলিবে না। (৪) আলুতে রেড়ীর খৈল সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সার।

আলু চাষে স্থান পরিবর্ত্তন—সমতল দেশের আলু, পাহাড়ে এবং পাহাড়ের আলু নিম্ন দেশে কিম্বা অন্য পাহাড়ে পাল্টা পাল্টি চাষ করিলে আলুর ফসলের উন্নতি হয়। স্থানীয় বীজ-আলু লইয়া বারবার চাষ করিলে আলু ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যায়। নিম্নবঙ্গে যে আলু জন্মে, তাহা হইতে বীজ রক্ষার আদৌ সুবিধা হয় না, এই কারণে নিম্ন বাঙলার চাষীগণকে প্রতি বৎসর পাটনা, নৈনিতাল (হালদেওয়ানী) ও দার্জ্জিলিঙ হইতে আলু আমদানী করিতে হয়।

আলু সংরক্ষণ—চাষের জন্যই হউক বা বীজের জন্য হউক আলু সমস্ত বৎসর ঠিক থাকে না, পচিয়া অনেক বাদ যায়। নৈনিতাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পচে। দার্জ্জিলিঙ ও পাটনা অপেক্ষাকৃত পচিয়া কম নষ্ট হয়।

বিলাত হইতে চাষের জন্য নূতন ধরণের আলু আসিতেছে এবং সঙ্গে আলুর নানা রোগও এদেশে আমদানী হইতেছে,—

আলুতে পোকা লাগিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। পাটনা অঞ্চলে পোকাতে আলুর বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। বেগুন গাছের পোকা কখন কখন আলুর পাতা খায়। একপ্রকার সবুজ রঙের পোকা গাছের রস চুষিয়া খায়। ইহাদিগকে ধরিয়া মারা ছাড়া অন্য উপায়ে নষ্ট করা কঠিন। ঘরে আলু রাখিলে তাহার ভিতর সুতলী পোকা ঢুকিয়া নষ্ট করে। ঠাণ্ডা জায়গায় বালি ঢাকা দিয়া আলু রাখিলে আলুতে পোকা লাগিতে পায় না এবং পচে কম। তিন ভাগ জলে এক ভাগ ক্রুড অয়েল (ক্রুড কেরোসিন তৈল) গুলিয়া ঐ জলে আলু ধুইয়া শুকাইয়া বালির ভিতর আলু রাখিলে ভাল থাকে। চূণের জলে বা তুঁতের জলে ধুইয়া রাখিলেও আলুতে পোকা লাগে না। আলু শুকাইয়া রাখিতে হয়, ভিজা আলু রাখিলে বেশী পচে। কিন্তু আলু রৌদ্রে শুকান উচিত নহে।

বোর্দোঁ মিশ্রণের পিচকারী দিলে আলুক্ষেতে পোকার উপদ্রব হয় না বা পোকা লাগিলে তাহা নিবারিত হইতে পারে। আলু ক্ষেতে ছাতরা রোগ দেখা দিলে বোর্দোঁ মিশ্রণের পিচকারী দিলে উপকার দর্শিতে পারে। আলুগুলি তুঁতের জলে ধুইয়া ক্ষেতে বসাইলে ছত্রক রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এক ক্ষেতের রোগ আর এক ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়িতে অধিকক্ষণ লাগে না, এমন অবস্থায় বোর্দোঁ মিশ্রণের পিচকারী একমাত্র প্রতিকারের উপায়। পোকা সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা "ফসলের পোকা"য় জানিতে পারা যায়।

আলু চাষে খরচ—

লাঙ্গল দেওয়া ৮ বার, মই দেওয়া ৪ বার … …	৮৲
জল সেচন ৪ বার … … …	৪৲
জল সেচনের পর কোপান ও মাটি দেওয়া ৪ বার …	৪৲
নিড়ান আবশ্যক হইলে ১ বার … … …	১৲
বীজ আলুর দাম ২ মণ কিম্বা ২॥০ মণ … …	১৫৲
আলু বসাইবার খরচ … … …	২৲
বীজ আলু তুঁতের জলে ধুইবার খরচ … …	২৲
আলু তুলিয়া গুদামজাত করিবার খরচ … …	৪৲
সারের খরচ … … … …	২৬৲
জমির খাজনা … … … …	৪৲
	৭০৲

বিঘা প্রতি ৬০ মণ আলু জন্মিলে তাহার মূল্য ১২০৲ টাকার কম হইবে না। ইহাতে বিঘায় ৫০৲ টাকা লাভ হয় কিন্তু আলু চাষে বিঘায় ৮০৲ কিম্বা ১০০৲ লাভ হওয়া অসম্ভব নহে।

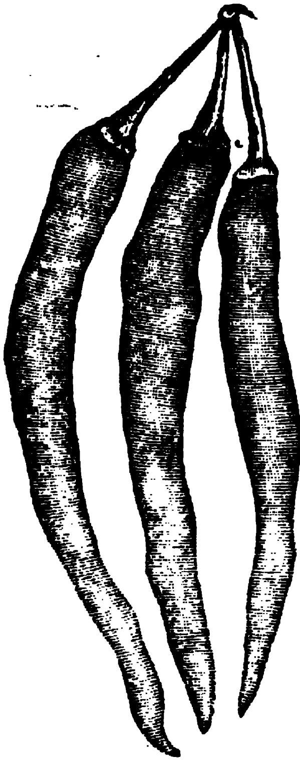
আলু যত জলদি ফলাইতে পারা যায় ততই বাজারে অধিক দরে আলু বিক্রয় হয়। হিমালয় কিম্বা শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে তুষার পতন হইতে আলুর ক্ষেত রক্ষা করিতে পারিলে যে কোন জাতীয় আলু খুব জলদি ফলাইতে পারা যায়, এমন কি খুব বর্ষা কিম্বা তুষার পাতের সময় ব্যতীত সব সময়েই পাহাড় হইতে নূতন আলুর আমদানী হইতে দেখা যায়। সমতল প্রদেশে বর্দ্ধমান ও হুগলীতে উৎপন্ন পাটনা আলুর আমদানী কলিকাতার বাজারে সর্ব্বাগ্রে হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য সহর বাজারে নূতন লাল গোল আলুরই প্রথম আমদানী হয়। তার পর নৈনিতাল জাতীয় আলুর আমদানী হয়। আলু বাজারে উঠিলেই দুই আনা, দশ পয়সা সের দরে বিক্রয় হয়। কখন কখন চারি আনা সেরও দর উঠে। এই দর কিন্তু অধিক দিন থাকে না কিম্বা ইহাতে যে লাভ হয় তাহার যৎকিঞ্চিৎমাত্র চাষীর ঘরে যায়, কারণ চাষী আলু ধরিয়া রাখিতে পারে না, টাকার দরকারে খরিদ্দার জুটিলেই বেচিয়া ফেলে। মাঝখান হইতে ব্যবসায়ী মধ্যব্যক্তি অধিকমাত্রায় দিন কতক লাভ করিয়া লয়। মহাজনগণের যেমন লাভের আশা আছে তেমনই আবার লোকসানের আশঙ্কা খুব অধিক। যদি শুকনা সারা আলু না হয় তবে আলু পচিয়া অনেক নষ্ট হয় কিম্বা যদি দৈবাৎ পোকা লাগে তবে গুদামের সমস্ত আলু অতি অল্প সময়ে দাগী হইয়া নষ্ট হয় এবং লাভ করা দূরে থাকুক খরিদ দর অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে তাহা বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। এই জন্যই আলুর সংরক্ষণ করিতে শিখাই আলু ব্যবসায়ের একমাত্র গতি।

এদেশে সাধারণতঃ দেশী কোদাল দ্বারা আলু তোলা হইয়া থাকে। দেশী কোদাল ব্যবহার না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বিলাতী হণ্টার-হো নামীয় কোদাল ব্যবহার করিলে কম খরচে এবং সহজে আলু উত্তোলন কার্য্য সমাধা হইতে পারে। আবাদ বিস্তৃত হইলে হণ্টার-হো ব্যবহার ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ছোট খাট ক্ষেতে দেশী কোদালই ভাল, কারণ হণ্টার-হোতে অপেক্ষাকৃত অধিক আলু কাটিয়া যায়। বিলাতে আলু তোলার একপ্রকার যন্ত্র আছে। ইহা এক প্রকার লাঙ্গল বিশেষ, ইহাদ্বারা কার্য্য খুব ভালই হয়। ক্ষেত হইতে আলু এককালে সমুদয় তুলিয়া না লইয়া, দুইবার আলু তুলিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ব্যবসায়ের কিছু সুবিধা হইতে পারে। সচরাচর আলু গাছের পাতা পাকিতে আরম্ভ করিলে আলু উঠান হয়, তাহার পর আর ক্ষেতে আলু রাখা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু ইতি পূর্ব্বে গাছের তেজ থাকিতে থাকিতে প্রত্যেক আলু গাছের গোড়া হইতে খাইবার উপযুক্ত কতকগুলি আলু উঠাইয়া লইলে চাষীর বেশ দুপয়সা লাভ হইতে পারে। এ কার্য্য খুব সাবধানে সম্পাদন করিতে হইবে, অধিক শিকড় কাটিয়া গেলে গাছ খারাপ হইবে। এইপ্রকারে আলু তোলার পর গাছের গোড়ায় একবার সার দিয়া মাটি ঢাকিয়া দিবার পর জল সেচন করিতে হয়। বসাইবার সময় হইতে তিন মাসে আলু ফসল তৈয়ারি হয়। এই তিন মাসের মধ্যে বাজারে যখন আলুর আমদানী কম তখন একবার আলু তুলিতে পারিলে আলু চাষে অধিক লাভ হওয়া সম্ভব।

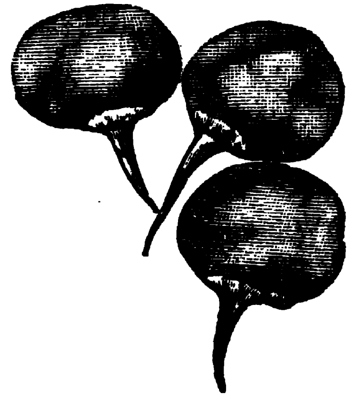
লঙ্কা

বেগুনের ন্যায় লঙ্কাও সোলেনেসী সব্জীর অন্তর্গত। ইহাকে ইংরাজিতে চিলি (Chillies) বা রেড পিপার (Red pepper) বলে। বাঙলা ভাষায় ইহার অপর নাম মরিচ এবং গোল মরিচের সহিত পৃথক করিবার জন্য লাল মরিচ বলা হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ মাত্রেই লঙ্কার চাষ হয়।

অনেক প্রকারের লঙ্কা আছে। দেশী লঙ্কা, সাধারণতঃ যাহার চাষ বঙ্গদেশে হইয়া থাকে তাহার রঙ পাকিলে হল্‌দে বা লাল হয়, আকারে চারি কিম্বা পাঁচ ইঞ্চ লম্বা হয়। এই গুলি অধিক মোটা হয় না। আর একপ্রকার লঙ্কা দুই তিন ইঞ্চ মাত্র লম্বা ও অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। ইহাদের ঝাল খুব অধিক। পূর্ব্ববঙ্গে বাখরগঞ্জ জেলায় খুব লঙ্কার চাষ আছে; তথায় লম্বা সরু লঙ্কার চাষই অধিক। ঐ সকল লঙ্কায় তাদৃশ ঝাল নাই। অধুনা বিলাতী অনেক প্রকারের লঙ্কা এদেশে আসিয়াছে। টমাটো আকৃতি এক প্রকার বেঁটে গোল লঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিলাতী। ইহা ছাড়া বিলাতী কুল লঙ্কা দেখিতে খুব সুন্দর। বিলাতী সুইট স্পানিশ নামক এক প্রকার লঙ্কার আমদানী হইয়াছে, তাহাতে ঝাল আদৌ নাই, অথচ লঙ্কার স্বাদ গন্ধ আছে এবং খাইতে সুস্বাদু। ঝালবিহীন দেশী লঙ্কাও আছে। ঝাল হীন লঙ্কা পাখীদের খাওয়ান হয়। লঙ্কা খাইলে পাখীদের গায়ের পোকা নষ্ট হয় এবং লোকে বলে তাহাদের পাখার রঙ উজ্জ্বল হয়। বাঙলা দেশে একপ্রকার লঙ্কা হয়, তাহার উর্দ্ধদিকে মুখ হয়। এক ইঞ্চ বড় বেশী দেড় ইঞ্চ মাত্র বড়, ঝাল খুব, বার মাস ফলে, নাম—সূর্য্যমণী। আর একপ্রকার লঙ্কারও উর্দ্ধদিকে মুখ হয়, তাহাকে ধানী লঙ্কা বলে। ইহার ঝাল খুব বেশী, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিলেও



দেশী লঙ্কা



বিলাতী কুল লঙ্কা



লঙ্কা—টমাটো আকৃতি

অত্যুক্তি হয় না। ইহাও বার মাস ফলে। ধানের মত আকার বলিয়া নাম ধানী হইয়াছে। লঙ্কা, জল সেচনের সুবিধা থাকিলে বারমাস ফলান যায়, কিন্তু তাহা না থাকিলে,

লঙ্কা চাষের সময়—জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাস। এই সময় বীজ বপন করিতে হয়। বেগুনের ন্যায় হাপরে বীজ ফেলিয়া চারা বাহির করিয়া লইতে হয়। চারা তৈয়ারি করিবার সময় ছায়া করিয়া দেওয়া বা অন্য পাইট ঠিক বেগুনেরই মত। ক্ষেতে চারা বসাইবার সময়, শ্রাবণ কিম্বা ভাদ্র।

চাষ—চারাগুলি ৫ কিম্বা ৬ ইঞ্চ বড় হইলে উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। ক্ষেতে চারা ২৪" × ১৮" ব্যবধানে বসাইতে হইবে। বেগুনের মত গোড়ায় ভাঁটি টানিয়া দিতে হইবে। ক্ষেতে জল বসিতে না পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। লঙ্কার চাষের জন্য বেলে দোয়াঁস মাটিই ভাল। চর জমিতে খুব লঙ্কা ফলে। আবশ্যক হইলে ক্ষেতে চারাগুলি ধরিয়া বসিবার পর বিঘা প্রতি ১/ কিম্বা ২/ মণ খৈল সার দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। লঙ্কাক্ষেতটি নিড়াইয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়। বেশ সুশৃঙ্খলায় চাষ হইলে প্রতি বিঘায় ৫/ মণ লঙ্কা ফলিয়া থাকে। খুব কম হইলেও বিঘাপ্রতি প্রায় ২/ মণের কম ফলন প্রায়ই হয় না।

পৌষ মাঘ মাসে লঙ্কা পাকিতে আরম্ভ হয়। লঙ্কা পাক ধরিতে আরম্ভ হইলে ১৫ দিন অন্তর ক্ষেত হইতে লঙ্কা তুলিতে হয়। এককালে সব লঙ্কা উঠান ভাল নহে। পৌষ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘের শেষ পর্য্যন্ত লঙ্কা তোলা শেষ হয়। কাঁচা লঙ্কা বাজারে বিক্রয় হয় কিন্তু তাহা অতি সামান্য। বেশীর ভাগ শুকাইয়া বিকায় ও দুর দেশে চালান যায়। যাঁহাদের ব্যবসায়ের জন্য চাষ করা উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে অধিক পরিমাণ জমি লইয়া চাষ করিতে হয়। বাগানে অন্য সব্জীর সহিত দেশী বিলাতী নানা রকম লঙ্কার চাষ করিলে, কাঁচা বেচিয়া ফেলাই সুবিধা। নানা রঙের লঙ্কাগুলি ফলিলে বাগানের বড় শোভা হয়।

লঙ্কা চাষে খরচ—

ক্ষেতে লাঙ্গল মৈ দেওয়া ও হাপরে চারা তৈয়ারি করার খরচ ...	৩৲
ক্ষেতে চারা রোপণ	১৲
ভাঁটি টানিয়া দেওয়া	২৲
নিড়ান ও জল সেচন	৩৲
সেচনের পর কোপান	১।০
লঙ্কা তোলা ও শুকান	১॥০
জমির খাজনা	৩৲
	১৪৸০

বীজের পরিমাণ—এক বিঘা জমি চাষ করিতে এক আউন্সের অধিক বীজের আবশ্যক হয় না। এক বিঘাতে কম বেশী হাজারের উপর চারা বসিতে পারে।

টেঁপারি (CAPE GOOSEBERRY)

ইহাও একপ্রকার বেগুন বা লঙ্কা জাতীয় উদ্ভিদ। সেই জন্য এই স্থলে ইহার বিষয়ও বলা হইল। গাছ, পাতা ও ফলে টমাটো বা বিলাতি বেগুনের সহিত ইহার বিশেষ কোন তফাৎ দেখা যায় না। ইহাও জাতিতে সোলেনেসী।

টেঁপারির চাষ সর্ব্ববিধ প্রকারে বেগুনেরই মত। বেগুনের মত চারা তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। বৎসরে দুই বার এমন কি বারমাস বেগুন ফলান যায় টেঁপারি কিন্তু বৎসরে একবার মাত্র হয়। বৈশাখে বীজ বপন করিতে হয়, জ্যৈষ্ঠে ক্ষেতে চারা রোপণ করিতে হয়, শ্রাবণ, ভাদ্রে ফল পাকে, পৌষ, মাঘ মাস পর্য্যন্ত ক্ষেতে ফল থাকে। আষাঢ় শ্রাবণে নাবী করিয়া চারা বসাইলে শীতের শেষ পর্য্যন্ত ফল থাকে। গাছগুলি খুব ঝাড়াল হয়। ডাল পালাগুলি যেন কতকটা লতানে ধরণের। এই রকম লতানে টমাটো গাছ আছে। সেগুলি পাশে পাশে মাচা বাঁধিয়া দিলে গাছ অনেক দিন বেশ তেজস্কর থাকে এবং অনেক ফল দেয়। টেঁপারি গাছের এইরূপ চাষ করিলেও হয়তঃ বেশী ফল পাওয়া যায়।

মাটি ও চাষ—দোয়াঁস মাটিতেই টেঁপারির চাষ ভাল হয়। ছাই মিশ্রিত গোবর সার ব্যবহার করা উচিত অথবা আবশ্যক হইলে বেগুনের মত খৈল সার দেওয়া যাইতে পারে। বেগুনের মত চারার গোড়ায় দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়, বেগুনের মত জল নিকাশের জন্য নালা কাটিয়া দিতে হয়। বেগুন অপেক্ষা টেঁপারির ক্ষেতে অধিক জল সেচনের আবশ্যকতা দেখা যায়। চারা ৪ ফি × ২ ফি ব্যবধানে বসাইতে হইবে। বীজ তলায় চারাগুলি ৮ ইঞ্চ বড় হইলে তবে ক্ষেতে রোপণ করার উপযুক্ত হয়।

টেঁপারির ফলগুলি ছোট, খাইতে অম্ল মধুর। ইহাতে সুন্দর চাটনি তৈয়ারি হয়। ছোট ছোট ছেলেদের ইহা বড় প্রিয়। ইহার গন্ধ অতি মনোহর। ইউরোপীয়গণ

ইহা আদরের সহিত খাইয়া থাকে। সারা বৎসর খাইবার জন্য ইহা সিরকায় ভিজাইয়া রাখা হয়। এদেশে টেঁপারির অম্ল রাঁধিয়া প্রায় সকলেই খাইয়া থাকে।

বীজের পরিমাণ—দুই তোলা বীজে এক বিঘা জমির চাষ হয়।

তামাক (TOBACCO)

সোলেনেসী জাতীয় যে সকল উদ্ভিদ বাগানে স্থান পাইয়াছে তামাকও তাহার মধ্যে একটি। তামাক যদিও আহারীয় সব্জী নহে, তথাপি উদ্যানজাত ফসলের মধ্যে ইহার উল্লেখ এক হিসাবে বিশেষ প্রয়োজন, কারণ তামাকের ব্যবহার নিয়তই খুব বাড়িতেছে। অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে তামাক, ছিলামে সাজিয়া ধুমপানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম তাম্রকূট। মুসলমান অধিকারে বাদসাহী আমলে এই প্রকারে ধুমপানের বহু প্রচলন হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেও এদেশে তামাক হইতে নস্য প্রস্তুত হইয়া ব্যবহার হইতে দেখা যায়। ইহার ইংরাজী নাম টোবাকো (Tobacco)। বিদেশীয় অধিকারের সময় হইতে তামাকের আরও নানারূপ ব্যবহার হইতেছে। এক্ষণে চুরুট, সিগারেটের বহু ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পানের সহিত ব্যবহারের জন্য জরদা, সুরতী প্রভৃতি তামাক হইতে প্রস্তুত হয়। কুলী মজুরগণের মধ্যে তামাকে চূণ মিশাইয়া খৈনি বা সুখা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র সকলেই তামাক কোন না কোন আকারে ব্যবহার করিয়া থাকে। তামাকের এত ভুরি ব্যবহার বলিয়া তামাক সব্জী না হইলেও উদ্যানজাত ফসলের সঙ্গে ইহার কিছু আলোচনা যুক্তি যুক্ত বলিয়া মনে হয়।

তামাকের জন্য মাটি—খুব হাল্কা ভাবে দোয়াঁস মাটির আবশ্যক। জলবসা জমি আদৌ চলিবে না, সেইজন্য বাগানের উচু জমি ইহার চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত নহে। তবে তামাকের বিস্তৃত চাষ করিতে হইলে তাহাকে সব্জী বাগানের এক কোণে জায়গা দিলে চলিবে না—বিস্তৃত নদীর চরে বা সুপ্রশস্ত বেলে দোয়াঁস মৃত্তিকাযুক্ত ক্ষেতে চাষ করিতে হয়। সখ মিটাইবার জন্য এবং সামান্য ব্যবহারের জন্য বাগানে নস্য বা চুরুট কিম্বা সিগারেটের উপযুক্ত তামাক চাষ চলিতে পারে কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য বিস্তৃত চাষের আবশ্যক।

ভারতবর্ষের বহুতর স্থানে এক্ষণে তামাক চাষ হইতেছে, বাঙলায় রঙ্গপুরের বিখ্যাত এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে, চুরুট প্রস্তুতোপযোগী তামাক উৎপন্ন হয়। বিহারেও মতিহারী তামাক উৎকৃষ্ট।

বীজ বপনের সময়—বাঙলা দেশে বর্ষার শেষে ভাদ্র মাসে তামাকের বীজ বপন করিতে হয়। কিন্তু বিহারে বা অন্যত্র যেখানে বর্ষা কম তথায় শ্রাবণ মাসেও বীজ বপন

করা চলে। বীজতলার মাটি খুব ধুলিবৎ গুঁড়া করিতে হয় এবং তাহাতে গোবর ও ছাই মিশ্রিত সার দিয়া তদুপরি বীজ বুনিতে হইবে। এক একর বা তিন বিঘা জমিতে তামাক চাষের জন্য এক আউন্স বা আড়াই তোলা বীজের আবশ্যক। হাপরে ঘন চারা বাহির হইলে কতকগুলি চারা তুলিয়া পাতলা করিয়া দিতে হয়।

চারাগুলি বীজ তলায় তিন চারি ইঞ্চ বড় হইলে ক্ষেতে নাড়িয়া বসাইবার উপযুক্ত হয়। তামাকের পক্ষে পটাস সার বিশেষ আবশ্যক, সেই জন্য ছাই ও তাহার সহিত গোবর মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। খুব হাল্কা মাটি না হইলে তামাক ভাল জন্মায় না, সেইজন্য ক্ষেতটি খুব ভালরূপ চষিতে বা কোপাইতে হয় ও মৈ দিয়া মাটি খুব গুঁড়া করার প্রয়োজন। আশ্বিন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকের শেষ পর্য্যন্ত চারা রোপণ করা চলিয়া থাকে। বড় জাতীয় তামাক ৩ ফি এবং ছোট জাতীয় তামাক ২ ফিট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। আবশ্যক মত ১০ কিম্বা ১৫ দিন অন্তর জল সেচন করা কর্ত্তব্য। গাছে ফুলের কুঁড়ি আসিলেই তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হয় ও নিচের পাকা পাতা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক গাছে অবস্থা বুঝিয়া ৮ হইতে ১০ টির অধিক পাতা রাখা উচিত নহে। তামাকের পাতাগুলি পাকিয়া অল্প অল্প হলদে হইয়া আসিলেই তামাক গাছ কাটিয়া লইতে হইবে। সকাল বেলা তামাক আহারণের বেশ ভাল সময়। গাছের পাতা হইতে রাত্রের শিশির শুকাইয়া আসিলেই আহরণ কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়।

তামাক পাতা শোধন—তামাক পাতা শুকাইবার গুণে ভালমন্দ হয়। তামাক পাতা ডাঁটা সমেত ঘরের মধ্যে দড়ি খাটাইয়া ঝুলাইয়া অল্পে অল্পে শুষ্ক করিতে হয়। এইরূপে শুকাইতে প্রায় দুই মাস সময় লাগিয়া থাকে। ঘরের হাওয়া সমশীতল থাকা উচিত, এই কারণে গরম হাওয়া বহিলে জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। গরমের সময় মাঝে মাঝে ঘরের মেঙেতে জল ছিটাইয়া দিলে ঘর আবশ্যক মত ঠাণ্ডা থাকে। পাতাগুলি আবশ্যকমত শুষ্ক হইলে পাড়িয়া, ডাঁটা হইতে ভাঙ্গিয়া ভাল, মন্দ, মাঝারি পাতার এক একটি ছোট ছোট বাণ্ডিল করিতে হয়। এই বাণ্ডিলগুলির উপর সপ বা মাদুর চাপা দিয়া তামাক পাতাগুলি ঘামাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু অতিরিক্ত গরমে তামাক পাতা পচিতে পারে এবং তাহা হইলে পাতায় কাল দাপ হইবে এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদন খারাপ হইবে। এই কারণে উপরের পাতা নীচে এবং নীচের পাতা উপরে রাখিয়া মধ্যে মধ্যে হাওয়া খাওয়াইয়া লইবার আবশ্যক হয়। এইরূপে প্রস্তুত তামাক পাতা হইতে চুরুট, নস্য, সুরতী এমন কি ধুমপানের পক্ষে সুন্দর তামাক তৈয়ারী হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে অধুনা চুরুটের জন্য কনেকটিকট্, কিউবা, সুমাত্রা, হাভানা তামাকের, সিগারেটের জন্য ষ্টারলিঙ, ভার্জিনিয়া প্রভৃতি তামাকের চাষ হইতেছে।

স্বভাবানুযায়ী অবস্থায় উদ্ভিদের শ্রীবৃদ্ধি

গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেত্রের উদ্যান তত্ত্বাবধারক

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত

ভিন্ন ভিন্ন মাটিতে ও রকম রকম জল হাওয়ায় নানা জাতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। বাঙলা দেশের তাতবাতে পাট যেমন হয় এমন আর কোথাও হয় না। এমেরিকাতে পাট চাষের বহুতর চেষ্টা হইতেছে তথাপি ঠিক বাঙলার মত আর্দ্র অথচ গরম আবহাওয়াটি মিলিতেছে না বলিয়া তথায় পাট চাষের উন্নতি হইতেছে না। আর্য্যাবর্ত্তে, দক্ষিণভারতে, সিংহলে ও কোন কোন ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আম জন্মায়। কিন্তু লোণা মাটি কিম্বা লোণা হাওয়ায় আম ভাল হয় না। অথচ যদি রামায়ণের আখ্যায়িকায় বিশ্বাস করা যায় তবে বুঝিতে হইবে যে আমের উৎপত্তি সিংহলে। বোধ হয় সিংহলের সমুদ্র উপকূল হইতে দূরবর্ত্তী ভূমিভাগেই কেবল আম জন্মায়। নিম্ন বাঙলার জলো হাওয়ায়ও আম ভাল হয় না। উত্তর বঙ্গের কোন কোন স্থানে, মালদা, দারবঙ্গ, মজঃফরপুর, কাশী, অযোধ্যায় যেমন আম হয় এমন আর কোথাও হয় না। অত্যন্ত শীত প্রধান দেশে আম আদৌ হয় না।

কোন উদ্ভিদের আবাদ করিতে হইলে সেইজন্য সেই সেই উদ্ভিদের স্বভাব বেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়। স্বদেশের উদ্ভিদই হউক বা বিদেশ হইতে আনীত উদ্ভিদই হউক তাহার স্বভাবানুযায়ী উপাদানগুলি তাহার জন্য যোগাড় করিয়া দিতে হয়। মাটি, জল, হাওয়া, উত্তাপ সকলগুলিই স্বাভাবিক উপাদান; মানুষে কি প্রকারে তাহার যোগাড় করিবে এ কথা স্বতঃই মনে আসে। কিন্তু ইহা একেবারে অসম্ভব নহে—মানুষের চেষ্টায় অনেক সহায়তা হয়। লোকে শীত প্রধান দেশের ক্যামেলিয়া গাছ আনাইয়া বাঙলা দেশে কাচের ঘর করিয়া রাখে এবং ক্রমশঃ তাহাদিগকে এদেশের জল হাওয়ায় অভ্যস্ত করিয়া লয় এবং তাহাতে ফুল ফুটাইতে বা তাহাদিগকে বাহিরের হাওয়ায় বাহির করিতে সমর্থ হয়।

চন্দ্রমল্লিকার আদি স্থান এসিয়া ভূখণ্ডে, ভারতেও বোধ হয় বনে জঙ্গলে চন্দ্রমল্লিকা থাকিতে পারে। চীন ও জাপানীদের হাতে পড়িয়া চন্দ্রমল্লিকার রূপের সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। ইহার শীত ঋতুতে ফুল ফুটে, কিন্তু খুব শীতে ভাল হয় না একটু পাহাড়ি উচ্চ ভূমিতে জন্মায় ভাল। বাঙলার বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না। বাঙলার মালীরা ইহার ঠিক ধাত বুঝিতে পারিয়াছে। তাহারা

বর্ষার সময় চন্দ্রমল্লিকার তেউড় বা চারাগুলি টবে তুলিয়া রাখে, টবের মাটি আল্গা রাখে না, যাহাতে টবের জল সব সরিয়া যায় এবং তাহাতে জল না বসে তাহার ব্যবস্থা করে এবং টবগুলি উচ্চস্থানে কয়লার ঘেঁস ফেলিয়া তাহার উপর সাজাইয়া রাখে। বাগানের মাঝে মাঝে যেখানে চন্দ্রমল্লিকা শীতকালে বসাইবে তাহার বেড় বা কেয়ারি রচনা করিয়া তাহাতে গোবর সার ফেলিয়া রাখে, গোবর বর্ষায় পচিয়া ঠিক হইয়া রহিল। সময়ে চন্দ্রমল্লিকা বসাইলে ফুলে গাছ ভরিয়া যায়।

ধান—চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা বা পঞ্জাবের প্রধান খাদ্য এবং বহুকাল হইতে যেন ইহা এই সকল মহাদেশের নিজস্ব হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অধুনা উদ্যোগী এমেরিকাবাসীগণ ধানের স্বভাব অনুশীলন করিয়া নিজের দেশে ধান চাষ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং ধান চাষে বাঙলাকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। এমেরিকাবাসীগণ ধান চাষের জন্য নিচু জমির অপেক্ষা করেন না—সেচা জলে জল বাঁধিয়া উচ্চ জমিতেও তাঁহারা ধান চাষ করিতেছেন। অবশ্য ধান চাষের অনুরূপ যে সকল স্থানের আবহাওয়া সেই সকল স্থানেই নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে।

বাঙলার পল্লি সমুহের একটা সাধারণ দৃশ্য—বাঁশ বন। ইংলণ্ডের ওয়াইসলী বাগানে এবং অন্যান্য স্থানে নানা জাতীয় বাঁশের কেয়ারি রচিত হইয়াছে—বাঁশ মর্ষী হইতেছে না তাঁহাদিগকে তথায় জলের ধারে ধারে বাঁশ বসাইতে হইয়াছে এবং একটু অপেক্ষাকৃত গরম জায়গা বাছিয়া লইতে হইয়াছে।

বাউগণভিলা এক প্রকার লতা বিশেষ—ইহার বেশ লাল চারিটি পাপ্‌ড়ি যুক্ত ফুল হয়। রসা পার্ব্বতীয় ভূমিতেই ইহারা তেজ করে কিন্তু এই লতা নিম্ন ভূমিতে নামিয়া আসিয়া রসা জায়গায় তাতবাতে বেশ সুখে আছে বলিয়া বোধ হয় এবং এখানে ইহাদের ফুলের বাহার কম নহে।

আসামে পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশে নাগকেশর ফুলের বন আছে এবং মেদিনীপুর জেলায় কঙ্করময় ভূমিতে ইহার বৃদ্ধি দেখিলে আনন্দ হয়, কিন্তু বাঙলার নদী সৈকতে বা বাগ বাগিচায় ইহা আদৌ জন্মিতে চায় না। নাগকেশর গাছের জন্য যে ঠিক কি উপাদানগুলি চাই, তাহা আজিও জানা যায় নাই, তাই তাহাকে বাঙলার বাগানের ফটকের মধ্যে আটকান যাইতেছে না।

বিলাতী মরসুমী ফুলগুলি বিলাতে বৎসরের মধ্যে ৯ মাস কাল এগুলি, সেগুলি, ওগুলি ফুটিয়া শোভা বর্দ্ধন করে কিন্তু এখানে যতদিন শীত ততদিন, শীত ফুরাইলে তাহাদের মরসুম ফুরাইল।

কন্‌ভল্‌ভিউলস্‌ মেজর—ইহা আপোমিয়া অর্থাৎ ঢোল কলমী জাতীয় লতা বিশেষ। অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকায় সেপ্টেম্বর মাসে, কানাডা ও যুক্ত রাজ্যে মার্চ্চ, এপ্রিল কিম্বা মে মাসে, ইজিপ্ট ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলে জানুয়ারি হইতে মে পর্য্যন্ত, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে জুন হইতে আগষ্ট মাসে, ভারতের শীত প্রধান স্থানে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে মার্চ্চ কিম্বা এপ্রিলে ইহার বীজ বপন করা হয়।

ভারতে সরিষার চাষ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সরিষা ও মূলা, উদ্ভিদ শাস্ত্রে এক জাতীয় উদ্ভিদ। মূলা চাষও এদেশে অনেক দিন হইতে প্রচলিত। সরিষার তৈল ও বীজের জন্য, মূলার মূল খাদ্যের জন্য ও বীজ তৈলের জন্য ইহাদের চাষ এদেশে হয়। কিন্তু এই সরিষা জাতীয় উদ্ভিদের চরম পরিণতি আমেরিকাতে সাধিত হইয়াছে। এই সরিষা জাতীয় উদ্ভিদ হইতে আমেরিকানগণ বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি ও শালগমের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈষৎ কর্দ্দমাক্ত দোয়াঁস মাটিতে ইহা জন্মায়। পৃথিবীর এমন দেশ নাই যেখানে জল হাওয়া বুঝিয়া একটু হিসাব করিয়া চাষ করিলে ইহারা জন্মিতে না পারে। এই সব্জীগুলি মানুষের একটি প্রধান খাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকগুলি বিদেশাগত উদ্ভিদ এক্ষণে এদেশে জন্মিতেছে এবং তন্মধ্যে কতকগুলির এমন শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে যে তাহাদিগকে স্বদেশীয় বলিয়াই মনে করিতে ইচ্ছা হয়। পত্রিকান্তর হইতে সঙ্কলিত নিম্নের তালিকা হইতে আমাদের কথার যথার্থতা সপ্রমাণ করিব।

টমাটো বা বিলাতী বেগুন আমেরিকায় জন্মিল কিন্তু এখন সমুদয় পৃথিবী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার চাষের উপযোগী জল মাটি সকল জায়গায় পাওয়া যায়। বাঙলায় ইহা শীত কাল ভিন্ন হয় না এবং যাহা হয় তাহা এখনও দেখিবার ও দেখাইবার মত নহে।

পান্থপাদপ—Travellers' Tree ইহা দুই প্রকারের, একটির জন্মস্থান উত্তর ব্রেজিল ও গিনি রাজ্যে, অপরটির মাডাগাসকরে। ইহার লাটিন নাম র‍্যাভেনালা। মাডাগাসকরের র‍্যাভোনালা ভারতে স্থান পাইয়াছে। ইহা আকৃতিতে কলাগাছের ন্যায়, কিন্তু বড় হইলে ইহার কঠিন কাণ্ড হয়। পাতার ডাঁটার মধ্যে জল থাকে। মধ্য প্রদেশের রাস্তার ধারে এই গাছ থাকিলে পথিকের জলকষ্ট দূর হইতে পারে।

কৃষ্ণকলি—পেরু রাজ্য হইতে আমদানী হইয়াছে। এক্ষণে ভারতের ফুলবাগানে যথা তথা জন্মিতেছে, কেবল সরস মাটি হইলেই হইল।

রবার বৃক্ষ—প্যারা রবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাকে Hevea Baziliensis বলে। হিভিয়া রবারের আরও অনেক প্রকার আছে। পানামা রবারও মন্দ নহে।

কলিকাতা বোটানিকাল উদ্যানে এই দুই প্রকারেরই গাছ আছে। আমেরিকায় ইহাদের জন্ম। তথা হইতে সিংহলে চাষ প্রবর্ত্তিত হয়। সিংহলে পানামা রবারের আবাদ অপেক্ষা প্যারা রবারের আবাদ ভাল হইতেছে। আসামে এই দুই প্রকারের রবারের আবাদ জন্য চেষ্টা হইতেছে।

কমলা—মধ্য এসিয়ায় ইহার জন্ম। শুনা যায় সলোমনের সময় পালেস্টাইনে ইহার চাষ করা হইত। প্রায় ৭০০ শত বর্ষ কাল সিরিয়া ও পারস্যে ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার পর ইহারা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইতে ইহা পূর্ব্ব ভারত ও আসামে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

পিচ—ইহারও জন্মস্থান পারস্য। কেহ কেহ বলেন চীনরাজ্যে ইহার প্রথম উৎপত্তি। অধুনা ইউরোপে ও আমেরিকায় ইহার আবাদ যথেষ্ট। ভারতের বাগানেও ইহা স্থান পাইয়াছে।

আলু—দক্ষিণ আমেরিকা প্রধানতঃ চিলি ও পেরু রাজ্যে ইহা প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮৫ কিম্বা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভার্জিনিয়া হইতে আয়ার্লাণ্ডে নীত হয়। অতি অল্প দিন হইল ইহা ইংরাজ বণিকগণ কর্ত্তৃক এদেশে আনীত হইয়াছে।

ডুমুর—কালিফোর্ণিয়ার ডুমুর অতি অল্পদিন হইল ভারতে স্থান পাইয়াছে। ডুমুরের আদি জন্মস্থান ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্ত্তী উপকূল, সিরিয়া, পারস্য হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত ভূখণ্ড। তথা হইতে ইহা ইউরোপে ও আমেরিকায় নীত হইয়াছে। আমেরিকায় ইহার চরম উন্নতি। আমেরিকায় রক্তবর্ণা নামক খুব বড় ডুমুরই কালিফর্ণিয়ান ফিগ্‌স্ নামে আমাদের দেশের সখের বাগানে স্থান পাইয়াছে। ভারতে বহুকাল হইতে ডুমুর আছে—এক প্রকার ছোট ডুমুর তাহার তরকারি খায়, দ্বিতীয় যজ্ঞডুমুর—যজ্ঞীয় কার্য্যে প্রধানতঃ ব্যবহার হয় বলিয়া এই আখ্যা পাইয়াছে। কালিফর্ণিয়া ডুমুর কাঁচা তরকারি খাওয়া যায় এবং পাকিলেও সুস্বাদু ও সুমিষ্ট। ডুমুর বাঙলার মাটি, জল, হাওয়া অধিকতর ভাল বাসে। মধ্য এসিয়া হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা সিদ্ধ করিয়া খাওয়া যায় অথবা মাছ মাংসের সহিত রাঁধিয়া খাইলে ব্যঞ্জন অতিসুস্বাদু হয়।

ইণ্ডিয়া রবার—ফিকাস্ ইলাষ্টিকা (Ficus elastica) যবদ্বীপে ইহার জন্ম তথা হইতে এদেশে আসিয়াছে। ইহা বট জাতীয় বৃক্ষ, এদেশের মৃত্তিকার বিশেষ উপযোগী।

ম্যানিলা কদলী (Mesua textiles)—ফলের জন্য ব্যবহার হয়। কয়েক প্রকার কদলী ভারতে খুব প্রাচীন কাল হইতে জন্মিতেছে। কিন্তু মর্ত্তমান কলা পিনাং

প্রভৃতি বিদেশ হইতে আসিয়াছে। ম্যানিলা কদলীর সূত্রে খুব মজবুত রজ্জু তৈয়ারি হয়। তাহার নামই ম্যানিলা রজ্জু। ফিলিপাইন দ্বীপ হইতে এই কদলী এদেশে আসিয়াছে। উষ্ণ অথচ আর্দ্র পর্ব্বতের উপত্যকায় কিম্বা পাদদেশে এই কলা খুব জন্মায়। উত্তর বঙ্গের পার্ব্বত্য প্রদেশে, আসাম ও চট্টগ্রামে ইহা জন্মিয়া থাকে।

রিয়া ও রামি—ইহা বিছুতি জাতীয় গাছ, যবদ্বীপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। আসামের বন-রিয়া ইহাদের মতই গাছ। ইহার খুব ভাল সূত্র হয়।

নোনা, আতা—এই দুইটি ফলই এদেশে বহুল পরিমাণে জন্মে. কিন্তু এই দুই ফলের একটিরও সংস্কৃত নাম পাওয়া যায় না। প্রায় ষাট রকমের আতা এবং নোনা আছে উহাদের মধ্যে কেবল দুই তিনটি ভিন্ন সকল গুলিরই আমেরিকায় জন্ম। ঐ দুই তিন রকমের আতা এসিয়ায় এবং আফ্রিকায় জন্মে। খুব সম্ভব নোনা এবং আতা যাহা আমাদের দেশে পাওয়া যায়, দুইটিই আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে। যদি ইহাদের মধ্যে কোনটি এদেশী হয়, তাহা হইলে নোনা এদেশী হইতে পারে, আতা কোন মতেই নয়। বিদেশী হইলেও বাঙলার আতা দেখিবার জিনিষ।

পোস্ত—অনেকেরই মতে ভূমধ্য সাগরকূলবর্ত্তী স্থানে ইহার চাষ আরম্ভ হয়। পোস্ত হইতে আফিমের চাষে পরিণত হইয়াছে। সাইপ্রস্ প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে এই উদ্ভিদ্ স্বভাবজ। বিহারে পোস্ত ও আফিমের জন্য ইহার চাষ প্রচুর।

সূর্য্যমণি—ইহা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উদ্ভিদ্ কিন্তু ভারতে বহু শতাব্দী হইতে জন্মিতেছে।

জবা—কেহ কেহ বলেন ইহা চীন হইতে এদেশে আসিয়াছে। সম্ভবতঃ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জই ইহার উৎপত্তি স্থান। কিঞ্চিৎ আর্দ্র জল হাওয়ায় যেন হাত পা ছড়াইয়া বাঁচে এবং মনের সাধে ফুল প্রসব করে।

স্থলপদ্ম—বাঙ্গলার প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। চীন হইতে এদেশে আসিয়াছে।

কামরাঙ্গা—পর্ত্তুগীজগণ আমেরিকা হইতে এদেশে প্রথম আনয়ন করে। সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ইহা স্বভাবজ।

বিলিম্বি—এখন ভারতীয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার প্রকৃত উৎপত্তি স্থান মালয় দ্বীপপুঞ্জে।

চীনে নারেঙ্গা—বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, কিন্তু ইহা চীনের আমদানী।

বাতাবি লেবু—কাপ্তেন সাদক যাবাদ্বীপ হইতে ভারতে আনিয়াছিলেন। ইহার বাঙলার মাটি বেশ পছন্দ সহি হইয়াছে। কাপ্তেন সাদকের নামে বাতাবির অপর নাম—সাদক।

মেহগণী—ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ এবং হন্দুরাস হইতে এদেশে আনা হইয়াছে। কিন্তু এদেশে ইহার বৃদ্ধি খুব ধিকি ধিকি।

লিচু—আজকাল বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। চীনের দক্ষিণ হইতে এই দেশে আসিয়াছে।

আঁসফল—ইহার জন্মস্থান চীনে। চীনে ইহার নাম লঁাব্যান।

কাজু বাদাম—চট্টগ্রাম এবং উড়িষ্যায় বহুল পরিমাণে জন্মে। আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে।

বিলাতি আমড়া—সোসাইটি, ফিজি, ফ্রেণ্ডলি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ইহারা স্বভাবজ।

চীনে বাদাম—বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার চাষ হয়। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বাঙলা, মান্দ্রাজে খুব অধিকার বিস্তার করিয়াছে।

বিলাতি কিকর—বাঙ্গলার অনেক স্থানেই জন্মিতে দেখা যায়, দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে।

গোলাপ—ইহার উৎপত্তি স্থান জানা যায় না। আতরের জন্য ভারতের নানা স্থানে ইহার চাষ করা হয়। কথিত আছে ১৬১২ খৃঃ অব্দে নুরজাহান প্রথম গোলাপি আতর ব্যবহার করেন। হিমালয় গাত্রে বনে জঙ্গলে বহুকাল হইতে জন্মিতেছে। শীতপ্রধান পাহাড়ীয়া মাটিতে গোলাপ ভাল জন্মায়।

কাঠ গোলাপ—চীন হইতে এদেশে আসিয়াছে। আজকাল প্রায় সকল বাগানেই জন্মিতে দেখা যায়।

শ্বেত গোলাপ—এই গোলাপ চীনে স্বভাবজ, উত্তর ভারতে পারস্য বা আফগানিস্থান হইতে আসিয়াছে।

লকেট—জাপানেই ইহার জন্মস্থান। এদেশে চীন হইতে আসিয়াছে।

পেয়ারা—আজকাল ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মে, খুব সম্ভব পর্ত্তুগীজেরা মেক্সিকো প্রভৃতি স্থান হইতে এদেশে আনিয়াছিলেন।

বিলাতি মেহুদি—এদেশে প্রায় সকল বাগানেই ইহার বেড়া দেখা যায়। ভূমধ্যসাগরোপকুলে, আফগানিস্থানে, বেলুচিস্থানে ইহা স্বভাবজ।

ডালিম—পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে স্বভাবতঃ জন্মায়; কিন্তু বহুশতাব্দী ধরিয়া ভারতে জন্মিতেছে। বাঙলায় গাছ ভাল হয়, ফল তেমন হয় না।

আয়াপান—এমাজন নদীর তীরেই ইহার উৎপত্তি, ভারতে এবং আমেরিকায় পূর্ব্বে সাপে কাটার ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত। বাঙলায় ইহার বাড় খুব।

গাঁদা—আফ্রিকা এবং ফরাসী দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র জন্মায়।

সূর্য্যমুখী—আইন আকবরিতেও ইহার নাম পাওয়া যায়। মেক্‌সিকো পেরু প্রভৃতি স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছে। ভারতে সকল স্থানেই সূর্য্যমুখীকে দেখিতে পাওয়া যায়।

সপেটা—কলিকাতার বোটানিকেল গার্ডেনে চীন হইতে আনা হইয়াছে, ইহার প্রকৃত জন্মস্থান আমেরিকায়। বাঙলায় ইহার গাছের বৃদ্ধি যেমন হয়, ফলও তেমনি সুন্দর হয়।

বিলাতি গাব্—বাঙলায় চীন হইতে আনা হইয়াছে। আসাম, ব্রহ্মদেশ, খাসিয়া পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে বেশ জন্মে। বাঙলার মাটি অনুকূল বোধ হয়।

হল্‌দে করবি—বাঙলার প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। মেক্‌সিকো হইতে ব্রাজিল পর্য্যন্ত স্থানে ইহা স্বভাবজ।

বিলাতি বেগুণ—দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে। ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোনো সময় পর্ত্তুগীজেরা এদেশে আনয়ন করে।

লঙ্কা—আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে। টেঁপারি—আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে। তামাকু—আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে।	ভারতের অনেক জায়গায় বিশেষতঃ বাঙলার পলিপড়া জমিতে ইহারা স্বভাবজ বলিয়া মনে হয়।

বিলাতি তুল্‌সী—আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে। ব্রাজিলের দাক্ষিণাংশ হইতে মেক্‌সিকো পর্য্যন্ত দেশ সমূহে ইহা স্বভাবজ।

কর্পূরপাতা—আবিসিনিয়া হইতে এদেশে আসিয়াছে। বাঙলায় ইহার নাম পানকর্পূর, এখানে ইহার শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়।

দারুচিনি—লঙ্কা হইতে এদেশে আসিয়াছে। বাঙলায় গাছ দেখিতে বেশ হয় ছালে তাদৃশ গন্ধ হয় না।

কর্পূর—চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে ইহা স্বভাবজ। এদেশে গাছ বেশ হয়, কিন্তু কর্পূর উৎপাদন শক্তির আজও এদেশে পরীক্ষা হয় নাই।

লঙ্কাসিজ্—আফ্রিকায় ইহা স্বভাবজ। বোধ হয় আফ্রিকা হইতে লঙ্কায় এবং লঙ্কা হইতে এদেশে আসিয়াছে। বাগানে ইহার বেড়া দেখা যায়। যেন এদেশেরই গাছ।

পেঁয়াজ—ভূমধ্য সাগরোপকূলবর্ত্তী কোন স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছে এবং ভাল রকম জন্মিতেছে।

বিলাতি সিজ্—ইহার বেড়াও অনেক সময় বাগানের চারিদিকে দেওয়া হয় কারণ গরু ছাগলে ইহা খায় না। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই উদ্ভিদ্ এদেশে আসিয়াছে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ ইহার প্রকৃত জন্ম স্থান।

লাল ভেরাণ্ডা—রাস্তার পাশে পাশে খুব জন্মিতে দেখা যায়। সার জোসেফ্ হুকার ইহার সন্ধান করিতে পারেন নাই। কাজেই ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পরে ইহা এই দেশে আসিয়াছে বলিতে হইবে কিন্তু ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ইহাকে বাঙলায় দেখা গিয়াছে।

আখ্রোট—মালয় দ্বীপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশ ভালবাসে, বাঙলার মাটিতে ফল প্রসব করিতে চায় না।

ভেরাণ্ডা—আফ্রিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে।

আনারস—১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ এদেশে প্রথম আনয়ন করেন। ব্রাজিল প্রভৃতি স্থানেই ইহার জন্ম। যেন বিদেশে ছিল দেশে আসিয়াছে, আসাম ও বাঙলার মাটি ও জল হাওয়া বড় ভাল লাগিয়াছে। আর্দ্র জল হাওয়ায় থাকে ভাল।

দশবাহু—পূর্ব্ব এসিয়ার এবং জাপানের বৃক্ষ বিশেষ। ইহা আইরিস জাতীয় লিলি বিশেষ এখন সচরাচর বাগানে দেখিতে পাওয়া যায়।

রজনীগন্ধা—প্রায় সকল বাগানেই আজকাল দেখা যায়, কিন্তু ইহার প্রকৃত জন্মস্থান মেক্সিকোতে।

হলাণ্ডে দরিদ্রের চাষবাসের ব্যবস্থা—হলাণ্ডে সক্ষম সবলকায় ব্যক্তি যাহাতে ভিক্ষাবৃত্তি করিতে না পায় সরকার হইতে এরূপ বন্দোবস্ত আছে। তথায় দরিদ্রদের চাষবাসের জন্য অনেক জমি আছে। দরিদ্র বেকার লোক অন্য কোন কাজ কর্ম্ম না পাইলে এই স্থানে প্রেরিত হয়। এখানে তাহাকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার পর তাহার নিজের চাষবাসের জন্য কতকটা জমি তাহাকে স্বল্প-হারে ইজারা দেওয়া হয়, এইরূপে সে ক্রমশঃ নিষ্কর্ম্মা ও পরের গলগ্রহ হইতে একজন উপায়ী কৃষক হইয়া উঠে। আমাদের দেশে এইরূপ একটা বন্দোবস্ত হইলে মন্দ হয় না।

ইংলণ্ডে অনুরূপ ব্যবস্থা—ইংলণ্ডের মুক্তি ফৌজ শুধু দরিদ্রের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করিয়া নিরস্ত নহেন, তাঁহারা দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ভরণপোষণের উপায় জন্য স্থানে স্থানে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্র হইতে উপার্জ্জন করিতে শিখিয়া বহুসংখ্যক লোক আলস্য ও পাপের পথ হইতে মুক্তিলাভ করে। এ বিষয়ে মুক্তিফৌজ নামের সার্থকতা আছে।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

মৃত্তিকা বিশ্লেষণ

কোন জমিতে চাষ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত তাহা কোন্ ফসলের উপযোগী। মৃত্তিকা কর্দ্দমাক্ত, কি দোয়াঁস কিম্বা বেলে দোয়াঁস কিম্বা বেলে আঁস তাহা দেখিতে হইবে। মৃত্তিকার প্রধান উপাদান গুলি তাহাতে বিদ্যমান কি না, তাহাতে কি নাই, বা তাহাতে কি যোগ করিতে হইবে, তাহা আগে বিচার করিয়া দেখিয়া তবে কৃষি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। আমাদের এদেশে এক কৃষি-বিভাগ ভিন্ন কোথাও মৃত্তিকা বিশ্লেষণের ব্যবস্থা নাই। ভারতীয় কৃষি-সমিতি দ্বারা এই কার্য্য অল্পমাত্রায় সাধিত হইতে পারে। বঙ্গের চাষীগণের জন্য মৃত্তিকা বিশ্লেষণ কার্য্য সম্পাদন করার ব্যবস্থা করা এক ভারতীয় কৃষি-সমিতির সাধ্যায়ত্ত নহে। এইজন্য যাঁহারা বিজ্ঞানোচিত পদ্ধতি অনুসারে মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করাইয়া চাষাবাদে হস্তক্ষেপ করিতে চান তাঁহাদিগকে আমরা বর্ত্তমান বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের নিকট মৃত্তিকার নমুনা পাঠাইতে পরামর্শ দিয়া থাকি।

নমুনা পাঠাইবার নিয়ম যাহা সরকারী বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা এস্থলে বিবৃত করিলাম। ১০ ইঞ্চ লম্বা, ১০ ইঞ্চ চওড়া, ১৮ ইঞ্চ গভীর একটি মৃত্তিকার চাপ বাক্সে বদ্ধ করিয়া পাঠাইতে হয়। চাপটি যেন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া না হয় এরূপ সতর্ক হইয়া মাটি তুলিয়া লইতে হয়। যে ক্ষেতের মাটি তাহার বিবরণ অর্থাৎ তাহার কোন্ দিক উচু, কোন্ দিক নিচু, কোথায় রাস্তা, কোথায় গলি, কোথায় উচ্চ শিরাল ভূমী, জমির উত্থান পতন ইত্যাদি একটা ম্যাপ নমুনার সঙ্গে পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়। জমিতে কোন চাষাবাদ আছে কি না, জমিতে গাছ পালা থাকিলে তাহার নাম বিবরণ, জমিতে সার দেওয়া হইলে কি সার এবংতাহার পরিমাণ এবং জমিতে চূণ দেওয়া হইয়াছে কি না ইত্যাদি সব খবর লিখিতে হয়।

আভাঙ্গা জমি হইলে তাহাতে বড় বড় কি বন্য বৃক্ষ আছে, কিম্বা ঝোপ জঙ্গল আছে, ঐ সকল গাছ পালার নাম ও বিবরণ দিতে হয়। জমি সম্প্রতি বন কাটিয়া পোড়া দেওয়া হইয়াছে কি না জানাইতে হয়।

পার্শ্ববর্ত্তী জমির বিবরণ কিম্বা পাশে পর্ব্বত থাকিলে তাহাতে উৎপন্ন গাছ পালার বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

জমির স্বাভাবিক বা মনুষ্যকৃত জল নিকাশের ব্যবস্থা কি আছে জানাইতে হয়।

যদি এক খণ্ড বিস্তৃত জমির নানা স্থানে নানাপ্রকার মৃত্তিকা দৃষ্ট হয় তবে জমিটি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক বিভাগের মৃত্তিকার নমুনা পাঠাইতে হইবে।

এইরূপে বিভক্ত ক্ষেতে প্রত্যেক বিভাগ হইতে অন্ততঃ তিনটি নমুনা পাঠাইলে ভাল হয়। ইহাতে সমুদয় ক্ষেতের মাটীর একটা সাধারণ ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আবার অনেকগুলি মাটির নমুনা নানা স্থান হইতে লইয়া সেগুলি বিশেষ রূপে মিশাইয়া সেই মিশ্রিত মাটির দুই কিম্বা তিন পাউণ্ড একটি থলে পুরিয়া মিশ্রিত নমুনা বলিয়া লেবেল আঁটিয়া পাঠাইতে হইবে।

মাটির উপরের স্তরের মত নিম্ন স্তরের নমুনা লইতে হইবে এবং সেগুলি বিশেষ চিহ্ন করিয়া না দিলে উপরের স্তরের নমুনার সহিত মিশাইয়া যাইবে। সকল নমুনাই বাক্সে বন্ধ করিয়া পাঠান কর্ত্তব্য। বাক্সগুলি যেন পরিষ্কার হয়, তাহার ভিতর কিছু থাকিলে মাটির প্রকৃত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। মাটির নমুনাগুলি খোলা অবস্থায় সার গাদার নিকট থাকিতে দিলে সারের হাওয়া লাগিয়া মাটির প্রকৃতির বিকার ঘটিতে পারে।

যেখান হইতে নমুনা তুলিবে তাহার উপরের ঘাস প্রভৃতি চাঁচিয়া ফেলিবে। তৎপরে একটি খোন্তা দ্বারা ১০ ইঞ্চ লম্বা ও চওড়া এবং ১৮ ইঞ্চ হইতে ২৪ ইঞ্চ গভীর এক একটি মৃত্তিকার চাপ খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে। সেই চাপটি ভাঙ্গিয়া না যায়,—১২ ইঞ্চ পর্য্যন্ত মাটি উপর স্তর এবং তাহার পর হইতে দুই ফিট পর্য্যন্ত নিম্নস্তর। উপর স্তরের পর নিম্নস্তর আরম্ভের সময় কোন স্পষ্ট চিহ্ন আছে কি না বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা উচিত।

এই উচ্চ স্তরের মাটি হইতে ৩ কিম্বা ৪ ইঞ্চ টুকরা টুকরা মাটি খোন্তাদ্বারা ক্ষেতের মাটির সহিত সমতলভাবে কাটিয়া লইয়া অপর নমুনা হইতে এই প্রকারে মাটি লইয়া মিশাইয়া উচ্চস্তরের মিশ্রিত মাটির নমুনা এবং এই প্রকারে নিম্নস্তরের মাটির মিশ্রিত নমুনা সংগ্রহ করিতে হয়।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ইক্ষুর আবাদ—১৯১১-১২

এতদঞ্চলে আখের ক্ষেতে সেচ দেওয়া হয় না। সময়মত বেশ সুবৃষ্টি হয় বলিয়া বৃষ্টি জলেই এখানে আখ চাষ হয়। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বর্ষার জলেই কাজ চলে তার পর বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেলেও আখের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। নদীর জলপ্লাবনে নিচু জমির আখের কিছু ক্ষতি করে।

বর্ত্তমান বর্ষে আবাদী জমির পরিমাণ অনুমান ১৭৯,৩০০ একর। ষোল আনা ফসল জন্মিলে একর প্রতি এখানে ২৪ হন্দর গুড় জন্মায়। এক হন্দরের ওজন

১ মণ ১৪ সের। এই হিসাবে ৪,৩০৩,২০০ হন্দর গুড় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়।

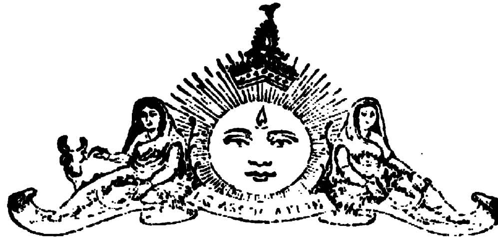
এতদ্ব্যতীত ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জে প্রচুর পরিমাণে খেজুরগুড় উৎপন্ন। এই অঞ্চলের অন্যত্র ইহার এক তৃতীয়াংশ খেজুরগুড় পাওয়া যায়। উৎপন্ন খেজুরগুড়ের পরিমাণ আলোচ্য বর্ষে ৮০১,২০০ হন্দর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে তিলের আবাদ—১৯১১

বাঙলার মধ্যে প্রধানতঃ সম্বলপুরে তিলের আবাদ হইয়া থাকে। সমগ্র বঙ্গে উৎপন্ন তিলের তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ এইখানেই জন্মায়। ছোটনাগপুর, মেদিনীপুর, চম্পারণ, ভাগলপুর, সাঁওতালপরগণা ও আঙ্গুলে তিলের আবাদের পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। বিগত বর্ষের তিল চাষে আবদ্ধ জমির পরিমাণ ২১১,৫০০ একর মাত্র, তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পরিমাণ কিছু অধিক এবং এই বৎসর সর্ব্বত্র ষোল আনা ফসল জন্মিয়াছে বলিয়া অনুমান অযৌক্তিক নহে। এক একর বা কমীবেশী তিন বিঘায় ৪ মণ ১০ সের উৎপন্ন তিলের হার ধরিয়া লইলে সমগ্র প্রদেশে ৩৩.০০০ টন তিল উৎপন্ন হইয়াছে। এই তিল চাষের কিছু পূর্ব্বে জলদি তিলের চাষ হইয়াছিল তাহাতে ৪,৭০০ টন তিল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামে হৈমন্তিক ধানের আবাদ—১৯১১-১২

বর্ত্তমান বর্ষে এতদঞ্চলে হৈমন্তিক ধানের জমির পরিমাণ ১২,৩১০,৮০০ একর। বিগত বৎসর অপেক্ষা ১০৯,৪০০ একর অধিক জমিতে এই ধানের আবাদ হইয়াছে। সময়মত সুবৃষ্টি হওয়ায় অধিক জমিতে ধানের আবাদ সম্ভবপর হইয়াছে। ষোল আনার উপর ধান জন্মিয়াছে। একর প্রতি উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৯॥ হন্দর ধরিয়া সমগ্র প্রদেশে ১২৬,৩০৮,৮০০ হন্দর ধান উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এক হন্দর চাউল আমাদের বাঙলা ওজনে এক মণ ১৪ সের মাত্র।



মাঘ, ১৩১৮ সাল।

কৃষি প্রতিষ্ঠা

ভারত সম্রাট ভারতে আসিয়াছিলেন। প্রায় মাসাধিক কাল ভারতময় লোকে রাজ সমাগম জনিত আনন্দ উপভোগ করিয়াছে। ভারতবাসী রাজ দর্শন মহাপুণ্য বলিয়া মনে করে, অনেকের পক্ষে সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। সম্রাট স্বয়ং মণীষী এবং হৃদয়বান। তিনি নানা স্থানে বক্তৃতায় অনেক সহানুভূতি আশার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে বঙ্গ ভঙ্গ রহিত হইয়াছে এবং রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী লইয়া যাইবার সংকল্প স্থির হইয়াছে। এই সব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে উত্তরোত্তর প্রজার সংস্রব বৃদ্ধি পায় তদনুরূপ ব্যবস্থা করা হইবে কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ আভাসও দিয়াছেন। মোটের উপর এই—সম্রাটের আগমনে ভারতে স্থায়ী কল্যাণের সুচনা হইবে অনেকে এরূপ আশা করিতেছেন। কিন্তু দরিদ্র লইয়াই দেশ, প্রায় জগতের সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ ভারতবর্ষে পনেরো আনা তিন পাই লোক নিঃস্ব। সারা দিন পরিশ্রম করিয়া দিন গুজরাণের উপায় করিতে পারে না। জন সংখ্যায় অধিকাংশ লোকেরই এইরূপ অবস্থা। ইহাদের প্রতি দৃষ্টি না করিলে ইহাদের অবস্থার উন্নতি বিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইলে কোন দেশেরই স্থায়ী কল্যাণের ভিত্তি স্থাপন হয় না। সুতরাং ভারতের বর্ত্তমান যুগের এই অভূতপূর্ব্ব রাজ দর্শন সৌভাগ্য আপামর সাধারণের কল্যাণের কোন সুচনা করিতে পারিয়াছে কি না তাহাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। রাজা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আপাততঃ বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবশ্য কাহার কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। স্বদেশী বিদেশী অনেক ভারত হিতৈষী মহাজনগণের বিশ্বাস যে, ভারতের সাধারণ লোকের অধিকাংশই

নিরক্ষর বলিয়া দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। তাহারা শরীর রক্ষার সামান্য নিয়মগুলি জানে না তাই তাহারা আধি ব্যাধিতে প্রপীড়িত অকাল মৃত্যুর কবলগত। তাহারা হিসাব পত্র বুঝে না বলিয়া মহাজন এবং জমিদারের অত্যাচারে জর্জ্জরিত সুতরাং তাহারা যে পরিমাণে শিক্ষিত হইবে সেই পরিমাণে সর্ব্ব বিষয়ে আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিবে। কথাগুলি শুনিতে বেশ এবং ইহার মূলে কিছু সত্যও নিহিত আছে। সর্ব্বত্রই পল্লীগ্রামগুলির যেরূপ অবস্থা, কালধর্ম্মে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকেরা যেরূপ বহির্ম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের পল্লীগ্রাম-বাস এবং মৃত্যু এই দুই একার্থ বোধক হইয়াছে। যাঁহাদের পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাঁহাদের মুখে শুনা যায় যে সর্ব্বত্রই কৃষি-শিল্পের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। ভদ্র লোকেরা আপনাদের ভদ্রাসন ছাড়িয়া সহরবাসী হওয়ায় গ্রামগুলি হিংস্র জন্তুর লীলাস্থল হইয়া পড়িয়াছে। এককালে যে সমস্ত পল্লীগ্রাম জন কোলাহলে পরিপূরিত ছিল, এখন সেগুলি শ্মশান প্রায়। জমি আছে, চাষ করিবার লোক নাই। দামদলে পচাপুকুরগুলি পরিপূর্ণ হইয়াছে। যে দু চার ঘর লোকের বাস আছে তাহার চতুঃপার্শ্বে নিবীড় অরণ্য। খাল বিলের বদ্ধ জলে ভেক, জলৌকা, মশক ব্যালির অসামান্য আধিপত্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই পল্লিগ্রামের জল বায়ু ম্যালেরিয়া বিষে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এ অবস্থায় আবার ধনী এবং মধ্যবিত্ত লোক পল্লিগ্রামে না ছুটিলে তথাকার স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় বিধান না করিলে জনসাধারণ বাঁচিতেই পারিবে না। সুতরাং কাহাকেই বা শিক্ষা দেওয়া যাইবে এবং কেই বা শিক্ষায় লাভবান হইবে। আবার পল্লীকুটীরকে মনুষ্যের বাসোপযোগী করিতে না পারিলে জন হিতকর অন্য সকল চেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে মাত্র। আমাদের ভদ্রাসন এবং বাস্তু ভিটার প্রতি একটা অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। ভদ্রাসন যাইবে, বাস্তু ছাড়িতে হইবে ইহা মনে করিলে পূর্ব্বে যেন লোকের মাথায় বাজ পড়িত কিন্তু এখন আর লোকে পল্লীগ্রাম-মুখী হইতে চায় না—আর হইবার উপায়ও নাই। সেবার যখন কলিকাতায় প্লেগ দেখা দেয় এবং গভর্ণমেণ্টের প্লেগ ভিতির বিধির ভয়ে যখন মহানগরীর সকল লোকে পুত্র কলত্র লইয়া পল্লীগ্রামের বাড়িতে আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দেশে যাইয়া অনেকেই ম্যালেরিয়ার হাত এড়াইতে পারেন নাই। দুই তিন মাস পরে যখন আবার তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন তখন দেখা গেল সকল বাড়িতেই দু এক জন রোগ শয্যায় শায়িত। পল্লীগ্রামের এই ভীষণ অবস্থার সর্ব্বাগ্রে প্রতিকার করিতে না পারিলে দেশের অন্য কোন কল্যাণই সম্ভব হইবে না। লোকগণনায় জন সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি যাহাই প্রকাশ হউক না কেন, যে কোন পল্লীবাসীকে জিজ্ঞাসা করা যাউক, তিনি বলিয়া থাকেন

"গ্রামে লোক নাই কেই বা চাষ করে, কেই বা জঙ্গল কাটে, কেই বা জল নিকাশের ব্যবস্থা করে, কেই বা পানীয় জলের উপায় বিধান করে, কেই বা গ্রামের কথা ভাবে।" এই রোগের ঘর। যাহা কিছু দুঃখ দুর্দ্দশা এই থান হইতে উৎপন্ন হইতেছে। কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে গেল তাহার অন্য ফলাফল যাহাই হউক লোকে যদি এই উপলক্ষে আবার পাড়াগাঁয়ের দিকে তাকায়, তাহারা যদি আবার দেশের ঘর বাড়ির জন্য ব্যস্ত হয়, তাহারা যদি অন্তর্ম্মুখীন হইতে শেখে তবে বলিব আমরা রোগ চিনিয়াছি এখন ঔষধের ব্যবস্থা হইতে পারে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে জমিতে সোণা ফলে কিন্তু সেই কৃষক আজ একলা পড়িয়া হয় প্রাণে মারা যাইতেছে, না হয় কুল কিনারা না পাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য বিদেশীর হাতে, দেশের শিল্প লোপ পাইয়াছে, এক ভরসা কৃষি। সহর, বাজারে কিছু কৃষি চলিতে পারে না। যে পল্লীগ্রামে কৃষাণ এবং তাহার কর্ম্মক্ষেত্র সেই পল্লীগ্রামের যদি এইরূপ অবস্থা হয় তাহা হইলে ত গাছের গোড়াই কাটা গেল, আর ফল পুষ্পের আশা করিয়া লাভ কি? তোমরা স্বায়ত্ব শাসনের স্বপ্ন দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতেছ কিন্তু যে বাস্তু ভিটা, জমি জমা আপনাদের হাতে ছিল, যেখানে তোমাদের প্রকৃত স্বায়ত্ব শাসনের গোড়া, যে পাড়াগাঁয়ের তুমি মালিক, তুমি যেখানে জঙ্গল কাটিয়া পচা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া সাবেক জমি জমার চাষাবাদের ব্যবস্থা করিয়া, রাজা হইয়া, দশ জনের একজন হইয়া বসিতে পার তাহার কোন উপায়ই করিতেছ না। সুতরাং তোমার এ সোণা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দেওয়ায় লাভ কি! কথায় বলে ক্ষেতে দাঁড়াইলে তবে কৃষাণের বুদ্ধি বাড়ে। তুমি ক্ষেত ছাড়িয়া, দেশের মুক্তবায়ু ছাড়িয়া সহরের অন্ধকুপবাসী হইয়াছ তাই তুমি জীবিকার জন্য চোখে অন্ধকার দেখিতেছ। তুমি আবার আপনার কোটে যাও তবে তোমার বল বুদ্ধি আসিবে। এই যে স্বদেশ হিতের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, এই যে সকল সঙ্কল্প শেয়ালের যুক্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে, ইহার আসল কথা তোমাদের শক্তি চেষ্টা অসম্বদ্ধ এবং ক্ষণস্থায়ী। পল্লীগ্রামের মধ্য দিয়া বাস্তু ভিটার প্রতি অনুরাগ পুনরানয়ন করিয়া এই সকল ক্ষুদ্র এবং বিক্ষিপ্ত শক্তি এবং চেষ্টার সংযোগ এবং সফলতা সাধন করিতে হইবে। তোমরা পাঁচজন গ্রামে গিয়া বইস, গ্রামের তাঁতী, কর্ম্মকার, চাষী আবাদী কাজ পাইবে, পুঁজীর টাকা যোগাড় করিতে পারিবে, পরিশ্রমের ফল দেখিয়া আত্মোন্নতির পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে শিখিবে তখন গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। পঞ্চাশটি গ্রাম এইরূপ জাঁকিয়া উঠিলে জেলা জাঁকিয়া উঠিবে, জেলাগুলি জাঁকিয়া উঠিলেই দেশ জাঁকিয়া উঠিবে। স্বদেশ হিতের এই এক পথ, অন্য পথ নাই। গ্রাম রক্ষার ভার আগে গ্রহণ কর

তবে দেশ রক্ষা করিতে পারিবে। তুমি স্বায়ত্বশাসন ছাড়িয়া দিতেছ, তুমি জাগিয়া ঘুমাইতেছে, তুমি আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতেছ তোমার ভাল অন্তে কে করিতে পারে, অন্যে তোমাকে কেমন করিয়া বড় করিবে। কৃষকের এই কথা, এই ভাবনা। তাহার কৃষিক্ষেত্রের চতুঃসীমানায় কেহ পা দেয় না, তাহার কৃষি উন্নতি কিসে হইবে। তোমরা নানা ভাবনা করিতেছ কৃষকের কেবল এই একই ভাবনা। তাহার ঘরের লাঙ্গলের ফালে মরিচা পড়িতেছে সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই আর তোমরা সহরে বসিয়া বিদেশী হাতিয়ার পত্র আনিবে, যৌথ মূলধনে কৃষি চালাইবে এরূপ কত রাজা উজীর মারিতেছে। রাজা আমাদের ঘরের খবর এতটা জানেন না; তাঁহাকে এবং রাজ কর্ম্মচারীদিগকে সহর বাজারের লোকের মুখে শুনিয়া শিখিতে হয় নতুবা তিনি যে রকম রাজা, যাহারা প্রাথমিক শিক্ষা পাইবে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেন।

পত্রাদি

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কুণ্ডু, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ,

আপনার পত্রের উত্তরে আপনাকে জানান যাইতেছে যে, গিনি ঘাস, জোয়ার প্রভৃতি যাবতীয় ঘাসের চাষ বর্ষারম্ভেই করিতে হয়।

কোন্ সময় কোন সব্জীর চাষ করিতে হয় তাহার তালিকা বীজ বপনের সময় নিরুপণ পুস্তিকায় পাইবেন। তাহার দাম দুই আনা। ডাক টিকিট পাঠাইলে চলিবে। ১৮ ও ২৪ রকম সময়োপযোগী সব্জী উক্ত তালিকা হইতে নির্দ্দিষ্ট হয়।

খুব ভাল পিতলের পিচকারি যাহার দাম ৭৲ কিম্বা ৮৲ টাকা তাহাদ্বারা ৩০।৪০ ফিট দুর পর্য্যন্ত জল চালান যায়। গাছ ধৌত করিবার জন্য এই সকল পিচকারী ব্যবহার করা হয়।

জলোত্তোলন যন্ত্র যাহার মূল্য ৯৲ টাকা তাহাও একপ্রকার পিচকারী বিশেষ। ইহাদ্বারা খুব বেশী নিচু স্থান হইতে জল উঠাইবার সুবিধা হয় না। ইহার একমুখ কোন জলের বাল্‌তি বা টবে রাখিয়া পম্প করিতে থাকিলে জল ৫০।৬০ ফিট উর্দ্ধে বা দুরে চালান যায়। বড় বড় বৃক্ষের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ধৌত করা উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহার করা হয়।

কলের লাঙ্গল ব্যবহার করিতে গেলে খুব প্রশস্ত জমির আবশ্যক। জমি অল্প হইলে কলের লাঙ্গল ব্যবহারের ব্যয় বাহুল্য চাষের লাভের অন্তরায় হইয়া

উঠে। আমাদের নরম জমির পক্ষে দেশী লাঙ্গলই ভাল। শিবপুর লাঙ্গল মন্দ নহে ইহাতে মাটি উল্টাইয়া সুগভীর চাষ হয়। কাঠের ফ্রেম ও লোহার ফলাযুক্ত শিবপুর লাঙ্গল তত ভারি নহে। দেশী জোয়ান বলদে অনায়াসে টানিতে পারে। সমুদয় লোহায় শিবপুর লাঙ্গল খুব ভারি হস্ত চালিত প্লানেট জুনিয়ার লাঙ্গল ব্যবহার করিতে পারা যায়, তাহাতে খরচের কিছু আনুকুল্য হইতে পারে।

আপনি একজন চাসের সহযোগী চান—এ বিষয়ে কৃষকে লেখা হইল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য শীলকোট চা-বাগান লোবা গাড়োয়াল,

১। চায়ের ক্ষেতে কোদালের খোদাই না করিয়া যগুপি লাঙ্গলের দ্বারায় মৃত্তিকা কর্ষণ করিয়া পরে ঢ্যালা ভাঙ্গিয়া জমি সমান করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে চায়ের কোন ক্ষতি হইবে-কি না।

২। ৩০।৪০ বৎসরের পুরাতন চা গাছ তাহাও আবার প্রায় ১৫।২০ বৎসর যাবৎ উহাতে কোন প্রকার জমির পাট না হওয়াতে ঐ সকল জমি দুর্ব্বা এবং ব্যানা ঘাসে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ছাগল গরুতে চা গাছ খাইয়া খাইয়া উহার উচ্চতা এক্ষণে ৬ বা ৮ ইঞ্চিতে দাঁড়াইয়াছে এক্ষণে ঐ সকল গাছের পাট করিলে ঐ সকল গাছের উন্নতির আশা আছে কি না।

৩। চায়ের গাছে গোবর সার অথবা ছাই দিলে উপকার হইবে কি না?

উঃ। চা বাগানে ঝুপী চা-গাছের মধ্য দিয়া লাঙ্গল চালাইবার সুবিধা হয় না। লাঙ্গল দ্বারা শিকড় ছাঁটাই কার্য্য সুচারুরূপে হয় না। চা বাগানের মাটির গভীর কর্ষণ আবশ্যক সেইজন্য কোদাল কোপানই ভাল।

৩০।৪০ বৎসরের পুরাতন চা-গাছ উঠাইয়া ফেলিয়া নূতন চারা রোপণ করাই সুযুক্তি। ছাগল গরুতে খাইয়া যে গাছ প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে তাহার আর উন্নতি হওয়া সুকঠিন।

পাতার জন্য চায়ের আবাদ অতএব চা-গাছের পক্ষে নাইট্রোজেন ও পটাস সারের আবশ্যক। পটাসের জন্য ছাই ব্যবহার এবং নাইট্রোজেনের জন্য সোরা ব্যবহার করিতে হয়।

গোময় সার ব্যবহারের একটা বিঘ্ন আছে, ইহা ব্যবহারে চা-গাছে পোকা লাগিতে পারে চায়ের ক্ষেতে অন্যসারের সহিত চুণ ব্যবহার করিতে হয়।

ব্রহ্মদেশে পাট—সকলেই জানেন, বাঙ্গালা দেশের ভূমি ভিন্ন অপর কোথাও পাট উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ব্রহ্মদেশেও যে পাটের চাষ হইতে পারে, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত পাটন নামক স্থানে কতিপয় প্রবাসী বাঙ্গালী পাট বপন করিয়াছিল। মৈমনসিংহ হইতে পাটের বীজ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। গত মে মাসে বীজ বপন করা হয় এবং আগষ্ট মাসে পাট পাকে। জুলাই মাসের অনাবৃষ্টিতে এবং পাট কাটিবার পর বৃষ্টির জল জনিত আর্দ্রতায় পাটের রং খারাপ হইলেও মোটের উপর পাটের চাষ সফল হইয়াছিল। এই পাট বাঙ্গলার পাটের প্রায় সমতুল্যই হইয়াছিল এবং ইহার সূতা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ ফিট ও দেখিতেও বেশ চিক্কণ হইয়াছিল। অধুনা বাঙ্গলা দেশে উদরান্ন সংস্থানের জন্য যেরূপ বিরাট জীবন সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, ক্রমাগত ও উপর্য্যুপরি কৃষিকার্য্যে দেশের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি যেরূপ হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে যদি বাঙ্গালী গৃহকোণ ছাড়িয়া বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য বহির্গত না হয়, তাহা হইলে দেশে দরিদ্রতার মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্য—সংপ্রতি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যে বাণিজ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের অধিকাংশ বাণিজ্যই কলিকাতার সহিত হইয়া থাকে। গত বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গের আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৬২ ভাগ কলিকাতার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। ঐ বিবরণীতে ইহাও প্রকাশ যে, পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্যের সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করিবার কোনও উপায় নাই। কেবল রেলপথে অথবা ষ্টীমারে যে সকল পণ্যের আমদানী রপ্তানি হইয়াছে, বিবরণীতে তাহারই উল্লেখ আছে। শকটে বা নৌকাযোগে যে সকল পণ্যের আমদানী রপ্তানি হইয়াছে, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করা অসম্ভব। কারণ উভয় বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী সীমা অতিক্রম করিয়া সকল পণ্যের আমদানী-রপ্তানি হয়, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইলে সীমান্তের প্রত্যেক গ্রামে কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হয়। অবশ্য তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। ফলকথা, পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ বাণিজ্যই যে পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ কলিকাতার সহিত হইয়া থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। চট্টগ্রাম বন্দর হইতে প্রত্যক্ষভাবে জলপথে অন্যান্য দেশের সহিত যেরূপ বাণিজ্য হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিয়াছিলেন, সেইরূপ হয় নাই। অধিকন্তু সাড়াঘাটে সেতু নির্ম্মিত হইলে উত্তর বঙ্গের সহিত কলিকাতার বাণিজ্য বহুরূপে বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভাবনা। সুতরাং কলিকাতা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলেও পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বাণিজ্য-স্রোত পূর্ব্বের ন্যায় কলিকাতার অভিমুখেই প্রবাহিত হইবে, সন্দেহ নাই।

সার-সংগ্রহ

আক মাড়া লোহার কল

অনেক স্থানে আকমাড়া কাঠের কল এখনও চলিত আছে। দুই রকম কাঠের কল আছে, এক রকম ঠিক তেলীদের ঘানির মত, ইহাকে ঘানি বা কলু বলে; আর এক রকম কাঠের কলে, লোহার কলে যেরূপ রোলার বা চরকি থাকে, সেইরূপ দুইটী কাঠের রোলার থাকে। ইহাদের কোনটীই লোহার কলের মত ভাল কাজ করে না। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানেই লোহার কল চলিত হইয়াছে। কিন্তু এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে লোহার কল এখনও চলে নাই। অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কাঠের কল দিয়া আক মাড়িলে যে পরিমাণ রস ও গুড় হয়, লোহার কল দিয়া মাড়িলে তাহার অপেক্ষা শতকরা অন্ততঃ দশ ভাগ বেশী রস ও গুড় পাওয়া যায়; অর্থাৎ ১০ মণ গুড়ের স্থলে ১১ মণ পাওয়া যাইতে পারে। ১৯০৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে জোড়হাট কৃষি-প্রদর্শনীতে স্থানীয় কাঠের কলের সহিত ৩টী রোলার লোহার কলের তুলনা করা হয়। ১০ দিন ধরিয়া এই পরীক্ষা হয়। প্রত্যেক কলে সর্ব্বসমেত ৩০ মণ ৩১ সের আক মাড়া হয়। লোহার কলে ১৬ ঘণ্টা ২৭ মিনিটে মাড়া শেষ হয় ও ২৫ মণ ২ সের রস বাহির হয়, আর কাঠের কলে ১৯ ঘণ্টা ২৯ মিনিট অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা ২ মিনিট বেশী সময় লাগে, অথচ ২১ মণ ৩১½ সের মাত্র রস অর্থাৎ লোহার কল হইতে যত রস পাওয়া গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা ৩ মণ ১০½ সের রস কম হইয়াছিল। এই হিসাবে, কাঠের কলে ১০০ মণ রস দিলে লোহার কল হইতে ১১৫ মণ রস পাইবার কথা। লোহার কল চালাইতে কিছু বেশী জোর লাগে, অর্থাৎ উহা চালাইতে জোরাল গরু বা মহিষের দরকার। এই কারণে লোহার কল চালাইতে কিছু বেশী খরচ লাগে বটে, কিন্তু উহা ব্যবহার করিলে যে বেশী গুড় পাওয়া যায়, তাহার মূল্য হইতে অতিরিক্ত খরচ বাদ দিলেও লাভ থাকিবার কথা। অনেক রকম লোহার কল আমাদের দেশে চলিত আছে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত লোকের তৈয়ারী কলগুলি ভাল বলিয়া খ্যাত আছে :—

মেসার্স টম্‌সন্ ও মিলন্, বিহিয়া, জিলা সাহাবাদ, বিহার।

মেসার্স রেন্‌উইক ও কোম্পানি, কুষ্টিয়া।

মেসার্স বারণ এণ্ড কোম্পানি হাওড়া, কলিকাতা।

রেনউইক্ কোম্পানির কল কিনিতে পাওয়া যায় না, তাঁহারা কল কেবল ভাড়া দিয়া থাকেন। কোন কোন লোহার কলে দুইটী রোলার, আর কোনটীতে

তিনটী রোলার থাকে। দুই রোলার অপেক্ষা তিন রোলার কলে ভাল কাজ হয়, সেই জন্য দুই রোলার কলের চলন কমিয়া আসিতেছে। একটী তিন রোলার ভাল কল বিহিয়া বা কলিকাতায় ৯০৲ টাকায় পাওয়া যায়; উহা ছাড়া আনিবার খরচ লাগে।

গুড় জ্বাল দিবার লোহার চেপ্টা কড়া

আমাদের দেশের অধিকাংশস্থলে আকের বা খেজুরের রস জ্বাল দিয়া গুড় তৈয়ারী করিবার জন্য মাটির বা লোহার বা পিতলের গভীর পাত্র ব্যবহৃত হয়। এরূপ গভীর পাত্রে রস জ্বাল দিলে গুড় তৈয়ার করিতে অনেক সময় লাগে; ফল এই হয় যে, গুড়ে দানার ভাগ কমিয়া গিয়া চিটের ভাগ বাড়ে; অধিকন্তু, পাত্রের ধারে গুড় অল্পবিস্তর পুড়িয়া যায় বলিয়া গুড়ের রং ময়লা হয়। চওড়া অল্প গভীর লোহার (বা তামার) কড়া ব্যবহার করিলে এই দোষগুলি ঘটে না; রস বিস্তৃত হইয়া থাকায় অল্প সময়েই গুড় তৈয়ারী হয় ও গুড়ের দানা নষ্ট হয় না। এইরূপ কড়া চুলার উপর এরূপ ভাবে বসাইতে হয় যে, উহার ৫।৬ ইঞ্চি পরিমাণ ধার আগুনের বাহিরে থাকে, তাহা হইলে গুড় আগুনের তাপে আদৌ জ্বলিয়া যাইতে পারে না, সুতরাং গুড়ের বর্ণ পরিষ্কার হয়।

এইরূপ লোহার কড়ার ব্যবহার আমাদের দেশের দুই এক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই ইহার চলন হয়, ইহা বড়ই বাঞ্ছনীয়। বিহিয়া ও কলিকাতা হইতে এই রকম কড়া ৩০৲ টাকার মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ কড়া সরার মত গোলাকার, প্রায় ৬ ফুট চওড়া ও প্রায় ৬ ইঞ্চি গভীর। ইহাতে এক একবারে প্রায় ৪ মণ রস জ্বাল দেওয়া যাইতে পারে।

গো-মহিষাদির খাদ্যোপযোগী শস্য

আমাদের দেশের অনেক স্থানে লোক সংখ্যা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে আবাদের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, গরু বাছুরের চরিবার স্থান নাই, বা থাকিলে এত কম যে, শুধু চরানির উপর গরু বাছুর পোষা অসম্ভব হইয়াছে। এরূপ স্থলে গো মহিষাদির খাইবার উপযোগী শস্য জন্মান নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অনেক প্রকার শস্য আছে। ইহাদের মধ্যে আমাদের দেশের পক্ষে জোয়ার নামক শস্যই উৎকৃষ্ট। রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদের স্থানে স্থানে গো মহিষাদির জন্য এই ফসলের আবাদ হইয়া থাকে; সেখানে জোয়ারকে প্যামা বলে। আমাদের দেশে জোয়ারকে স্থানে স্থানে দেওধান বলে। কেহ কেহ খৈ তৈয়ারী করিয়া খাইবার জন্য বাড়ীর কাছে কিছু কিছু দেওধান লাগাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে জোয়ারের দানা মানুষের প্রধান খাদ্য,

ও উহার ডাঁটা কাঁচা অবস্থায় অথবা শুকাইয়া গরু বাছুরকে খাওয়ান হয়। এই শস্যের চাষ আমাদের দেশে প্রচলিত হইলে গো মহিষাদি পালন করিবার বড়ই সুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ যেখানে চরানি মাটির অভাব হইয়াছে, সেখানে ইহার আবাদ প্রচলিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

জোয়ার বর্ষাকালে হয়। আউশ ধানের উপযোগী উচু মাটিতে ইহা উত্তম জন্মিতে পারে। বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে বুনিতে হয়। আউশ ধানের জন্য জমি যেরূপ ভাবে তৈয়ারী করিতে হয়, ইহার জন্যও সেইরূপ করিলে চলে। এক বিঘা জমিতে ৬ সের বীজের দরকার। বুনিবার পরে জমিতে আর হাত দিতে হয় না। ৪৫ সপ্তাহের ভিতর গাছ গুলি এত ঘন হইয়া উঠে যে মাটি দেখা যায় না, ও উহার ভিতর কোন আগাছাও জন্মিতে পারে না। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জোয়ার পাকে। ভাদ্র বা আশ্বিন মাস হইতে জোয়ারের গাছ কাঁচা কাটিয়া গো মহিষাদিকে খাওয়ান যায়, পরে পাকিয়া গেলে উহা শুকাইয়া রাখিলে শীত ও গ্রীষ্মকালে দরকারি মত গরু বাছুরকে খাওয়ান যাইতে পারে। এক বিঘা মাটি হইতে ডাঁটা পাতা লইয়া ৭০।৮০ মণ কাঁচা ঘাস পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক গরুকে গড়ে ২০ সের জোয়ার দিলে এক বিঘা জমির উৎপন্ন চাস দিয়া একটী গরু ৪।৫ মাস পালন করা যাইতে পারে। শুষ্ক জোয়ার দা দিয়া বিচালীর মত ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া দিতে হয়। কাঁচা জোয়ারও কাটিয়া দিলে ভাল হয়। ফুল বাহির হইবার পূর্ব্বে জোয়ার গরু বাছুরকে দিতে নাই ; কারণ নিতান্ত কাঁচা অবস্থায় জোয়ারের গাছে কখন কখন একরূপ বিষাক্ত পদার্থ জন্মে, উহাতে গবাদির অনিষ্ট হইতে পারে। যদি কোন গরু জোয়ার খাইয়া বিষের লক্ষণ দেখায়, তাহা হইলে উহাকে তৎক্ষণাৎ অনেকটা দুধ পান করাইয়া দিবে ; দুধ না পাইলে গুড় গুলিয়া উহা খাওয়াইয়া দিবে। ইহাতে বিষ কাটিয়া যাইবে।

জোয়ার ছাড়া আরও নানাবিধ শস্য আছে যাহা গো মহিষাদির জন্য জন্মান যাইতে পারে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যে সকল স্থান বন্যায় ডুবিয়া যায়, সে সকল স্থানের কৃষকেরা খলিয়া ঘাস নামে একপ্রকার নলজাতীয় ঘাস নদীর চরে রোপণ করে। বর্ষাকালে ইহা বাড়িয়া জলের উপর উঠে, তখন অন্য ঘাস পাওয়া যায় না ; লোকে ঐ ঘাস কাটিয়া আনিয়া গরুকে খাওয়ায়। মটর, খেঁসারি, বরবটী প্রভৃতি ডাইলের গাছ গো মহিষাদির বিশেষতঃ গাভীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী খাদ্য। মটরজাতীয় গাছ মাত্রে মাংস ও রক্তবৃদ্ধিকর বস্তু অধিক পরিমাণে থাকে। কাঁচা জই ও ভুট্টা গাছও গবাদির সুন্দর খাদ্য। গিনি ঘাস নামক এক প্রকার ঘাস আছে, উহার চাষ করিলে বারমাস অনায়াসে গরুর খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে। গিনিঘাসের চাষ-প্রণালী অপর স্থলে দেওয়া হইল।

সাইলো।

গো মহিষাদির খাদ্যোপযোগী কাঁচা ঘাস বা অন্যান্য কাঁচা গাছ পুঁতিয়া রাখিলে উহা শীঘ্র নষ্ট হয় না, এবং আবশ্যক মতে তুলিয়া উহা গরু বাছুরকে খাওয়াইতে পারা যায়। যে স্থানে বা যে গৃহে এরূপ ভাবে গবাদির খাদ্য রক্ষিত হয়, তাহাকে "সাইলো" বলে, ও ঐরূপ রক্ষিত খাদ্যকে "সাইলেজ" বলে। পৃথিবীর অনেক দেশে সাইলোর ব্যবহার আছে। দেখা যায় অনেক স্থলে বৎসরের একভাগে গো মহিষাদির বিস্তর খাদ্য পাওয়া যায়, অথচ অন্য সময় এত দুষ্প্রাপ্য হয় যে, গো মহিষাদি ঘাস অভাবে শীর্ণ হইয়া পড়ে। যখন বেশী খাদ্য পাওয়া যায়, তখন শুকাইয়া রাখিলে বা সাইলোতে পুতিয়া রাখিলে, পরে উহা বিশেষ কাজে লাগিতে পারে। যে সকল ঘাস বা গাছের ডাঁটা মোটা, সেগুলি শুকাইলে গরু বাছুরে ভাল করিয়া খায় না, এবং বর্ষাকালে উৎপন্ন হইলে উহা শুকাইতেও পারা যায় না। কিন্তু সাইলোতে রাখিলে উহার রস বজায় থাকে ও উহা শুকাইবারও কোন প্রয়োজন হয় না।

খাসিয়া পাহাড়ে শীতকালে ঘাস সমস্তই মরিয়া যায়, তখন গরুর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। উপর-শিলং কৃষিক্ষেত্রে জঙ্গলী ঘাস ও ভুট্টার গাছ দিয়া সাইলোর পরীক্ষা কয়েক বৎসর ধরিয়া করা হইতেছে। বর্ষাকালে (ভাদ্রমাসে) সাইলোতে উপরোক্ত গবাদির খাদ্য সকল রাখা হয়, আর মাঘ ফাল্গুন মাসে যখন দুষ্প্রাপ্য হয়, তখন সাইলো খুলিয়া উহার ভিতর হইতে সঞ্চিত খাদ্য বাহির করিয়া কৃষিক্ষেত্রের গরু বাছুরকে খাওয়ান হয়। এই কৃষিক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত দেখিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের ২।৪ জন খাসিয়া কৃষক সাইলো নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে। তাহারা প্রতিবৎসর এই প্রণালী অনুসারে ক্ষেত্রজাত ভুট্টার গাছ ও জঙ্গল হইতে ঘাস সংগ্রহ করিয়া সাইলোতে পুঁতিয়া রাখে, ও ৩।৪ মাস পরে উহা উঠাইয়া ব্যবহার করে।

এইরূপ, যে যে স্থানে বৎসরের কোন এক সময় গবাদির প্রচুর খাদ্য জন্মে, অথচ অন্য সময় দুষ্প্রাপ্য হয়, সেরূপ স্থানে সাইলো প্রস্তুত করিয়া উহাতে গবাদির আহার সঞ্চিত করিয়া রাখিলে বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে।

সাইলো নানাপ্রকার আছে; তাহাদের মধ্যে যে দুই রকম সাইলো সাধারণ লোকে প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাদের কথা বলিতেছি। এক প্রকার সাইলো, শুধু মাটীতে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান অথবা গোলাকার একটি গর্ত্ত বই আর কিছুই নহে। গর্ত্তটী যত বড় ও যত গভীর হয় ততই ভাল। গর্ত্তটী উচ্চভূমিতে হওয়া চাই; দেখিবে যেন উহার তলা হইতে জল বাহির না হয়, অথবা চতুষ্পার্শ্ব হইতে

জল বাহিয়া উহার ভিতর না পড়ে। জল লাগিলে ঘাস পচিয়া যাইবে। দ্বিতীয় প্রকার সাইলো জমির উপর নির্ম্মিত হয়। ইহা গোল বা চতুষ্কোণ হইতে পারে। ইহার দেওয়াল তক্তা অথবা মাটী বা ইট দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়; দেওয়াল এরূপ হওয়া চাই যেন উহার ভিতর দিয়া বায়ু সাইলোর ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে, কারণ বায়ুর সংস্পর্শে কাঁচা ঘাস পচিয়া যায়।

সাইলোর উপর চাল দিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত, নতুবা বৃষ্টির জল ভিতরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘাস নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

ঘাসের ভিতর হইতে যতদূর পারা যায় বায়ু বাহির করিয়া দিয়া, যাহাতে পুনরায় বাহিরের বায়ু উহার সংস্পর্শে না আসিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে, ঘাস স্তরে স্তরে রাখিয়া পা দিয়া সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ ধার ও কোণা-গুলিতে, ভাল করিয়া চাপিয়া দিবে; ঘাস ভরা হইয়া গেলে, উহার উপর একফুট বা বেশী মাটী চাপাইয়া রাখিবে।

সাইলো মাত্রেই অল্পবিস্তর ঘাস পচিয়া যায়, কারণ হাজার চেষ্টা করিলেও কিছু না কিছু বায়ু উহার ভিতর থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ সাইলোর উপরিভাগ ও পার্শ্বের ও কখন কখন তলার কিছু কিছু ঘাস নষ্ট হয়। ভাল সাইলো হইলে ৩ ইঞ্চি বেশী ঘাস পচে না। বড় সাইলো অপেক্ষা ছোট সাইলোতে অনুপাতে অধিক পরিমাণ ঘাস পচিবার কথা, সেইজন্য সাইলো যত বড় হয় ততই ভাল। সাইলো ১০ ফুট×১০ ফুট×৮ ফুট হইতে ছোট হইলে ভাল হয় না। মাটীর নীচের সাইলো ৮ ফুটের বেশী গভীর করা সাধারণতঃ সম্ভবপর হয় না, কারণ, আমাদের দেশের মাটী এত ভিজা যে কয়েক ফুটের মধ্যেই জল বাহির হইয়া পড়ে। মাটীর উপরে নির্ম্মিত সাইলো যত ইচ্ছা গভীর করা যাইতে পারে। উপরিভাগ, পার্শ্ব ও তলার ঘাস অল্প বিস্তর নষ্ট হয়; সেইজন্য ভাল ঘাস ভিতরে রাখিয়া উপরে, পাশে ও তলায় নিকৃষ্ট জঙ্গলী ঘাস বা অন্য পাতা লতার একটী স্তর রাখিলে ভাল হয়।

ঘাস, ভুট্টাগাছ, জোয়ার, জই, ইত্যাদি নানারকম গবাদির আহার্য্য সাইলোতে রাখা যাইতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি মোটা ডাঁটা বিশিষ্ট দ্রব্য ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রাখা উচিত; না কাটিয়া রাখিলে উহারা সাইলোর ভিতর সুন্দররূপে চাপিয়া বসে না।

ফুল হইবার পর, অথচ বীজ নরম রহিয়াছে, পাকে নাই, এই অবস্থায় ঘাস, ভুট্টা, জোয়ার ইত্যাদি কাটিলে উহা গবাদির আহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়। এই সময় উহাতে পুষ্টিকর সামগ্রী বেশী পরিমাণ থাকে। ভুট্টা গাছ হইতে কাঁচা ভুট্টা উঠাইয়া লইয়া, পরে উহা সাইলোতে রাখা যাইতে পারে, কিন্তু যেখানে কাঁচা ভুট্টা উঠাইবার দরকার নাই, সেখানে বাধ্য হইয়া ভুট্টা না পাকা পর্য্যন্ত অপেক্ষা

করিতে হয়। আধ্-পাকা ভুট্টার ফল ও গাছ একত্রে কাটিয়া সাইলোতে রাখিলে, অতি উৎকৃষ্ট সাইলেজ প্রস্তুত হয়।

২।৩ দিন অন্তর অল্পে অল্পে ৩।৪ বার সাইলো ভরিতে পারিলে ভাল হয়। প্রত্যেকবার ভরিবার পর, পা দিয়া ঘাস চাপিয়া দিয়া, উহার উপর কয়েকখানি ভারি কাঠ রাখিয়া দিবে। ২।৩ দিনের মধ্যে ঘাস এত গরম হইয়া উঠিবে যে উহার ভিতর হাত রাখিতে পারা যাইবে না। তখন কাঠগুলি উঠাইয়া লইয়া, পুনরায় আর এক স্তর ঘাস রাখিয়া, পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত চাপা দিবে। এইরূপ ভাবে ৩।৪ স্তর রাখা শেষ হইয়া গেলে, আরও ২।৩ দিন অপেক্ষা করিয়া, পরে উহার উপর মাটী চাপা দিবে। এইরূপ ভাবে ঘাস রাখিলে, উহা ভাল করিয়া জাতিয়া বসিবে, ও বায়ু অতি কম পরিমাণেই উহার ভিতর থাকিতে পারিবে। বেশী বায়ু থাকিয়া গেলে অথবা যদি পরে বাহির হইতে বায়ু ঘাসের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে ঘাস অতিরিক্ত মাতিয়া (fermented) উঠে ও সাইলেজ টক্ হইয়া পড়ে। আর যদি ঘাস একবার খুব গরম হইয়া উঠে ও পরে উহা হইতে বায়ু যতদূর সম্ভব দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সাইলেজ মাতিতে পারে না, সুতরাং মিষ্ট হয়।

সাইলেজে বিশেষতঃ টক্ সাইলেজে, এরূপ একটী গন্ধ হয় যে উহা অনভ্যস্ত গরু বাছুরে প্রথমতঃ খাইতে চায় না। অল্পক্ষণ বাতাসে রাখিয়া দিলে গন্ধ অনেক পরিমাণে চলিয়া যায়। গবাদিকে প্রথম প্রথম সাইলেজ দিবার সময়, উহার উপর একটু লবণ ছড়াইয়া দিলে, উহারা সহজেই উহা খাইতে আরম্ভ করে। সাইলো হইতে ঘাস বাহির করিবার সময় স্তরে স্তরে বাহির করিবে। প্রত্যহ নূতন নূতন স্তর বাহির হওয়া চাই; দুই একদিন বায়ুর সংস্পর্শে থাকিলে উহাতে ছাতা পড়ে।

এক বিঘা জমি হইতে ১০০ মণ ভুট্টার গাছ ও ভুট্টা পাওয়া যাইতে পারে। ১০০ মণ গাছ ও ভুট্টা কাটিয়া সাইলোজাত করিতে ৭৫ মণ সাইলেজ পাওয়া যাইতে পারে। ঘরে বাঁধিয়া দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়াইতে হইলে ২০ হইতে ৩০ সের ঘাসের দরকার হয়। প্রত্যহ ২৫ সের হিসাবে ৭৫ মণ সাইলেজ দিয়া একটী গাভীকে ১২০ দিন বা ৪ মাস খাওয়ান যাইতে পারে। ভুট্টা সমেত গাছ খাওয়াইলে গাভীকে পৃথক অন্য কোন দানা (কলাই ইত্যাদি) দিবার দরকার হয় না কিছু খৈল দিলেই চলে।

এক ঘন-ফুট সাইলেজ ওজনে প্রায় ২০ সের। এই হারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গবাদির জন্য কত বড় সাইলো প্রস্তুত করা দরকার, তাহা হিসাব করিয়া ঠিক করা যাইতে পারে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ফাল্গুন মাস।

সব্জী বাগান।—তরমুজ, খরমুজ, শসা, ঝিঙ্গা, প্রভৃতি যে সকল দেশী সব্জী চাষ মাঘ মাসে প্রায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাপানটে বীজ এই সময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষি-ক্ষেত্র। ছোলা, মটর, যব, শরিষা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এত দিনে ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র সকল চষিয়া ভবিষ্যতে পাট, ধান প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই।

ফুলের বাগান।—এখন বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছ গুলির তদ্বির না করিলে জলদি ফুল ফুটিবে না। জলদি ফুল না ফুটিলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

এই সময় টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মূলজ ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ করিবার ইচ্ছা থাকিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই পাতায় এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে, এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

REGISTERED No. C [illegible]

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

ফাল্গুন, ১৩১৮।

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



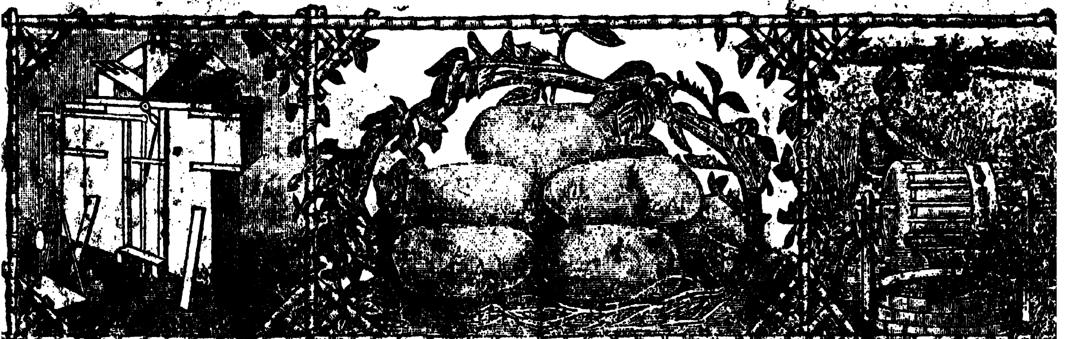
দ্বাদশ খণ্ড,—১১শ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

ফাল্গুন, ১৩১৮।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচীপত্র।

ফাল্গুন, ১৩১৮ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵৹ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ খণ্ড। } ফাল্গুন, ১৩১৮ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

সব্জী চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

টমাটো

(বিলাতী বাগুট বেগুন)

বপনের সময়—শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক

টমাটো বা বিলাতি বেগুনের বিষয় বলিয়া আমরা সব্জী বাগানে সোলেনেসী বর্গের চাষের বিবরণ শেষ করিব।

মৃত্তিকা—টমাটো ক্ষেতের হাল্কা অথবা শক্ত দোয়াঁস মাটি।

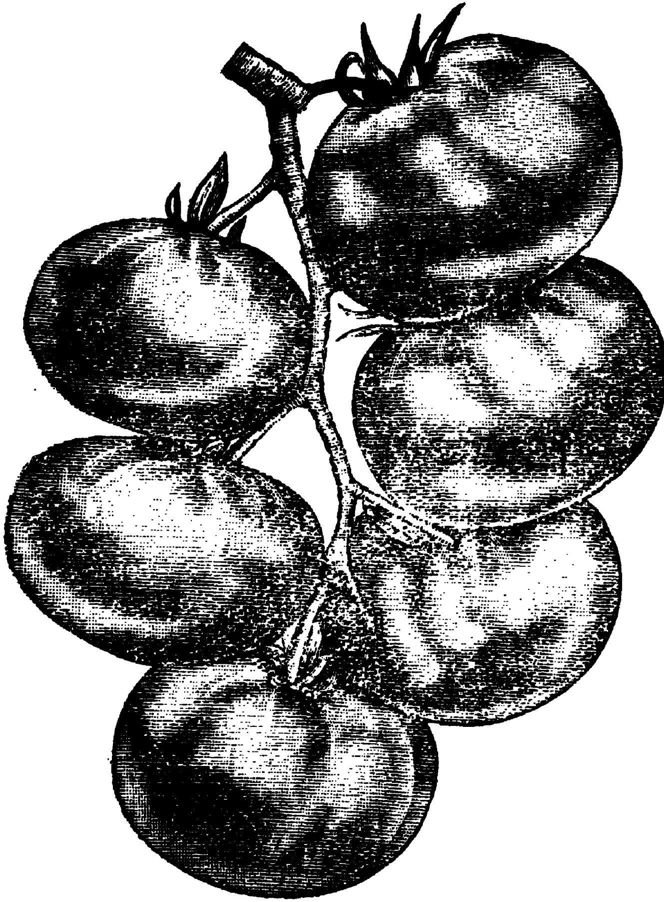
সার।—"ভেড়ার" সার—গোবর-সার অথবা মিশ্র-সার।

বপনাদি প্রণালী ও জলসেচন।—বর্ষা থাকিতে থাকিতে—বীজ বপন করিতে হইলে—টবে বীজ বপন করা উচিত অথবা হাপর অত্যন্ত উচ্চ করিয়া এবং বাঁধাকপির প্রবন্ধোল্লিখিত আবরণাদির ব্যবস্থা করিয়া—সেই হাপরে বীজ বপন করিতে হয়, ও যথানিয়মে চারা রক্ষা করিতে হয়। এতদ্বিষয়ে বাঁধাকপির প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। টমাটোর গাছ অল্লাধিক বড় হইলে—বৃষ্টির জল অনেকটা সহ্য করিতে পারে। এই কারণে বর্ষা শেষে অথবা বর্ষা থাকিতে থাকিতে ইহার চারা ক্ষেত্রে রোপণ করা যাইতে পারে।

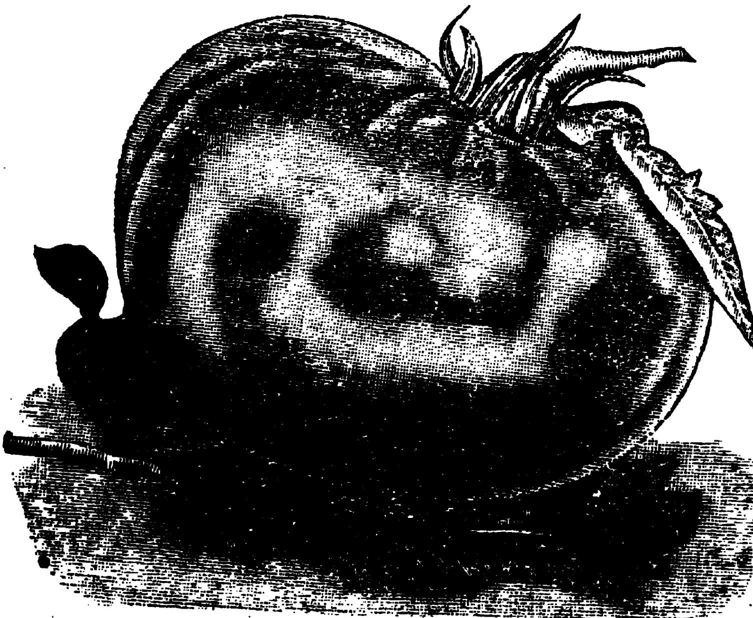
টবে বা হাপরে—চারা বহির্গত হইলে—প্রত্যেক চারা তিন অথবা চারি ইঞ্চি পৃথক করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা চারা দুর্ব্বল হইবে। চারা পৃথক করণের পর—ছয় বা আট ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে—ক্ষেত্রে রোপণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক চারা প্রত্যেক দিকে দেড় বা দুই হাত অন্তর রোপণ করা হইয়া থাকে। জলসেচনাদি কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা উচিত। গাছ বড় হইতে থাকিলে—এক একটী যষ্টি বা শাখা-প্রশাখা, গাছের অবলম্বন-স্বরূপ গাছের মূলকাণ্ডের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। টমাটো গাছে এত টমাটো ধরে যে, ফলভরে অবনত হইয়া পড়ে। যষ্টির বন্দোবস্ত অপেক্ষা ছোট ছোট "মাচা"র বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়।



গাছ টমাটো—সোজা বড় গাছ হয়। ফল ছোট হয়,
রাখিলে গাছ ২।৩ বৎসর থাকে।



ল্যাণ্ডেথের রেডরক টমাটো—নিরেট সুগোল গাত্র, লাল রঙ, ১১০ দিনে ফসল তৈয়ারি হয়। এমেরিকায় ইহার ফলন প্রতি বিঘায় ১৭০ মণেরও অধিক। এক একটি থলোতে চারি, পাঁচ বা ছয়টি পর্য্যন্ত ফল হয়।



টমাটো পণ্ডিরোসা—আকারে খুব বড়, দেখিতে সুন্দর।

অবশিষ্ট কার্য্য—ক্ষেত্রে আগাছা জন্মিলে—তাহা উত্তোলন ভিন্ন আর কিছু করিতে হয় না।

বীজের—পরিমাণ এক একরে ৩ আউন্স।

আরও অনেক প্রকার বিলাতী টমাটো এদেশে আমদানী হয়।

বিলাতী বীজ হইতে এদেশে একপ্রকার ছোট টমাটো জন্মিতেছে, আকারে বড় মার্ব্বেল অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বড়, পাত্র ততটা মসৃণ নহে। আর একপ্রকার বড় টমাটোও জন্মিতেছে। এদেশে এই টমাটোর বীজ জন্মিতেছে এবং উক্ত বীজ হইতে টমাটোর ফলন মন্দ হইতেছে না।

পিয়াঁজ

বপনের সময়—কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ



বিলাতী সাদা ও লাল পিয়াঁজ

উদ্ভিদশাস্ত্রে পিয়াঁজ, রসুন, লিক, আসপারেগাস লিলিয়াসি বর্গের অন্তর্গত সুতরাং ইহাদের চাষ প্রণালী প্রায় একই ধরণের।

মৃত্তিকা—বিশেষ সারযুক্ত হাল্কা দোয়াঁস মাটি। চাষের জমী ছায়াবিহীন স্থানে নির্ব্বাচন করা উচিত।

সার—পুরাতন গোবর সার, মিশ্র-সার অথবা অল্প পরিমাণে "ভেড়া"র সার ব্যবহার করা যাইতে পারে। ব্যবহার্য্য সারের সহিত অল্পাধিক পরিমাণে ছাই মিশ্রিত করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। ছাই মিশ্রিত করিয়া দিলে, কীটাদির উপদ্রব হইতে অনেকটা পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

বপনাদি প্রণালী—বীজ হইতে চারা হাপরে প্রস্তুত না করিলে চলে। চাষের জমী সারাদি মিশ্রণে যথোপযুক্ত প্রস্তুত হইলে—সুবিধামত "চৌকা" নির্ম্মাণ করিয়া—তাহাতে পাতলা করিয়া বীজ বপন করিতে হয়।

[যে সময় পিঁয়াজের বীজ বপন করা হইয়া থাকে—সে সময়ে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা থাকে না। সেই হেতু চারা তৈয়ারি করিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।]

বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইয়া—কিঞ্চিৎ দীর্ঘকার হইলে চৌকায় প্রত্যেকটী প্রত্যেক হইতে চারি বা পাঁচ ইঞ্চি পৃথক করিয়া বসাইয়া দিবে। চাষের জমিতে রোপণ কালে চারার মধ্যে ১৫ ইঞ্চি×৯ ইঞ্চি ব্যবধান থাকা চাই। চাষের জমিস্থিত সমস্ত চারা পৃথক করিয়া রোপণান্তর—চারা অবশিষ্ট থাকিলে—সেগুলি অন্য স্থানে অন্য চাষের জমিতে রোপণ করিয়া দিলে চলিতে পারে।

অবশিষ্ট কার্য্য ও জলসেচনাদি—প্রথমাবধি আবশ্যকমত জলসিঞ্চন করিতে হয় এবং আগাছা জন্মিলে—তাহা তুলিয়া দিতে হইবে। ক্ষেত্রে আগাছা থাকিলে পিঁয়াজের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

বিশেষ কার্য্য—পিঁয়াজের গাছ কোন কারণে হরিদ্রা বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া—শ্রীহীন হইলে—ছাই চূর্ণ করিয়া—জল দিবার পরে গাছে সার প্রয়োগ করা উচিত।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই সমস্ত গাছ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইবে এবং বিশেষ আবশ্যক না হইলে—এ সময়ে জলসেচন প্রায়ই করিতে হয় না। গাছ সকল মরিয়া যাইলে ক্ষেত্র হইতে পিঁয়াজ তুলিয়া রৌদ্রে রস মারিয়া ভাণ্ডার-জাত করিতে হয়।

বিশেষ কথা—বিলাতী পিঁয়াজের বীজের জীবনী অর্থাৎ অঙ্কুরিত হইবার শক্তি শীঘ্র অন্তর্হিত হইয়া যায়। বিশেষ সাবধানতা ও যত্নপূর্ব্বক উক্ত বীজ রাখিতে ও বপন করিতে হয়, কিন্তু দেশী উৎকৃষ্ট পাটনাই পিঁয়াজের বীজ হইতে চারা সহজেই জন্মিয়া থাকে। ফসলও বিলাতী পিঁয়াজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় না। এরূপস্থলে দেশী বীজই ব্যবহার করা প্রার্থনীয়। পাটনাই পিঁয়াজ সাদা ও লাল উভয় প্রকারের আছে, পাটনাই পিঁয়াজ বিলাতির মত এমন কি বিলাতী অপেক্ষা বড় হয়। পাটনাই পিঁয়াজ অপেক্ষা বিলাতী পিঁয়াজ খাইতে সুস্বাদু। দেশী পিঁয়াজ আকারে খুব ছোট, ফলনে পাটনাই অপেক্ষা কম কিন্তু খাইতে সুস্বাদু। এই কারণে বাজারে পাটনাই পিঁয়াজের দর যখন এক আনা সের, দেশী পিঁয়াজ তখন ছয় পয়সা সের বিক্রয় হয়।

বীজের পরিমাণ—প্রতি একরে ৬ হইতে ৮ আউন্স বীজের আবশ্যক হয়। কোয়া পিঁয়াজ বসাইলে এক একর জমির জন্য ১ মণ হইতে ১৷৷০ মণ পিঁয়াজের আবশ্যক হয়। মাটির গুণে ও পিঁয়াজের জাতি হিসাবে প্রতি একরে ১২০ হইতে ১৪০ মণ পিঁয়াজ উৎপন্ন হয়।

রস্থন (GARLIC)

পলাণ্ডু ও রসুনের আবাদ প্রণালী একই প্রকার। ইহার চাষের জন্য মাটি উচ্চ ও হাল্কা হওয়া আবশ্যক। আবাদের সময় আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে। বর্ষা শেষ হইয়া গেলে জমীতে রসুন বসাইতে হয়। ৮ ইঞ্চি অন্তর পাটী করিয়া তন্মধ্যে ৬ ইঞ্চি ব্যবধানে এক একটী রসুনের কোয়া মাটীতে পুতিয়া দিবে। কোয়াগুলিতে অধিক মাটি চাপা না পড়ে, উপরি ভাগ মৃত্তিকার উপরে কিঞ্চিন্মাত্র ভাসিয়া থাকিলে ভাল হয়। যতদিন অঙ্কুরিত না হয় ততদিন উহাতে জল সেচনের কোন আবশ্যক নাই। অঙ্কুরিত হইয়া পাতা বাহির হইলে, মাটীতে রসের অবস্থা বুঝিয়া সপ্তাহে একবার বা দুইবার জল সেচন করিতে হইবে। সর্ব্বদা গোড়ার মাটী নীড়ানি দ্বারা আল্গা রাখা আবশ্যক। ফাল্গুন মাসে গাছ শুখাইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে সমুদায় গাছ শুখাইয়া গেলে যত্ন সহকারে উঠাইয়া দুই তিন দিন রৌদ্র লাগাইয়া পেয়াঁজের ন্যায় গোলাজাত করিয়া রাখিয়া পরে আবশ্যক মত বিক্রয় করিতে হইবে।

বীজের পরিমাণ—বীজ বপন করিলে বিঘাতে ৭ কিম্বা ৮ তোলা বীজের আবশ্যক। কোয়া বসাইলে ১০ কিম্বা ১২ সের কোয়ায় এক বিঘা জমির চাষ হয়। উৎপন্ন রসুনের পরিমাণ বিঘাপ্রতি ৫০ হইতে ৯০।

বিঘা প্রতি ৫০ মণ গোবর সার পর্য্যাপ্ত।

গদিনা

গদিনার মূলের ও পাতার গন্ধ রসুনের ন্যায়। মূল হইতে ইহার গাছ জন্মে। মূল তরকারিতে ব্যবহৃত হয়। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে ইহার মূল জমিতে লাগাইতে হয় কিন্তু শীত প্রদেশে ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস অবধি মূল পুতিবার সময়। আবাদ প্রণালী পিয়াঁজ বা রসুনের মত। পৌষ মাসে ইহার মূল বা কালি খাইবার উপযুক্ত হইতে পারে।

লীক্

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক

মৃত্তিকা—সারযুক্ত হাল্কা দোয়াঁস মাটি।

সার—গোবর সার অথবা মিশ্র সার।

বপনাদি প্রণালী—হাপরে চারা প্রস্তুত করিয়া পরে চাষের জমীতে বসাইতে হয়। হাপরের মাটি ধূলির ন্যায় ঢেলাবিহীন ও বিশেষরূপ সার মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। হাপরে কোন সময়ে জলাভাব না হয়—সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাপরে চারা ঘন হইয়া বাহির হইলে হাপরেই পাতলা করিয়া পৃথক পৃথক বসাইয়া দিলে ভাল হয়। চারা পাঁচ বা ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে হাপর হইতে তুলিয়া চাষের জমীতে রোপণ করিতে হয়। চাষের জমী নিম্নলিখিত মত তৈয়ারী করিতে হইবে,—

ছয় ইঞ্চি গভীর চারি বা পাঁচ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং সুবিধা মত দীর্ঘ নালা বা গর্ত্ত কাটিতে হইবে। সারি দিয়া পাশাপাশি নালা করিতে হইবে। প্রত্যেক নালা পার্শ্ববর্ত্তী নালা হইতে বার ইঞ্চি পৃথক থাকিবে। গর্ত্তস্থিত মাটির সহিত উত্তমরূপে সার মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। এতদর্থে গোবর সার, অথবা মিশ্র-সার সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়। অত্যল্প পরিমাণে "ভেড়া"র সার প্রয়োগ করা বিধেয়।

হাপর হইতে চারা তুলিয়া প্রত্যেক চারা গর্ত্তের ঠিক মধ্যস্থলে লাইনবন্দী করিয়া পাঁচ বা ছয় ইঞ্চি পৃথক রোপণ করিতে হয়। চারা সকল পুতিয়া ছয় ইঞ্চি গভীর নালার তিন ইঞ্চি মাটি চাপা দিতে হয়। গাছ বড় হইলে মাসাধিক পরে গাছের মূলদেশে পুনরায় মাটি টানিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এইরূপে তিনবারে নয় ইঞ্চি নালা পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়। জমী "যো-যুক্ত" থাকিতে থাকিতে মাটি টানিয়া দিতে হয়।

অবশিষ্ট কার্য্যাদি—নূতনত্ব কিছুই নাই।

বিশেষ কথা—লীক্ পলাণ্ডুজাতীয় এক প্রকার বিলাতী সব্জী বিশেষ। ইহার শাঁসযুক্ত ডাঁটা, পিয়াঁজের ন্যায় আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকে "বিলাতী পিয়াঁজ" বলা যাইতে পারে।

বীজের পরিমাণ—এক একরে ২ আউন্স।

আস্‌পারেগাস্‌

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ

মৃত্তিকা—সারযুক্ত দোয়াঁস হাল্কা মাটি। শক্ত মৃত্তিকায় ভালরূপ জন্মে না।

সার—বিশেষ তেজঃপূর্ণ অথচ পুরাতন সারের আবশ্যক। বেশী পরিমাণে

গোবর সার, ঘোড়ার সার ও আবর্জ্জনাদির সার এই তিন প্রকার সার সমান অংশে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। চাষের জমি চারা বসাইবার মাসাধিক পূর্ব্বে সার-সংযোগে উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়।

বপনাদি প্রণালী ও জলসিঞ্চন—অল্লোচ্চ "হাপরে" বীজ ছড়াইয়া অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ চূর্ণ মাটি চাপা দিতে হয়, এবং আবশ্যক মত জল দিবার ব্যবস্থা করা বিধেয়। চারা জন্মিয়া সাত কিম্বা আট ইঞ্চি বড় হইলে চাষের জমিতে পনর ইঞ্চি পৃথক সারি দিয়া প্রত্যেক চারাটী সেই সারিতে বা লাইনে বার ইঞ্চি অন্তর বসাইয়া জলসিঞ্চন করিলেই চলিবে। চারা "হাপর" হইতে উঠাইবার সময় চারার শিকড় যেন কোনরূপে নষ্ট না হয় অর্থাৎ যাহাতে সম্পূর্ণ থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বিশেষ কথা ও অবশিষ্ট কার্য্য—কচি কচি শাখা প্রশাখার জন্য আস্‌পারেগাসের চাষ করা হয়। দুই বৎসর অতীত না হইলে ইহার শাখা ব্যবহার করা উচিত নয়। তৃতীয় বৎসরে অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আস্‌পারেগাস্ গাছ অনেক বৎসর স্থায়ী। একবার গাছ প্রস্তুত করিতে পারিলে, অনেক বৎসর ব্যাপিয়া ফল ভোগ করিতে পারা যায়। দুই বৎসর অতীত হইয়া যাইলে ইহার চাষে বিশেষ মনোযোগী হইতে হয় না।

বৎসরে একবার করিয়া সারের সহিত সামান্য পরিমাণে লবণ মিশ্রিত করিয়া জল মিশ্রণে তরল করিয়া সেই তরল সার প্রয়োগ করা উচিত। পৌষমাসে এইরূপ সার প্রয়োগ করিতে হয়। আগাছা জন্মিলে যে তাহা উত্তোলন করিয়া দিতে হইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

ইহার একজাতি যাহাকে আমরা শতমূলী বলি। ইহার লতানিয়া গাছ হয়, লতার গায়ে কাঁটা থাকে, লতার আঁকড়াগুলি ধারাল কাঁটার মত। ইহার শাখা, প্রশাখা বা ডগা কেহ খায় না। ইহার মূল কবিরাজী ঔষধে ব্যবহারে লাগে। ইহার মূলের চাট্‌নি ও মোরব্বা অতি উপাদেয়। মাটির নীচে এক গুচ্ছে শতাধিক মূল থাকে সেই জন্য ইহার নাম শতমূলী।

বীজের পরিমাণ—প্রতি একরের জন্য ২ আউন্স বীজের আবশ্যক।

দ্রাক্ষালতার চাষ (VINE CULTIVATION)

শ্রীগণপতি রায় লিখিত

দ্রাক্ষালতা অনেক প্রকারের আছে। ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলে দ্রাক্ষালতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারও কালো কালো ফল হয় কিন্তু তাহা মানুষে খায় না। এই দ্রাক্ষালতার শিকড়ে ঔষধ হয়। আর এক প্রকার দ্রাক্ষালতা হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পশ্চিম গাত্রে হইতে দেখা যায়। ইহার পাতাগুলি ছোট ছোট, থলো থলো কাল রঙের আঙ্গুর ফলে। কাশ্মির হইতে নেপাল পর্য্যন্ত এমন কি পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন স্থানে খুব জন্মায়। আর একপ্রকার কাবুলী আঙ্গুর যাহা বাক্সে করিয়া বাজারে বিক্রয় হয় তাহাও হিমালয় গাত্রে জন্মে। এমেরিকান আঙ্গুরের সহিত ইহার খুব সাদৃশ্য আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এমেরিকান আঙ্গুরের সহিত শঙ্কর ভাবে এই আঙ্গুরের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহাই হউক এই বিষয় লইয়া মিমাংসার এখানে আমাদের আবশ্যকতা নাই। আমরা জানি বহুযুগ ধরিয়া শুষ্ক আঙ্গুর বা আঙ্গুরের রস হিন্দুরা ঔষধার্থে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ইহা খাইলে কোষ্ঠসাফ হয়, শরীর ঠাণ্ডা হয়, কফ্ দমন হয়, শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তৃষ্ণা নিবারণ হয়, এমন কি স্বরভঙ্গ নিবারণ হয় এবং কাশ দমন হয়। টাক্‌কা পাকা আঙ্গুর যে খাইতে সুমিষ্ট এবং ইহা সর্ব্বদেশে যে সর্ব্ব সময়ে আদৃত তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শীত প্রধান স্থান না হইলে আঙ্গুর জন্মায় না কিন্তু সাধারণের আঙ্গুর খাইবার ইচ্ছা এত বলবতী যে লোকে বিসদৃশ অবস্থাতেও আঙ্গুর চাষ করিবার জন্য কাঁচের ঘর নির্ম্মান করিতে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। আমরা কিস্‌মিস্, মনাক্কা ব্যবহার করিয়া থাকি। অনেকে হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে কিস্‌মিস্ ও মনাক্কা আঙ্গুরেরই জাতি বিশেষ—ইহারা আঙ্গুরের শুষ্ক অবস্থামাত্র। বহু টাকার কিস্‌মিস্ মনাক্কা সহর বাজারে বিক্রিত হইয়া থাকে। আঙ্গুর হইতে যে মদ তৈয়ারি হয় তাহার আদর যথেষ্ট। আঙ্গুরের হিন্দি নাম আরক হইতে মদের নাম আরক হইয়াছে এবং ইংরাজীতে আঙ্গুর অর্থাৎ ভাইন হইতে মদের নাম ওয়াইন হইয়াছে।

শীতপ্রধান দেশে বাগান মাত্রেই আঙ্গুরের চাষ আছে। পারস্যদেশেও আঙ্গুরের চাষ হয়। হিরাটের আঙ্গুর খুব উৎকৃষ্ট। তথায় মাচার উপর আঙ্গুর লতাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হয়। ইউরোপে এক্ষণে নানাজাতীয় আঙ্গুরের চাষ হইতেছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন পঞ্জাবের মাটিতে আঙ্গুর ভাল রকম ফলিতে পারে। পঞ্জাবে অনেক রকম আঙ্গুরের চাষও হয়. কিন্তু পঞ্জাবে আঙ্গুর চাষের একটি ব্যাঘাত এই যে এখানে

গাছ খুব বড় হইয়া উঠে, লতা পাতা খুব অধিক হয় সুতরাং ফল ভাগ্য পঞ্জাবের মত মাটিতে তত ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু একটু যত্ন করিয়া চাষ করিলে বা একটু কমতেজী পাথুরে জায়গায় আঙ্গুরের আবাদ করিলে ফলের ব্যাঘাত ঘটে না। কাশ্মিরে, কাবুলে আঙ্গুর চাষের প্রসার খুব। কথিত আছে স্বয়ং বাদসাহ আকবর আঙ্গুর চাষের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেন এবং তিনি আঙ্গুরকে ভগবান দত্ত ফলের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট ফল বলিয়া মনে করিতেন। তিনি কাশ্মিরী আঙ্গুর ব্যতীত অন্যত্র হইতে ভাল জাতীয় আঙ্গুর আনাইয়া কাশ্মিরে চাষ করাইয়া ছিলেন এবং তাঁহারই যত্নে লাহোর, দিল্লি, আগ্রা, এলেহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভাল জাতীয় আঙ্গুরের চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙলাদেশে অত্যন্ত বৃষ্টি হয় বলিয়া এখানে আঙ্গুর চাষের তাদৃশ সুবিধা হওয়া সম্ভব নহে। রসা জমিতে লতা পাতা খুব বাড়িতে পারে কিন্তু ফল ভাল হইবে না। বিহারের অনেক জায়গায় আবহাওয়া উত্তর সীমান্ত প্রদেশের মত সুতরাং এই সকল স্থানে আঙ্গুর জন্মিতে পারে। দানাপুর এবং ত্রিহুতে অনেক সময় বেশ ভাল আঙ্গুরই জন্মায়। আসামে যে যে স্থানে বারিপাত কম তথায় আঙ্গুর চাষের সুবিধা হইতে পারে। শিলঙে আঙ্গুর চাষের সুবিধা হইতেছে। জল নিকাশের সুব্যবস্থা করিয়া আসামের নিম্ন ভূমিভাগে আঙ্গুর চাষের চেষ্টা হইতেছে।

আমরা কলিকাতার বাজারে যে সকল আঙ্গুর বিক্রিত হইতে দেখি তাহার অধিকাংশই কাবুল হইতে আসে। আজ কাল কাশ্মির হইতে আমদানী কিস্‌মিস্ ও আঙ্গুর নিতান্ত কম নহে। কিন্তু অধিকাংশ কিস্‌মিস্ ও মনাক্কা আদি যাহা ভারতের বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে তাহা প্রধানতঃ কাবুল এবং পারস্য দেশ হইতে আমদানী হয়। থলো আঙ্গুর ভারতের বাজারে চারি হইতে ছয় আনা সের দরে, বাক্সের আঙ্গুর চারি পাঁচ আনা প্রতি বাক্স বিক্রয় হয়। এক বাক্সে এক শতের অধিক আঙ্গুর থাকে না। কিস্‌মিসের দর ৮॥০ টাকা হইতে ১০৲ টাকা মণ, মনাক্কার দর আরও অধিক।

আমাদের বাঙলাদেশ সর্ব্বত্র তাদৃশ শীত প্রধান নহে বলিয়া দ্রাক্ষালতা জন্মে না। যাহা হউক দেশের যে সকল স্থান শীত বহুল বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট করা যায় তথায় নিম্ন লিখিত উপায়ে দ্রাক্ষালতার চাষ করিলে সুফল ফলিতে পারে। দারজিলিঙ্গ, আসাম প্রভৃতি স্থানে দ্রাক্ষাচাষের চেষ্টা করিলে বোধ হয় অন্যায় না। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে দ্রাক্ষা চাষ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

ভূমিনির্দ্দেশ—দ্রাক্ষালতা চাষের জমি নির্দ্দেশ করিতে হইলে বালি ও সারমাটি সমপরিমাণ হওয়া চাই। সারমাটিকে ইংরাজীতে loam বলে। উহাতে কর্দ্দম ও বালি মিশ্রিত থাকে। সুতরাং উক্ত সারমাটির সঙ্গে বালির ভাগ কম থাকিলে তাহার সঙ্গেই বালি মিশাইতে সম পরিমাণ হয় তাহাই করিতে হইবে।

সার—অপরাপর বৃক্ষাদির আবাদ অপেক্ষা দ্রাক্ষালতার চাষ অধিক পরিশ্রম সাপেক্ষ। সাধারণতঃ প্রতি ৪ হাজার ৮ শত ৪০ বর্গ গজ ভূমিতে ৬/ ছয় মণ সার দিলেই উত্তম দ্রাক্ষা জন্মিতে পারে। উহার জমি তিনবার জলে সিক্ত করিয়া তবে দ্রাক্ষাচাষ আরম্ভ করিতে হয়।

রোপণ—প্রতি ৪ হাজার ৮ শত ৪০ বর্গ গজ ভূমিতে ৩ শত ৭০টি দ্রাক্ষালতার কটিং রোপণ করিতে হয়। চতুর্থ বর্ষ হইতে দ্রাক্ষা ফলিতে থাকে। অষ্টম বর্ষ হইতে পঞ্চবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত দ্রাক্ষা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

শীতপ্রধান দেশে লতার ডগাগুলি গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া মাটি চাপা দেওয়া হয় এবং বসন্তকাল আসিলে ঐ মাটিগুলি তথা হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। তখন উহা মাটির উপর বাঁশ বা কাষ্ঠ দণ্ডের সাহায্যে লম্বাভাবে বাড়িতে থাকে। কেহ কেহ বাঁশের কেয়ারী করিয়া দেয় এবং দ্রাক্ষা তাহার উপর বাড়িতে থাকে।

দ্রাক্ষা সংগ্রহ—অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে দ্রাক্ষা ফল পক হইতে আরম্ভ হয়। দ্রাক্ষা বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কোথায় কোথায় প্রতি ৪ হাজার ৮ শত ৪০ বর্গ গজে ৭০২ মণ দ্রাক্ষা জন্মিতে দেখা গিয়াছে।

কিস্‌মিস্—উক্ত দ্রাক্ষাফল শুষ্ক করিয়া কিস্‌মিসের আকারে পরিণত করা হয়। কেহ কেহ রৌদ্রে না দিয়া শীঘ্র শীঘ্র উক্ত ফল শুষ্ক করিবার জন্য সিদ্ধ করিয়া কিস্‌মিস্ প্রস্তুত করে। তাহা অপেক্ষা রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই উত্তম কিস্‌মিস্ প্রস্তুত হইল। উক্ত ফল সিদ্ধ করিলে মিষ্ট [illegible] কমিয়া যায়। সেই জন্য ঐরূপ করা অন্যায়। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে দ্রাক্ষাফল হইতে কিস্‌মিস্ প্রস্তুত হয়। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য দ্রাক্ষালতার চাষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। আমাদের দেশে যে কিস্‌মিস্ আসিয়া থাকে তাহা দ্রাক্ষার শুষ্ক ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দৈনিক রসদ

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের বিশেষজ্ঞ ও কৃষি-পরিদর্শক

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত

খাদ্যের পরিমাণ, ভোক্তার বয়স, স্বাস্থ্য ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। একজন পূর্ণ বয়স্ক পরিশ্রমী ব্যক্তির (যাহার শরীরের ওজন এক মণ ত্রিশ সের) নিমিত্ত সাধারণতঃ নিম্ন লিখিত পরিমাণে দৈনিক বিভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

শ্বেত সার ও শর্করা	...	...	৪০ তোলা
ঘৃত ও তৈল	...	...	৮ তোলা
প্রোটিড্	...	...	১০ তোলা

এই সকল উপাদান এইরূপে মিশ্রিত ভাবে গ্রহণ করা আবশ্যক যাহাতে ইহারা সহজে পরিপাক হয়। এক শত ভাগে নিম্ন লিখিত পরিমাণে বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত হওয়া উচিত :—

শ্বেত সার ও শর্করা	...	...	১০·৬
ঘৃত, তৈল ও চর্ব্বি	...	...	৩·০
প্রোটিড্	...	...	৩·৯
সাধারণ লবণ	...	...	০·৭
ফস্ফেট, পটাস প্রভৃতি	...	...	০·৩
জল	...	...	৮১·৫
মোট			১০০

বাঙ্গালীদিগের খাদ্যে প্রোটিডের পরিমাণ সাধরণতঃ কম, সুতরাং তাহারা শারীরিক দুর্ব্বল। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালি দেহের দীর্ঘতায় ও প্রসারতায় ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে।

বাঙ্গালীগণ সাধারণতঃ নিম্ন লিখিত পরিমাণে খাদ্য দৈনিক গ্রহণ করিয়া থাকে।

খাদ্য	পূর্ণ মাত্রা	প্রোটিডের পরিমাণ
চাউল	৪০ তোলা	২¼ তোলা
ডাইল	৭ „	১¼ „
তরকারী	১৫ „	¾ „
মৎস্য	১০ „	১ „
তৈল	২ „	
	৭৭ „	৫¼ „

উক্ত তালিকা পাঠে প্রতীয়মান হইবে যে বাঙ্গালির খাদ্যে প্রোটিডের ভাগ উপর্য্যুক্ত পরিমাণের একার্দ্ধের কিঞ্চিদধিক। ইহার পরিমাণ পূরণ করিতে হইলে দৈনিক এক পোয়া ডাইল আহার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে অর্দ্ধ পোয়া ডাইল জীর্ণ করাই অসম্ভব।

বাঙ্গালীগণ সাধারণতঃ দৈনিক অর্দ্ধ সের চাউল গ্রহণ করে। চাউল অপেক্ষা গমের ময়দা দেড়গুণ বলকারক খাদ্য। সহ্য হইলে, রাত্রিকালে ভাতের বদলে রুটী আহার করা বিধেয়। ময়দা অল্প জলে মাখিয়া ছোট ছোট তাল করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া লইয়া উহার দ্বারা রুটী প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে, ইহা সুপাচ্য হয়। ইদানীং মৎস্য ও দুগ্ধের যেরূপ অভাব তাহাতে পরিমিত রসদ সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন। অবস্থায় কুলাইলে প্রত্যহ এক বেলা মাংস গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালীগণ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, কিন্তু উপযুক্ত আহারের অভাবে তাহারা অচিরাৎ বলহীন হইয়া অকালে কালের হস্তে পতিত হয়। মাছ মাংস ভক্ষণ ব্যয়সাধ্য, ইহা সাধারণের পক্ষে ব্যবস্থা করা যায় না। সাধারণ লোকে দৈনিক পাঁচ পোয়া চাউলের অন্ন ও অর্দ্ধ পোয়া সুসিদ্ধ ডাল ভক্ষণ না করিলে চলিবে না। খাস বঙ্গদেশে কদাচিৎ গম উৎপন্ন হয়, সুতরাং ময়দা সাধারণের পক্ষে দৈনিক খাদ্যরূপে প্রবর্ত্তন করা যায় না। যাহাদের চলে, তাহাদের দৈনিক অর্দ্ধ সের মাছ মাংস গ্রহণ কর্ত্তব্য। মাছ অপেক্ষা মাংস অধিক পরিমাণে পরিপাক করা যায়, কিন্তু অধিক মসলা দ্বারা রন্ধন করিলে মাংসও দুষ্পাচ্য হয়। অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম্ব সহজে জীর্ণ হয়। মাছে জেলেটিন্ অধিক থাকায়, ইহা মাংসের মত সুপাচ্য নহে। মাছ, মাংস ভক্ষণে বুদ্ধি শক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি হয়। মাংসাশী জীবজন্তু অতিশয় সুচতুর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইহারা অতি দ্রুততার সহিত স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। নিরামিষ ভোজী জন্তুর এসব গুণ নাই। ইহারা স্বভাবতঃ ভীরু এবং সাধারণতঃ অলস। গঠন ও প্রকৃতি তত্বানুন্ধান করিলে আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ খাদ্যই মনুষ্যের প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুমান করা যায়। সুতরাং দেহ রক্ষা কিংবা দেহের উন্নতি বিধানার্থে বিভিন্ন রুচির ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মাছ ও মাংস ভক্ষণ কখনও নিন্দনীয় হইতে পারে না। আমরা বিভিন্ন অবস্থার ও বিভিন্ন রুচির ব্যক্তির নিমিত্ত নিম্ন লিখিত দৈনিক রসদ ব্যবস্থা করিতেছি। ইহা উল্লেখ করা উচিত যে সকলের পক্ষে একরূপ খাদ্য ব্যবস্থা করা যায় না। ভাত অতিশয় লঘুপাচ্য খাদ্য, কিন্তু ইহাও কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী হয় না, কিন্তু সেই ব্যক্তি সহজে গুরুপাচ্য রুটী পরিপাক করিতে পারে। দুগ্ধের ন্যায় লঘুপথ্যও কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে। অপ্রবৃত্তির সহিত সুখাদ্য গ্রহণ করিলেও ইহা বিষতুল্য হইতে পারে। আবার অভ্যাসে, অরুচিকর খাদ্যও রুচিকর হইয়া থাকে।

মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দৈনিক রসদ :—

খাদ্যবস্তুর নাম	পরিমাণ	প্রোটিডের পরিমাণ
চাউল	২০ তোলা	১½ তোলা
ময়দা	২০ „	২ „
মৎস্য	২০ „	২ „
মাংস	২০ „	৩ „
ডিম্ব (২টা)	১০ „	১ „
ডাইল	৫ „	½ „
দুগ্ধ	২০ „	½ „
তরকারী ও ফল	২০ „	½ „
ঘৃত ও তৈল	৫ „	
শর্করা	১০ „	
	১৫০ „	১১

যাঁহার রুটী সহ্য হয় না, তাঁহার দুই বেলায় তিন পোয়া চাউলের অন্ন গ্রহণ করা উচিত, এবং যিনি মাংস আহার করেন না, তাঁহার মৎস্য, ডিম্ব ও দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। যিনি নিরামিষ আহার করেন, তাঁহার পক্ষে রুটী ও ছানার ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। সম্ভব হইলে, দুই বেলার পরিবর্ত্তে তিন বা চারি বেলা আহারের ব্যবস্থা করা উচিত। বাসী পাঁউরুটী অতি লঘু পথ্য; কিন্তু ইহা খুব পরিষ্কৃত রূপে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশীয় সাধারণ লোকের জন্য নিম্ন লিখিত দৈনিক রসদ ব্যবস্থা করা যাইতেছে :—

খাদ্যবস্তুর নাম	পরিমাণ	প্রোটিডের পরিমাণ
চাউল	১০০ তোলা	৭ তোলা
ডাইল	১০ „	২ „
তরকারী	২০ „	½ „
তৈল, ঘৃত, শর্করা		

বঙ্গদেশীয় সাধারণ লোক ক্রয় করিয়া মাছ, মাংস কিম্বা দুগ্ধ গ্রহণ করিতে অক্ষম। যে স্থানে মৎস্য প্রচুর তথায় তাহারা নিজেরাই মৎস্য ধরিয়া লয়। মৎস্য দুষ্প্রাপ্য হইলে, পাঁচ পোয়া চাউলের ভাত না খাইলে চলিবে কেন? দুইবারে পাঁচ পোয়া চাউলের ভাত গ্রহণ করিতে না পারিলে তিন বারে ইহা গ্রহণ করিতে হইবে। এতদ্দেশীয় কৃষকগণ তিন বেলা আহার করে। কিন্তু ইহা বক্তব্য

যে, খাদ্যে প্রোটিড ও প্রোটিডহীন পদার্থের অনুপাত অনুসারে, মনুষ্য ও অন্য জন্তর শক্তি বা স্বাস্থ্য নির্ভর করে। মনুষ্যের একমাত্র চাউল উপযুক্ত খাদ্য হইতে পারে না।

চাউলের সহিত অধিক সারবান খাদ্য গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ময়দার সহিত অন্য কোন খাদ্য যোগ না করিলেও চলিতে পারে। এই জন্য ভেত বাঙ্গালী অপেক্ষা হিন্দুস্থানী লোক অধিক বলবান। বঙ্গদেশীয় অনেক লোকের নিকট রুটী ও ডাইল আশ্চর্য্য সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং অভাবে একমাত্র চাউলের দ্বারাই প্রোটিডের মাত্রা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। পরিমিত চাউলও না জুটিলে আর উপায়ান্তর নাই।

সহ্য হইলে লুচী বিলক্ষণ বলকারক। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে লুচীও ব্যবস্থা করা যায়। বলা বাহুল্য যে, লুচী অতিশয় গুরুপাচ্য। লুচী শীতল হইলে অতিশয় গুরুপাচ্য হইয়া থাকে।

তরকারীর মধ্যে আলু, পটল, কড়াইশুঁটী, সিম, বরবটী, ফুলকপী, ঝিঙ্গা, বেগুন, সুপাচ্য; কিন্তু মূলা, পেঁয়াজ, বিট, শশা, মিঠাকুমড়া, বান্ধাকপি প্রভৃতি দুষ্পাচ্য। তীব্র গন্ধযুক্ত কিম্বা তীব্র স্বাদযুক্ত পদার্থ স্বভাবতঃ দুষ্পাচ্য ও অস্বাস্থ্যকর। লঙ্কা, সরিষা, গোলমরিচ, ধনিয়া প্রভৃতি মসলা এবং ঔষধে ব্যবহার্য্য সজ্জী অধিক পরিমাণে ব্যবহার নিষিদ্ধ। অপক্ক ফলগ্রহণ করা অনুচিত। নারিকেল, বাদাম, ফুটি, খিরাই, তরমুজ প্রভৃতি ফল অতিশয় দুষ্পাচ্য। পক্ক পেয়ারা ও কুল রন্ধন করিয়া অম্ল রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কামরাঙ্গা ও নোড়ফল, অপক্ক তেঁতুল, গ্রহণ কখনও ব্যবস্থা হইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ পুরাতন তেঁতুলের অম্ল অনেক রোগে ব্যবস্থা করেন। গাঢ় চা কিম্বা কাফি কখনও গ্রহণ করা উচিত নয়।

লোণা বা শুষ্ক মৎস্য ও মাংস, চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, হাঁস, খরগস, বরাহ মাংস, সুসিদ্ধ ডিম্ব প্রভৃতি খাদ্য অতিশয় গুরুপাচ্য।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

১৯১০ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের সমলকোট বিবরণীতে "বৃক্ষ রোপণ পদ্ধতি" সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইয়াছে তাহা দেশের প্রত্যেক কৃষকের স্মরণ রাখা উচিত। বৃক্ষগণের মধ্যে উপযুক্ত দূরত্ব থাকা আবশ্যক। যেখানে বৃক্ষ সকল ঘন সন্নিবিষ্ট রূপে রোপিত হয় সেখানে বৃক্ষ সকল আশানুরূপ তেজস্বী ও হরিদ্বর্ণ হয় না; এবং তাহারা উপযুক্ত পরিমাণে ফল প্রসব করে না এবং ফলও সুমিষ্ট হয় না; পরিমাণেও কম হয় ও সম্যক পরিপুষ্ট হয় না। ক্ষেত্রস্থ শস্যের আবাদ করিলেও কৃষকগণ প্রথমে

বীজ বপন করিয়া তৎপরে বীজাঙ্কুরিত হইলে, যাহাতে গাছ সকল পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া না থাকে তদ্বিষয় বিশেষ মনোযোগী না হইলে ফল ভাল হয় না। বৃক্ষ, লতা বা গুল্ম মধ্যে উপযুক্ত ফাঁক থাকা চাই। বৃক্ষ সম্বন্ধে যে নিয়ম সাধারণ শস্য বীজ বপন সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। শস্য ঘন সন্নিবিষ্ট হইলে উপযুক্ত পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হয় না। অনেকের বিশ্বাস—"আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ঐরূপ ভাবে কৃষিকার্য্য করিয়া গিয়াছেন ও সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরাও তাঁহাদের পথানুসরণ করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইতেছি।" ইহাদের এই ধারণা ভুল এবং ইহাই আমাদের বর্ত্তমান কৃষকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

মানব দেহ যেমন উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে হৃষ্ট পুষ্ট হয় না, দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে, সেইরূপ বৃক্ষ সকল ও উপযুক্ত খাদ্য, আলোক ও বায়ু অভাবে দিন দিন শীর্ণ ও নিঃস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং শেষে তাহাদের আর ফলোৎপাদিকা শক্তি থাকে না। সূর্য্যালোক গাছের পরম হিতকর, রৌদ্র বা আলোক ব্যতীত বৃক্ষ সকল বাঁচিতে পারে না। বাগানে বেড়াইতে গিয়া দেখা যায় যে যেখানে অনেকগুলি গাছ ঘন ঘন হইয়া আছে সেখানে কোন গাছ সেরূপ হৃষ্টপুষ্ট ও সতেজ নহে, গাছগুলি লম্বা ও কৃশ, কেবল লম্বাভাবে ঊর্দ্ধ দিকে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে গাছগুলি ঘন ঘন থাকায় চতুস্পার্শ্ব হইতে উপযুক্ত পরিমাণ আলোক বা রৌদ্র ও বাতাস পাইতেছে না। আলোক ও বাতাস পাইবার জন্য কেবল ঊর্দ্ধগামী হইবার চেষ্টা করিতেছে; আবার যেখানে গাছ সকল ফাঁকা, সেখানে গাছগুলি দীর্ঘ হয় না, অনেক শাখা প্রশাখা ও পাতায় ভরিয়া যায়।

সকল দিকে বায়ু ও রৌদ্র লাগে বলিয়া গাছগুলি একটু বাড়িলেই উহাদের শাখা প্রশাখা ও পাতা বাহির হয়। এইরূপ উদাহরণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রৌদ্র বা আলোক ও বায়ু বৃক্ষের প্রাণ স্বরূপ ও পাতার হরিদ্বর্ণের উৎপাদনের কারণ। পাতা না হইলে গাছ বাঁচিতে পারে না, যে হেতু পাতায় অধিক পরিমাণে হরিদ্বর্ণ সঞ্চিত থাকে।

মোটের পরে যাহাতে বৃক্ষ সকল ঘন ঘন না থাকে ফাঁকে ফাঁকে থাকে এবং যাহাতে চতুর্দ্দিক হইতে যথেষ্ট আলোক ও বাতাস পায় সর্ব্বতোভাবে তদ্বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান আমাদের নব্য কৃষকগণ যাহাতে বিশেষ অভিজ্ঞ ও বৃদ্ধ কৃষকের পদানুসরণ করেন তদ্বিষয়ে আমাদের সম্যক যত্নবান হওয়া উচিত।

সাবরে পানের চাষ

শ্রীযুৎ এস্, কে, দত্ত লিখিত

সাবরে অবস্থিতি কালে কিয়ৎদূরে বাজারের একটি পানের বরজ দেখিতে গিয়াছিলাম। পান চাষে লাভ বেশী কারণ পান বাজারে পড়িতে পায় না। এ দেশে ছোট বড় সকলেই আহারের পর পান খাইয়া থাকে এবং অনেকের পান ব্যতীত দিন চলে না। পান চাষ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা সাধারণে প্রকাশ করিতে বাসনা করি,—

যে বরজটি আমি দেখিয়াছিলাম তাহার পরিমাণ ৭ কাঠা মাত্র। বরজের মাটি বেলে দোয়াঁস, ২৷৷৹ ফিট অন্তর এক একটি লম্বা মাদা করা হইয়াছে, পুষ্করিণীর পাঁক মাটি আনিয়া এই মাদাটি ৪ কিম্বা ৬ ইঞ্চ উঁচু করা হইয়াছে, মাদার পরিসর এক ফুট মাত্র।

বরজটি চারি দিকে বাঁশের বেড়ায় ঘেরা, মাথার উপর চালি এবং সমস্ত ঘরটি উলু ঘাস দিয়া পাতলা করিয়া ছাওয়া। বরজের মধ্যে আলো ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারিবে, মৃদু সূর্য্যালোক ও অল্প উত্তাপ প্রবেশ করিবে এরূপ ব্যবস্থা করা। প্রখর আলো বা রৌদ্র লাগিলে পানের পাতা জ্বলিয়া যাইবে। পানের বেশ সবুজ সরস পাতাই চর্ব্বনের উপযোগী এবং তাহাই আদরের। এই প্রকারের গাছ ঘর না করিলে বাতাসের সমতা রক্ষা করা যায় না। অনাবৃত স্থানে পানের গাছ থাকিলে প্রবল বাতাসেও ক্ষতি হয়। বরজের ঘর সাধারণতঃ ৪৷৷৹ কিম্বা ৫৷৷৹ ফিট উঁচু হয়। মানুষ তাহার ভিতর দিয়া চলাচল করিতে পারে এমন উঁচু করা হয়। গাছ ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহার পর পান বসান হয়। ঘর ৮ হইতে ১০ বৎসর টিকে। কিন্তু প্রতি বৎসর মেরামত ও উলু পাল্টাইয়া ছাওয়ার আবশ্যক হয়।

তিন বা ততোধিক বয়সের গাছ ডগা ছাঁটিয়া জমিতে বসাইলে পান গাছ হয়। ডগাটি ১ ফুট লম্বা এবং তাহাতে ৪ কিম্বা ৬টা পত্র গ্রন্থি থাকা চাই। এই গ্রন্থি মুখ হইতে নূতন ফাঁকড়া বাহির হইবে। ফাল্গুন মাসে মাদায় কাত ভাবে শোয়াইয়া চারা বসান বিধি। মাদায় এক ধার হইতে ৪।৫টা ডগা কাটা বসাইয়া আবার ১২ কিম্বা ১৬ ইঞ্চ তফাতে আর ৪।৫ ডগাকাটা বসাইয়া যাইতে হইবে। এইরূপ হিসাবে ডগা বসাইলে এক বিঘা জমিতে আবাদ করিবার জন্য ১৫,০০০ ডগাকাটার প্রয়োজন।

প্রথমতঃ মাদাতে দিন ৪।৫ বার জল দিয়া কটিংগুলি সজীব রাখিতে হইবে। প্রায় ১ মাস কাল এই প্রকারে জল দিবার পর তবে শিকড় বাহির হইয়া ডগাগুলি গজাইতে থাকে। অতঃপর গোড়ায় মাটি দিয়া ডগার নিকটে নিকটে বাখারির বেড়া পুঁতিয়া দিতে হয়। ডগাগুলি লতাইবার সুবিধার জন্য কুশ ঘাস দিয়া বাখারির চটার সহিত ৩।৫ ইঞ্চ অন্তর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

এই সময় হইতে সপ্তাহে দুই দিন জল দেওয়া হয়। বৃষ্টির সময় জল দিবার আবশ্যক হয় না কিম্বা পৌষ মাসে জল দিবার প্রয়োজন নাই। পৌষমাসে ডগাগুলি প্রায় ৪ ফিট গজাইয়া উঠে। পান গাছের ২ ফিট পর্য্যন্ত নিচের পাতাগুলি বিক্রয়ের জন্য ভাঙ্গিয়া লওয়া হয় এবং পানের লতাগুলি নামাইয়া লইয়া জমিতে মাটি চাপা দিয়া পুতিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ক্রমশঃ এই লতাগুলি পুতিতে মাঝে যে ১২ হইতে ১৬ ইঞ্চি ফাঁক রাখা হইয়াছে তাহা পানের ডগায় পূর্ণ হইয়া যায় এবং মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাঁশের চটা পুতিয়া দিবার আবশ্যক হয়। গাছ বৎসরে দুইবার নামাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, ভাদ্রে একবার এবং ফাল্গুনে দ্বিতীয় বার।

সার—পানের জন্য কেবলমাত্র সরিষার খৈলসার ব্যবহার করা হয়। এক একটি ৫৫ ফিট লম্বা মাদায় ২ কিম্বা ৩ সের সরিষার খৈলের গুঁড়া ছড়ান হয়। আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৪ মাসে চারিবার খৈল দেওয়া হয়।

আমি যে বরজটির কথা বলিতেছি এরূপ একটি বরজের জন্য দুই জন মজুরের প্রত্যেক দিনের কার্য্য আছে, কখন নিড়ান, কখন জল দেওয়া, কখন সার ছড়ান, পানের লতা বাঁধা, ডগা নামাইয়া বসান, বরজের ঘর মেরামত একটা না একটা কার্য্য আছেই।

উৎপন্ন পান—প্রত্যেক গাছ হইতে মাসে দুইবার পাতাভাঙ্গা হয় এবং প্রত্যেক বারে ৪ টা পাতা প্রত্যেক লতা হইতে পাওয়া যায়। এক বৎসরে ১ বিঘায় ১২ লক্ষ পাতা উৎপন্ন হইতে পারে। নূতন বরজ বসাইলে ভাদ্র মাস হইতে পান ভাঙ্গা সুরু হইতে পারে। বরজ একবার তৈয়ারি করিয়া লইতে পারিলে ৮।১০ বৎসর বেশ ভাল অবস্থায় থাকে।

পানে রোগ বা পোকা—বারুইদের মুখে শুনা গেল যে পানে কোন পোকা লাগিতে বড় দেখা যায় না। তবে পানে এক প্রকার কাল চিতি ধরে, ঐ চিতি ধরা স্থান পচিয়া যায়। সময় সময় এত বড় বড় দাগ হয় যে সে পানটি ফেলিয়া দিতে হয়।

পানের চাষ বারুইদের এক চেটে এবং তাহাদের বিশ্বাস কিম্বা তাহারা সাধারণে প্রকাশ করিতে চায় যে পান চাষের সমুদয় তত্ত্ব তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। তাহারা আর একটা ভয় দেখাইয়া থাকে যে বারুই ব্যতীত অন্য কেহ পান চাষ করিলে সে সবংশে উৎসন্ন হইবে। বোধ হয় কোন শিক্ষিত লোকে তাহাদের এ কথায় কর্ণপাত করিবেন না। তাহাদের বৃত্তিটি অন্য কেহ না কাড়িয়া লয় সেই ভয়ে তাহারা এরূপ ভয় প্রদর্শন করে মাত্র।

বরজগুলি দেবতার নামে উৎসর্গ করা থাকে। আমি যে বরজ দেখিয়াছিলাম তাহা দুর্গা দেবীর নামে উৎসর্গকৃত। তাহারা সেইজন্য দুর্গা অষ্টমীর দিন বরজে প্রবেশ করে না, একলক্ষ মুদ্রা দিলেও এ কাজ করিবে না। একজন এরূপ করায়

অবশেষে কলেরা রোগে প্রাণ হারাইয়াছে, আমার বিশ্বাস সেই স্থানে কলেরা হইতেছিল. বরজে প্রবেশ না করিলেও সে মরিত।

[২৪ পরগণার পানের বরজে চারি দিকে পাকাটি বা ধঞ্চে কাটির বেড়া দেওয়া হয়, মাঝে মাঝে বাঁশের চটার খুঁটি দেওয়া হয় মাত্র। এখানে বরজ ৪ ফিটের অধিক উঁচু করা হয় না, লোকে কষ্টে হেঁট হইয়া ভিতরে যাতায়াত করিতে পারে। তাহারা বলে অধিক উচ্চ করিলে পান গাছের ক্ষতি হইবে এবং হাওয়ায় বরজ ভাঙ্গিয়া যাইবে। এখানকার হাওয়া অপেক্ষাকৃত কিছু প্রবল বলিতে হইবে। উচ্চতা বাড়াইলে গাছ খারাপ হইবে কি না পরীক্ষা সাপেক্ষ। এখানে বারুইগণ গাছ নামাইয়া দুইবার বৎসরে নূতন পুরাতন সব গাছের গোড়ায় এক বৎসরের শুষ্ক পুরাতন পাঁক মাটি মাদায় দিয়া থাকে। এখানকার বারুইগণ বরজের ভিতরের কাটাম এড়ো এড়ো গরাণের সরু কচা পুতিয়া করিয়া লয়। তাহার উপর দিয়া লম্বা বাঁখারির চটা চালাইয়া চালের কাটাম করে। চালেও পাকাটি দেয় এবং উলু ঘাস দিয়া চারি দিক ছায়। ডগা বসাইয়া এখানে দিনে ৪ ৫ বার জল দিবার আবশ্যক হয় না, একবার জলেই যথেষ্ট হয়। পরে সপ্তাহে একবার জল, দুই তিন মাস পরে দুই মাস অন্তর একবার সেচ দিলেই চলে। এখানে বারুইরা লতা উঠাইবার জন্য পাকাটি ব্যবহার করে, পানের ফাকড়া বাহির হইলে ডগাগুলি নামাইবার সময় সেগুলির গোড়ায় মাটি দিয়া এক একটি নূতন গাছ করিয়া লয়। এখানকার বারুইদেরও একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে। সব কার্য্য দেবতার নামে উৎসর্গ হওয়া কতকটা ভাল। তাহারা বরজে অশুচি কাপড়ে, পা, গা, মুখ না ধুইয়া প্রবেশ করে না বা কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহার কিন্তু একটু সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়, অপরিস্কার অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় ঢুকিলে পানের বরজে পোকার জীবাণু সঙ্গে যাইতে পারে। তাহারা এত সাবধান বলিয়া পানের বরজে প্রায়ই পোকা দেখা যায় না।

লেখক বরজের মাদার পরিমাণ দেন নাই। এখানকার মাদাগুলি ২ ফিট চওড়া, মাদার মধ্যের ব্যবধান ১॥০ ফিট এবং ইচ্ছামত লম্বা করা হয়।

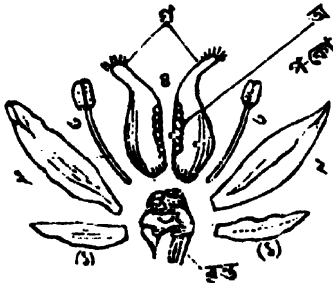
একচেটে ব্যবসা বলিয়া তাহারা রহস্য কাহাকেও জানিতে দেয় না কিন্তু জীবন সংগ্রামের দিনে এ রহস্য অধিক দিন লুকান থাকিবে না। কর্ম্মানুসারে জাতি বিভাগ একেবারে খারাপ বলা যায় না। ইতর ভদ্র সকলেই এক কাজ করিব বলিয়া উদ্যোগী হইলে কাহারও কিছু হয় না। ভদ্রলোকে বারুইগণের বৃত্তি কাড়িয়া লইলে রাজাকে বারুইগণের অন্নের ভাবনা ভাবিতে হইবে। কিন্তু স্বচ্ছলের সময় সব যুক্তিই সুযুক্তি, যখন অনশন ক্লিষ্ট দেশ, যখন ঘোরতর জীবন সংগ্রাম চলিতেছে তখন যে সময়োচিত কাজ করিবে সেই বাঁচিবে। আমাদের দেশে কর্ম্মভেদে জাতিভেদ, তাই এখনও অপেক্ষাকৃত মঙ্গল আছে কিন্তু ইউরোপ আমেরিকায় জীবন সংগ্রাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ একথা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।] কৃঃ সঃ



ফাল্গুন, ১৩১৮ সাল।

ফল উৎপাদনে পতঙ্গের কার্য্য

পতঙ্গগণের দ্বারা কি প্রকারে ফল বা বীজ উৎপাদনের সহায়তা হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে হইলে ফুলের আকৃতি ও অবয়বের বিষয় একটু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ফুলের সাধারণতঃ চারিটি অঙ্গ থাকে। এই অঙ্গগুলি ফুলের বৃন্তের উপর একটির ভিতর আর একটি, থাকে থাকে, গোলাকারে সজ্জিত থাকে। (ক) বেষ্টন পত্র Calyx and Sepals (খ) তাহার ভিতর সুন্দর বর্ণের পাপড়ি Corola and petals (গ) ষ্টামেন (Stamens) পরাগ কেশর দণ্ড, (Filament) ও পরাগ কেশর বিশিষ্ট পরাগ কোষ (Anther) এই পরাগ কেশরের মধ্যে পরাগ রেণু (Pollen) থাকে; (ঘ) স্ত্রী স্তবক (Pistle,) ইহার মধ্যে গর্ভকেশর (Style) ও কেশরাগ্রে কিঞ্জল্ক (Stigma) থাকে। নিম্নে চিত্র দেখিলে ফুলের অঙ্গগুলির বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে।



১।১ বেষ্টন পত্র (Sepals)
২।২ পাপড়ি (Petals)
৩৩ পরাগ কেশর দণ্ড (Filament) ; পঃ কোঃ পরাগ কোষ (Anther)
৪ স্ত্রী স্তবক (Pistle) ; গর্ভ কেশর ; তাহার কিঞ্জল্ক বা কেশরাগ্র (Stigma) ; স্ত্রী স্তবকের মধ্যে অণ্ডাণু (Ovule) থাকে।

এই ফুলের কিঞ্জল্কাগ্রে পরাগপাত না হইলে বীজের উৎপত্তি হয় না। পরাগ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরাগ কেশর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং তখন পরাগ রেণু বাহির হইয়া পড়ে। চিত্রে পরাগ কোষের মাঝ খানে যে রেখা চিহ্ন রহিয়াছে, কোষটি এই রেখায় রেখায় বিচ্ছিন্ন হয়। এই পরাগ রেণু না হইলে কোন কার্য্য

হইবে না। পরাগ কোষ উন্মুক্ত হইবার পূর্ব্বে যদি ইহা ছিঁড়িয়া ফেলা যায় তবে ফল বা বীজ উৎপন্নই হইবে না।

পুষ্পের মধ্যেও স্ত্রী ও পুরুষ আছে। যাহাতে স্ত্রী স্তবক যন্ত্রটি থাকে সেইটি স্ত্রী পুষ্প, যাহাতে পুং যন্ত্রটা থাকে সেইটি পুং পুষ্প। ফুলের বিচিত্র বর্ণের পাপড়ি, বেষ্টনী উভয় ফুলেই থাকে। ফুলের পাপড়ির মধ্যে মধু সকল ফুলেই থাকে এবং ফুলের গন্ধ থাকে। এই গুলিই পতঙ্গগণকে ডাকিয়া আনে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে একই ফুলে স্ত্রী ও পুং উভয় যন্ত্র বিদ্যমান। এরূপ স্থলে স্বপুষ্পের পরাগ রেণু গর্ভকেশরে পতিত হইয়া ফল উৎপাদিত হইতে পারে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে এই প্রকারে উৎপন্ন ফল বা বীজ ভাল হয় না কিম্বা অকালে শুকাইয়া যায়। ভিন্ন ফুল হইতে পরাগ নিষেক হওয়া আবশ্যক। পতঙ্গগণ এই কার্য্যের সহায়।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা এস্থলে আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ঘেটকুলের কাহিনীটি বিবৃত করিতে ইচ্ছা করি—





চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, (ক) মৌমাছি ফুলের পাপড়ির উপর বসিয়াছে, তাহার শৃঙ্গ ফুলের পরাগ আধার স্পর্শ করিতেছে, (খ) মৌমাছির শৃঙ্গে পরাগ কেশর রেণু লাগিয়া গিয়াছে এবং সে শৃঙ্গ দুইটি উঁচু করিয়া রাখিয়াছে।

"আমি বলিতেছিলাম যে, উদ্ভিদ্‌গণ মৌমাছিদিগকে ডাকিবার নিমিত্ত বায়ুভরে পুষ্পগন্ধ প্রেরণ করিয়া চারিদিক্ সৌরভে আমোদিত করে। মৌমাছিগণ ফুলের গন্ধ পাইয়া সেই দিকে ধাবিত হয়। তাহার পর উজ্জ্বলবর্ণ বিশিষ্ট সুন্দর ফুলটী সম্মুখে দেখিয়া তাহার উপর উপবিষ্ট হয়, মধু পান ও মধু সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ফুলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিয়দংশ মধু তাহাদের গায়ে লাগিয়া যায়। পরাগ-কেশরের রেণু সেই মধুতে জড়াইয়া যায়; মৌমাছি তাহার পর অন্য ফুলে গমন করে। মৌমাছির দেহ হইতে রেণু এই ফুলের গর্ভকেশরে পতিত হয়।

তখন ফল দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে। গর্ভকেশরের নিম্নে যে অণ্ডাণু থাকে, তাহা ক্রমে বীজে পরিণত হয়। রেণু সংযোগে ফুলে যখন ফল হয়, তখন আর ফুলের পাপড়ি ও পরাগ কেশরের আবশ্যক হয় না। সেগুলি তখন শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া যায়। গর্ভকেশরে রেণু না পতিত হইলে, ফুলে ফল হয় না। ফুটন্ত আম মুকুলের উপর বৃষ্টির জল পতিত হইলে, লোকে বলে "ফুলের মধু ধুইয়া গেল, এবার আর আম হইবে না।" মধু যত ধৌত হউক আর না হউক, রেণু ধুইয়া যায়। সে জন্য সে বৎসর আম ভাল হয় না। যে কলসীর খেজুর আরব প্রভৃতি দেশ হইতে কলিকাতায় আমদানি হয়, ইহার চাষ করিতে গিয়া আরববাসীরা কখন কখন বিপন্ন হয়। খেজুরের এক গাছে কেবল রেণু বিশিষ্ট ফুল হয়, আর অন্য গাছে কেবল গর্ভকেশর বিশিষ্ট ফুল হয়। পিণ্ড খেজুরের বীজ হইতে লোকে বড় গাছ করে না। যেমন কলার গোড়া হইতে তেড় বা চারা বাহির হয়, ইহারও সেইরূপ হয়। চারা দেখিয়া বলিতে পারা যায় না যে, কোন্ চারাটী বড় হইয়া রেণুবিশিষ্ট ফুল প্রসব করিবে, কোন্টী গর্ভকেশরবিশিষ্ট ফুল প্রসব করিবে। বলা বাহুল্য যে, যে গাছে খেজুর হয় না। বাগানটী ভুমি করিলে অনেক যত্ন করিয়া, অনেক জল সেচন করিয়া গাছগুলি বড় করিলে, তাহার পর যখন ফুল হইল তখন দেখিলে যে, অধিকাংশ রেণুবিশিষ্ট ফুলের গাছ। এক আধটী এরূপ গাছ চাই বটে, কিন্তু এত রাঁড়া গাছ লইয়া সে কি করিবে? সুতরাং রাঁড়া গাছগুলিকে কাটিয়া ফেলিতে হয়। অনেক সময় পেঁপের ক্ষেতে এইপ্রকার রাঁড়া পেঁপে গাছ হইয়া কৃষকের সমুদয় পরিশ্রম বিফল করে, সাধ্যানুসারে সে স্থানে লোকে গর্ভকেশর ফুল বিশিষ্ট গাছের চাষ করে। তাহার সঙ্গে একটী কি দুইটী রাঁড়া গাছ রাখিয়া দেয়। গর্ভকেশরবিশিষ্ট খেজুর গাছ দূরে থাকিলে, রেণুবিশিষ্ট গাছ হইতে ফুল লইয়া সে গাছে বাঁধিয়া দিতে হয়। তাহা হইতে রেণু পতিত হইলে তবে সে গাছে খেজুর হয়। আমাদের এখানেও মাঝে মাঝে রাঁড়া তাল গাছ আছে। বিলাত প্রভৃতি দেশে লোকে এক গাছের রেণু অন্য গাছে দিয়া অনেক ফল ও ফসলের উন্নতি করিয়াছে। আমেরিকায় একজন সাহেব এই উপায় অবলম্বন করিয়া অনেক নূতন সুমিষ্ট ফলের সৃষ্টি করিয়াছেন। গত বৎসর আমি একজনকে আম সম্বন্ধে এইরূপ পরীক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু অগাধ ধৈর্য্য ও নিরীক্ষণ-শক্তি ব্যতীত কেহ এরূপ কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারে না।

ঘেটকুলের গাছ মূল হইতে উৎপন্ন হয়; বীজ হইতেও হয়। শীতকাল গত হইলে প্রথমে ইহার একটি পত্র বাহির হয়, তাহার পর আর একটী পত্র বাহির হয়, তাহার পর আর একটী পত্র বাহির হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ইহাতে তিনটী পত্র হয়। সেই কোষের ভিতর হইতে ফুল বাহির হয় ফুলটী এক লোহিত পীত বর্ণের দণ্ড

স্বরূপ। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি ঘেটকুলের ফুল ফুটিলে ইহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। এত দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, নিকটে বসিতে পারা যায় না। কিন্তু তোমার আমার পক্ষে যাহা দুর্গন্ধ, সকল জীবের পক্ষে তাহা নহে। মৌমাছিদিগকে ডাকিবার নিমিত্ত ঘেটকুল এরূপ দুর্গন্ধ বাহির করে না। এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গ আছে, ঘেটকুলের কাজ তাহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। সে তাহাদিগকেই সাদরে আহ্বান করে। এ পতঙ্গ এত ক্ষুদ্র যে, সূক্ষ্ম সূচের অগ্রভাগে তাহাদের স্থান হয় কি না সন্দেহ। ইহাদিগকে আমরা এক প্রকার ওনকি বলি। অনেকে একত্র হইয়া সূর্য্যকিরণে উড়িয়া ইহারা খেলা করিতে ভাল বাসে। যত ক্ষণ সূর্য্যকিরণের ভিতর উড়িতে থাকে, ততক্ষণ ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, না মদের নাম-গন্ধ নাই। মদ অন্বেষণ করিতে করিতে দণ্ড পথে তাহারা নীচে নামিতে লাগিল। সে স্থানে সেই আঁশের ভিতর দিয়া তাহারা ফুলের ভিতর প্রবেশ করিল। সে স্থানেও মদ দেখিতে পাইল না। ফুলের ভিতর যে স্থানে পরাগকেশর ও গর্ভকেশর আছে, সেই ঘরের ভিতর ক্ষুদ্র পতঙ্গগণ মদের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঘেটকুল ফুলের মাঝখানে যে লোহিত-পীতবর্ণের দণ্ড থাকে, তাহাই ইহার সাইনবোর্ড। এ দোকানে অন্যান্য ফুলের ন্যায় মিষ্ট মধু বিক্রীত হয় না।

মৌমাছিরা মাতাল নহে। সুতরাং তাহারা এ মধু সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ঘেটকুল ফুলের নিকট আগমন করে না।

উপরে যে ক্ষুদ্র পতঙ্গের কথা বলিয়াছি, এক দল সেই পতঙ্গ অন্য এক ঘেটকুল ফুলে গিয়াছিল। সেই ফুল হইতে উড়িয়া বায়ুর উপর টলিতে টলিতে তাহারা আমাদের এই ঘেটকুল ফুলের সাইনবোর্ড দেখিতে পাইল। আপনা আপনি তাহারা বলাবলি করিল,—"ওহে; এখানে আবার এক মদের দোকান! চল, দুই এক ঢোক এখানেও খাওয়া যাউক।" নিকটে আসিয়া সাইনবোর্ডে অর্থাৎ ঘেটকুলফুলের সেই রঞ্জিত দণ্ডে কি লেখা আছে, তাহা পড়িয়া দেখিল। দেখিল যে তাহাতে লেখা আছে—

এ স্থানে খাঁটি মদ বিক্রীত হয়।

ঘেঁটকুল এক প্রকার ওলের জাতি। সাইন-বোর্ড পাঠ করিয়া মাতালের দল আরও একটু স্ফূর্ত্তি করিবার নিমিত্ত ফুলের ভিতর প্রবেশ করিল।

অন্যান্য ফুলের ন্যায় ঘেঁটকুল ফুলে সবুজ পাপড়ি ও রঞ্জিত পাপড়ি নাই। ইহার পরাগকেশর ও গর্ভ-কেশর অন্যান্য ফুলের ন্যায় নহে। ইহার ফুলে প্রথম একটি কোষ আছে, যাহার ভিতর সাইন-বোর্ড স্বরূপ লোহিত-পীত বর্ণের দণ্ড দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার নিম্নে অনেক গুলি সূক্ষ্ম শোঁ বা আঁশ আছে।

ইহাদের উপর দিক্ ঈষৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে, নিম্ন মুখ পরস্পরে ছুঁইয়া আছে। তাহার নিম্নে কতকগুলি গোল গোল পদার্থ রহিয়াছে। এ ফুলের পরাগ-কেশর দেখিতে এইরূপ। ইহার ভিতর রেণু আছে। পরাগ-কেশর পরিপক্ক হইলে ঢাকিয়া যায় ও ইহার ভিতর হইতে রেণু বাহির হয়। সেই রেণু গর্ভকেশরে পতিত হইলে তবে ফুলে ফল ও বীজ জন্মে। সর্ব্ব নিম্নে যে গোলাকার পদার্থগুলি রহিয়াছে, তাহাই গর্ভকেশর। এই গর্ভকেশর প্রস্ফুটিত হইলে ইহাতে পরাগকেশরের রেণু পতিত হইয়া ফল জন্মে। কিন্তু স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘেঁটকুল নিজের রেণু ইহাতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করে না। অন্য ফুলের রেণু আপনি লইবে ও আপনার রেণু অন্য ফুলে প্রেরণ করিবে, সেই জন্য এই মাতালের দলকে মদের লোভ দেখাইয়া সে আহ্বান করিয়াছে।

মাতালগণ প্রথম সাইন-বোর্ড স্বরূপ সেই দণ্ডে উপবিষ্ট হইল। সে স্থানে-উপাদেয় সৌরভ (আমাদের পক্ষে দুর্গন্ধ) আছে বটে, কিন্তু পতঙ্গগণ যেমন অনায়াসে ঘুনির ভিতর প্রবেশ করিতে পারে ? কিন্তু পুনরায় বাহির হইতে পারে না। ঘেঁটকুলের এই চক্রব্যূহের ভিতর প্রবেশ করিতে পারা যায়, কিন্তু ইহা হইতে বাহির হইতে পারা যায় না। পতঙ্গ ধরিবার নিমিত্ত ঘেঁটকুল মহাশয় এই ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন। দণ্ডের নিম্নে ও পরাগ কেশরের উপরের সেই যে আঁশগুলির কথা বলিয়াছি, তাহাদের উপর দিকে ঈষৎ পথ আছে, কিন্তু নীচের দিকে মুখে মুখে যোড়া। পতঙ্গগণ উপরের পথ দিয়া আসিয়া নিম্ন দিকের দুই পাশ ঠেলিয়া অনায়াসে ফুলের ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু বাহিরে যাইবার সময় সেই আঁশের অগ্রভাগ তাহাদের মুখে ফুটিয়া যাইতে লাগিল, কিছুতেই তাহারা বাহির হইতে পারিল না।

যাহা হউক, দুই তিন দিন পরে ফুলের গর্ভকেশরগুলি প্রস্ফুটিত হইল। পতঙ্গগণ সেই কারাগারে অনাহারে রাগে দুঃখে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অন্য ঘেঁটকুলের ফুল হইতে তাহারা যে রেণু আনিয়াছিল, এক্ষণে এই ঘেঁটকুলের প্রস্ফুটিত গর্ভকেশরে তাহা লাগিয়া গেল। গর্ভকেশরের নিম্নদেশে অবস্থিত অতি সূক্ষ্ম অণ্ডাণুগুলি তখন ফল ও বীজে পরিণত হইবার নিমিত্ত উন্মুখ হইল। গর্ভকেশরের কাজ যখন হইয়া গেল তখন উপরের পরাগকেশরগুলি প্রস্ফুটিত হইল। তাহা হইতে ঝর্ ঝর্ শব্দে এখন রেণু পতিত হইতে লাগিল। পতঙ্গগণ সেই রেণুতে কতক পরিমাণে চাপা পড়িল। এই রেণুতেই পতঙ্গগণের আহারীয় ও পানীয় পদার্থ থাকে। যে মধুর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহাতেই সেই মধু থাকে।

পতঙ্গদিগের পিঠে রেণু বোঝাই দিয়া ঘেঁটকুল মহাশয় এখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। উপরের সেই শোঁ বা আঁশগুলি এখন তিনি গুটাইয়া লইলেন। কতক শুষ্ক হইয়া গেল, কতক পাশে সরিয়া পড়িল। বাহিরে যাইবার পথ পরিষ্কার হইল। পেট ভরিয়া মদ খাইয়া পিঠের উপর রেণু লইয়া টলিতে টলিতে পতঙ্গগণ বাহির হইল। বায়ুভরে অল্পদূর উড়িতে না উড়িতে তাহাদের নেশা কিয়ৎ পরিমাণে ছুটিয়া গেল। তখন আর একটী ঘেঁটকুল ফুলের গন্ধ পাইয়া, আর একটী মদের দোকানের সাইনবোর্ড দেখিয়া, তাহার ভিতর তাহারা প্রবেশ করিল। সে স্থানে পুনরায় পূর্ব্বরূপ ঘটনা হইল।"

সুগন্ধী ফুল হইতে মধু আহরণ করা প্রায়ই মৌমাছিগণের কার্য্য। এ কার্য্যে তাহারা বিশেষ পারদর্শী (ক) চিত্রে দেখিতে পাইবেন সুগন্ধে বহুদূর হইতে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া মধুমক্ষিকা কি প্রকারে ফুলের পাপড়ির উপর বসিয়াছে এবং মধু আহার জন্য কিরূপে ফুলের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। (খ) চিত্রে দেখিবেন যে মধুমক্ষিকা পরাগরেণু মাথায় মাখিয়া ফিরিয়াছে; মধু লোভে দ্বিতীয় পুষ্পে প্রবেশ করিয়া, সে এই পরাগরেণু গর্ভকেশরের উপর লাগাইয়া দিবে। ফুলগুলি মধু মক্ষিকার কার্য্যের সুবিধার জন্য এরূপ বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মিত যে, বোধ হয় যেন পতঙ্গের এই কার্য্য বিধাতার অভিপ্রেত।

মধুমক্ষিকা নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে মধু বা পরাগ আহরণে নিযুক্ত নহে। মধু লইতে গেলে তাহাকে এক ফুল হইতে পরাগ মাখিয়া অন্য ফুলের ভিতর লাগাইয়া দিতে হয়। সমস্ত পরাগ কিন্তু তাহারা ফেলিয়া যায়। এই পরাগ রেণু মৌমাছি-শিশুগণের খাদ্য। মধু তাহারা উদরস্থ করে না, কারণ উদরস্থ হইলেই তাহা হজম হইয়া যাইবে। এত মধুই বা উদরস্থ কি প্রকারে করিবে। মধু আহরণের জন্য তাহাদের একটি স্বতন্ত্র থলী আছে। ভবিষ্যতে আহারের জন্য তাহারা ঐ মধু মধুচক্রে সঞ্চিত করিয়া রাখে, যাহা রাখে সমস্ত তাহাদের আবশ্যক হয় না। মানুষে তাহার ভাগ লয়।

আমেরিকা ও ইউরোপের উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ফল কিম্বা সব্জী বাগানের আশে পাশে কতিপয় সংখ্যক মৌচাক থাকা চাই, তাঁহারা বলেন "No Bees, no Fruit." স্বভাবতঃ মৌমাছি কোথাও আছে কোথাও নাই, কখন আছে কখন নাই। কৃত্রিম মৌচাক করিয়া দিয়া মৌমাছি পুষিয়া তাঁহারা ফলের বাগানের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন এবং মধু ও মোম হইতেও অনেক লাভ করিতেছেন। আমাদের দেশে ফলের বাগানের এরূপ উন্নতি কত দিনে হইবে তাহা ঠিক বলা যায় না।

ভারতে গো সেবা

ভারতে কৃষিকর্ম্ম দ্বারা রত্ন উৎপাদিত হয়। ভারতীয় রাজস্বের বিশিষ্টাংশ কৃষকের নিকট হইতে আদায় হইয়া থাকে। গবাদি পশু কৃষকের প্রধান অবলম্বন, চাষাদের প্রধান সহায়। সেই গবাদি জন্তুগণকে রক্ষা করিবার বিশেষ যত্ন ও চেষ্টার আবশ্যক। অনেকে শুনিয়া সুখী হইবেন যে, শ্রীমৎ কে, এস, যশওয়ালা মহোদয়ের প্রযত্নে, ইংলণ্ডে "ভারতীয় গোরক্ষিণী" সভা নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত সভা গ্রেট ব্রিটেনবাসীদিগকে বুঝাইতে চান যে, ভারতীয় কৃষির উন্নতি হইলে গ্রেট ব্রিটেনের তাহাতে লাভ আছে। কৃষিজাত ভারতীয় অনেক দ্রব্যের উপর তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। বিশেষতঃ, ভারতীয় পাট এবং তুলা শ্রমশিল্পের প্রাণ হইয়া উঠিয়াছে। যশওয়ালা, অগ্র প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণকে উক্ত সভার সভ্য হইতে আমন্ত্রণ করিতেছেন। সকলে মিলিয়া যাহাতে ভারতের গোধন রক্ষার উপায় করিতে পারেন এই মহৎ উদ্দেশেই এই সভা সংস্থাপিত—আমরা অতঃপর দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ভারতে গোকুলের কি মর্য্যাদা ছিল এবং হিন্দুমাত্রেই এখনও গোসেবার জন্য কত ব্যস্ত।

আবহমান কাল হইতে ভারতবর্ষে গো সেবা মাতৃ সেবার ন্যায় পুণ্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা গো সেবা পরাঙ্মুখ হইয়া শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল হারাইয়া নরাকারে পশুতে পরিণত হইতে বসিয়াছি, আর্য্যদের গরুর সহিত নিত্য নৈমিত্তিক কতরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ষ আরম্ভ করিতে হইলে ভগবতী বোধে গো পূজা করিতে হয়, এ কারণ বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে হিন্দুগণ পরম উৎসাহের সহিত গো-ভগবতী পূজা করিয়া থাকেন। কুমারীগণ এবং সধবা মেয়েরা সম্পূর্ণ বৈশাখ মাস গো পাদপদ্ম পূজা করতঃ পঞ্চগ্রাস সবুজ ঘাস (তাজাঘাস) আহার দিয়া গোকুল ব্রত করিয়া থাকেন। এই ব্রত সমাপ্ত হইলে গাভীর খুর ও শৃঙ্গ সুবর্ণে মণ্ডিত করিয়া দেওয়া হইত। বর্ত্তমানে ব্রতান্তে সুবর্ণ নির্ম্মিত খুরও শৃঙ্গ পুরোহিতকে প্রদান করা হয়। পুরাকালে আর্য্যকন্যাগণ গোদুগ্ধ দোহন করিতেন বলিয়া অদ্যাবধি দুহিতা নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। কুমারীগণ গোসেবা ও দুগ্ধ দোহন করিতে করিতে বিবাহ যোগ্যা হইলে (জ্যোতিষ মতে শুভ যোগ না মিলিলেও) গোধূলী লগ্নে বরপাত্রে অর্পিতা হইতেন। অদ্যাবধিও গোধূলী লগ্নে বিবাহ হইয়া থাকে; কিন্তু গোধূলী কাহাকে বলে হয়ত অনেকে তাহা অবগত নহেন। যৎকালে গোষ্ঠ-প্রত্যাগত অসংখ্য ধেনুগণ হাম্বারবে, ঊর্দ্ধ পুচ্ছ হইয়া ছুটিতে থাকে তৎকালে

তাহাদের খুরোত্থিত ধূলীরাশি দ্বারা অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ জাল আবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক পাংশুবর্ণ দেখায়; সেই সময়কে গোধূলী বলে। গো-সেবা পরায়ণা দুহিতার গোধূলী লগ্নে বিবাহ হইলেই গরুর সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিন্ন হইল না। বয়োপ্রাপ্তে, গর্ভধান দিনে (অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের প্রথম দিনে) দ্বিতীয় সংস্কার প্রথানুযায়ী স্ত্রীকে পঞ্চগব্য (গোময়, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত) সেবন করাইয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়। আয়ুর্ব্বেদ বলেন পঞ্চগব্য জরায়ুস্থ দুষ্ট কীট ধ্বংস করিয়া বীর্য্য ধারিণী শক্তি দান করে। গাভীর পঞ্চগব্য, জননীর গর্ভ ধারিণী শক্তি দান করতঃ আমাদের জন্মের সহায়তা করে; এবং ভূমিষ্ঠ কাল হইতে আজীবন গাভীদুগ্ধ পীযুষ পানে আমরা জীবিত থাকিতে পারি বলিয়া গাভীকে শাস্ত্র কারে। পঞ্চ মাতার মধ্যে স্থান দিয়াছেন। আমরা এমনি অকৃতী সন্তান যে গাভী মাতার সেবায় পরাঙ্মুখ হইয়া (স্বদেশ) জন্মভূমি রূপ মাতৃ সেবায় অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক। গোমাতৃ সেবায় চিত্ত শুদ্ধ হইলে তবে মাতৃ সেবায় অধিকার জন্মে; তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে সাকার বাদী হিন্দুর পূর্ণাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ লোক শিক্ষার্থে বাল্যজীবন শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোচারণ করিয়াছিলেন। যখন ব্রজবাসী গোসেবায় শিক্ষিত হইল, তখন বৈষ্ণব শিরোমণি অক্রুর আসিয়া নিবেদন করিলেন প্রভো, আপনি গোসেবায় রত কিন্তু আপনার মাতা কংশ কারাগারে শৃঙ্খলিতা ও প্রপীড়িতা; বলদেব ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, ভাই, তুমি এতদিন এ কথা কেন বল নাই? উত্তরে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন (লোকশিক্ষার্থে) চিত্ত শুদ্ধ না হইলে মাতৃসেবায় অধিকার জন্মে না, গোসেবায় আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে এখন আমরা মাতৃসেবা করিব। আমরা গোসেবা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি লাভ না করিলে, জন্মভূমির সেবায়, মাতৃসেবায়, কখনই সক্ষম হইব না।

কোন পতিপুত্রবতী রমণীর মৃত্যু হইলে তাহার অক্ষয় স্বর্গ কামনায় চন্দ্রধেনু শ্রাদ্ধ করিতে হয়, সবৎস গাভী উৎসর্গ করিয়া তাহার রক্ষাণাবেক্ষণ করিতে হয়; সেই গাভী বাঁধিবার কাষ্ঠের নাম যুগ কাষ্ঠ; আমরা বর্ত্তমানে বৃষোৎসর্গ করি। কিন্তু সে বৃষের কোন সংবাদ রাখি না, সে বৃষ হয়ত মিউনিসিপালিটির ময়লার গাড়ি টানিয়া পিতৃপুরুষের স্বর্গ কামনার সহায়তা করিতেছে।

কোন পুণ্য কার্য্যে বা শুভ যাত্রায় মঙ্গল কামনা হেতু যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহাকে যাত্রা মঙ্গল বলে। ঐ মন্ত্রেও ধেনু বৎসা প্রযুক্তা অর্থাৎ বৎসযুক্তা গাভী দর্শন অভাবে পাঠ ও শ্রবণ করিলেও কার্য্য সিদ্ধ হয়। হিন্দুর জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত গরুর সহিত অনবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে। জন্মে (গর্ভধানে) পঞ্চগব্য বিবাহে গোধূলী, যাত্রায় সবৎস ধেনু দর্শন, ব্রতে গোকুল, শ্রাদ্ধে চন্দ্রধেনু ও বৃষোৎসর্গ

মরণে ছড়া, ঝাঁটি ও গোময় লেপন। এই ধেনু রক্ষা হিন্দু ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। রামায়ণে দেখিতে পাই, স্বেচ্ছাচারী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আর্য্য ঋষির আশ্রমস্থ ধেনুর লোভে লোভী হওয়ায় পরশুরাম ধেনু রক্ষার্থে যেন অবতার রূপে ধরায় অবতীর্ণ হন; তাঁহার কীর্ত্তি কাহিনী রামায়ণে বর্ণিত আছে।

কৃষি কার্য্যে ও জীবন ধারণে গরুর প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নহে, যখনই ঋষিগণ মানবের আহারার্থে পঞ্চ শস্য আবিষ্কার করিয়া সমাজে চাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখনই গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইল, কৃষি কার্য্যে গরুই প্রধান সহায়, চাষ করিতে গরু আবশ্যক, ক্ষেত্রে সার দিতে গোময় প্রধান উপাদান, গোমূত্র ক্ষেত্রের পোকা নাশক ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে, গোময় শুষ্কাবস্থায় ঘুঁটে রূপে আমাদের জ্বালানি কাঠের সহায়তা করে. মাতৃস্তন্য পানে আমরা কেবলমাত্র বাল্যকালে কয়েক মাস জীবিত থাকি, কিন্তু আমরা মাতৃরূপিণী গাভীর পীযুষ পানে চিরকাল জীবিত থাকিতে পারি।

গরু যে কেবল জীবিতাবস্থায় আমাদের মঙ্গল সাধন করে তাহা নয়—ইহারা মৃত্যুর পরেও আমাদের অনেক উপকার করিয়া থাকে; ইহার চর্ম্মে জুতা, হাড়ে-চুণ, ছুরির বাঁট ইত্যাদি প্রস্তুত হয় এবং হাড়-সার জমির মূল্যবান সার।

পত্রাদি

তামাকে পোকা—জনৈক পত্র প্রেরক কুচবেহার হইতে লিখিতেছেন যে এক প্রকার পোকাতে প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা তামাক গাছ খাইয়া নষ্ট করিতেছে, চাষাগণ তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছে না। আমরা তাহাদিগকে পোকা ধরিয়া সরকারী কীটতত্ত্ববিদের নিকট পাঠাইতে পরামর্শ দিই। তাঁহার ঠিকানা—কীটতত্ত্ববিদ্, ইম্পিরিয়াল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, পুষা—(বেঙ্গল)।

পিচকারি—পিতলের পিচকারির ব্যবহার জানিতে চান—ইহা ব্যবহার করা অতি সহজ। ৭৲ কিম্বা ৮৲ টাকা দামের পিচকারি দ্বারা ১০০ ফিট দূরে জল নিক্ষেপ করা যায়। পিচকারি সহজে খোলা যায়। খুলিয়া ভিতরের সুতা জড়ান ডাঁটিতে একটু তৈল লাগাইয়া লইলে পিচকারি দ্বারা জল ছুড়িতে কোন কষ্টই হয় না। দুই মুখ ওয়ালা এক প্রকার পিচকারি আছে, একটি মুখ একটা জলের বাল্‌তিতে রাখিয়া অনবরত জল ছোড়া যায়, এই পিচকারি গুলি আরও ভাল, দাম ৯৲ কিম্বা ১০৲ টাকা দুই শত ফিট বা তাহার অধিক দূরে জল চালান যায়। বড় গাছ ধুইবার জন্য ঊর্দ্ধে জল ছোড়ার পক্ষে বড় উপযোগী। নদী, খাল, বিল বা পুষ্করিণী হইতে জল তুলিতে হইলে সিউনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, কম খরচে কাজ হয়। ক্ষেত তিন কিম্বা চারি হাজার বিঘা বিস্তৃত না হইলে পম্প প্রভৃতির আয়োজন করা বিধেয় নহে।

সরকারী কার্য্যে কৃষি কলেজ উত্তীর্ণ ছাত্র নিয়োগ—বোম্বাই কৃষি-কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রেরা কাজে লাগিতেছেন। দেখিতেছি, বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগে ৯ জন এবং খাজানা-বিভাগে ৫ জন নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজস্ববিভাগে কৃষিবিৎ লোকের উপযোগিতা আছে। বরদা রাজ্যে ২ জনের কর্ম্ম হইয়াছে। আর দুইটি দেশীয় রাজ্যে চারিজন নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ আসামের কৃষি-বিভাগে ৩ জন আসিতেছেন। বঙ্গের কৃষি-বিভাগে ১ জন আনীত হইয়াছেন। মধ্য প্রদেশের শিল্প বিভাগে একজন নিযুক্ত হইয়াছেন। মিউনিসিপাল কার্য্যে ১ জন এবং ব্যক্তিবিশেষের কৃষিকার্য্যে ১ জন নিযুক্ত হইয়াছেন।

রাজকুমারের কৃষি অনুরাগ—আমরা অতীব আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, ময়মনসিংহ রামগোপাল পুরের খ্যাতনামা রাজা বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার নগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে এক জন আদর্শ ঔদ্যানিক মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি নানাবিধ উদ্ভিদ হইতে সূক্ষ্ম সূত্রাদি বহিষ্করণ পরীক্ষা বিষয়েও সমধিক পারদর্শী। তিনি নানা প্রকার উদ্ভিজ্জাত সূত্রাদি পরীক্ষা করতঃ বিভিন্ন স্থানের প্রদর্শনী সমূহে প্রেরণ করিয়া অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক এবং সম্মানসূচক নিদর্শনলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ যদি আমাদের দেশের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার দৃষ্টান্তানুযায়ী এ ক্ষেত্রে সামন্য মনঃসংযোগ করিতেন তাহা হইলে আমাদের দেশের কৃষিবিদ্যার তাদৃশ অধঃপতন ঘটিত না। উক্ত কুমার মহোদয় সর্ব্বত্রই এ বিষয়ের বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। দেশের ও দশের কল্যাণ হেতু তাঁহাকে এই কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণানুবাদ করিতেছেন। তিনি যে যে বিভিন্ন প্রদর্শনী হইতে বিভিন্ন রকমের পদকাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, নিম্নে তাহার এক তালিকা সাধারণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইল। তিনি ভারতীয় কৃষি সমিতির সহিত সংশ্রব রাখেন এবং তাহার এক জন বিশিষ্ট সভ্য।

স্বর্ণ মেডেল—ধুবড়ি ও ময়মনসিং সারস্বত প্রদর্শনীতে প্রাপ্ত।

রৌপ্য মেডেল—বেনজিটিয়া প্রদর্শনী (মুর্শিদাবাদ) ময়মনসিংহ, হুগলী, প্রদর্শনী (চুচুড়া) খুলনা প্রদর্শনী—ফরিদপুর।

সার্টিফকেট ১ম শ্রেণীর—বেনজিটিয়া প্রদর্শনী, (মুর্শিদাবাদ) ময়মনসিংহ, সারস্বত প্রদর্শনী, হুগলী প্রদর্শনী (চুচুড়া) খুলনা প্রদর্শনী।

সার-সংগ্রহ

"হরিতকীর উপকারিতা"

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত

কোন কোন স্থানে হরিতকী "হরড়া" নামে পরিচিত, চিকিৎসা শাস্ত্র মতে ইহা সর্ব্ব রোগ নিবারক "অমৃত" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। হরিতকীর মাত্রা ও সেবনের তারতম্যে যাবতীয় রোগ নিঃসন্দেহ রূপে আরোগ্য হইতে পারে, অধুনা হরিতকী সাধারণের নিকট তাচ্ছিল্লের বস্তু হইলেও এবং আধুনিক চিকিৎসকগণ হরিতকীকে অতি তুচ্ছ বনের ফল মাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিলেও, আমরা প্রাচীন আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহার কতিপয় গুণাবলী নিম্নে লিপীবদ্ধ করিলাম, ইহার তুল্য সর্ব্বরোগঘ্ন মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই, হরিতকী প্রকার ভেদে সপ্তপ্রকার হয়।

"বিজয়া রোহিণীশ্চৈব পুতনা অমৃতা তথা।
অভয়া জীবন্তী শ্চৈব চেতকীর সপ্ত সংযোগ॥
এতে সপ্তাভিধায়েন হরিতক্য প্রকীর্ত্তিতা॥"

বিজয়া—অলাবুর ন্যায় বৃন্ত বিশিষ্ট, গুণে অন্যান্য প্রকার হইতে ইহা প্রধান, সর্ব্বরোগেই দেওয়া যায় এবং সহজে পাওয়া যায়।

রোহিণী—বৃন্ত গোলাকার, ক্ষত রোগের প্রধান ঔষধ।

পূতনা—অল্প ত্বক বিশিষ্ট, লেপনে শরীরের যন্ত্রণা, ফুলা, ক্ষত, বেদনা নষ্ট হয়, ইহা সিন্ধু দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

অমৃতা—স্থুল ত্বক বিশিষ্ট, বিরেচক, বৃন্দাবনে পাওয়া যায়।

অভয়া—পঞ্চ শির বিশিষ্ট, চক্ষু রোগের মহৌষধ, বিষ চিকিৎসায় ফণিজ ও দেহজ বিষ নষ্ট হয়, চম্পা প্রদেশে পাওয়া যায়।

জীবন্তী—বর্ণ স্বর্ণ স্বরূপ, অজীর্ণ, উদরাময় রোগের ঔষধ, সৌরাষ্ট্র দেশে পাওয়া যায়।

চেতকী—ত্রিশির বিশিষ্ট, সর্ব্বরোগে মাত্রা ও অনুপান তারতম্যে দেওয়া যায়। হিমালয় প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মধু যেমন সর্ব্ব রোগেই প্রায় ব্যবহৃত হয়, হরিতকীও তদ্রূপ মধুর ন্যায় যোগ বাহী গুণ বিশিষ্ট, ইহা প্রত্যেক ঔষধে অনুপান রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

হরিতকী সেবনে আহার জাত সর্ব্বপ্রকার পীড়ানাশ হয়, চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নির বৃদ্ধি হয় এবং পেষণ করিয়া উদরস্থ করিলে মল শুদ্ধি হয়।

বলহীন, রুগ্ন, কৃশ, উপবাসী ও পথশ্রান্ত এবং পিত্তাধিক্যে হরিতকী ব্যবহার নিষিদ্ধ, গর্ভবতী স্ত্রীর পক্ষেও হরিতকী সেবন নিষিদ্ধ, এতদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার রোগে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে হরিতকী সেবন বিধি, ইহাতে অনিষ্টের বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা নাই, শাস্ত্রে আছে ;—

"কদাচিৎ কুপ্যাতি মাতা নো দরস্থা হরিতকী।
মাতেব ভক্ষয়ে দ্যোহি হিতকারী হরিতকী।"

মাতাও বরং ক্রুদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু হরিতকী উদরস্থ হইয়া কখনই অনিষ্ট করে না। অপিচ মাতার ন্যায় সর্ব্বদা হিতকারী হইয়া থাকে।

ভাজা হরিতকী সর্ব্বদোষ-বিনাশক। ঋতু ভেদে অনুপান সহিত হরিতকী সেবন করিলে মানব দেব দেহ তুল্য কান্তি বিশিষ্ট এবং নীরোগী হইতে পারেন। গ্রীষ্মে গুড়, বর্ষায় সৈন্ধব লবণ, শরতে শর্করা, হেমন্তে শুঁট, শীতে পিপুল, বসন্তে মধু, অনুপান রূপে ব্যবহার করিলে কোন প্রকার ব্যাধি তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারে না, এইজন্যই হরিতকী "অমৃত" বলিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

অতি অল্প মাত্র পরিশ্রমে হরিতকী হইতে একপ্রকার নির্য্যাস নির্গত করা যাইতে পারে, সেই নির্য্যাস অনুপান ভেদে ব্যবহার করাইলে, কেবল মাত্র হরিতকী দ্বারা যাবতীয় রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে। উপায়টী এই ;—

কতকগুলি হরিতকী বৃক্ষ হইতে সদ্য ছিন্ন করিয়া একটী পরিষ্কার মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহার গলা পর্য্যন্ত জল দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে, এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ শর্করা ও লবণ নিক্ষেপ করিয়া হাঁড়ির মুখ সরা দ্বারা উত্তমরূপে আবদ্ধ করিতে হইবে। পরিমাণ যথা ;—হরিতকী একসের, জল তিন সের, লবণ এক পোয়া, চিনি অর্দ্ধ সের। ময়দার কাই প্রস্তুত করিয়া সরা ও হাঁড়ির ছিদ্র সমুদায় উত্তমরূপে এমনভাবে বদ্ধ করিতে হইবে যে, কোন মতে হাঁড়ির মধ্যস্থিত ধুম উপরে উঠিতে পারে না। এইরূপে হাঁড়ির মুখ বদ্ধ করিয়া উত্তাপ দিতে থাকিবে, হাঁড়ির মধ্যদেশ অতি সন্তর্পণে ভেদ করিয়া একটী গোলাকার ছিদ্র ও ছিদ্র মুখে একটী বক্রনল প্রবেশ করাইয়া সেই নলের নিম্নে একটী কাচের পরিষ্কার গ্লাস রাখিয়া দিবে, উত্তাপে ক্রমে ক্রমে সেই নল বহিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম সেই পাত্রে পতিত হইতে থাকিবে। ইহাকেই "হরিতকী নির্য্যাস" কহে, এই নির্য্যাসের পরিমাণের সিকি ভাগ স্পিরিট একত্রে মিশ্রিত করিলে বহুকাল রাখা যায়। এক্ষণে কোন্ কোন্ অনুপান সহ যোগে ব্যবহার করিলে কি কি পীড়া আরোগ্য হয় তাহার দুই চারিটী নিম্নে বিবৃত হইল।

১। এক ছটাক কাঁচা জলে পাঁচ হইতে দশ ফোঁটা নির্য্যাস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদরের পীড়া আরোগ্য হয়, আবার এতদ্বারা কোষ্ঠবদ্ধ ও নিরাকৃত হইয়া থাকে।

২। তুলসীরস ও বিল্বপত্র রস সহ যোগে সেবন করিলে বহুমূত্র, রক্তপ্রস্রাব, প্রদর, ও মেহ আরোগ্য হয়।

৩। গন্ধক চূর্ণ সহ যোগে ব্যবহারে এক সপ্তাহ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ ভাল হয়।

৪। এই নির্য্যাস-ব্যবহারে শরীর স্থূল ও রক্ত পরিষ্কার করে।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুণ আছে, এতাদৃক গুণ সম্পন্ন বস্তু বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে থাকা আবশ্যক ও সর্ব্বক্ষণ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। হিন্দু বিধবা ও যাহারা সাহস করিয়া কবিরাজের ঔষধও সেবন করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে সদ্য এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করান যাইতে পারে, নূতন প্রস্তুত করিয়া এক মাসের মধ্যে সেবন করিলে স্পিরিট দিতে হয় না।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

চৈত্র মাস।

সব্জী বাগান।—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসের জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স ও স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভূট্টা দানা মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদি ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্র। এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউশ ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁকমাটী ও সার দিতে হয়। এখানে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য লোককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন, চৈত্রে মাটী, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটী দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এই মাসেই ধঞ্চে, পাট, অরহর, আউশ ধান বুনিতে হয়।—চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—বিলাতী মরসুমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতেরও শেষ হইল, গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগ্নোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্ট, জিনিয়া, আষ্টারসম, ফ্লক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে ঐই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদি লিচু যাহা এই সময় পাকিতেছে সেই লিচু গাছে জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।

REGISTERED No. C 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

চৈত্র, ১৩১৮।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



দ্বাদশ খণ্ড,—১২শ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

চৈত্র, ১৩১৮।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন, বিবাহের তত্ত্বে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ ৸৹ বায়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতেপারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹। মাশুলাদি ।৶৹। তিন শিশির মূল্য ২৲। মাশুলাদি ৸৶৹ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি, ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারা-দোষ নাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা; মাশুলাদি ॥৶৹ আনা।

অম্লপিত্তান্তক চূর্ণ।

পাকযন্ত্রের বিকৃতি হইলে, ভুক্তদ্রব্যের সম্যক পরিপাক হয় না। তাহা হইতেই অম্লরোগ জন্মায়। ইহাতে বুকজ্বালা, পেটফাঁপা, অম্লোদ্গার, কোষ্ঠকাঠিন্য, (স্থলবিশেষে উদরাময়) প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদের "অম্লপিত্তান্তক চূর্ণ" সেবনে অল্পসময়ে নির্দ্দোষরূপে এই সকল উপসর্গ বিদূরিত হইয়া শরীর সুস্থ ও সবল হয়, আহারে রুচি জন্মে এবং সহজে পরিপাক হয়। যাঁহারা সতত উক্ত রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা আমাদের এই ঔষধ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

মূল্য—প্রতি শিশি ১৲; মাশুলাদি ।৶৹ আনা।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বদেশী এসেন্স্।

বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্‌কা বকুলফুলের মতই অটুট সুন্দর।



দিল্‌ অব্‌ রোজ।—ইহার সৌরভ কেমন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। বস্তুতঃ ইহা একটী অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় সামগ্রী।

গোলাপসার।—নামমাত্রেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গমাতা।—বাঙ্গালীর "বঙ্গমাতা" সমস্ত বাঙ্গালার গৌরবস্বরূপ।

খস্‌খস্‌।—প্রথম গ্রীষ্মের দিনে খস্‌খসের মত এমন আরামপ্রদ এসেন্স আর নাই।

গন্ধরাজ।—সত্য সত্যই ইহা রাজভোগ্য সৌরভসার।

পারিজাত।—এ যেন সত্য সত্যই স্বর্গীয় সৌরভে বিভোর করে।

মস্ক্‌-জেসমিন।—মিলিত নামই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸৹ বার আনা। ছোট ।৶৹ সাত আনা। প্রিয়জনের প্রীতি-উপহারের জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২॥৹ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট তিন শিশি ১।৹ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸৹ বার আনা, ডাকমাশুল ।৶৹ সাত আনা। অডিকলোন ১ শিশি ॥৹ আট আনা। মাশুলাদি ।৶৹ পাঁচ আনা। আমাদের অটো ডি রোজ, অটো অব্‌ নিরোলী, অটো অব্‌ মতিয়া ও অটো অব্‌ খস্‌খস্‌ অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা। ডজন ১০৲ দশ টাকা।

মিল্ক্‌ অব্‌ রোজ।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ পাঁচ আনা।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমারা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্‌।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কৃষক।

সূচীপত্র।

চৈত্র, ১৩১৮ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

Devoted to Gardening and Agr'culture. Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulation.

It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3-8. 1 Column Rs. 2.
½ Column Rs. 1-8

MANAGER—"KRISHAK,"
162, Bowbazar Street, Calcutta.

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

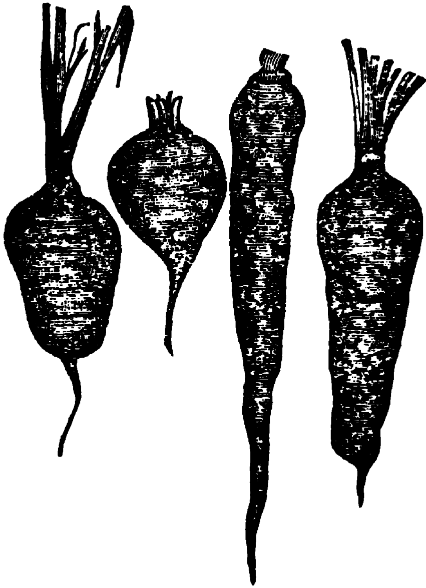
১২শ খণ্ড। } চৈত্র, ১৩১৮ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

সব্জী চাষ.

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিলাতী গাজর

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ



গাজর

মৃত্তিকা—হাল্কা দোয়াঁস মাটি। চাষের জমি কিছু গভীর কর্ষিত হওয়া আবশ্যক।

সার—গোবর সার, মিশ্র-সার প্রভৃতি। খৈল ও অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করিলে ফলন অধিক হয়।

বপনাদি প্রণালী—চারা হাপরে প্রস্তত না করিয়া, এককালে চাষের জমিতে বপন করিতে হয়। গাজরের জন্য জমি রীতিমত কর্ষণ করা কর্ত্তব্য। গাজর মূলজ ফসল। জমি কিছু গভীর ভাবে কর্ষণ ও বিশেষরূপ ঢেলাবিহীন করিতে হয়। উক্তরূপে কর্ষিত জমিতে অল্প প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ—"চৌকা" বা "পটী" * প্রস্তত করিয়া—তাহাতে পাতলা করিয়া বীজ বপন করিলে, অন্য বন্দোবস্ত অপেক্ষা অনেক সুবিধা হয়। বীজ বপন করিয়া—মাটি শুষ্ক থাকিলে—জল সেচন আবশ্যক হয়। চারা উৎপন্ন হইয়া দুই বা চারিটি পত্রযুক্ত হইলে—প্রত্যেক চারা সাত বা আট ইঞ্চি পৃথক করিয়া বসাইতে হয়।

* চারি ধারে মাটির "আইল" দেওয়া (অল্পোচ্চ মাটি দেওয়া) অল্প প্রশস্ত ও অপ্লাধিক দীর্ঘ চাষের জমিকে "চৌক" বা "পটী" কহে।

জল সেচনাদি—আবশ্যক মত জলসিঞ্চন ও আগাছা হইলে—তদোত্তোলন ভিন্ন আর কিছু করিতে হয় না।

বিশেষ কথা—বিলাতী গাজর দেশী গাজর অপেক্ষা আস্বাদনে সুমিষ্ট ও সুঘ্রাণযুক্ত।

বীজের পরিমাণ—এক কাঠা বা ৭২০ বর্গ ফিট জমির জন্য ১০ আউন্স।

গাজরের বীজ হইতে অঙ্কুর ফুটাইতে একটু কৌশল চাই। প্রথমে বীজগুলি একটী গামলায় জল দিয়া ভিজাইতে হয়। দুই ঘণ্টা ঐ জলে রাখিয়া একটী কাপড়ের পুঁটুলীতে ভিজা বীজগুলি বাঁধিয়া রৌদ্রে রাখিবে; সমস্ত দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সন্ধ্যাকালে হাপরে রাখিবে; কোন স্থানে দুই হাত গভীর একটী গর্ত্ত খুলিয়া, ঐ গর্ত্তের ভিতরে বিচালী বিছাইয়া দিবে। পরে ঐ বীজপূর্ণ পুঁটুলী রাখিয়া তাহার উপর আবার বিচালী দিয়া মাটী চাপা দিয়া রাখিবে। ইহারই নাম হাপরে রাখা। ফল কথা বীজ ভিজাইয়া যে কোন প্রকারে হউক গরমে রাখা। পরিমাণ মত উত্তাপ না পাইলে তাহাতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। সমস্ত রাত্রি ঐরূপ অবস্থায় হাপরে রাখিয়া সকালে তাহাকে উঠাইয়া আবার ভিজাইয়া পূর্ব্বের মত রৌদ্রে রাখিবে ও রাত্রিতে হাপরে রাখিবে। এই প্রকারে তিন দিবস করিলেই বীজ হইতে অঙ্কুর হইবে। এই রূপে বীজগুলির অঙ্কুর হইলে ঐ বীজগুলি পূর্ব্বোক্তরূপ তৈয়ারি জমিতে ইচ্ছামত লাইনবন্দী করিয়া বসাইবে অথবা ইচ্ছামত ছড়াইয়া দিবে।

গাজর, বীট প্রভৃতি সমুদয় ক্ষেতের উপর যথেচ্ছ ভাবে আবাদ না করিয়া সারিবন্দি বীজ বপন করিলে ভবিষ্যতে ক্ষেতের পাইট করিবার সুবিধা হয়, ক্ষেত নিড়াইবার ও কোপাইবার বেশ সুযোগ থাকে। বিশেষতঃ চাকাযুক্ত প্লানেট জুনিয়ার কোদালে চাষ করিতে হইলে সারিবন্দি আবাদ হওয়াই আবশ্যক। দুইটি সারি মধ্যে চলাফেরা করা এবং ক্ষেত কারকিত মেরামত করা সহজ হইয়া পড়ে। গাজরের ক্ষেতে বীজ ঘন বাহির হইলে উপরন্তু চারা উঠাইয়া ফেলিয়া পাতলা করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

অন্য একটী উপায় এই যে, একটী মাটীর গামলা বা কেরোসিনের বাক্সে ভিজা বালি দিয়া তাহাতে গাজর বীজ মিশ্রিত করিয়া ২।৩ দিন গামলা বা বাক্স একটি চট দিয়া ঢাকিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিলে বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইবে। এই উপায়টী সহজ বটে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিধি ইহা অপেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হয়।

বিলাতী গাজর বীজে এই প্রকারে পাট করিতে হয়। পাটনাই গাজর, বিলাতী গাজর অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল। ইহার ফলনও বিঘা প্রতি বিলাতী গাজর অপেক্ষা অনেক বেশী। এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে পাটনাই গাজরের চাষ করা নিতান্ত বিধেয়। গোধুম ধান্যাদি শস্য না হইলে, ইহার উপর কতক পরিমাণে নির্ভর করা যাইতে পারে। ঐ সময়ে গাজর খাইয়া গবাদি পশুও প্রাণ বাঁচাইতে পারে।

সময় সময় পাটনাই গাজর বিঘা প্রতি ১০০/ এক শত মণ পর্য্যন্তও ফলিতে দেখা গিয়াছে। ইহা কাঁচা খাইতেও ভাল। পশ্চিম প্রদেশের লোকেরা কাঁচা গাজর আগ্রহ সহকারে খায়। ইহা খাইতে সুমিষ্ট ও অত্যন্ত পুষ্টিকারক। কাঁচা গাজর কতকটা দুষ্পাচ্য, সেই জন্য কাঁচা খাইলে অনেকক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, অথচ শরীর ভাল থাকে—কোন অসুখ হয় না। অতএব অন্নক্লিষ্ট দেশে ইহাকে মহোপকারী খাদ্য বলিয়া ধরিতে হইবে। একর প্রতি /৪ সের পরিমাণে বীজ লাগিয়া থাকে। ইহার চাষ খুব কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য নহে এবং কেবলমাত্র জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় না। গাজর খাওয়াইলে ঘোড়া বলিষ্ঠ হয় এবং গো মহিষাদিকে খাওয়াইলে তাহাদের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় ও তাহাদের দুগ্ধ মিষ্ট হয়। ইহার চাষে জমিও দুই মাসের অধিক দিন আবদ্ধ থাকে না। আমাদের দেশের কৃষকগণ যাহাতে জমিতে কিছু কিছু গাজর চাষ করে এমত উপদেশ তাহাদের দিলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবে না।

গাজর পশু-খাদ্যের উপযুক্ত কি না তাহা বুঝিবার জন্য বিলাতী গাজরে কি কি পদার্থ আছে তাহার একটী তালিকা নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।

বিলাতী গাজর—	জল	৮৭·৩০
	শ্বেতসার	·৬৬
	শর্করা	৮·১০
	আঁস (fibre)	৩·২০
	ধাতব পদার্থ	·৭৪

পাটনাই গাজর বিলাতী গাজরের মত উৎকৃষ্ট না হইলেও উহাতে ঐ সমস্ত পদার্থ ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে।

পারস্‌নিপ

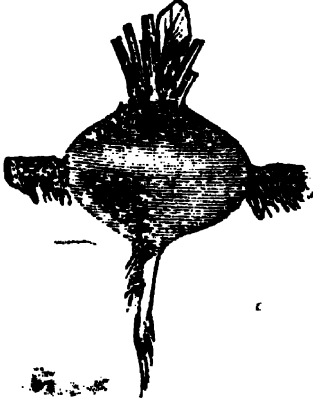
গাজর ও বীটের ন্যায় ইহাও মূলজ খন্দের অন্তর্গত। ইহা পুষ্টিকর ও সুখাদ্য এবং খাইতে সুস্বাদু। চাষাবাদের নিয়ম গাজর বা বীটেরই অনুরূপ। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ইহার চাষ ততটা প্রচলিত হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ এই যে, ইহার বীজ এদেশের হাওয়ায় অতি শীঘ্র খারাপ হইয়া যায়। প্রতি বৎসর ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বীজ আনান ও সাবধানে বীজ রাখা উচিত। বৃষ্টির অভাব হইলে সেচন জলের আবশ্যক হয়, শুষ্ক প্রদেশ সমূহে ইহার ক্ষেতে প্রতি সপ্তাহে এক ইঞ্চ হিসাবে জল সিঞ্চনের আবশ্যকতা দেখা যায়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে নিম্ন সমতল প্রদেশে নভেম্বর মাসে বীজ বপন করিতে হয়। মূলার যেমন হাপরে চারা করিয়া স্থানান্তরে রোপণের আবশ্যক হয় না, স্বক্ষেত্রে বীজ বুনান করিলেই চলে, পারস্‌নিপ বীজও তদ্রূপ স্বক্ষেত্রে বুনিতে হয়।

বীজের পরিমাণ—এক বিঘা জমি চাষের জন্য ২।৹ আউন্স বীজ যথেষ্ট।

বীট

বপনের সময়—ভাদ্র হইতে পৌষ

মৃত্তিকা—সারযুক্ত হাল্কা মাটি। চাষের জমি ছায়াবিহীন হওয়া প্রার্থনীয়।



বীট



বীট

সার—পুরাতন হাল্কা সার—গোবর বা আবর্জ্জনাদির সার—জমির সহিত লাঙ্গল সাহায্যে অথবা কোদালীদ্বারা মিশ্রিত করা আবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার মূলজ খন্দের চাষে জমি ঢেলাবিহীন করিতে হয়। বীটের চাষেও মাটি যতদুর পারা যায়, গভীর কর্ষণদ্বারা ধূলির ন্যায় করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে তরল (জল মিশ্রিত) সার প্রয়োগ করিতে পারিলে ভাল হয়। কেবল গোবর সার প্রয়োগে বীট তত সুস্বাদু হয় না। একর প্রতি ৫৲ মণ সরিষার খৈল দিলে ভাল হয়।

বপনাদি প্রণালী—পার্শ্বস্থিত জমি অপেক্ষা দুই ইঞ্চি উচ্চ "হাপরে" বীজ ছড়াইয়া প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণে চূর্ণ মাটি চাপা দিয়া আবশ্যক মত জলসিঞ্চন করিতে হয়। হাপরে চারা না করিয়া চাষের জমিতেও একবারে বীজ ফেলিলে চলে। চারা "হাপরে" প্রস্তুত করিয়া—অথবা চাষের জমিতে বীজ ছড়াইয়া চারা বাহির হইলে—এবং ঐ চারাগুলি চারি কিম্বা পাঁচ ইঞ্চি বড় হইলে লাইনবন্দী করিয়া প্রত্যেক চারাটী নয় ইঞ্চি অন্তর বসাইতে হয়। প্রত্যেক লাইন পনর ইঞ্চি অন্তর হইবে। বর্ষা থাকিতে থাকিতে বীজ বপন করিলে জমি কিছু উচ্চ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জলসিঞ্চন ও অবশিষ্ট কার্য্য—নূতনত্ব কিছুই নাই।

বীটের চারা নাড়িয়া বসাইবার অনেক সময় সুবিধা হয়। বড় বড় ক্ষেত্রে এইজন্য বীজ ছড়াইয়া বপন করা হয়।

বীজের পরিমাণ—একর প্রতি ৴২॥ সের বীজের আবশ্যক হয়।

পালঙ-শাক

বপনের সময়—ভাদ্র, আশ্বিন মাস

পালঙ-শাক ভারতবাসীর বড় আদরের তরকারী। বীজ বপনের পর অল্প দিন মধ্যেই আহার উপযোগী হয়। ইহার কচি কচি পাতা কাটিয়া রন্ধন করা হইয়া থাকে। ভাদ্র, আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিবার সময়। কেহ কেহ ইহার অনেক আগে বীজ বুনিয়া থাকেন। খুব উচ্চ জমি না হইলে বর্ষায় পালঙ হয় না। ৪ বর্গ হাত এক একটি কেয়ারি তৈয়ার করিয়া তাহাতে গোয়াল ঘরের মিশ্রিত সার দিয়া ছয় ইঞ্চি ব্যবধানে দুইটি করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। সকল বীজ অঙ্কুরিত না হইতে পারে, যদি সকল বীজই অঙ্কুরিত হয়, তাহা হইলে এক একটি চারা তুলিয়া অন্য খালি জায়গায় পুতিয়া দিয়া ক্ষেত পাতলা করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে নিয়মিত প্রণালীতে বীজ বপন করিলে অল্প স্থানে অধিক শাক উৎপন্ন হইতে পারে। ঘন ঘন গাছ জন্মিলে গাছগুলি ছোট হয় সুতরাং তাহার পত্র সংখ্যাও অল্প হইয়া থাকে। যাঁহারা অধিক জমিতে পালঙ বুনেন তাঁহারা ক্ষেতে বীজ ছড়াইয়া ফেলিয়া থাকেন। ইহাতে অনেক বীজ নষ্ট হয়, গাছের পাতাগুলি একটু বড় হইয়া উঠিলে মূলের দুই অঙ্গুলি উপর হইতে পাতা কাটিয়া লইতে হয়। দুই তিন বার কাটিবার পর পটি মধ্যে একবার সার ছড়াইয়া দিতে পারিলে গাছের তেজ পুনরায় বাড়ে।

—•—

চুকা-পালঙ

ইহার পাতার আস্বাদ অম্লাক্ত, চাটনির জন্যই ইহার ব্যবহার। শীত কালেই ইহা জন্মিয়া থাকে এবং পালঙ শাকের ন্যায় আবাদের নিয়ম সুতরাং তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র আর অধিক কিছু লেখা গেল না।

চুকা পালঙ বা মিষ্ট পালঙ যে কোনটির চাষ করা যাউক না যদি এক ফুট অন্তর সারি এবং প্রতি সারিতে ৫ কিম্বা ৬ ইঞ্চ অন্তর বীজ বোনা যায় তবে পালঙ্গের ঝাড় বাধে এবং অল্প বীজে কাজ হয়।

বীজের পরিমাণ—এক একর জমিতে চাষের জন্য প্রায় এক সের বীজের আবশ্যক। বীটের বীজ একর প্রতি ৬০ তোলার প্রয়োজন। পালঙ, বীটেরই জাতি—প্রভেদ এই, মূলের জন্য বীটের আদর, পালঙের ব্যবহার শাক খাইবার জন্য। পালঙ্গের মূল বীটের মত পরিপুষ্ট হয় না।

স্পাইনাক্

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ

মৃত্তিকা—হাল্কা দোয়াঁস মাটি।

সার—প্রচলিত যে কোন প্রকার সার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বপনাদি প্রণালী—অল্প ছায়াযুক্ত স্থানে ইহার চাষ হইতে পারে। বীজ একবারে চাষের জমিতে বপন করিতে হয়। রীতিমত প্রস্তুত চাষের জমিতে দশ হইতে পনর ইঞ্চি পৃথক লাইন কাটিয়া—সেই লাইনে বীজ পাতলা করিয়া বপন করিতে হয়। পরে চারা বহির্গত হইয়া চারিটী পত্রযুক্ত হইলে—প্রত্যেক চারা আট বা দশ ইঞ্চি পৃথক করিয়া রোপণ করা আবশ্যক।

অবশিষ্ট কার্য্য ও জল সেচন—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যথারীতি জলসিঞ্চন আবশ্যক। এতদ্ সম্বন্ধে জল সিঞ্চন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। গাছের মূলদেশের মাটি মধ্যে মধ্যে সঞ্চালিত করা অর্থাৎ খুশিয়া দেওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে আগাছার মূলোচ্ছেদ করিতে হয়।

ইহা পালঙ জাতীয় সব্জী, দেশী পালঙ্গের মত ইহার ডাঁটা, পাতা খাইতে হয়।

নিউজিলণ্ড দেশীয় স্পাইনাক্ খাইতে খুব সুমিষ্ট এবং সাধারণ স্পাইনাকের যে তীব্র গন্ধ, তাহা ইহাতে নাই। যদি দেশী পালঙ ও স্পাইনাক্ প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বাংশে বীটেরই মত, কিন্তু বীটের যেমন মূল খাওয়া যায় ইহাদের মূল প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য; বরং দেশী পালঙ্গের মূল খাওয়া যায়, কিন্তু স্পাইনাকের মূল অব্যবহার্য্য।

আর্টিচোক বা হাতিচোক

বপনের সময়—ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক

মৃত্তিকা—দোয়াঁস হাল্কা মাটি। শক্ত মৃত্তিকাতেও আর্টিচোক জন্মিয়া থাকে।

সার—দোয়াঁস হাল্কা মাটি হইলে পুরাতন গোবর বা আবর্জ্জনাদির সার অথবা উভয় সারই অর্দ্ধেক পরিমাণে জমির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলেই চলিবে। শক্ত মৃত্তিকা হইলে "ঘোড়া"র সার প্রয়োগ করা বিধেয়। চাষের সমস্ত জমিতে মিশ্রিত করিবার মত অধিক পরিমাণে সার সংগৃহীত না থাকিলে—চারিফুট অন্তর এবং দীর্ঘে, প্রস্থেও গভীর এক হস্ত পরিমাণ গর্ত্ত করিয়া—সেই গর্ত্তের মাটি ঢেলাবিহীন করিয়া—তাহার সহিত যথোচিত সার মিশ্রিত করিয়া—সেই গর্ত্তে এক একটী চারা বসাইলেও চলিবে।

বপণ প্রণালী ও জলসিঞ্চনাদি—বীজ হইতে চারা "হাপরে" প্রস্তুত করিয়া পরে চাষের জমিতে বসাইতে হয়। "হাপর" পার্শ্বস্থিত জমি অপেক্ষা কিছু উচ্চ (দুই তিন ইঞ্চি) হওয়া আবশ্যক। বৃষ্টির জল পড়িলে যেন হাপরে আবদ্ধ হইয়া না থাকে। সমস্তই যেন বহিয়া চলিয়া যায়। "হাপরে"র মৃত্তিকা ধূলির ন্যায় চূর্ণ করিয়া—যে কোন পুরাতন সহজলভ্য সার মিশ্রিত করিতে হইবে। বীজ ছড়াইয়া অর্দ্ধ ইঞ্চি বা তদপেক্ষা কিছু বেশী চূর্ণ মাটি চাপা দিতে হয়। জলসিঞ্চন দুই অথবা একদিবস অন্তর করা হইয়া থাকে বটে—কিন্তু জলসিঞ্চন ব্যাপার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ করা বিধেয়। বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইলে—এবং ঐ চারাগুলির চারি বা পাঁচটী পাতা জন্মাইলে—চাষের জমিতে প্রত্যেক দিকে চারিফুট অন্তরে এক একটী চারা বসাইতে হয়। ইহাতে একর প্রতি ২,৭২৩টী চারা আবশ্যক হয়। মধ্যে মধ্যে রীতিমত জলসিঞ্চন করাই ইহার বিশেষ কার্য্য।

অবশিষ্ট কার্য্য—ক্ষেত্র হইতে আগাছা উত্তোলন এবং মধ্যে মধ্যে "নিড়ানি" যন্ত্রের দ্বারা গাছের মূলদেশের মাটি সঞ্চালন করিয়া দিতে হয়।

বীজের পরিমাণ ২ আউন্স। ইহার বীজ অনেক বাদ যায় নতুবা ১॥০ আউন্স বীজে কাজ চলে।

বিশেষ কথা—আর্টিচোক দুই প্রকার। উপরে যাহার বিষয় লিখিত হইল—উহার অপ্রস্ফুটিত কুসুমকোরক ভক্ষ্য। আর এক প্রকার আর্টিচোক আছে—

তাহার মূল বা জড় সব্জীরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে "জেরুজলেম্ আর্টিচোক" বলে। "মূল আর্টিচোক" বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইহা বীজ হইতে উৎপন্ন হয় না। মূল রোপণ করিয়া গাছ করিতে হয়।

বীজের পরিমাণ। মূল বসাইলে প্রায় একরে ১॥০ বা ২/ মণ মূল আবশ্যক হয়। চাষ প্রায় সর্ব্বপ্রকারে আদা চাষের অনুরূপ।

জেরুজলেম আর্টিচোক।

আমেরিকার উত্তর-প্রদেশে ইহা স্বভাবতঃ জন্মায়। জেরুজলেম আর্টিচোকের নাম বলিয়া ইহাকে জেরুজলেমের সামগ্রী মনে করা উচিত নহে। কচুর মুখীর মত ইহার মূল হয়, এক গোড়ার আলুর মত অনেকগুলি গেঁড় জন্মে তাহাই আহার্য্য। আলুর মত ইহার জমির গভীর চাষ আবশ্যক এবং মাটিও হাল্কা দোয়াঁস হওয়া প্রয়োজন। জমিতে মাঘ মাসে উত্তমরূপে সার দিয়া ও মাটি চূর্ণ করিয়া ফাল্গুন মাস মধ্যে ইহার মূল ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। ক্ষেত্রে ২॥০ ফুট × এক ফুট ব্যবধানে তিন ইঞ্চ মাটি চাপা দিয়া গেঁড় পুতিতে হয়। সুপুষ্ট গেঁড় না হইলে তাহা হইতে ভাল চারা উৎপন্ন হয় না। যতদিন না চারা বাহির হয় ততদিন দুই এক দিবস অন্তর জল দিতে হইবে। চারা বাহির হইতে দশ বা বার দিন সময় লাগে। পরে মধ্যে মধ্যে অবস্থা বুঝিয়া জল সেচন করিতে হইবে। গাছগুলি এক ফুট উচ্চ হইলে আলুগাছের ন্যায় গোড়ায় মাটি দিতে হইবে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাস মধ্যে উহার মূল ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে কিন্তু সুপুষ্ট করিবার জন্য পৌষ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে রাখা আবশ্যক। ক্ষেত্র হইতে মূলগুলি উঠাইয়া শুষ্ক বালি মধ্যে রাখিয়া দিলে ভাল থাকে। আর্টিচোকের মূল পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে এবং ইহা সুঘ্রাণ। যে স্থানে আলু জন্মান কঠিন তথায় ইহার প্রচলন করায় লাভ আছে। অনেকের মতে,—ইহার প্রচুর চাষ থাকিলে দুর্ভিক্ষকালে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। ইহার আবাদ উত্তরোত্তর যাহাতে দেশ মধ্যে বিস্তৃত হয় সে বিষয়ে সকলের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

বীজের পরিমাণ—এক একর চাষের জন্য ১॥০ মণ গেঁড়োর আবশ্যক। একর প্রতি ফলন ৪০ হইতে ৫০ মণ। দাম—সাধারণতঃ বাজারে দুই আনা সের দরে বিক্রয় হয়।

সার

কৃষি-কুশল—শ্রীযুৎ রাজনারায়ণ বিশ্বাস লিখিত

জন্তুগণ যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিয়া জীবিত থাকে এবং বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়, উদ্ভিদগণও সেইরূপ আহার্য্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয় এবং জীবিত থাকে। মৃত্তিকা মধ্যে উদ্ভিদের খাদ্য স্বভাবতঃ নিহিত থাকে, উদ্ভিদ সেই খাদ্য আহার করিয়া জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়। এক জমিতে পুনঃ পুনঃ এক জাতীয় শস্যের চাষে উদ্ভিদের খাদ্য নিঃশেষিত হইয়া যায়। তখন আর সেই জমিতে সেই জাতীয় উদ্ভিদ বপণ বা রোপণ করিলে, পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ ও বর্দ্ধিত হয় না। তখন সেই জমিতে উদ্ভিদের খাদ্য পুনঃ প্রদান না করিলে আর আশানুরূপ ফল প্রাপ্তির উপায় থাকে না। তখন উদ্ভিদের খাদ্যের জন্য জমিতে সার প্রয়োগ নিতান্ত আবশ্যক।

কিন্তু উদ্ভিদের খাদ্যের উপাদান, মৃত্তিকায় সভাবতঃ নিহিত থাকে। জমিতে পুনঃ পুনঃ চাষ আবাদ করিলেও উদ্ভিদের খাদ্যের সকল উপাদান এককালে নিঃশেষিত হয় না। ঐ সকল উপাদানের মধ্যে কতকগুলি উপাদান নিঃশেষিত হয় মাত্র। ভূমিস্থ সোরাজান (নাইট্রোজান), ক্ষারজান (পোটাসিয়ম), হাড়জান (ফস্‌ফোরস) ও চুণজান (ক্যালসিয়ম) এই সকল উপাদান উদ্ভিদ স্বীয় পোষনের জন্য মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে, সুতরাং শীঘ্রই এই সকল উপাদান কমিয়া যায়। অন্যান্য অনেক উপাদানও উদ্ভিদের পোষণ জন্য ব্যয়িত হয় বটে, কিন্তু সে সকল উপাদান মৃত্তিকায় স্বভাবতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে, তজ্জন্য মনুষ্যের সেই সকল উপাদান প্রদান করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় মৃত্তিকায় পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার উপাদানের মধ্যে ক্যালসিয়ম উপাদানও সচরাচর দিবার তত আবশ্যক হয় না। ইহা জমিতে স্বভাবতঃই বিদ্যমান আছে, সহজে ফুরায় না এবং একবার দিলে আর অনেক দিন দিবার দরকার হয় না। ভূমিস্থিত সোরাজান, ক্ষারজান ও হাড়জান শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া যায়। এ কারণ কৃষককে ঐ তিনটী উপাদানের অভাব পূরণ করিতে হয়।

উদ্ভিদগণ বায়ুমণ্ডল হইতে আর একটি খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, সেটি অঙ্গার। অঙ্গার কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস রূপে পত্রমুখে উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে। কিঞ্চিন্মাত্র বায়বীয় য়্যামোনিয়া বা অঙ্গারীয় এসিড ব্যতীত বাকী আহারোপযোগী সার সমূহ উদ্ভিদগণ মূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে আকর্ষণ করিয়া লয়। জল ও উদ্ভিদ দেহ গঠনের একটি প্রধান উপাদান। উদ্ভিদ, শরীরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল ও রসরূপে সর্ব্বদাই

বিদ্যমান। উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সার সমূহ জল দ্বারা গলিয়া রসরূপে পরিণত হইলে তবে উদ্ভিদগণ গ্রহণ করিতে পারে।

আমরা আমাদের প্রস্তাবনা এস্থলে একটু বিশদ করিয়া বলিতে চাই। উদ্ভি শরীরের পত্র ত্বকাদি বায়ুমণ্ডলস্থিত অঙ্গার বাষ্প (কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস) দ্বার এবং উদ্ভিদ কঙ্কাল ও দারুময় ভাগে মৃত্তিকা নিহিত পটাস, ফস্ফরিক, অম্ল এব য়্যামোনিয়া (নাট্রোজেন) দ্বারা গঠিত হয়। মনুষ্য দেহের হাড়ের সহিত উদ্ভিদে দারুময় (কাষ্ঠ) ভাগের তুলনা করা যাইতে পারে। ত্বক ও পত্রাদি কঙ্কালাচ্ছাদিত মাংস ছাল স্বরূপ। মৃত্তিকা এবং বায়ুমণ্ডল হইতে হউক বা যে কোন উপা উদ্ভিদ নিজ নিজ গঠনোপযোগী পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহারা জীবিত থাকিতে পারে। এই কারণে আমরা সমুদ্র গর্ভে জীবিত উদ্ভিদ দেখিতে পাই উদ্ভিদের খাদ্য সমুদ্রজলে নিশ্চয়ই নিহিত আছে। সরোবর কিম্বা পুষ্করিণী আদি জলের উপর উদ্ভিদ জন্মিতেছে। তাহারা বায়ুমণ্ডল হইতে তাহাদের ত্বকাদি নির্ম্মাণকারী, ও জল হইতে দারু নির্ম্মানকারী আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছে।

আহারোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে না পারিলে যেমন উদ্ভিদ বাঁচে ন তেমনি আবার কেবল মাত্র আহার যোগাইলেই উদ্ভিদকে বাঁচাইয়া রাখা যায় না উদ্ভিদের মৃত্তিকানিহিত তিনটি উপদান যেমন জলদ্বারা গলিত হইয়া রসরূপে পরিণত না হইলে উদ্ভিদগণ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না, তেমনই উদ্ভিদের সমুদ খাদ্য উদ্ভিদের আহারোপযোগী অবস্থায় আনিবার জন্য আর একটি শক্তি প্রয়োজন। সূর্য্যালোক সেই শক্তি প্রদান করিয়া থাকে। সূর্য্যালোক ভূমি নিহিত খাদ্যবস্তু রূপান্তরিত করিয়া উদ্ভিদের আহারোপযোগী রস রূপে পরিণত করে।

এই সূর্য্যালোকের জন্য আমাদের বড় কিছু ভাবনা নাই। সূর্য্যালোক কিম্ব ত্বক পত্রাদি নির্ম্মাণকারী কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস আমরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যথ তথা পাই। আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, উদ্ভিদ প্রতিনিয়ত তাহার দারুময় দেহ বা অস্থি গঠন করিতে যাহা সংগ্রহ করিতেছে এবং তদ্দ্বারা ভূমির উর্ব্বরত শক্তির যে ক্ষয় হইতেছে, আমরা কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই ক্ষয় নিবারণ করিতে পারিব। ভূমির উর্ব্বরতার ক্ষয় নিবারণের জন্য ভূমিতে সার প্রদান করিতে হয়, উদ্ভিদের আহার যোগাইতে হয়। কতকগুলি সারে সোরজান ক্ষারজান, হাড়জান এই তিনটী উপাদনই বিদ্যমান থাকে আবার কতকগুলি সারে ঐ তিনটীর মধ্যে একটী বা দুইটী উপাদান থাকে। যে সারে ঐ তিনটী উপাদনই বিদ্যমান থাকে, ভূমিতে সে সার দিলে আর অন্য সার দিবার প্রয়োজন হয় না; কারণ ভূমির যে তিনটী উপাদান ব্যয়িত হইয়া ভূমি অনুর্ব্বরা হয়, ঐ সার ভূমিতে দিলে

সে অভাব পূরণ হইয়া ভূমি আবার উর্ব্বরা হইয়া উঠে। যে সার দ্বারা ভূমির পূর্ব্বোক্ত তিনটী উপাদান পুনঃ প্রাপ্ত হয়, প্রতি বৎসর কৃষকের সেই সার দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে ভূমির উর্ব্বরতা নষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

সারকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে ইচ্ছা করি, যে সারে উদ্ভিদের সকল অভাব পূরণ হয়, অর্থাৎ যে সারে সোরাজান, ক্ষারজান ও হাড়জান এই তিনটী উপাদানই বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সাধারণ সার ; আর যে সারে উদ্ভিদের আংশিক অভাব পূরণ করে অর্থাৎ যে সারে পূর্ব্বোক্ত উপাদানের মধ্যে দুইটী কি একটী উপাদান বিদ্যমান থাকে, তাহাকে বিশেষ সার আখ্যা প্রদান করা যায় এই সাধারণ ও বিশেষ সার আবার তিন প্রকার যথা, প্রাণীজ, খনিজ, উদ্ভিজ্জ। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ সারের অধিকাংশই সাধারণ সারের অন্তর্ভূ্ত। আর খনিজ সারের অধিকাংশ সারই বিশেষ সারের মধ্যে গণিত হয়। প্রাণীজ সারের যে সকল-গুলিই সাধারণ সার এ কথা আমরা বলিতেছি না ; যেমন জন্তুগণের মলমূত্র সাধারণ সার, কিন্তু তাহাদের অস্থি বিশেষ সারের অন্তর্ভূ্ত।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী উপাদানের মধ্যে সোরাজানই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী। যে সারে সোরাজান অধিক পরিমাণ থাকে, সেই সারই অধিক আদরণীয়। সকল উদ্ভিদের পক্ষেই যে সোরাজানবিশিষ্ট সার বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। এমন কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যে, তাহাতে সোরাজানের তত আবশ্যক হয় না। ধান্য প্রভৃতি তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে সোরাজানবিশিষ্ট সার বিশেষ প্রয়োজনীয় ; আর শিম্বিজাতীয় ফসলের পক্ষে সোরাজানবহুল সারের তত প্রয়োজন হয় না। বরং ঐ জাতীয় ফসল বায়ু হইতে সোরাজান আকর্ষণ করিয়া আপনাদের পুষ্টি সাধন করে এবং আপন দেহে ও মূলে সঞ্চিত করিয়া রাখে। ঐ শিম্বিজাতীয় ফসল উৎপাটন বা ছেদন করিয়া লইলেও বহু সংখ্যক মূল জমির মধ্যে নিহিত থাকে ; তজ্জন্য ঐ সকল জমিতে বহু পরিমাণ সোরাজান সঞ্চিত হয় ; সুতরাং জমির উর্ব্বরতা বাড়িয়া যায়। এই সকল কারণে পর্য্যায় রোপণে বিনা সারেও অনেক সময় আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারা যায়। শণ, ধঞ্চে সকল প্রকার কলাই শিম্বি জাতীয় ফসল। এই সকল ফসল বপন করিবার পর ধান্যাদি তৃণ জাতীয় ফসল বপণ বা রোপণ করিলে বিনা সারেও বিশেষ ফল লাভ করিতে পারা যায়। প্রায় উদ্ভিদ মাত্রেই বায়ু ও বৃষ্টি হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সোরাজান আকর্ষণ করিয়া আপনাদের পুষ্টি সাধন করে বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য বলিয়া তাহার উপর নির্ভর করিলে চলে না। তজ্জন্য জমিতে উদ্ভিদের পুষ্টি সাধনোপযোগী অভাব পূরণ জন্য সার দিবার নিতান্ত

প্রয়োজন হয়। বিনা সারে উদ্ভিদাদি রোপণ বা চাষ করা নিতান্ত বিড়ম্বনা ভোগ মাত্র।

সাধারণ সার,—আমাদের দেশে জমিতে যে সার দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে গোবরই সাধারণ সারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণতঃ গৃহপালিত জন্তুগণের মলমূত্রই গোবর সার বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। গোবর সারে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সমস্ত উপাদান বিদ্যমান আছে। জমিতে গোবর সার দিলে, বৃক্ষ লতাদির সকল অভাব অল্প বিস্তর পূরণ হইয়া থাকে। গোবরে সোরাজান, হাড়জান, ক্ষারজান এই তিনটী উদ্ভিদের প্রধান পোষণোপযোগী পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণ সংমিশ্রিত থাকে। গোবর প্রাণীজ সারের মধ্যে গণনীয়। গোবর সারে সুত্রাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থ বিদ্যমান থাকায় মৃত্তিকার স্বাভাবিক গঠনের পরিবর্ত্তন হয়, ঘন সম্বদ্ধ মাটি আল্গাভাব ধারণ করিয়া শস্য আবাদের অধিকতর উপযোগী হয়। কিন্তু গোবর সার রাখিবার দোষে অনেক তেজস্কর পদার্থ নষ্ট হইয়া থাকে। অজ্ঞ কৃষকেরা চির প্রচলিত প্রথানুসারে একস্থানে গোবরের গাদা করিয়া রাখিয়া থাকে। ইহাতে গোবর সারের অধিকাংশ তেজস্কর পদার্থ বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া যায়। রৌদ্রে শুষ্ক হইয়াও গোবরের অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে। গোবর সার রাখিবার সুবন্দোবস্ত করা কৃষক গণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

গোবরে শতকরা প্রায় ৭৫ মণ জল, অবশিষ্ট কঠিন পদার্থ। একশত মণ গোবরে ঘুঁটা প্রস্তুত করাইলে, তাহার জলীয় অংশ প্রায় ৭৫ মণ বাষ্প হইয়া যায়। অবশিষ্টে ২৫ মণ অপেক্ষা কিছু অধিক কঠিন পদার্থ বিদ্যমান থাকে। ঘুঁটের ঐ কঠিন অংশ পোড়াইলে, ৭।৮ মণ ভস্ম অবশিষ্ট থাকে; বাকী ১৭।১৮ মণ জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া যায়। যে ৭।৮ মণ ভস্ম অবশিষ্ট থাকে, জ্বলিয়া যায় না, তাহাতেই ক্ষারজান ও হাড়জান কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমানই থাকে। যে ১৭।১৮ মণ জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতেই সোরাজানের অংশ থাকে। এ জন্য গোবরের ভস্মে সোরাজানের অংশ বিদ্যমান থাকে না। গোবর সারে যে প্রকার উপকার হয়, ঘুঁটের ছাই দ্বারা সে প্রকার উপকার পাওয়া যায় না। গোবর পোড়াইলে তাহার প্রধান তেজস্কর সোরাজান জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কৃষকের গোবর পোড়ান কোনরূপে কর্ত্তব্য নহে।

জীবজন্তুর মল ব্যতীত আরও অনেক সাধারণ সার আছে। জান্তব, উদ্ভিজ্জ ও উদ্ভিজ্জ সার মাত্রেই প্রায় সাধারণ সার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কারণ ঐ সকল সার জমিতে প্রদান করিলে জমির সকল অভাব পূরণ করিয়া থাকে। ঐ সকল সারে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী প্রায় সমস্ত উপাদান বিদ্যমান আছে। লতা পাতা, খড় ঘাস, প্রভৃতি উদ্ভিদ দেহ এবং

জন্তুর দেহ পচিয়া যে সার প্রস্তুত হয় তাহা সাধারণ সারের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। পুকুরের পানা ও সাঁজ পচিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপ সার হইতে পারে। ঐ সকল সার জমিতে দিলে গোবরের ন্যায় কার্য্য করে।

খইল মাত্রেই সাধারণ সার। খইলে কতকটা গোবরের ন্যায় কার্য্য করে। কিন্তু গোবর ও খইলের গুণের অনেক প্রভেদ আছে। গোবরে যে পরিমাণ সোরাজান থাকে, খইলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি থাকে। কিন্তু খইল অপেক্ষা গোবরে ক্ষারজান ও হাড়জান অনেক অধিক থাকে। এজন্য খইলকে সোরাজানময় সার বলা যাইতে পারে। অন্যান্য খইল অপেক্ষা রেড়ির খইলে সোরাজানের অংশ অধিক। খইলে সোরাজানাদি উপাদান উদ্ভিদের পোষণোপযোগী পদার্থে পরিণত থাকায়, খইল জমিতে দিবামাত্রেই উদ্ভিদের আশু উপকার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রেড়ির খইল জমিতে দিবার পর এক সপ্তাহ মধ্যে তাহার ফল দেখিতে পাওয়া যায়। গোমূত্রাদি ব্যতীত অন্য কোন সারে রেড়ির খইলের ন্যায় আশু উপকার পাইতে দেখা যায় না। খইল অপেক্ষা গোবরে জলীয় অংশ অনেক অধিক। একশত মণ কাঁচা গোবরে প্রায় ৭৫ মণ জল থাকে। একশত মণ খইলে ৮।১০ মণের অধিক জল থাকে না। এজন্য গোবর অপেক্ষা অল্প খইলে অধিক উপকার পাওয়া যায়। সকল প্রকার খইলই সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এক্ষণে কৃষকদিগকে রেড়ির খইল ও সরিষার খইল সার রূপে ব্যবহার করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশেষ সার,—ফস্ফরাস প্রধান সার—সকল জন্তুরই হাড় সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, হাড় আমাদের দেশে প্রায়ই সার রূপে ব্যবহৃত হয় না। হাড়ে অল্প পরিমাণে সোরাজান ও বহু পরিমাণে হাড়জান থাকে, ইহাতে ক্ষারজান প্রায়ই থাকে না। সুতরাং হাড় দ্বারা উদ্ভিদের সকল অভাব পূরণ হয় না। এজন্য ইহাকে সাধারণ সার না বলিয়া বিশেষ সার কহে। জমিতে হাড় প্রয়োগ করিলে হাড়ের সোরাজান ও হাড়জান মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া উহার তেজ বৃদ্ধি করে। একশত মণ হাড়ে ৭।৫ মণ সোরাজান ও ২৪।২৫ মণ হাড়জান থাকে। হাড় জমির মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইলে ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া পরিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ পচে। গোটা হাড় অপেক্ষা গুঁড়া হাড় শীঘ্র রূপান্তরিত হইয়া পচিয়া থাকে। আস্ত হাড় রূপান্তরিত হইতে দীর্ঘ সময় লাগে। আস্ত হাড় জমিতে দিলে তাহা মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইতে বহু বৎসর লাগে। আস্ত হাড় এত অল্প পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়া উদ্ভিদের পোষণোপযোগী পদার্থে পরিণত হয় যে, তদ্বারা উদ্ভিদের আশু উপকার দেখিতে পাওয়া যায় না। একারণ আস্ত হাড় প্রয়োগ না করিয়া গুঁড়া হাড়

প্রয়োগ করা উচিত। গুঁড়া হাড় প্রয়োগ করিলে, তাহা সত্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ভিদের পোষণোপযোগী পদার্থে পরিণত হয় এবং তদ্বারা আশু উদ্ভিদের উপকার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে হাড় গুঁড়া করিবার কোন সহজ উপায় নাই। যত দিন পর্য্যন্ত না হাড় গুঁড়া করিবার কোন সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত হাড় ব্যবহারের আশু সুবিধা নাই।

সকল গ্রামেই মৃত গো দেহ ফেলিয়া দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ভাগাড় আছে। অন্য কোন মৃত জন্তুর দেহ তথায় ফেলিতে দেখা যায় না এবং তাহা ফেলিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানও নাই;—যেখানে সেখানে ফেলিয়া থাকে। মৃত গরু ভাগাড়ে ফেলিয়া দিলে মুচিরা সেই মৃত গরুর চামড়া ও মাংস কাটিয়া লইয়া যায়, বড় বড় হাড়গুলি পড়িয়া থাকে। 'এখানকার কৃষকেরা ঐ গো হাড় অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে, এ কারণ ঐ গো হাড় তাহারা স্পর্শও করে না। পূর্ব্বে ভাগাড়ে বড় বড় গো হাড় রাশীকৃত হইয়া থাকিত। কয়েক বৎসর হইতে ভিন্ন স্থানের লোকেরা আসিয়া ঐ সকল গো হাড় সংগ্রহ করিয়া গো গাড়িতে বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছে। এক্ষণে আর ভাগাড়ে একটীও গো হাড় দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনা যায়, ঐ সকল হাড় চূর্ণ হইবার জন্য ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চালান যাইতেছে।

হাড়ের সহিত গন্ধক দ্রাবক মিশ্রিত করিলে, হাড় নরম হইয়া সহজে গুঁড়া হইয়া যায়। গন্ধক দ্রাবক মিশ্রিত করিলে হাড়ের আর এক পরিবর্ত্তন হয়। হাড়ে হাড়জান যে অবস্থায় থাকে, তাহা উদ্ভিদের পোষণোপযোগী অবস্থায় থাকে না। মৃত্তিকার সহিত কিছু দিন সংমিশ্রিত থাকিলে তাপ, জল বায়ু ও অন্যান্য পদার্থের সংযোগে হাড়ের হাড়জান পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ভিদের পোষণোপযোগী পদার্থে পরিণত হয়। আস্ত হাড় অপেক্ষা গুঁড়া হাড় অল্প সময় মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ভিদের পোষণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু গন্ধক দ্রাবক হাড়ের সহিত সংযোগ করিলে, ঐ পরিবর্ত্তন অতি অল্প কাল মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা মাটিতে প্রয়োগ করিবামাত্র, উদ্ভিদে প্রবেশ করিতে পারে। হাড়ের গুঁড়া প্রতি বিঘায় ২/০ মণ দিলেই যথেষ্ট হয়। (ক্রমশঃ)

হরিদ্রা

জাপান প্রত্যাগত কৃষিতত্ত্ববিদ্—শ্রীযুৎ যামিনীমোহন মজুমদার লিখিত

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠতে হলুদ রোও।
দাবা পাশা খেলা ফেলে থোও॥
আষাঢ় শ্রাবণে নিড়ায় মাটী।
ভাঙ্গরে নিড়ায়ে করিবে খাটি॥
অন্যথা পিয়ে পুতলে হলদি।
পৃথিবী বলেন তাতে না ফলদি॥ (খনা)

হরিদ্রার নাম—হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, নিশাবাচক শব্দ বরবর্ণনী, ক্রিমিঘ্না, হলদি, যোষিৎপ্রিয়া ও হরবিলাসিনী।

১। হরিদ্রার গুণ—আমরা পাক করিবার সময় মাছে, তরকারিতে ও ডাউলে হলুদ ব্যবহার করিয়া থাকি,—সাধারণে হরিদ্রার একমাত্র ব্যবহারই জানেন। কিন্তু হরিদ্রা একটী মহৎ উপকারী বস্তু। নানা কঠিন পীড়ায় ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে হরিদ্রা কফ, বায়ু আশ্রিত কুষ্ঠ, কুণ্ড এবং ব্রণ ইত্যাদির একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাজবল্লভ গ্রন্থ মতে হরিদ্রা সোথ রোগেরও একটী উত্তম ঔষধ। শোথ রোগে ডাক্তারি মতে আজ কাল হরিদ্রার ব্যবহার হইতেছে। হরিদ্রার যে কৃমি নষ্ট করিবার একটী আশ্চর্য্য শক্তি আছে তাহা পল্লিগ্রামের অনেক গৃহস্থ ললনাগণ অবগত আছেন। শিশুদিগের ক্রিমি হইলে সচরাচার গুড়ের সহিত কাঁচা হলুদ খাওয়াইয়া দেওয়া হয়। অভিধানে হরিদ্রার অপর নাম বর্ণবতী। অনেক দেশের স্ত্রী লোকগণ প্রতিদিন কাঁচা হলুদ মাখিয়া স্নান করতঃ এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। আজ কাল ডাক্তারি পুস্তকেও হরিদ্রার গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ হইয়াছে। ডাক্তার রমফিস্ সাহেবের মতে সকল প্রকার চর্ম্মরোগের পক্ষেই হরিদ্রা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তারি মতে হরিদ্রা আগ্নেয় অর্থাৎ ইহা হইতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। কোন কোন ডাক্তার বলেন, কাঁমলা এবং বহুমূত্র পীড়ায় পীড়িত রোগীর পক্ষে হরিদ্রা বিশেষ উপকারী। ডাক্তারদের মধ্যেও অনেকে কাঁচা হরিদ্রার রস ক্রিমির জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পরন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও মতে কঠিন নাকে ঘা ইত্যাদির পক্ষে হরিদ্রার ছাই একটী মহৌষধি। হরিদ্রা পোড়াইয়া তাহার ছাই এবং মার্গছা তৈল একত্রে মিশাইয়া নাকে দিলে যে কোন প্রকার নাকে ঘা হউক প্রায়ই আরোগ্য হয়।

বিলাতের বৈজ্ঞানিকেরা ও ডাক্তারেরা হরিদ্রার সাহায্যে আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় পরিক্ষা করিয়া থাকেন। আহারের কোন বস্তুতে কিম্বা কোন ঔষধে প্রস্রাবে বা জলে সারক পদার্থ আছে কি না, ইহা পরীক্ষার জন্য টারমেরিক নামক যে কাগজ ব্যবহার হয় তাহা হরিদ্রার দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। হরিদ্রা কাগজে মাখাইয়া তাহা বাতাসে শুখাইয়া সেই কাগজ কোন বস্তুর মধ্যে দিলে যদি লাল বা কটা রঙ হয় তবেই বুঝা যায় তাহাতে ক্ষার পদার্থ আছে। বিখ্যাত ডাক্তার রইলে সাহেব নানা অনুসন্ধান ও পরিক্ষা করিয়া হরিদ্রার এই কয়টী গুণ স্থির করিয়াছেন—১ হরিদ্রার রস তিক্ত, ২ সাগন্ধযুক্ত, ৩ উত্তেজক, ৪ বলকারক, ৫ উদরের পীড়ানাশক, ৬ সবিরাম জ্বর নিবারক, এবং ৭ উদরী পীড়ানাশক। মুসলমান হাকিমগণের মতেও হরিদ্রা অনেক পীড়ার ঔষধ, প্রমেহ পীড়ায় সর্ব্বদাই তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। হরিদ্রা যে কেবল ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার হয় এমন নহে ইহার অনেকগুণ আছে। হরিদ্রা কুমিরের পক্ষে ভয়ানক বিষ, কোন প্রকারে কুমিরের গাত্রে একটু প্রবেশ করিলেই কুমীর মরিয়া যায়, একারণ শীকারিগণ গুলীতে হরিদ্রা মাখাইয়া বন্দুকে ব্যবহার করেণ। হরিদ্রার গন্ধে কুমীর পলায় বলিয়া কুমীরভরা নদীতে হরিদ্রা গাত্রে মাখিয়া স্নানে বিপদের আশঙ্কা থাকে না। এ কারণ দাক্ষিণাত্যের লোকেরা হরিদ্রা গাত্রে ব্যবহার করে। সাপও হরিদ্রার গন্ধ সহ্য করিতে পারে না।

হরিদ্রা সমস্ত প্রকার পোকা নষ্ট করে, হরিদ্রায় পচা নিবারণ করে, এজন্য চামারেরা চাম প্রস্তুত করিতে হরিদ্রা ব্যবহার করে। অনেকে গোলাপ ইত্যাদির চারা রোপণ করিয়া উইয়ের ও অন্যান্য পোকার উপদ্রবে বড় কষ্ট পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যদি হলুদ গুলিয়া পিচ্‌কারীর দ্বারায় গাছে ও মাটীতে ছিটাইয়া চারা রোপণ করেণ তবে পোকায় আর গাছ নষ্ট করিতে পারে না।

২। হরিদ্রার ব্যবসা—হরিদ্রার গুণও যেরূপ ইহার ব্যবসায় লাভ ও তেমনি প্রচুর। যত্ন করিয়া হরিদ্রার চাষ করিলে একর প্রতি খরচ বাদে ৮০৲ হইতে ১২০৲ পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশ হইতে পশ্চিমে হরিদ্রা রপ্তানী হয়। বিদেশে এদেশ হইতে এখনও অধিক পরিমাণে যাইতে পারিতেছে না। চীন ও জাপান দেশেও ইহার আবাদ হয়। ব্যবসার জন্য ২ প্রকার হরিদ্রা প্রস্তুত হয়। একপ্রকার ইহাকে জলে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া বস্তাবন্দি করিতে হয়। আর একপ্রকার ইহার চুর্ণ প্রস্তুত করিয়া চিনি বা লবনের মত বস্তাবন্দি করিয়া ব্যবসার জন্য চালান দেওয়া হয়। এই প্রকার হলুদের মূল্য অধিক; কিন্তু প্রথম প্রকারের হরিদ্রা অধিক দিন ভাল থাকে।

৩। হরিদ্রার জাতি ভেদ—আমাদের দেশে চারি জাতীয় হলুদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা পাঁকানিরা, কাজলা, ছকমো ও বাঘহাতা। ইহার মধ্যে প্রথম দুই জাতীয় হলুদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাছাড় অঞ্চলে কামরাঙ্গা নামক এক জাতি হলুদ পাওয়া যায়। ঐ হলুদ মোটা হয় বটে কিন্তু সিদ্ধ করিলে গুঁট প্রস্তুত হয় না; কাঁচা বেলায় ইহার রঙ ঠিক চীনে সিন্দুরের ন্যায় দেখায়। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছাঁচি, বাঘনালী, বয়ারবাঁট, আদা গেঁটে, খেজুর ছড়ী ইত্যাদি নানা নামে নানা জাতীয় হলুদ জন্মে।

৪। হরিদ্রার কৃষি স্থান নিরূপণ—দোয়াঁস বেলে মাটী হরিদ্রার উপযুক্ত জমি, মেটেল অথবা একেবারে বালি মাটীতে হলুদ ভাল হয় না। অধিক দিনের পতিত জমিতে উত্তম হরিদ্রা জন্মে। অধিক দিনের পতিত জমি না পাওয়া গেলে অন্ততঃ চার পাঁচ বৎসরের পতিত জমিতে হলুদ মন্দ হয় না। যে জমি বন্যার জলে ডুবিয়া যায় অথবা যাহাতে বৃষ্টির জল বাঁধিয়া থাকে, সে প্রকার জমিতে কখনই হলুদ হইতে পারে না, কারণ হলুদ গাছের নীচে জল বাঁধিলে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫। সময় নির্ব্বাচন—১৫ই বৈশাখের পর হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত হরিদ্রা রোপণের উৎকৃষ্ট সময়। ইহার পর হরিদ্রা রোপণ করিলে গাছ নিস্তেজ হয়; সুতরাং তাহার নীচে হলুদ জন্মে না।

৬। সার কথন—পতিত ক্ষেত্রে সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, স্বভাবতঃই তাহার উর্ব্বরতাশক্তি অধিক হইয়া থাকে। ওচলামাটী, পচা পাতা, পচা খড়, হরিদ্রা ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তম সার। গোবর সার নিষিদ্ধ, কারণ ইহাতে কড়া পোকা জন্মিয়া চারা কাটিয়া দেয়; আর পোকা না হইলেও গাছ শীঘ্র বড় হইয়া যায়, সেই জন্য হলুদের পরিমাণও কম হয়; এবং যে হলুদ হয় তাহাও মোটা হইয়া পড়ে, তাহাতে জলীয় অংশ বেশী থাকে, কাজেই মোটের উপর ফলন কমিয়া যায়।

৭। চাষ প্রণালী—যে জমিতে হলুদের চাষ করিতে হইবে, তাহা অন্ততঃ এক ফুট করিয়া খনন করা কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে ঐ জমি একবার কোদাল দিয়া কোপাইয়া রাখিতে হয়, তাহার পর ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে দোকোপা করিয়া তাহার উপর ৩।৪ বার মই দিয়া জমি সমান করিয়া লইতে হয়। হলুদের জমিতে কিছু কিছু ঢেলা থাকা আবশ্যক, কারণ ঢেলা থাকিলে জমিতে ফাঁপ থাকে, সুতরাং হলুদও ভাল জন্মে। লাঙ্গল দ্বারা চাষ না করিয়া কোদাল দ্বারা জমি কোপাইয়া জমি প্রস্তুত করিয়া হরিদ্রা রোপণই প্রশস্ত।

৮। বীজ কথন—হলুদের মোথাই বীজরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোথার অভাবে বড় বড় মুখী দ্বারাও বীজ করা যাইতে পারে। মুখী দ্বারা বীজ করা

হইলে তাহার গাত্রসংলগ্ন ছোট মুখী গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। মোথার বীজ অপেক্ষা মুখীর বীজে হলুদ কম জন্মে।

৯। রোপণ পদ্ধতি—জমি প্রস্তুত হইলে, তাহার এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক এক হাত অন্তর ৫।৬ অঙ্গুলী গভীর করিয়া সোজাসুজি জুলি কাটিয়া তাহার মধ্যে ১৫।১৬ অঙ্গুলী ব্যবধানে এক একটী বীজ ফেলিয়া তাহার পর ৩।৪ অঙ্গুলী মাটী চাপা দিতে হয়। কৃষকেরা জুলি, কাটা ও হরিদ্রার বীজ রোপণ এক সঙ্গেই করিয়া থাকে। তাহারা প্রথমে একটী জুলি কাটিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে বীজ ফেলিয়া যায় এবং দ্বিতীয় জুলির মাটী প্রথম জুলিতে রোপিত বীজের উপর চাপা দেয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে একটী জুলির মাটী অন্য জুলির বীজের উপর চাপা দিয়া গেলেই বীজ রোপণের কার্য্য সহজে সম্পাদিত হয়। হলুদের জমিতে জল নিকাশের জন্য দীর্ঘ প্রস্থে এক ফুট নালা কাটিয়া দিয়া তাহা কতকগুলি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়া দিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। হলুদের জমি যত শুক্‌না থাকে ততই ভাল। কোন কোন স্থানে দীর্ঘ প্রস্থে আধ হাত অন্তর ঐরূপে হলুদের বীজ রোপণের পদ্ধতি আছে। কিন্তু তাহা ভাল ব্যবস্থা নহে। ইহাতে গাছ অত্যন্ত ঘন ঘন হয় এবং হলুদ কম জন্মে। বিশেষতঃ হলুদ তুলিবার সময় কোদালের কোপ লাগিয়া অনেক হলুদ কাটিয়া যায়। হলুদ গাছের গোড়ায় দাঁড়া বাঁধিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। দাঁড়া বা আইল বাঁধিয়া না দিলে গাছের গোড়ায় জল বাঁধিয়া গাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বীজ রোপণ করিয়া তাহার উপরকার মাটীগুলি হাত দিয়া সমান করিয়া না দিলেও চলে। ক্ষেত্রে যে ছোট ছোট ঢেলা থাকিবে, তাহা বৃষ্টির জলে গলিয়া গিয়া আপনাআপনি মাটী সমান হইয়া যাইবে। চারা বাহির হইলে এক মাস পরে একবার নিড়াইয়া দিতে হয়। প্রথমবার নিড়ানের পর ২০।২৫ দিনের পর পুনরায় নিড়ান উচিত, কারণ হরিদ্রা ক্ষেত্রে ঘাস হইতে দেওয়া উচিত নহে। দো-নিড়ানির পরে হলুদ গাছে আইল বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। আইল বাঁধিবার জন্য গাছের মধ্যে মধ্যে জুলি কাটা হইবে, তাহার গভীরতা যেন আধ হাতের অধিক না হয়। গাছ বড় হইলে তাহার নীচে ঘাস জন্মিতে পারে না, জন্মিলেও আপনি মরিয়া যায়। যদি নিতান্তই অধিক ঘাস জন্মে তবে হাত দিয়া তুলিয়া ফেলিলেই চলিবে। ইহার পর হলুদক্ষেত্রের কোন কাজ নাই। কেবল গরু বাছুর যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে তদ্রূপ বেড়া দেওয়া উচিত।

১০। হরিদ্রা উত্তোলন—মাঘ মাসে কি তাহার পূর্ব্বে হলুদের গাছগুলি শুকাইলে তাহা ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত করিতে বা পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে প্রত্যেক আইল বা পিলের ফাঁকে ফাঁকে কোপাইয়া হলুদ তুলিতে হয়। হলুদ

তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হলুদের মুখীগুলিও পৃথক করিয়া লওয়া আবশ্যক। মোথীগুলি এই সময় উত্তমরূপে ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া এবং তাহা বীজের জন্য কোন বৃক্ষের ছাওয়ায় অথবা কোন শীতল স্থানে গাদা করিয়া পোয়াল (খড়) চাপা দিয়া রাখিতে হয়।

১১। সিদ্ধ ও শুষ্ক প্রণালী—হরিদ্রা সিদ্ধ করিয়া তাহার শুট প্রস্তুত করা অপেক্ষাকৃত কিছু কঠিন কার্য্য; কিরূপে হলুদ সিদ্ধ করিতে হয় এবং সেই সিদ্ধ হলুদ কিরূপেই বা শুকাইতে হয়, যাঁহারা স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহারা কেবল পুস্তিকা পাঠ করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন। সিদ্ধ করিবার সময় অন্যমনস্ক হইলে, একটু তাপ খারাপ হইলে সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়। হলুদ কম সিদ্ধ হইলে দরকোচা মারিয়া যায়, শুট হয় না এবং অধিক সিদ্ধ হইলে রঙ জ্বলিয়া যায়।

হরিদ্রা সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে নাদা, ঝুড়ি ও তেকাটা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। এই গুলি হলুদ সিদ্ধ করিবার উপকরণ। যে স্থানে হলুদ সিদ্ধ করার উনান কিংবা বাইন কাটা হইবে, তাহার অনতিদূরে নাদা পাতিয়া তাহার উপর তেকাটা ও ঝুড়ি বসাইয়া রাখিতে হয়। মাঝারি রকমের তোলো হাঁড়িই হলুদ সিদ্ধ করিবার উপযুক্ত পাত্র। প্রথমতঃ হাঁড়ির চারি ভাগের তিন ভাগ হরিদ্রা পূর্ণ করিয়া তাহাতে গোবর মিশ্রিত জল ঢালিয়া দিতে হয়। ঐ জল যেন হরিদ্রার তিন অঙ্গুলী নীচে থাকে। হলুদের সমান সমান জল দেওয়া কিম্বা জল দিয়া হলুদ ডুবাইয়া দেওয়া উচিত নহে। জ্বাল দিতে দিতে যখন হরিদ্রা উতলাইয়া পড়িবে সেই সময় একটা কাঠির দ্বারা ঠাসিয়া দিয়া তাহা হইতে নামাইয়া ঝুড়ির মধ্যে তাড়াতাড়ি ঢালিয়া দিতে হইবে। একবার উতলাইয়া উঠিলেই যে হলুদ সিদ্ধ হইল এমত নহে, ঐ গরম জলের তাপ সমুদয় হলুদের উপর লাগিয়াছে কি না ইহা দেখিয়া তবে উনান হইতে হলুদ নামাইতে হইবে। যদি বুঝিতে পারা যায় যে, গরম জলের ভাপ উপরকার হলুদের উপর ভাল করিয়া লাগে নাই, তাহা হইলে আর একবার উতলাইলে নামাইতে হয়। দুইবারের অধিক জল উতলাইতে দেওয়া উচিত নহে। হলুদ সিদ্ধ হইয়া গেলে তাহা তাড়াতাড়ি করিয়া ঐ ঝুড়ির মধ্যে ঢালিয়া ফেলা যাইতে পারে। তৎপরে সমস্ত সিদ্ধ হলুদগুলি একস্থানে গাদা করিয়া প্রথম দিন চেটাই কিম্বা ছালা দিয়া ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় দিনে ঐ সিদ্ধ হলুদ কোন ঘাসযুক্ত স্থানে ৩।৪ অঙ্গুলী পুরু করিয়া বিছাইয়া দিতে হয় এবং প্রত্যেক চারি দিন অন্তর তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিতে হয়, এইরূপ করিলে যখন হলুদের রস মরিয়া যাইবে, তখন হলুদগুলি দলিতে হইবে। না দলিলে হলুদের দানা গোল হইবে না, চেপ্টা হইয়া যাইবে। ৩।৪ বার দলিলেই দানা গোল হইবে। এক দিনেই তিন চার বার দলিতে হইবে এমন নহে;

প্রথম দিন দলিবার ২।৩ দিন পরে দ্বিতীয়বার দলিতে হইবে। দলিয়া দিবার পরও যত দিন না শুকায় ততদিন রৌদ্রে দিতে হইবে। ভাল করিয়া শুকাইলে ঐ হলুদ কুলা দ্বারা ঝাড়িয়া গোলাজাত কিম্বা বস্তাবন্দি করিয়া রাখিতে হয়। মাঘ মাসের মধ্যেই হলুদ সিদ্ধ কার্য্য শেষ করিতে হয়। হলুদে পোকা লাগিলে তাহা গরুর চোনা মাখাইয়া শুকাইলে পোকা মরিয়া যায়। হলুদ ভাল জন্মিলে বিঘা প্রতি ২০/ মণ শুষ্ক হরিদ্রা পাওয়া যায়। এক জমিতে দুই বারের বেশী হলুদ রোপণ উচিত নহে, কারণ হলুদ জমির উর্ব্বরতা নষ্ট করে। হলুদ তুলিয়া সেই ক্ষেত্রে ভালরূপে সার না দিয়া অন্য ফসল দেওয়া উচিত নহে।

আলুর পোকা

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ হইতে প্রাপ্ত

উৎপত্তি ও বৃদ্ধি—কয়েক বৎসর হইল এই পোকা ইউরোপ হইতে বীজ-আলুর সহিত ভারতবর্ষে আইসে এবং ১৯০৭ সালে প্রথমে পাটনার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি আলুর গুদামে বিশেষ অনিষ্ট করে। রেলের রপ্তানির হিসাবে খুঁজিয়া দেখা গিয়াছে কেবলমাত্র পাটনা সহরে এই পোকার উপদ্রবে আলুর রপ্তানি ১৯০৮ সালে ২৭৭০০০ (দুই শত সাতাত্তর হাজার) মণ হইতে ১৯১১ সালে কেবল মাত্র ৫৪০০০ (চুয়ান্ন হাজার) মণে দাঁড়াইয়াছে। ১৯১১ সালে এই পোকার উপদ্রব সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা, বর্দ্ধমান, হাওড়া ও আন্দুল প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত জায়গা হইতে শুনা গিয়াছে এবং খুব সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে বাঙলার যেখানে যেখানে আলুর চাষ হইয়া থাকে সেই খানে এই পোকা ক্ষতি করিতে আরম্ভ করিবে।

জীবন বৃত্তান্ত ও বিবরণ—ক্ষেতে স্ত্রী প্রজাপতি আলু গাছের পাতার বা ডাঁটার উপর ডিম পাড়িয়া থাকে এবং কীড়াগুলি ডিম হইতে ফুটিয়া পাতায় বা ডাঁটার ভিতর প্রবেশ করিয়া খাইতে থাকে এবং তজ্জন্য সেই পাতা বা ডাঁটাগুলি শুকাইয়া যায়। আলুর উপরও ইহা অনুরূপ ভাবে ডিম পাড়ে। আলু চোখের উপর স্ত্রী প্রজাপতি ডিম পাড়ে এবং কীড়াগুলি ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়া আলুর ভিতর প্রবেশ করিয়া ইহার শাঁস খাইতে থাকে। গুদাম জাত আলুর অনিষ্ট এইরূপ ভাবে হয়। আলু চোখের নিকট কাল রঙের গুঁড়া গুঁড়া কীড়ার বিষ্ঠা দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে উহাতে পোকা লাগিয়াছে। দশ পনর দিন এইরূপ

ভাবে খাইয়া কীড়াগুলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তখন প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা দেখিতে শাদা রঙের ছোট গুটি বাঁধিয়া তাহার ভিতর পুত্তলী হইয়া থাকে এবং অল্প দিনের ভিতর প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। প্রজাপতিটী প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা এবং দেখিতে ছোট কাল রঙের হয়। স্ত্রী প্রজাপতি গুলি আলু গুদামের ভিতর ভাল আলুর চোখের নিকট ডিম পাড়ে ; সাধারণতঃ গুদামে আলু ঢাকা থাকে না সেই জন্য স্ত্রী প্রজাপতিগুলির ডিম পাড়িবার সুবিধা হয় এবং অল্প কালের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং সেই পরিমাণে আলুর ক্ষতি হয়। প্রত্যেক স্ত্রী প্রজাপতি প্রায় ১০০ (একশত) করিয়া ডিম পাড়ে এবং এক মাসের ভিতর সেইগুলি প্রজাপতি হইয়া পুনরায় ডিম পাড়িয়া থাকে। যেখানে এই পোকার প্রকোপ বেশী হইয়াছে সেখানে কোনরূপ প্রতিকার বিনা আলু ভাল ভাবে রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বাঙলাদেশে চৈত্র হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ঐ পোকা হইতে গুদাম জাত আলুর বিশেষ ক্ষতি হয়।

উপায়—সরকারী কীটতত্ত্ববিদ অনেক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আলু শুকান বালির দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে, প্রজাপতি আলুর চোখের নিকট ডিম পাড়িতে পারে না। তজ্জন্য আলুর কোন প্রকার ক্ষতি হয় না, ১৯০৯ সাল হইতে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ পাটনায় বালি দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া আলু বাঁচাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ১৯১০ সালে ৫০ মণ এবং ১৯১১ সালে ১০০ মণ আলু উপরোক্ত উপায়ে পাটনায় চৈত্র মাস হইতে আশ্বিন মাস অবধি রাখা হইয়াছিল। উহা হইতে বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছিল। বালির নীচে রক্ষিত আলু পুরা হিসাবে পাওয়া গিয়াছিল অর্থাৎ পোকার উপদ্রবে অপচয় না হইলে ১০০ মণে যত মণ পাওয়া যাইত ইহাতেও সেই হিসাবে পাওয়া গিয়াছিল। গুদামে কিছু দিন আলু রাখিলে শুকাইয়া যাইবার দরুণ, ইহার ওজন বিশেষ কমিয়া যায়। সংরক্ষিত আলুর ওজন সেই পরিমাণে ঘাটতি হইয়াছিল মাত্র। গত ১৯১০ সালে পাটনাতে ২০০ শত চাষী প্রায় ৮৪৩০ মণ আলু উপরোক্ত উপায়ে রাখিয়াছিল, তাহারা ইহাতে বিশেষ উপকার পাইয়াছিল। কিন্তু যাহারা এই নিয়মের মতে কাজ করে নাই তাহাদের আলু জ্যৈষ্ঠ মাসের ভিতরেই পোকার দ্বারা নিঃশেষিত হইয়াছিল। বালি সংগ্রহ করা এবং মাঝে মাঝে আলুর বাছানি খরচ এমন কিছু বেশী নহে এবং পোকা লাগা জায়গায় এইরূপ উপায়ে আলু বাঁচাইয়া বীজ স্বরূপ বেচিতে পারিলে বিশেষ লাভ হয়। গত ১৯১০ ও ১৯১১ সালে যখন পাটনায় সমস্ত গুদামে এই পোকা, আলুর বিস্তর ক্ষতি করিতেছিল তখন সরকারী তরফ হইতে ৯৬৲ টাকা খরচ করিয়া ৭৫ মণ আলু ৬ মাসের জন্য উপরোক্ত উপায়ে রাখা হইয়াছিল এবং আশ্বিন মাসে উহা ২৮৩৲ টাকায় বিক্রয়

করা হইয়াছিল। অর্থাৎ গুদাম ভাড়া ও বাছানি খরচ বাদে (চাষীর এই বাবদ কিছুই খরচ করিতে হয় না) মণ করা ২॥• টাকা হারে লাভ হইয়াছিল। ইহা হইতে বালির দাম, চ্যাটাইয়ের দাম, বাছানি খরচ প্রভৃতি যদি মণ করা ॥• আনা হিসাবে বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলেও মণ করা ২৲ টাকা লাভ থাকে।

সাবধানতা—আলু রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

১। যে গুদামে আলু রাখা যাইবে তাহার অবস্থা ভাল হওয়া উচিত। যেন ছাদ হইতে বর্ষার জল না পড়ে। ঘরটি ঠাণ্ডা ও দেওয়াল শুকান হইলেই ভাল। আলু রাখিবার আগে ঘরটি ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লওয়া উচিত যেন আগে হইতেই ইহার ভিতর প্রজাপতি না থাকিতে পারে।

২। গুদামের মেজে মাটি হইতে যত উঁচু হয় ততই ভাল এবং ইহা দেখা উচিত যে ইহা যেন কোন সময়ে এমন কি বর্ষাকালেও সেঁতসেঁতে না হয়।

৩। আলু গুদামে তুলিবার আগেই ইহাকে ভাল করিয়া বাছিয়া লওয়া উচিত। পচা বা পোকালাগা আলুগুলি বাছিয়া মাটীর নীচে পুতিয়া ফেলা উচিত। ইহা ভাল আলুর সহিত যেন গুদামের ভিতর না যায়।

৪। আগে হইতে নদীর বালি কিম্বা অন্য কোন বালি খুব উত্তম রূপে শুকাইয়া রাখা উচিত। আলু গুদামজাত হইলে ঐ শুকান বালির দ্বারা আলুর প্রত্যেক গাদাটী এমন সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া রাখা উচিত যে বালীর ভিতর হইতে একটী আলুও যেন বাহির হইয়া না থাকে। আলুর গাদা গুলি এক হাতের অধিক উচ্চ না হইলেই ভাল হয়।

৫। মাঝে মাঝে বালির নীচে হইতে আলুর গাদা বাহির করিয়া পচা ও পোকা ধরা আলু বাছা উচিত এবং ঐরূপ খারাপ আলুকে মাটীর নীচে পুতিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। বাছা হইয়া যাইলে প্রত্যেক গাদা পুনরায় বালির দ্বারা পূর্ব্বেকার মতন ঢাকিয়া রাখা উচিত।

যাঁহারা উপরোক্ত উপায়ে আলু রাখিতে ইচ্ছুক তাঁহারা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখিলে ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিতে ও এই বিষয়ে সাহায্য করিতে বিশেষ সুখী জ্ঞান করিবেন। কোন নূতন জায়গায় এই পোকার আবির্ভাবের সংবাদ পাইলে উক্ত ব্যক্তি বিশেষ বাধিত হইবেন।

ই, জে, উডহাউস্ এম, এ ; এফ্, এল, এস,
ইকনমিক বটানিষ্ট, বেঙ্গল, সাবোর। ই, আই, আর (লুপ লাইন)

N.B.—আলুর পোকার চিত্র ও বিশেষ বিবরণ বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ হইতে প্রকাশিত "ফসলের পোকা" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য। মূল্য ১।• টাকা, কৃষক অফিসে পাওয়া যায়।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

বঙ্গদেশে তুলার চাষ

(তুলা তত্ত্ববিদ জি সেরার্ড সাহেবের অভিমত)

১৯১০-১১ সালে তুলা তত্ত্ববিদ তুলা চাষের পরীক্ষা-ক্ষেত্রগুলি পরিদর্শন করিয়া বঙ্গে তুলাচাষ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বড় কিছু আশাপ্রদ নহে।

চুঁচড়া ক্ষেত্রে দুইটি চৌকায় বুড়ী ও কাম্বোডিয়া তুলা তিনি ভালরূপ জন্মিতে দেখিয়াছেন। সেই দুইটি চৌকা পুকুরের পাঁকমাটি ও জলজ উদ্ভিদ সার ফেলিয়া খুব উঁচু করা ও তাহাতে সারের মাত্রা খুব অধিক। জল বসিবার কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু সাধারণতঃ বাঙলার সর্ব্বত্র এইরূপ কতটুকু জমি মিলিতে পারে সুতরাং ঐ দুই চৌকায় উৎপন্ন তুলার ফলাফল লইয়া বিচার করা চলে না। তিনি আরও বলেন যে, এই দুই স্থানে তুলাচাষ না করিয়া কলা বাগান করিলে লাভ অধিক হইত। সাধারণ সমতল জমির চৌকাগুলিতে তুলা ভাল জন্মায় নাই। সেগুলি ধান জমির সহিত সমতল সুতরাং তাহাতে কিছু জলবসা, তাঁহার মতে সে জমিতে ধান চাষ করাই ভাল। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় তুলারও পরীক্ষা হইতেছিল। স্থানীয় তুলা চাষে কোন লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ শীতের শেষে তাহাদের ফুল হইতে সুরু হইল, গ্রীষ্ম ভিন্ন ফলগুলি পাকিবে না কিন্তু গরমে ভাল তুলা হওয়া অসম্ভব। এরূপ স্থলে স্থানীয় তুলার আবাদ না করিয়া ধান কিম্বা পাটের চাষ করাই সুযুক্তি। দেশিলা ও বগিলা এই দুই জাতীয় তুলার আবাদ হইয়াছিল ইহা আরও দেরীতে পাকে এবং দীর্ঘ কাল ক্ষেতে থাকা হেতু অসুবিধা হয়। এই সকল বিশেষ কারণ আছে বলিয়া তাঁহার মতে বাঙলায় তুলা চাষের সুবিধা হওয়া কঠিন। তবে কাম্বোডিয়া ও বুড়ীর আবাদ দীর্ঘ কাল ধরিয়া করিতে করিতে উক্ত দুইটির চাষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান

পাওয়া যাইতে পারিবে এবং কি প্রকার জল, হাওয়া বা মাটি ইহার চাষে আবশ্যক তাহা নিরাকরণ করা সম্ভবপর হইবে। হাজারিবাগ রিফরমেটারি স্কুলের ক্ষেতেই এই তুলার পরীক্ষা হইয়াছিল।

তিনি যতগুলি ক্ষেত্র দেখিয়াছেন কোন স্থানে তুলা চাষ আশানুরূপ দেখিতে পান নাই—ডুমরাঁও, বর্দ্ধমান ও বাঁকীপুর সকল স্থানেই তুলা চাষ ব্যর্থ হইয়াছে।

বুড়ী, কম্বোডিয়া, দেশিলা, বগিলা এই কয় জাতীয় তুলা লইয়াই পরীক্ষা হইতেছে। এই কয় জাতীয় তুলার মধ্যে বুড়ী তুলার চাষই কথঞ্চিৎ লাভজনক বলিয়া মনে হয়। বাঁকীপুরে বুড়ীতুলার চাষে এক একরে ৩১৲ টাকা লাভ হইয়াছে।

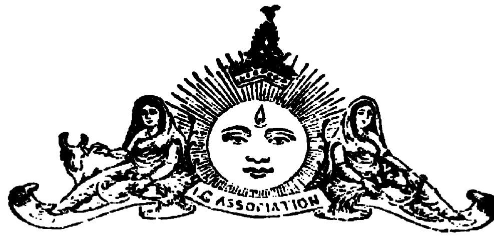
হাজারিবাগে তুলার আবাদ কতকটা যে আশাপ্রদ তাহা নিম্নে ১৯১০-১১ সালের এক একর বা তিন বিঘায় পরীক্ষার ফল দেখিলে বুঝা যায়,—

নাম	চাষে খরচ	উৎপন্ন তুলা	মূল্য	লাভ
বুড়ী	৪৬'৶০	৫/ মণ	৬০৲	১৩৸/০
কাম্বোডিয়া	৪৬।৶০	৫/	৬০৲	১৩৸/০
দেশিলা	৪৬।৶০	৪/	”	১৸/০

এখানে উৎপন্ন বুড়ী তুলা সুরাট তুলার প্রায় সমান দাঁড়াইয়াছে। রঙ কিছু ময়লা। সেইজন্য সুরাটের দর যখন এক কাণ্ডি ৩৩৫৲ টাকা, বুড়ীর দর ৩৪১৲ টাকা। রঙের জন্য কেবল ৫৲ টাকা দর কমিল।

কাম্বোডিয়ার তুলার আঁস নরম, চিক্কণ কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট। ইহা ব্রোচ তুলার প্রায় সমান, ব্রোচের দর ৩৩১৲ টাকা এক কাণ্ডি এবং কাম্বোডিয়ার দর ৩২৫৲ টাকা কাণ্ডি, রঙ ও ছোট আঁসের জন্য দর ৫৲ টাকার কিছু কম।

বুড়ী তুলার হাজারিবাগের মাটিতে অনেক উন্নতি হইয়াছে, মাত্র একটু রঙ খারাপ হইয়াছে কিন্তু কাম্বোডিয়ার রঙ এবং আঁসের দৈর্ঘ্য দুই খারাপ হইয়াছে। কি প্রকার মাটি ইহার চাষের জন্য আবশ্যক তাহা নিরাকরণ করা বোধ হয় ভবিষ্যতে সম্ভবপর হইবে।



চৈত্র, ১৩১৮ সাল।

কৃষি-প্রতিষ্ঠা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন কৃষিকাজ কে করিবে? আমরা ভদ্র সন্তান লেখাপড়া শিখিয়া এখন কি চাষার কার্য্য করিব? কিন্তু তাঁহারা যদি ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন তবেই বুঝিতে পারিবেন যে, কৃষিকার্য্য অনাদরের জিনিষ নহে। ইহা উচ্চতম বিজ্ঞানের একটী অঙ্গ। বৈদিক সময়ে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ স্বহস্তে হল চালনা করিতেন। কৃষিশাস্ত্র ধ্যাননিরত উপনিষদ প্রণেতা ঋষিগণেরই মস্তিষ্ক নিঃসৃত জ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশ। মহামুনি পরাশর প্রণীত কৃষি-সংহিতাই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ, পৌরাণিক যুগে আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, ধনৈশ্বর্য্যের দেবী লক্ষ্মীকে লাভ করিতে হইলে কৃষিকার্য্যই তাহার উৎকৃষ্ট পন্থা ছিল; তাই মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের হল ফলকে উৎপন্না হইয়া লক্ষ্মী সীতা নাম প্রাপ্ত হইলেন, তৎসময়ের কৃষি-উৎপন্না ভারতলক্ষ্মী রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হওয়ার এই প্রধান কারণ দেখিতে পাই। তখন লঙ্কাধিপতি রাবণের সভায় ডাক নামক একজন বিখ্যাত কৃষিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ছিলেন। ডাকের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন, যথা—

ডাকে বলে শুনহে রাবণ,
কলা রোবে না আষাঢ় শ্রাবণ।
রোপিলে কলা হবে না,
গাছে কলার বয়স পাবে না।

• বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে উজ্জয়িনী নগরের মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় জ্যোতিষরাজ্ঞী খনাকে দেখিতে

পাই। তাঁহার কৃষি-পাণ্ডিত্য কে না অবগত আছেন। যাঁহার অপূর্ব কৃষিজ্ঞান পল্লীগ্রামের নিরক্ষর কৃষকগণের মুখে নিত্য গীত হইয়া থাকে যথাঃ—"ক্ষেত্রের কোণা. বাণিজ্যের সোণা" জ্যোতিষরাজ্ঞীর এই বাক্য দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি বাণিজ্য স্বর্ণপ্রসূ হইলেও ক্ষেত্রের এক কোণায় অর্থাৎ প্রান্তে তাহা উৎপন্ন হইতে পারে। বাণিজ্য প্রভূত অর্থ সাপেক্ষ এবং লোকসানের সম্ভবও আছে বলিয়া বোধ হয় এরূপ বলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণগণ উপদিষ্ট, বিশ্বামিত্র প্রদর্শিত, পরাশর লিখিত, খনা ও ডাক পোষিত ও রাজর্ষি জনক সেবিত কৃষিকার্য্য এখন বর্ণজ্ঞান বিরহিত সমাজের নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের হস্তে পড়িয়া হীন কার্য্য বলিয়া গণিত হইতেছে। বর্ত্তমান জমিদারগণ আর—রাজর্ষি জনকের আদর্শ মনশ্চক্ষুর সামনে রাখেন না। পুণ্যভূমি ভারতের উজ্জ্বল রত্ন সকল বহুকাল হইল অন্তর্হিত হইয়াছে। নিদর্শন গিয়াছে, স্মৃতিও গেল কেন? অনেকের নিদর্শন যায়, স্মৃতি থাকে, আমাদের নিদর্শন গেল; স্মৃতিও গেল হইয়াছে, কারণ আমরা আর নিজের ইচ্ছামত কোন কাজ করিতে পারি না। অনুকরণপ্রিয় হইয়াছি, দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি না কেন! আমেরিকান, জর্ম্মান, বেলজিয়ান নূতন কৃষি-পদ্ধতি প্রণয়ন করিতেছেন। আমরা প্রণয়ন করিতে পারি না—অনুকরণ করি—মন্দের অনুকরণ করি—ভালর অনুকরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না কেন? জমিদারগণ চাষ করেন না। চাষীদের সহায়তাও করেন না, উহারা খাটিয়া উৎপন্ন করে। জমি ভাল করিলে জমিদারগণ খাজনা বাড়ান, কোন কৃষকের একটু উন্নতি হইলে জমিদার ও মহাজনে তাহার সম্পদ বিভাগ করিয়া লয়েন, তাঁহারা আলস্যে বিলাস করেন, সংসারের ভোগ্যবস্তু ভোগ করেন। যাহারা খাটিয়া তোমাদিগকে খাওয়াইল, ভোগ বিলাসের যোগাড় করিয়া দিল, অনাবৃষ্টির বৎসর তাহারা দুর্ভিক্ষে মরিল, অল্লাহারে ম্যালেরিয়ায় মরিল। এই সব দেখিয়া বিলাতের শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের নেতা মহামতি কেয়ার হার্ডি সেবার ঢাকায় পরিভ্রমণকালে বলিয়াছিলেন যে, অলস জমিদারগণের বিলাসের অর্থ গরীব শ্রমজীবি প্রজাদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত।

আমরা যদি এখন গোলামী ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হই তবে আমাদিগের পল্লীগ্রামের অবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। আর্থিক অবস্থা উন্নত হইবে, শিল্প স্বাস্থ্যের উদ্ধার হইবে। আমাদিগকে কৃষিকার্য্য করিতে হইবে বলিয়া সমাজের বর্ত্তমান কৃষকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আমরা তাহাদিগের স্থান অধিকার করিতে ইচ্ছুক নহি। আর কেহ এরূপ ইচ্ছা করিলেও, তাহার শরীর তাহাকে অনুমতি দিবে না। শীতাতপ সহিষ্ণু কৃষকের শারীরিক বলে ও আমাদের মানসিক জ্ঞানের সম্মিলনে এক অভিনব কৃষক প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহারা কোন্ কোন্

উপায় অবলম্বনে ক্ষেত্র কর্ষণ, বীজ বপন, ত্রিশ কোটী লোকের আহার্য্য সংরক্ষণ এবং ভারত উৎপন্ন শস্য দ্বারা বৈদেশিক অর্থ দেশে আনয়ন করিতে পারিবে তাহার উপায় চিন্তা করিবে। ইহা দেশী ও বিদেশী কৃষিপদ্ধতির আলোচনা, বীজ রক্ষার আবশ্যকতা এবং উপায় চিন্তা, স্বদেশে বীজ ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার উপর একান্ত নির্ভর করে। বারান্তরে আমরা এই বিষয় আলোচনা করিয়া ইহার যথার্থতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)।

পত্রাদি

আবাদের জমি—

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, সম্পাদক, বান্ধব কোম্পানী, কৈলাসহর, (শ্রীহট্ট)

নিম্নে স্বাস্থ্যকর স্থানের একটি বিবরণী প্রকাশিত হইল। আপনি স্বাক্ষরকারীর নিকট অনুসন্ধান করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

কৈলাসহরের জল বায়ু ভাল। ঐ প্রদেশে যেখানেই জঙ্গল আবাদ হইয়াছে, সেখানেই জল বায়ু ভাল হইতে দেখা গিয়াছে। কৈলাসহর স্বাধীন ত্রিপুরার একটি ডিভিসন। ইহা পার্ব্বত্য লোকদিগের সঙ্গে বাঙ্গালীর কারবারের একটি বিস্তৃত স্থান। এই স্থান আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সমসের নগর ষ্টেশন হইতে বাঁধা রাস্তায় প্রায় ৮ মাইল। এখন হাঁটিয়া যাইতে হয় তিন চার মাস পরে এই রাস্তায় গো-যানের ব্যবহার হইবে বলিয়াও আশা করা যায়। টিলাগাঁ ষ্টেসন হইতে নৌকাতেও যাতায়তে চলে, কিন্তু নৌকায় উজাইয়া যাইতেও সময় ও খরচ কিছু বেশী লাগে।

আবাদের স্থান কৈলাসহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে। ধান, পাট, ইক্ষু, তুলা, তিল, সরিষা, ইত্যাদি ফসল, এবং আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, পেঁপে, কমলা, কলা, আনারস, সুপারী প্রভৃতি ফলবৃক্ষ এখানে জন্মিয়া থাকে। ভূমি এত উর্ব্বর যে, প্রথম কয়েক বৎসর কোন প্রকার সারের প্রয়োজন হয় না। আবাদী ভূমির উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমায় তিনটি ছড়া বা ক্ষুদ্র সরিৎ প্রবাহিত হইয়া মনু নদীতে পড়িয়াছে। মনু নদী কৈলাসহরের এক প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া ত্রিশ কি বত্রিশ মাইল দূরে বরাক নদীতে পড়িয়াছে। বরাক নদী দিয়া কলিকাতা হইতে কাছাড় পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে জাহাজ বারমাস চলে।

অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালাতেই লিখিবেন, নতুবা উত্তর পাইতে অত্যধিক বিলম্ব হইবে। স্থানটি কলিকাতা হইতে সমসের নগর পর্য্যন্ত রেলওয়ে ও ষ্টিমারের ভাড়া ৫।৶১০ আনা। গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর যাইয়া আবার গাড়ী পাওয়া যায়।

আপনার Catalogue আদি যথা সময়ে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। আমি কৃষকের স্পেশাল মেম্বর নিশ্চয় হইব এবং বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম হইতে আরম্ভ করিব। তবে অর্ডার পাঠাইবার পূর্ব্বে কয়েকটী বিষয় জানিবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় সবিনয় নিবেদন করিতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখিয়া বাধিত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। প্রত্যুত্তর জন্য অর্দ্ধ আনার টিকিট এতৎসহ পাঠাইলাম।

১। গবাদী পশুর খাদ্য গিনি ঘাস, জোয়ার, বিয়ানা ইত্যাদি ঘাস কোন সময় বুনিতে হয় এবং চাষের প্রণালী কি?

২। চাঁওলাইয়ের শাক যাহা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় তাহাকে আপনারা কি শাক বলেন এবং তাহা আপনাদের আফিসে পাওয়া যায় কি না।

আমার ৩৫০/ সাড়ে তিন শত বিঘা জমি আছে কিন্তু আমার দেশীয় লাঙ্গলে গরু মহিষ দ্বারা মুনিস দিয়া চাষ করাইয়া মজুর খরচ এত বেশী পড়িয়া যাইতেছে যে আমি আয় অপেক্ষা ব্যয় বৎসর বৎসর বেশী হওয়ায় বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি। বাধ্য হইয়া আমাকে জমি আধি ভাগে ও খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আমার পেনসন লইয়া চাষ আবাদ করিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। আমাদের দেশের জমিতে সকল প্রকার ধান্য, চৈতালী ও শাক সব্জী ও তরকারি প্রচুর জন্মে, কেবল মজুর খাটা লোকের বড় অভাব। এমন লাঙ্গল যদি পাওয়া যায় যাহাতে গো মহিষের প্রয়োজন হয় না অথচ মজুর দ্বারা অনায়াসে চালিত হয় তাহা হইলে আরও ভাল হয়। আমি আপনার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিব।

আমাদের দেশে কপি ইত্যাদি তরকারী এত বেশী হয় যে বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া প্রতিদিন কলিকাতায় চালান যাইতেছে। পটলের আবাদ এত বেশী আর কোথাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনার যদি কোন বন্ধু-বান্ধব ইহাতে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাতেও আমি ইচ্ছুক আছি। আমার চাষের স্থানে ঘরবাড়ী চাকর ইত্যাদি সমস্ত আছে। বহরমপুর হইতে অতি নিকট, জল বায়ু ভাল। কলিকাতার নিকট—প্রত্যহ রাত্রি ১১টার সময় জিনিষ চালান দিলে প্রাতে কলিকাতায় পৌঁছে। যদি কেহ যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন তবে লিখিবেন আমি তাঁহাকে আনাইয়া সমস্ত দেখাইব। আমার বাসবাটী খাগড়ায়। বাটীতেও ভদ্রলোকের থাকিবার স্থান যথেষ্ট আছে।

উঃ—গিনি ঘাস বা অন্য ঘাসের চাষ বর্ষারম্ভেই আরম্ভ করিতে হয়। বাঙলা দেশে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বীজ করিতে হইবে। জমি ভালমতে চষিয়া সার দিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। বৃষ্টির জল না হইলে ক্ষেতে জল সেচন করিতে হইবে।

বিশেষ প্রণালী পশু খাদ্য পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। পুস্তক ভারতীয় কৃষি-সমিতি হইতে পাইবেন।

আপনি চাষের জন্য শিবপুর লাঙ্গল বা মেষ্টন লাঙ্গল ব্যবহার করিতে পারেন। শিবপুর লাঙ্গলের জন্য একটু জোরাল বলদের আবশ্যক কিন্তু জমিতে গভীর চাষ হইবে। মেষ্টন লাঙ্গল হাল্কা, ইহাতে কিন্তু আবাদ মন্দ হয় না। প্লানেট জুনিয়ার হো বা হাতে ঠেলা কোদালী ব্যবহারে লোকের অভাবের কতকটা প্রতিকার হইতে পারে। দাম অধিক নহে, হো নানা সাইজের আছে; সর্ব্বাপেক্ষা কম দামের প্লানেট জুনিয়ারের দাম ১৫৲ টাকা।

শিবপুর বা মেষ্টন লাঙ্গল সহজে মেরামত হইবে। প্লানেট জুনিয়ার মেরামত করিতে বিশেষ কোন অসুবিধা নাই।

দেশী লাঙ্গল ভালরূপে তৈয়ারি করিয়া লইলেও কাজ মন্দ চলিবে না। দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা শিবপুর বা মেষ্টন লাঙ্গল চালাইতে বিশেষ কোন মজুরির কম হইবে না। আপনার ইচ্ছামত আবশ্যকানুরূপ সহযোগী মিলিতে পারে।

লুসার্ণ—ইহা এক প্রকার ঘাস। গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, শূকর, এমন কি হাঁস; মুরগীরও পুষ্টিকর খাদ্য। সিংহলের কোন প্রদেশে এক স্থানে ৩০০ একর এই ঘাসের চাষের আবাদ করা হইতেছে। ২০০ শত একরে ঘাস জন্মিতেছে। ৩০০ একর বাঙ্গলার বিঘার পরিমাণে প্রায় এক হাজার বিঘা। ভারতে গবাদির খাদ্যোপযুক্ত নানা প্রকার ঘাসের অভাব নাই, কিন্তু এমন অনেক জায়গা আছে, যথায় বৎসরের মধ্যে দুই এক মাস ব্যতীত ঘাস মিলে না, কোন জায়গায় বা ঘাস আদৌ জন্মায় না, সে সকল জায়গার জন্য কাছে নিকটে লুসার্ণ বা গিনি ঘাসের চাষ করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

সার-সংগ্রহ

নব প্রণালীতে কৃষিশিক্ষা দিয়া আদর্শ কৃষকের জন্য কৃষি-বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি, তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং—এই মহাবাক্য দ্বারা জানা যায় যে, বাণিজ্যই ধনাগমের প্রধান উপায়, কৃষি তাহার নিম্নে, ও সর্ব্ব নিম্নে রাজ সেবার স্থান, তৎসত্বেও আমাদের দেশের যুবকেরা স্কুল কলেজে পড়িয়া বাণিজ্য ও কৃষির দিকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশে যাইয়া বহুকাল বেজায় খাটিয়া

অনেক কষ্টে চাকরির যোগাড় করিয়া বাসা খরচ বাদে মাসিক ২০৲।২৫৲ টাকা আয় করিতে লালায়িত, তখন দেশে এক বিঘা জমি আলু ও পাটের চাষ করিলে বাড়ী বসিয়া মাসিক অন্যূন ২৫৲ টাকা আয় হইতে পারে, সেই দেশের সন্তানগণের ঐরূপ কৃষি বিষয়ে অবহেলা করা বড়ই ক্ষোভের বিষয়, বাণিজ্য করিতে হইলেও কৃষি দ্রব্যাদির দরকার। সুতরাং কৃষিই সকল ধনাগমের মূল, অন্যদেশে অর্থ ব্যয় করিয়া কৃষিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া কৃষিতত্ত্ববিদ্ অর্থাৎ চাষা এই উপাধি লইতে ভদ্র সন্তানগণ লালায়িত, কিন্তু আমাদের দেশে চাষা বলিলে গালি দেওয়া হয়। ভদ্র সন্তানগণের উদাসীনতাই ইহার মূলীভূত কারণ।

জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের অধিবাসীগণ কৃষিকার্য্যের দ্বারা ভূরি পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন করতঃ যথেষ্ট ধনাগম করিয়া জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। সে দেশের জমি অপেক্ষা আমাদের দেশের জমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভারত মাতা চিরকালই রত্নপ্রসূতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, বিশেষতঃ বঙ্গের ভূমি ভারতের মধ্যে সকল দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বঙ্গের ভূমি এত উর্ব্বরা ছিল যে, এদেশের কৃষকগণ বিনা শিক্ষায় কৃষিকার্য্য করিয়া সুখস্বচ্ছন্দতায় পরিবার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল। প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এক্ষণে বঙ্গভূমির প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তজ্জন্য বঙ্গীয় কৃষককুল পূর্ব্ব প্রচলিত প্রণালীতে দিবারাত্র পরিশ্রমে কৃষিকার্য্য করিয়া উদর পূর্ণ করিতে পারিতেছে না। ঋণজালে জড়িত হইয়া চিরদিনের মত দারিদ্র দুঃখে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছে।

২। আমাদের দেশের কৃষককুলের কষ্ট হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী মফঃস্বলবাসী ভদ্র লোকেরও বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশীয় মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানের কিছু না কিছু জমা জমি আছে। ঐ জমা জমি কৃষকগণকে শস্য ভাগে অথবা খাজনায় বিলি করিয়া তদুৎপন্ন গ্রহণ করতঃ জীবন যাপন করিতে থাকেন। জমি অজন্মা নিবন্ধন তাহারা খাজনা অথবা ভাগ কিছুই পান না ; পাইলেও অতি সামান্য খাজনা ও ভাগ না পাওয়ায় আদালতের সাহায্য লইয়া হয়রাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কৃষককুল আমাদের অর্জ্জনক্ষম পুত্র, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, জমিদার ও ব্যবসাদার সকলেই তাহাদের মুখাপেক্ষী, তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় দেশ ক্রমে অবনতির অন্তিম সীমায় উপস্থিত হইতেছে।

৩। বঙ্গীয় কৃষককুল অতিরিক্ত লাভের আশায় অধিক পরিমাণে জমি কর্ষণ করায় গোচারণের মাঠ না থাকায় ও গরু, মহিষ অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে উপরোক্ত গরু, মহিষ ও গাভী শীর্ণ হইয়া যাইতেছে ; যে দেশ পূর্ব্বতন রাজপুরুষ সায়েস্তা খাঁ নবাবের সময় টাকায় ৮/ মণ করিয়া চাউল, ঘৃত টাকায় /৮ সের ও দুগ্ধ টাকায় ১/ মণ ছিল, এক্ষণে সেই দেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ

দেখা দিতেছে ও কত লোক অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে ও এক্ষণে টাকায় ⁄৮ সের চাউল ঘৃত টাকায় ⁄৸০ পোয়া ও দুগ্ধ ⁄৪ সের বিক্রয় হইতেছে।

৪। বঙ্গ সন্তানগণ উপযুক্ত খাদ্য অভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অকাল মৃত্যু দেখা দিতেছে, বাঙ্গালী ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইতেছে, যে বঙ্গভূমি এতদিন ধরিয়া পাট, ধান্য, আলু, রবিখন্দ প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মাইতেছে, সেই বঙ্গসন্তানগণের এরূপ শোচনীয় দশা হইবার কারণ কি অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, একমাত্র নবপ্রবর্ত্তিত কৃষিকার্য্যের অনভিজ্ঞতার জন্যই এই দুঃখ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে।

৫। আমাদের দেশের সহৃদয় স্বদেশ হিতৈষী পূজ্যপাদ নেতাগণ যুবকদিগের সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য নূতন কলেজ, শিল্প শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মেডিকেল কলেজ, সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংস্কৃত কলেজ ও আইন শিক্ষা দেওয়ার জন্য কলেজ প্রতিদিনই স্থাপন করিতেছেন। এতদ্দেশের শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর, কৃষিকার্য্যই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু যে দেশের অধিবাসী শতকরা ৯০ জন কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া আছে, যাহাদের উপর আমাদের জীবন, মরণ নির্ভর করে, তাহাদের সাধারণ কৃষি-শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয়, ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমাদের সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে ৪।৫টী কৃষি ফারম করিয়াছেন ও প্রতি ফারমে ৭৮ জন প্রাকৃটিকেল কৃষি শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষানবিস্ গ্রহণ করিয়া থাকেন ও ক্লাস খুলিয়াছেন। যে দেশে ৫ কোটী লোক কৃষিজীবি ও যাহাদের মধ্যে অধিকাংশ নিরক্ষর এবং কৃষিজীবি, সে দেশে ঐরূপ অপ্রচুর শিক্ষা কোনক্রমেই কার্য্যকর হইতে পারে না।

৬। যদি স্বদেশ হিতৈষী পূজ্যপাদ নেতাগণ প্রতি জেলায় ও মহকুমায় আদর্শ কৃষকের জন্য কৃষি-বিদ্যালয় ও প্রতি পল্লীতে কৃষি-পাঠশালা করিয়া কৃষিশিক্ষা না দেন তবে বঙ্গীয় কৃষককুলের দুঃখ, দুর্দ্দশা দূর হইবার কোনই উপায় নাই। অভিনব প্রণালীতে কৃষকগণ শিক্ষিত হইয়া কৃষিকার্য্য করিলে ও গবাদির উন্নতিকল্পে শিক্ষিত হইলে বঙ্গসন্তান সত্বরই ধনধান্যে সমৃদ্ধ হইয়া সুখ লাভ করিতে পারে, ঐরূপ ভাবে কৃষিশিক্ষা প্রচলিত হইলে সাধারণ শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে।

৭। জাপানবাসীগণ নবপ্রবর্ত্তিত কৃষিকার্য্য করিয়া যদি ৩০ বৎসরের ঊর্দ্ধ কালের মধ্যে ধনে মানে জগতের সুসভ্য জাতির সমকক্ষ হইতে পারে, তবে আমাদেরও ঐরূপ আশা করা দুরাশা নহে।

শ্রীরাধামাধব দাস মোহন্ত, চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

বৈশাখ মাস।

সব্জীবাগান।—মাখন সীম, বরবটি, লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত। টেপারি কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেপারি বীজ বসাইবার এখন সময় যায় নাই। শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালা ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজবপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ-ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া রোপণ করে।

কৃষিক্ষেত্র।—বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে আশুধান্য, ধনিচা, অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময় রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত। যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

কিঞ্চিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাখের শেষ ভাগে গাছগুলি বড় হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ-ইক্ষু বা আখের টাঁক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ইক্ষুক্ষেতে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্যক হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু ও ওল এই সময়ে বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা, বাঁশ ও তুঁত গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি এই সময় দিতে হয়।

ফুল বাগান।—বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারান্থাস্, দোপাটী, গ্লোব আমারান্থাস্ সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মাটিনিয়াডায়াণ্ড্রা, মেরিগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেল ও যুঁইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপরিয্যাপ্ত ফুল ফুটিবে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

আদা, হলুদ, আর্টিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে সেগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।